JOTINDRO NATH DUTTA
JANMABHUMI OFFICE
[illegible]

ওঁ

পুনঃ প্রাণান ধারয়তি পুনঃ প্রাণদমুচ্যতে

গীতগোবিন্দে শ্যামবর্ণ।

কি আশ্চর্য্য জয়দেবের ভক্তি মাধুর্য্য!—ভক্তিরসে—প্রেমরসে এরূপ মধুর ভাব বিকশিত করা যথার্থ কবিত্বপূর্ণ হৃদয় ব্যতীত অন্য হৃদয়ের সাধ্য নাই। জয়বে গোবিন্দের ভক্ত—তিনি গোবিন্দের গান গাহিতেছেন, গোবিন্দকে তিনি কবিতায় ফুটাইবেন, মহা ঘটা করিয়া প্রকাশ করিবেন। ঠিক কৃতকার্য্য হইয়াছেন।—কারণ প্রথমেই তিনি নিম্নলিখিত কাব্য ধ্বনিত করতঃ শ্রী গীত গোবিন্দ আরম্ভ করিতেছেন :—

"মেঘৈর্মেদুরমম্বরং বনভুবঃ শ্যামাস্তমালদ্রুমৈঃ।
নক্তং ভীরুরয়ং ত্বমেব তদিমং রাধে গৃহং প্রাপয়।
ইত্থং নন্দনিদেশতশ্চলিতয়োঃ প্রত্যধ্বকুঞ্জদ্রুমং।
রাধামাধবয়োর্জয়ন্তি যমুনাকূলে রহঃ কেলয়ঃ। ১"

কবি অম্বরকে মেঘছায়ে মেদুর করিলেন, তমালদ্রুমসমূহের দ্বারা বনভূমি ছায়াঘোর করিলেন। এইরূপে যমুনাতীরে রাধাকৃষ্ণের বিজনালাপের সুবিধা করিয়া দিলেন। শেষে বলিলেন—

"রাধামাধবয়োর্জয়ন্তি যমুনাকূলে রহঃকেলয়ঃ।"

'যমুনাকূলে রাধামাধবের যে রহঃকেলি জয়লাভ করুক।' তাঁহার শেষোক্ত এই 'রহঃকেলি' কথাতে শ্রীকৃষ্ণের ছায়াময় শ্যামমাধুরী অন্ধকারমাধুর্য্য যেন পূর্ণতা প্রাপ্ত হইয়াছে।—কবি জয়দেব গীতগোবিন্দের প্রথমেই তাঁহার প্রথম

কবিতার দ্বারাই তাঁহার শ্যামভক্তির রসোচ্ছ্বাসজনিত কাব্যের পরাকাষ্ঠা দেখাইতে সমর্থ হইয়াছেন :—

শ্যামভক্তিতে তাঁহার প্রথম কবিতাটী একেবারে শ্যামবর্ণ আকার ধরিয়াছে!—একে অম্বরকে মেঘশ্যাম অর্থাৎ অন্ধকার করিলেন, পরে তমালদ্রুমের দ্বারা বনভূমি শ্যামবর্ণ করিলেন, তারপরে যমুনাও শ্যাম, তারপরে গোবিন্দ নিজে শ্যাম, জয়দেব যেন একেবারে শ্যামে মগ্ন হইয়া গীতগোবিন্দ লিখিতে—গাহিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। পুনশ্চ—এই শ্যামঘোর শ্যামভাবে—অন্ধকার ছায়াময়ভাবে রহঃকেলি কথাটীও যুক্তিযুক্ত হইয়াছে, ঠিক শোভা পাইয়াছে। কারণ কৃষ্ণবর্ণের ভাবই হইতেছে রহস-ভাব—প্রকাশ ভাব—গূঢ়ভাব—বর্ণহীনের ভাব—অবর্ণের ভাব।—সেই বর্ণহীনতার দ্বেষহিংসাবিরহিত স্নিগ্ধবিজনছায়ায় রহঃকেলিমাধুরী যথার্থ ভক্তের বিজনপ্রদেশে দেখা দেয়; তাহা ভক্তের ভক্তিপূর্ণ দৃষ্টিতে 'রণ্‌ট্‌গেন' রশ্মির ন্যায় অন্ধকার আবরণ ভেদ করিয়া দেখা দেয়। ভক্তই তাই ভক্তিপূর্ণ হৃদয়ে রহঃকেলি দেখিতে পায়।

এই শেষ 'রহঃকেলি' কথাটী যত ভাবি, ততই প্রাণ প্রেমভক্তিতে যেন আপ্লুত হইয়া উঠে।—কথাটী অনন্তরসে ভরা—এক অমূল্য কথা!—কারণ ভগবান ভক্তের সঙ্গে বিজনে ভক্তের অন্তরে গোপনে অবির্ভূত হয়েন ও ক্রীড়া করেন। সে তখন তাঁহার বিজন সহবাসজনিত আনন্দে তাঁহার সঙ্গে তন্ময় ও বিলীন হইতে চায়। এই রহঃকেলির প্রাণ, বেদে, উপনিষদে ধ্বনিত দেখিতে পাই! সমগ্র হিন্দুশাস্ত্রে এই 'রহঃকেলির'ই মর্য্যাদা উপলব্ধ হইয়াছে। গূঢ় বিজনমন্ত্র হিন্দুজাতি যেমন ভালবাসে এমন অন্যজাতি ভালবাসে না। প্রাচীন ভারতের আর্য্যজাতি হইতেই বিজন গূঢ় ভাবমাধুরী, জগতে বিশেষভাবে প্রচারিত হয়।—আমাদের শাস্ত্রের যত কিছু মন্ত্র তাহাদের মুখ্য ভাবই হইতেছে বিজনে সেই গূঢ় পুরুষের সঙ্গসহবাস লাভের চেষ্টা, তাহারই জন্য প্রস্তুত হওয়া।—বিজনে সেই গূঢ় পুরুষের সঙ্গে আনন্দলীলা করা।

মানুষের দোষে সব ভাল ভাব খারাপ হইয়া যায়; এই আত্মা পরমাত্মার বিজনসহবাসের ভাব—রহঃকেলির ভাব মানুষের দোষেই বিকৃত হইয়া পড়ে;

নচেৎ ভাল লোক যে, সে ভাল দেখে; খারাপ লোক সে খারাপ দেখে।—মানুষের অমন ভাল 'বৈরাগ্য' কথা 'বৈরেগী' হইল; অমন ভাল 'ব্রাহ্ম' 'ব্রেহ্ম' হইল; অমন ভাল 'বৈষ্ণব' কথা 'বোষ্টোম' হইল, সেই জন্য যে ভাল দেখিতে চায়, তাহার অন্তরে বিজনে শুভদৃষ্টি চাই;—ভক্তিচক্ষে শুভদৃষ্টিতে যমুনাকূলে রাধামাধবেরও শুভসম্মিলন এই, দেখিতে পাই। ভক্তিমান কবিশ্রেষ্ঠ জয়দেবও সেই প্রেমভক্তিচক্ষে—যথার্থ ভক্তের চক্ষে রাধামাধবের সেই বিজন-সহবাস রহঃকেলির জয় দেখিলেন—বলিলেন—

"রাধামাধবয়োর্জয়ন্তি যমুনাকূলে রহঃকেলয়ঃ।"

শ্রীহিতেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

ভানুমতী।

(গল্প।)

১

লোকজন কেহ নাই। সম্মুখে নির্জ্জন রুদ্র বন। লোকালয় বিশক্রোশ দূরে। কাছে একটী ছোট নদী বহিয়া যাইতেছে। নদীর ওপারে একটী লোক—কে একজন দণ্ডায়মান হইয়া ক্ষণে ক্ষণে সজোরে যেন কাহারও অন্বেষণে ভেঁপু বাজাইয়া উঠিতেছে। ভেঁপুর রবে এপারের বন মধুর প্রতিধ্বনিত হইতেছে—বনের নির্জ্জনতা ঈষৎ অধীর হইয়া পড়িতেছে। সেই লোকটী এইরূপ কতকবার করিয়া সহসা কোথায় অন্তর্দ্ধান হইয়া পড়িল, আর দেখা গেল না। চতুর্দ্দিক সুগভীর নির্জ্জনতা প্রাপ্ত হইল।

২

সুরেশ একেলা নদীর ধারে যাইয়া বসিয়া আছে; তরঙ্গিনীর কুলুকুলু ধ্বনি শ্রবণ করিয়া সে মাঝে মাঝে বলিয়া উঠিতেছে :—

"হে তরঙ্গিণি! আমি ভেসে চ'লে যাই
তোমার সাথে আমি ভেসে চ'লে যাই;
আর এ পাঠশালায় গো কাজ নাই;
একা এসেছি চ'লে যাইব যে একাই।"

কিছুক্ষণ পরে সুগভীর বিজন বনের বিজনতা ভঙ্গ করিয়া কে বাঁশরী বাজাইতে লাগিল, কে গাহিতে লাগিল; কোনো সুরের ভাব উদাস, বিরহ-পীড়িত, কোনো সুরের ভাব হর্ষজড়িত। প্রকৃতির নিস্তব্ধতার মাঝে কে অপর একজন পুনরায় বাঁশী বাজাইয়া এক অপূর্ব্ব গীতিময়ী শ্রী প্রস্ফুটিত করিয়া তুলিতেছে; তাহার সঙ্গে অপর একটী কণ্ঠ সুর ধরিল! সুর শুনিয়া মনে হয় স্ত্রীকণ্ঠ। আহা বড় মধুর তান ধরিয়াছে, কিন্তু তানের মধ্যে তেমন হৃদয়ের নিগূঢ় প্রেমপ্রীতিময় মধুর আকর্ষণ নাই; তাহাতে মায়ামোহমিশ্রিত হর্ষের ভাব বিদ্যমান। বাঁশরীনিঃসৃত সুরের সহিত গানের সুরের এক অপরূপ সংযোগ হইতেছিল; বাঁশীর সুরের সহিত গানের সুরের প্রভেদ—পশ্চিমদিকের মেঘের সহিত পূর্ব্বদিকের মেঘের যেরূপ প্রভেদ। অমোঘ পশ্চিমদিকস্থ মেঘের যেন সংহতভাব বাঁশরীর সুরে ছিল; পূর্ব্বদিকস্থ মেঘের অসংহত ভাব যেন গানের মধ্যে ছিল। এইরূপে বিচিত্রভাবময়ী স্বরলীলা চলিতেছে, এমন সময়ে জটাধারী যোগী এক বন হইতে নদীতীরে আসিয়া দাঁড়াইল এবং সুরেশকে নদীতীরে বসিতে দেখিয়া তাহাকে ভীম-গম্ভীররবে বলিয়া উঠিল "সুরেশ! শিষ্যদের নদীর ধারে যাওয়া গুরুর অনুমতিবিনা নিষেধ আছে।" এই নিষেধবাণী সুরেশের বুকে বড় বাজিল। অবনত ও ম্রিয়মান হইয়া সুরেশ ধীরে ধীরে নিজকুটীরে ফিরিয়া গেল।

৩

সুরেশ চলিয়া গেল; সন্ন্যাসী জটাধারী ভীমকায় পুরুষটী সুরেশের জায়গায় নদীতীরে আসিয়া বসিল এবং আপন মনে বলিতে লাগিল:—

"শিষ্যদের আর কাউকে নদীরধারে যাইতে দেওয়া হবে না; কখন্ কোন্ নৌকা করিয়া এ বন ছাড়িয়া পলাইয়া যেতে পারে।"—এইরূপ বলিতেছে এমন সময়ে কালী নামে একটী স্ত্রীলোক তথায় আসিয়া উপস্থিত হইল।

জটাধারী। কি কালী? কেমন, সব ঠিক করতে পেরেছো?

কালী। বেশ আয়ত্ত কত্তে পেরেছি। তুমি নেশাটেশা ভাল ক'রে শিখিও।

জটাধারী। আমি প্রায় সব ঠিক করেছি। কিন্তু সুরেশকে তেমন ঠিক আয়ত্ত কত্তে পাচ্চিনে। অনেকটা পেরেছি তবু যেন পাচ্চিনে।

কালী। জানই তো ভাই ওকে আমাদের দেশের একজনের স্ত্রীলোকের বিয়ে করবার ইচ্ছে ছিল, নবগ্রামে কত ফিকির করা গিয়েছিল, কিছুতেই ফিকির খাটেনি।

জটাধারী। এবার তাইতো ফকিরের ব্রত ধরে ফকিরের ছদ্মবেশে ফিকির কত্তে ব'সেছি। নবগ্রাম থেকে লোকের দ্বারা গোপনে খবর পেয়েছি, সুরেশের যার সঙ্গে বিয়ে হ'য়ে গেছে; সুরেশ এতদিন বাড়ী যায় নি, দেখে, সুরেশের স্ত্রী কোথায় চ'লে গেছে, তার আর কিছু খোঁজখবর পাওয়া যাচ্চে না, হয়তো সে কুচরিত্রা হ'য়ে কুল হ'তে বেরিয়ে গেছে, নয়তো বাপের বাড়ী গেছে।—কিন্তু সেদিন তার বাপের বাড়ীর একজন লোক কুসুমপুরের হাটে এসেছিল, সেখানে লোকপরম্পরায় শুনলেম যে সে বাপের বাড়ীও যায় নি।

কালী। তা হ'লে ঠিকই হ'য়েছে; সে খারাপ হ'য়ে বেরিয়ে গেছে। যাক্, এইবার আমাদের বেশ সুবিয়ে হবে ভানুমতীর সঙ্গে বিয়ে দিতে।

জটাধারী। তা ঠিকই হবে, সুরেশ যে রকম লোক, ও যদি একবার নিজের স্ত্রীর চরিত্র সম্বন্ধে সন্দিহান হয় তো আর তাকে ঘরে নিচ্চে না, তা হ'লে ভানুমতীর সঙ্গে ঠিক চেষ্টা করবার পথ খুলে যাবে। কিন্তু সুরেশের ভানুমতীকে ভাল লাগলে তো? ভানুমতীর ইচ্ছে আছে, তা কি সুরেশ জানে? সুরেশের ইচ্ছে থাকলে তো? তা যাক্, ওকে নেশাটেশা অভ্যাস করিয়ে আমাদের বেশ আয়ত্তের মধ্যে এনে বাস্ ভানুমতীর সঙ্গে বিয়ের ঠিক বন্দোবস্ত কত্তে পারবো।—খরচটরচের আর ভাবনা নেই, সব ভানুমতীর ঠেয়ে পাওয়া যাবে।

কালী। আর সুরেশ একটু তয়ের হ'লেই আমরা আমড়াতলার বাগানটা তার ঠেয়ে কোনো রকম ক'রে ভোগা দিয়ে নেবো এখন।

জটাধারী। "হাঁ—সে বিষয়ে নিঃসন্দেহ। ঢের লোকের মাথা খেয়েছি, আমি আর ভোগা দিতে জানিনে?"—বলিয়াই জটাধারী গাঁজার এক টান

টানিয়া লইল। "সেই এক-ই সব এক ব্রহ্ম দ্বিতীয়ো নাস্তি; ভোঁগা টোগা সব সেই এক, পাপ পুণ্য সবই এক;" আবার মধ্যে গঞ্জিকা আর এক টান টানিয়া লইল; এবং তাহার মাহাত্ম্যে বলিয়া উঠিল "পাপ আবার কি? পাপ পুণ্য ব'লে কি আর পদার্থ আছে? ধর্ম্মাধর্ম্ম কিছুই নাই যা হচ্চে, যা কচ্চি সব সেই এক ব্রহ্ম করচেন!" বলিয়া গঞ্জিকামুখে রক্তবর্ণনেত্রদ্বয় বিস্ফারিত করিল। এমন সময়ে যমুনা নামে এক শিষ্যা তথায় আসিয়া বসিল ও গুরুজীকে নমস্কার করিল। কালী গুরুজীর কথায় সায় দিয়া বলিয়া উঠিল "ব্রহ্মময়ী মা তুমি সবই কচ্চো। পাপ করাচ্চো পাপ কচ্চি, পুণ্য করাচ্চো পুণ্য কচ্চি।—কচ্চি কি না কচ্চি কিছুই জানিনে। তুমিই কচ্চো।"

জটাধারী। "আবার কালী ওকথা বল্লি কেন? পাপ নেই তা পাপ করাচ্চো কি? পাপ পুণ্য সব মায়া।—সব এক ব্রহ্ম করচেন, পাপই বা কি পুণ্যই বা কি সব সেই এক।" বলিতে বলিতে আর এক ছিলিম গাঁজা কল্কে'তে দিয়া সজোরে এক টান দিলেন।

যমুনার মনে জটাধারীর সকল কথা যেন লাগিয়াও লাগিতেছে না; থেকে থেকে দীর্ঘনিশ্বাসসহকারে বলিয়া উঠিল—"এই সুরেশের স্ত্রী কোথায় চ'লে গেছে, এই সুরেশের বাপ মারা গেছে কতদিন, তার পিতৃহীন অবস্থায় তার আত্মীয়স্বজনেরা তার কত হানি ক'রেছে, তাকে কত প্রবঞ্চনা ক'রেছে। ভগবান তুমিই পিতৃহীনের পিতা, তুমিই অসহায়ের সহায়, তুমিই নিরুপায়ের উপায়, তুমিই নিরাশ্রয়ের আশ্রয়। সুরেশের মায়ের সঙ্গে আমি কত দিন কনকপুরে ছিলেম, তারপরে—

জটাধারী অমনি হঠাৎ যমুনাকে ভৎর্সনা করতঃ বলিল "ঢের হ'য়েছে ঢের হ'য়েছে তুই আর বকিস্‌নে।"

কালী। একে সঙ্গে ক'রে নিয়ে এলেম; এর সব ম'রে হ'রে গেছে: আমাদের সঙ্গে থেকে মনও ভাল থাক্‌বে আর আমাদের সন্ন্যাসীর পাঠশালায় ব্রহ্মচারিণী হ'য়ে থাক্‌বে, একটা দেশের কাজে লাগবে—কি থেকে থেকে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে, কি দুঃখুসুখের কথা কয় ভাললাগে না।—যা, যা, বাছা তুই ঘরে গিয়ে ব'সগে, আমরা বন থেকে কাঠটাঠ নিয়ে যাই, রান্না হবে না,

নৈলে বেহ্মচারী, বেহ্মচারিণীদের খেতে দেরী হ'য়ে যাবে। তোকে এইবার গুরুজীর পাঠশালায় প্রধান কর্ত্রী ক'রে দেবো। চল। এই বলিয়া সকলে চলিয়া গেল। যমুনা আপনার কুটীরে প্রস্থান করিল।

৪

বনের মধ্যে একটী ক্ষুদ্র শ্বেতশৈলখণ্ডোপরি কালী ও জটাধারী বসিয়া আছে। কালী কহিতেছে "দেখ যমুনার সামনে সব কথা বোলো না।"

জটাধারী। হাঁ হাঁ ঠিক 'ষটকর্ণৈর্ভিদ্যতে মন্ত্রঃ' ছয়কাণ হ'লে মন্ত্রভেদ হয়।

কালী। আমি তার জন্যে বলছিনে ওর মনে আমাদের কল কৌশল কিছুতেই বসবে না; কথায় বার্ত্তায় আমি অনেকবার টের পেয়েছি, আর শুনলে না সুরেশের মায়ের দিকে কেমন টান; ও সুরেশদের ঘর বড় ভাল-বাসে। ওর কেউ ছিল না ব'লে আমি ওকে সঙ্গে করে নিয়ে এসেছি। যাই হোক, আমাদের গোপনীয় কথাবার্ত্তা ওর কাছে বা ও কাছে থাকলে কিছু বোলো না, ও সুরেশকে সব ব'লে দেবে। আর তা নাও বল্‌তে পারে ও সুরেশের মায়ের খুব দূর সম্পর্কে কে হয়—সে খুব দূর সম্পর্ক। ও সুরেশকে জানে, কিন্তু সুরেশ ওকে জানে না; আর ও স্ত্রীলোক ব'লে লজ্জায় সুরেশের সঙ্গে কোনো কথাবার্ত্তা কয় না, বা কৈতেও যাবে না; না সে বিষয়ে কোনো ভয় নেই; তবু দরকার কি? ওর সামনে আমাদের গোপনীয় কথাবার্ত্তা, গুপ্তমন্ত্রাদি, গুপ্তমন্ত্রণাদির কথা না বলিলেই ভাল।

জটাধারী। তা ভাল। কাল সেই লোকটী আমাকে নবগ্রামের সব খবর দিয়ে গেল, আমার নিয়ম আছে, একটী লোক ঠিক ক'রেছি। ভেঁপু সেই লোকটী দূর হইতে বাজায়—ইশারা হচ্চে, যে, সে গুপ্ত খবর নিয়ে এসেছে।

এইবার উভয়ে উঠিয়া বন হইতে কতকগুলি কাষ্ঠ আহরণ করিয়া নিজ গুরুকুটীরে ফিরিলেন।

৫

যমুনা আপনার বিজন কুটীরে বসিয়া ভাবনাব্যাকুলিত চিত্তে আপনমনে কহিতেছে:—হে বিধাত! সুরেশ শুন্‌ছি এই বনের মধ্যে পুরুষদের পাঠশালায়

শিক্ষা করে; জটাধারী ফকিরচাঁদ গুরুজীর নিকট দীক্ষিত হ'য়ে বেহ্মচারী হ'য়ে এ বনে বাস করচে। দু একটী ছাত্রী এসে আমাকে বলে, রোজ কালী তার কাছে যায়। কি রকম বেহ্মচর্য্য তা বল্‌তে পারিনে; হায় গেরুয়া বসন পরলেই কি হয়। সুরেশ এ বনে কেমন ক'রে এলো? তার বিয়ে থা হ'য়েছে, কি ক'রে সে এখানে মর্ত্তে এলো? আমার কেই নেই ত্রিকূলে কেউ নেই, আমার সন্ন্যাসীনী হ'য়ে এ বনে মরা শোভা পায়; সে কেন এখানে মর্ত্তে এলো। সংসারের ফিকির কিছুই বুঝতে পারিনে; দেখচি ফকিরেও ফিকির করে। আমার সেই কবিতাগীতিটী মনে পড়ে, কতদিন প'ড়েছিলেম ঃ—

ধর্ম্মের কল বতাসে নড়ে
কেহ তাহারে দিতে পারে না ফাঁকি,
ধর্ম্মবলে প্রাণ আসে জড়ে
সব গেলে ধর্ম্ম শুধু থাকে বাকি,
বন্ধুসম করে কাজ কাছে থাকি।
ধর্ম্মের কল বাতাসে নড়ে।
ধর্ম্ম ঈশ্বরের ন্যায় দয়া বিধি
গুপ্তভাবে সুখৈশ্বর্য্য গড়ে,
ধর্ম্ম ধার্ম্মিকের যে অমূল্য নিধি
ধর্ম্মবলে তরে' সে ভববারিধি।
ধর্ম্মের কল বাতাসে নড়ে।
ধর্ম্মের কল বাতাসে নড়ে,
ধর্ম্ম অবিরত মহাশান্তি ধরে
সংসারের বিপ্লব ও ঝড়ে,
গুপ্তভাবে দুর্ব্বলেরে রক্ষা করে,—
অত্যাচার হয় যদি তার পরে,—
অসহায় হ'য়ে যদি পড়ে।
ধর্ম্মের কল বাতাসে নড়ে।

আমি ছেলেবেলায় সুরেশের মায়ের সঙ্গে কত ছড়াই যে পড়তাম, কত

গানই আওড়াতাম, সে দিন গেছে।—সুরেশের মা অত্যন্ত দয়াবতী ছিল, সুরেশের মার বাড়ীতে সুরেশের মেজমামী তিনি বিধবা, তাঁর অসহায়, দুর্ব্বল অবস্থায় অন্যেরা তাঁকে অনেক কষ্ট দিয়েছিল, অনেক ফাঁকি দিত; তাই শুনে সুরেশের মা সত্বর অশ্রুজল ফেলিতে ফেলিতে ভগবানের কাছে অসহায়, দুর্ব্বলের হ'য়ে কত প্রার্থনাই কর্ত্তেন। একদিন তাঁর গানে খাতায় একটী গান দেখিয়াছিলাম; সেটী অন্যায়ের প্রতিবিধান তরে ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা ঃ—

হায় অসহায় যারা
তাদের কত লোকে ফাঁকি দেয়!—
এই কি ভবের ধারা!—
তাদের কেড়েকুড়ে সবে নেয়।
হে ঈশ্বর হে ঈশ্বর
অন্যায়ের কর প্রতিবিধান,
তাদের কাতর স্বর
শ্রবণ কর করুণানিধান,—
অন্যায়ের কর প্রতিবিধান।

সুরেশের মামার বাড়ী এইবার উচ্ছন্ন যাবে। তার মধ্যে সব খারাপ জিনিষ ঢুকেছে। পরিবারের মধ্যে একবার অন্যায় প্রবঞ্চনা, শঠতা, দুর্ব্বলের উপর অত্যাচার, অবিচার ঢুকলে সে পরিবারের মহত্ত্ব কি আর থাকে? ঈশ্বরের কোপদৃষ্টি একদিন তার উপরে পড়ে সমূলে তাকে নষ্ট করবে। এবং সবলদের ধ্বংস ক'রে দুর্ব্বলদের উদ্ধার করবেন। এইরূপে ভগবান অসহায়ের যে সহায়, দুর্ব্বলের যে বল, তার পরিচয় দেন,—নিরুপায়ের উপায় হইয়া মহা করুণার চরিচয় দেন। তাঁর দণ্ডাঘাতে অন্যায় অবিচার, অত্যাচার সব বিনষ্ট হইয়া যায়। হায় কত পরিবারে এইরূপ দুর্ব্বল সন্তানেরা সবলের অন্যায় অত্যাচারে উৎপীড়িত হইয়া অশ্রুজল ফেলিতেছে, করুণাময় পরমেশ্বর তাহা না সহ্য করিতে পারিয়া, তাঁর রুদ্রমূর্ত্তি দেখাইয়া তাঁর রুদ্রদণ্ডে আহত করিয়া সবলকে দুর্ব্বল করিয়া দিতেছেন, এবং সেই সবলের সামনে দুর্ব্বলকে সবল করিয়া তুলিতেছেন—তিনি যে দুর্ব্বলের বল, তাহা তাঁর সন্তানদের

বুঝাইয়া দিতেছেন ঃ—আমি কত দেখেছি।

হে ভগবন! আর সংসারের কিছুরই উপর বিশ্বাস নাই
দেখে শুনে মনে হয় প্রকৃত ধর্ম্ম এখানে নাই।
কেবল যেন ধর্ম্মের দোকানদারী ব'সেছে ধর্ম্মের নামে
অধর্ম্মের স্রোত চ'লেছে। আমাকে এ অধর্ম্ম হ'তে বাঁচাও বাঁচাও।

যমুনা ক্ষণিকক্ষণ স্তব্ধ হইয়া রহিলেন ও কি জানি কেন অশ্রুজল বুঝি চোখ হইতে দু এক ফোঁটা পড়িল; মুছিতে মুছিতে কুটীরের বাহিরে গেলেন।

৬

বনপ্রান্তে বটতলে সুরেশ বসিয়া একটী পাপিয়ার দিকে চাহিয়া দেখিতেছে—পাপিয়া পিউপিউস্বরে মধুর তান ছাড়িতেছে, আনন্দমনে তাহা শুনিতেছে। কিছুক্ষণ ডাকিয়া পাপিয়াটী উড়িয়া গেল; সুরেশ ম্রিয়মান হইয়া পাপিয়াকে সম্বোধন করতঃ বলিয়া উঠিল—

পাপিয়া রে মোর পাপিয়া রে,
যা চ'লে নবগ্রামে, প্রিয়ারে
বল্‌গে আমার, বেহ্মচারী-
ধর্ম্ম আর সহিবারে নারি,
কতদিন বলহীনা নারি!
তোরে ছেড়ে হনু বেহ্মচারী,
হায় এবে যোগীর ভণ্ডামি
সমুদয় বুঝিয়াছি আমি,
আমার হ'য়েছে অপরাধ
নাই আর বেহ্মচর্য্যে সাধ।
বল্‌গে বল্‌গে পাপিয়ারে
একথা আমার সে প্রিয়ারে।

"আমার আর এ সন্ন্যাসীর পাঠশালা ভাল লাগচে না, এতদিন তো রৈলুম, কি আমার উন্নতি হ'ল, কেবল অল্পস্বল্প গাঁজা টান্‌তে শিখেছি। এই তো আমার উন্নতি হ'য়েছে, চরিত্রটী আমার যা ছিল, তার চেয়ে খারাপ হ'য়ে

গেছে—না, আর না এখানে, কেমন সহসা আমার আজকাল বাড়ীর জন্যে মন কেমন করচে।—কাল রাত্রে আমি স্বপ্ন দেখলেম কে যেন আমার কাণে এসে বল্লে 'তুমি এই রুদ্রবন ছেড়ে সত্বর পলাও।' স্বপ্ন দেখে অবধি আর আমার মোটে এখানে থাক্‌তে ভাল লাগচে না। আমি এই ফকিরচাঁদ যোগীর এতদিন তো শিষ্য হ'য়ে রৈলুম, আমার কি লাভ হ'ল? আমাকে কি মন্ত্র দেয়, আমি কিছুই বুঝতে পারিনে।—ফকিরচাঁদের মন্ত্রতন্ত্রে কি যেন ফিকির আছে।—স্বপ্ন দেখবার পর থেকে আমার তার মন্ত্রতন্ত্র আর ভাল লাগচে না।"

দেখিতে দেখিতে মধ্যাহ্নকাল অবসান হইল; সন্ধ্যা আগতপ্রায়; বনের সুগন্ধি, শীতল সুখকর সমীরকরস্পর্শে বনফুলগুলি দুলিতে লাগিল; মধুরস্বর অন্যান্য বহুতর বিহগগণ আকাশে উড়িয়া কোথায় চলিয়া যাইতেছে, দেখা যাইতে লাগিল; থাকিয়া থাকিয়া পুংস্কোকিলকুল কোন্ দূরতরুপরে বসিয়া ডাকিয়া উঠিল; সেই কোকিলের কুহুধ্বনি সুরেশের অন্তর প্রতিধ্বনিত করিল; সুরেশ কি যেন বিরহব্যথায় বনপ্রান্ত হইতে উঠিয়া গেল এবং বনের চতুর্দ্দিকে ইতস্ততঃ পরিভ্রমণ করিতে লাগিল। এমন সময়ে কালী বন হইতে চীৎকারস্বরে সুরেশকে ডাকিল—

"গো সুরেশ খাবার আয়োজন হ'য়েছে। এস গো। সুরেশ কি ভাবিতে ভাবিতে সেইদিকে চলিল।

৭

একদিন ফকিরচাঁদ যোগী কালীর সঙ্গে সমীপবর্ত্তী বনান্তরে বেড়াইতে গিয়াছে; সেই অবসরে সুরেশ ফকিরচাঁদ যোগীর ঘরে ঢুকিয়া গাঁজার কল্কে খুঁজিতেছে; সহসা গৃহকোণে একটী সন্ন্যাসীর ঝুলি দেখিতে পাইল; সেই দিকে গেল ও ঝুলিটী খুলিল; পরে সেই ঝুলির মধ্যে অপর একটী ছোট ঝুলি ছিল; সেটীও খুলিল ঃ—সেইটী খুলিয়া গাঁজার কল্কের সঙ্গে একটী অসম্পূর্ণ পত্র দেখিতে পাইল;—তাহাতে লেখা আছে ঃ—

"আমি সুরেশকে অনেকটা বশ ক'রেছি; তার চরিত্রটা এখন বেশ জঘন্য হ'য়ে আসবার উপক্রম হ'য়েছে; কালীও তাকে বেশ বশ ক'রেছে ব'লে মনে হয়। আজকাল কালী তাকে খুব হজম ক'রেছে এইবার তার

কি অদেষ্টোর কাণ ধ'রে ঘুরিয়ে আন্‌তে পারেন না? কেষ্টো কেষ্টো হরে হরে, সেই সর্ব্বজনে তরে। যা, যা ঘরে গিয়ে হরিনোট দিস্, সব বিপদ দূর হ'য়ে যাবে। হরির দয়ার চেয়ে আর কিছু নেই। এই, এই বাড়ীর গিন্নির জামাই গেছে মেয়ে গেছে সব আস্‌বে। মেয়েটীর ভাঁরি পুণ্যি সব ফিরে আস্‌বে। মেয়েটী দ্বিতীয় সাবিত্তির, কিছু ভয় নেই হরি আছেন।" শুনিয়া বামার মার চোখে অশ্রু বহিতেছিল। মুছিয়া বলিল "হরির কথা সব সময়ে মনে আসে না। তা হ'লে এত দুঃখু। মতির মা দূরে বসিয়াছিল, তাহার কাণে কি করিয়া এই কথাটা বিশেষরূপে প্রবেশ করিয়াছিল। মতির মা আপন স্থান হইতে সত্বর উঠিয়া আসিয়া প্রতিধ্বনির মত বলিল "তা হ'লে এত দুঃখু।" একে একে অনেকেই উঠিয়া আসিয়া তাহাতে সায় দিল—সহানুভূতি করিল। এইরূপে দিন গেল, সন্ধ্যা গেল, রাত্রি আসিল, রাত্রি গভীরতর হইল। সব থামিয়া গেল। নিদ্রার মহিমা চতুর্দ্দিকে প্রকাশিত হইয়া পড়িল।

৯

নদীতীর। প্রাতঃকাল। একজন লোক নৌকার জন্য বড় ব্যগ্র হইয়া চতুর্দ্দিকে দৃষ্টিপাত করিতেছে। আর বলিতেছে "কালি এবার তাকে পেলে মেরে ফেল্‌বো, শীকার পালিয়েছে;" কাল্লী উত্তরে বলিল "এইবার তাকে নিকেশ করা চাই।" কোথায়—কি করিয়া নৌকা পাইবে কিছুই ঠিক করিয়া উঠিতে পারিতেছে না। সব নৌকা জোয়ারে ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছে। ভেটেল বেশ হইলে তবে বিস্তর নৌকা মিলিবার সম্ভাবনা। এই জন্য তাহাকে হতাশ্বাস হইয়া তীরস্থ একটী বটবৃক্ষতলে বসিয়া অপেক্ষা করিতে হইল। তাহাকে দেখিয়া বোধ হইল নিশ্চয় একজন ছদ্মবেশী। কিন্তু কে সে লোক ঠাওর করিবার যো নাই। তাহাকে ভারি ব্যস্ত অধীর ঠেকিতেছিল। অত ব্যস্ততা—অধীরতার কারণ কিছু বুঝিবার যো নাই। ক্ষানিক পরে দেখিতে দেখিতে দেখা গেল, তাহার কোমরে একটী ছুরিকা গোঁজা রহিয়াছে। দেখিয়া মনে হইল কাঁহাকে খুন করিয়া পলায়নের জন্য ব্যস্ত হইয়াছে। এই ব্যাপারটী দূরে একজন সন্ন্যাসী সকলি দেখিতেছিলেন। দেখিয়া তাঁহার মনে ভারি সন্দেহ উদয় হইল। মনে উদয় হইয়া ক্রমে ক্রমে

পুষ্টিলাভ করিল। মনের মধ্যে আধিপত্য স্থাপন করিল। আরো তদন্ত করিয়া তাঁহার সব জানিবার ইচ্ছা হইল। গুপ্তভাবে কোন সুযোগস্থানে যাইয়া ব্যাপারটা আগ্রহসহকারে জানিবার চেষ্টায় রহিলেন। এইরূপ চেষ্টায় আছেন —সহসা কি দেখিলেন!—তাহার এক চুবড়ির মধ্যে একটী স্ত্রীলোক শয়ান ছিল, ঢাকা ছিল। খুলিবামাত্র বাহির হইয়া পড়িল। পড়িয়াই ক্ষাণিকক্ষণ গা ঝাড়া দিয়া হাত পা নাড়িয়া ফের চুবড়ির মধ্যে প্রবেশ করিল! এ সব ব্যাপার কি? এ সব ব্যাপারের অর্থ কি? তিনি কিছুই বুঝিতে পারিলেন না। সন্দেহ তাঁহার খুব বাড়িল। আমাদের অবোধতা আমাদের সকল বিষয়ে সন্দেহ বাড়াইয়া দেয়। এখানেও তাই। না কিছু বুঝিতে পারিয়া—অতি ঈষৎ বোধের রাজত্বে পড়িয়া ঐ অনুসন্ধিৎসু লোকটীর মনে ঘোরতর সন্দেহ উপস্থিত হইল। ঘুরিয়া ঘুরিয়া কৌশলে শেষ পর্য্যন্ত ব্যাপারটীর বিষয় জানিবার অভিলাষ হইল। এখন জোয়ার থামিয়াছে। ভেটেল দেখা দিয়াছে। ভেটেলে রাশি রাশি নৌকা আসিতে লাগিল। প্রথমোক্ত ছদ্ম-বেশী তাহার চুবড়ি লইয়া নৌকায় উটিল। নৌকা ছাড়িয়া দিল। দ্বিতীয় জনটীও অপর একটী নৌকায় উঠিয়া তাহার পশ্চাতে পশ্চাতে অনুসন্ধিৎসু হইয়া চলিলেন।

১০

মধ্যাহ্নকাল। ঘোর রৌদ্র। নবগ্রামের পাঠ দিয়া দুইটী পথিক কথা কহিতে কহিতে যাইতেছে। একজন কহিতেছে 'তাকে আজ মেরে ফেল্‌তে হবে। আস্পর্দ্ধা কম নয় তার।' অপরজন কহিল 'না, না, মেরে কি হবে! ওকে ওষুধ ক'রে জব্দ করতে হবে।' প্রথম ব্যক্তি কহিল 'না, না, তোর ওষুধ থাক। তাকে নিকেশ ক'রে সুদ শুদ্ধ আদায় করতে হবে। দেখিস্ শিগ্‌গিরই হবে, ভয় নেই।' এইরূপে দুইটী পথিক কথোপকথন করিতে করিতে পথে চলিয়া যাইতেছে। যাইতে যাইতে তাহারা একটী ঝিলের ধারে আসিল—তাহাদের বড় তৃষ্ণা পাইয়াছিল। তথায় তাহারা তৃষ্ণা নিবা-রণ করিয়া ফের চলিল। চলিতে চলিতে সন্ধ্যা হইল, ক্রমে রাত্রি হইল। তাহারা একটী অনতিদূরস্থ কুটিরে যাইয়া আশ্রয় লইল। কুটিরটী একটী জেলের। জেলের একটী মেয়ে সেই কুটিরে একা বসিয়া রাঁধিতেছিল,

দুইজন অপরিচিত লোক দেখিয়া সহসা ভয়ে চীৎকার করিতে লাগিল। তাহারা কত অনুনয় করিয়া তাহার চীৎকার থামাইতে চেষ্টা করিল কিছুতেই থামাইতে পারিল না। শেষে তাহার চীৎকার শুনিয়া দূর হইতে জেলে ত্বরা গৃহে আসিয়া পঁহুছিল। আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল "তোমরা কে গো?" তাহারা বলিল "আমরা অতিথি, আজ রাত্রির জন্যে আশ্রয় আমাদের দাও গো। এখানে রাত্রি কাটিয়ে সকালে ফের চ'লে যাব।" জেলের তাহাদের কথা তেমন ভাল লাগিল না, কেমন কেমন ঠেকিল, তাহাদের খারাপ লোক বলিয়া তাহার বোধ হইল।—আশ্রয় দিতে অসম্মত হইল—দূরে একটী আলো দেখা যাইতেছিল সেথায় অঙ্গুলি নির্দ্দেশ পূর্ব্বক দেখাইয়া বলিয়া দিল "ঐ হোথা যাও, হোথায় এক সন্ন্যাসী থাকেন। হোথা গেলে ভালরকম আশ্রয় পাবে। রাত্রিটা তোমাদের বেশ সুখে কেটে যাবে। আহারাদির তোমাদের কিছুমাত্র কষ্ট হবে না।—ঐ সন্ন্যাসীর বাড়ী যাও। সন্ন্যাসীমানুষ, কোন ভাবনা চিন্তে নেই, তোমাদের খুব যত্ন ক'রে রাখিবেন। যাও ওখানে যাও।" জেলের কথানুসারে পথিকদ্বয় রাত্রি কাটাইবার জন্য তথায় গেল।

১১

পথিকদ্বয় সন্ন্যাসীর কুটীরের দ্বারে আসিয়া উপস্থিত হইল। দ্বার ঠেলিতে লাগিল। সন্ন্যাসী জিজ্ঞাসা করিলেন "কে ও তোমরা?" তাহারা বলিল "আমরা অতিথি।" সন্ন্যাসী বলিলেন "এস তবে বাছা, তোমরা সুখে রাত্রি কাটাও। হেথা আহারসামগ্রীর মধ্যে আমার এই ফলমূল আছে, ইচ্ছা হয় ক্ষুধাতৃষ্ণা নিবারণ করতে পার।" এই বলিয়া সন্ন্যাসীঠাকুর কুটীরের বাহিরে চলিয়া গেলেন। এখন পথিকদ্বয় কুটীরে বিশ্রাম করিতে লাগিল। কিছুক্ষণ পরে নিস্তব্ধ নিশীথে তাহারা কথোপকথন আরম্ভ করিল। যাহারা দুষ্টলোক তাহাদের সুনিদ্রা আসিতে পায় না, কেবল ভাবনায় হৃদয় মন ভরিয়া থাকে। দুইজনেরই মনে দুষ্ট অভিসন্ধি গুজ গুজ করিতেছে, বিশ্রামের সুস্বাদ কিরূপে অন্তরের সহিত তাহারা গ্রহণ করিবে? তাহারা কেবল আপনাদের দুরভিপ্রায় লইয়াই ব্যস্ত। দুরভিসন্ধিসিদ্ধিই তাহাদের বিশ্রামের স্থান। তাই দুষ্ট পথিকদ্বয়ের রাত্রিতে বিশ্রামের স্থানে আসিয়াও কুমন্ত্রণা চলিতে লাগিল। একজন বলিল "এই নবগ্রামে সুরেশের ভালরূপ সন্ধান লইতে হইবে। একে-

বারে মারা কোন কাজের কথা নয়, সুরেশের শত্রুমিত্রের সব সন্ধান নিয়ে তাকে আচ্ছা ক'রে হাত করতে হবে। আমাদের তাকে ভালরকম বশীভূত করতে হবে।" অপরজন বলিল "সুবিধা পেলেই তার দফারফা শেষ করব। তাকে ধ্বংস ক'রে তবে আমি ছাড়ব। আমার সাংঘাতিক তন্ত্রমন্ত্র যত কিছু আছে তার দ্বারা এইবার তাকে চিরজন্মের মত যাদু করব। মনে করচি কাল এই সন্ন্যাসীঠাকুরের কাছে সুরেশের আজকালকার সমুদয় সংবাদ জেনে নিয়ে যাব। শুনেছি নাকি এইখানকার এক সন্ন্যাসীঠাকুর সুরেশের সম্বন্ধে অনেক খবর রাখেন।" এইরূপ কথাবার্ত্তা কহিতেছে, কহিতে কহিতে আর বেশীক্ষণ পারিল না।—তাহাদের তন্দ্রা আসিল, পরে নিদ্রা আসিয়া তাহাদের একেবারে নীরব করিয়া দিল। এদিকে কি করিয়া ঘরের বাহিরের এক চালের কোণে অগ্নি ধরিয়া গিয়াছে বা কে ধরাইয়া দিয়াছে; অগ্নি হু হু স্বরে ক্রোধে রক্তবর্ণ ভীষণ দৈত্যের ন্যায় কুটিরের চতুর্দ্দিক ছাইয়া ফেলিল। একজন অর্দ্ধদগ্ধ হইয়া দৈবাৎ কোনক্রমে বাঁচিয়া বাহিরে পলায়ন করিল। অপরজন কিছুতেই বহির্গত হইতে পারিল না অগ্নিরাশির মধ্যে চাপা পড়িয়া গেল। নিশীথে এক ভীষণ কাণ্ড সমাপ্ত হইল।

১২

সুরেশ এক খালের ধারে চাঁপাগাছের তলে বসিয়া আছে। বসিয়া বসিয়া একটা চিঠি পড়িতেছে। ক্ষণিকক্ষণ চিঠিটী পড়িয়া বলিয়া উঠিল "আমার নামে এ চিঠি এখানে কে রেখে গেল! এখানে আমার সন্ধান কে জান্‌লে! লেখা আছে—'শত্রু ম'রেছে, আপদ গেছে, তুমি শীঘ্র বাড়ী চ'লে এস। এক জন শত্রু এখনো তোমার অনুসন্ধানে ফিরিতে পারে, তুমি শীঘ্র বাড়ী চ'লে এস।'—কে এরকম লিখেছে? শত্রুটা কে আমি তো কিছু বুঝতে পাচ্চিনে। আমার যে শত্রু রুদ্রবনে ছিল সেইকি? তা তাকে অন্যে কি ক'রে জন্‌বে? আমিই বিপদে প'ড়েছিলুম আমিই জানি।"

১৩

এইরূপ আপনা আপনি সুরেশ চিঠির বিষয় আলোচনা করিতেছেন, এমন সময়ে একজন লোক লুকাইয়া তাঁহার পশ্চাতে আসিয়া দাঁড়াইল। সুরেশ কিছুই জানিতে পারিলেন না। লোকটী ঝট করিয়া কি এক জলীয়

পদার্থ—বিষ হইবে—কাণে ঢালিয়া দিয়াই কোথায় সরিয়া পড়িল। সুরেশ চীৎকারপূর্ব্বক পশ্চাতে ফিরিয়া দেখিলেন, কাহাকেও দেখিতে পাইলেন না, শীঘ্রই মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়া গেলেন। অত্যল্পক্ষণ পরেই তাঁহাকে ঐরূপ অবস্থাপন্ন দেখিয়া একজন কৃষক আসিয়া কোলে করিয়া তাঁহার জীবিতভাব পরীক্ষার দ্বারা জানিতে পারিয়া আপন গৃহে লইয়া গেলেন।

১৪

বিষজনিত দোষ কৃষকের সাহায্যে ওঝাদ্বারা দূরীকৃত হইলে সুরেশ বেশ চেতনা—আরোগ্য লাভ করিলেন। আরোগ্য লাভে তিনি কৃষকের প্রতি যৎপরোনাস্তি সন্তুষ্ট হইয়া তাহাকে কৃতজ্ঞতা স্বরূপ পুরস্কারস্বরূপ কিঞ্চিৎ ভূমিদান অঙ্গীকার পত্র লিখিয়া দিয়া প্রস্থান করিলেন। একা আর কোনস্থানে বসিতে চাহিলেন না— তাঁহার সাহস হইল না, বরাবর বাড়ীর অভিমুখে চলিলেন। পথে রাত্রি হইলে তাঁহার দস্যুভীতি জন্মিল—তাঁহার সঙ্গে কিছু অর্থ ছিল—তাহা আরও গুপ্তভাবে রাখিতে লাগিলেন। ক্ষাণিক পরে তাঁহার আর চলিতে সাহস হইল না, কোন কিছু অস্ফুটশব্দে চমকিয়া উঠিতে লাগিলেন।—ধীরে ধীরে নিঃশব্দে চলিতে লাগিলেন। চলিতে চলিতে দেখিতেছেন চতুর্দ্দিকে ত্রস্তভাবে, নিকটে কোন গৃহস্থের বাড়ী আছে কিনা, খুব আগ্রহের সহিত কুটীরের আলো দেখিবার চেষ্টায় রহিলেন। কিছুক্ষণ পরে তাঁহার ঈশানকোণে অনতিদূরে একটী আলো দেখিতে পাইলেন। তাহাতে ঈষৎ আশ্বাসান্বিত হইয়া তদভিমুখে চলিলেন। নিকটে পঁহুছিয়া কিন্তু দেখিলেন এক ভয়াবহ পদার্থ!—মৃতদেহ মাঠের মাঝখানে পুড়িতেছে। দেখিয়াই ভয়ে একেবারে কাতর হইয়া পড়িলেন; সেই রাত্রিতে যে তিনি কি করিবেন, কোথায় যাইবেন, কিছুই ঠিক করিয়া উঠিতে পারিলেন না। সেথায় তাঁহার দস্যুভয় ভয়ানকমূর্ত্তি ধারণ করিল। তাঁহার মনে ক্রমাগত আন্দোলিত হইতে লাগিল যে দস্যুরা আসিয়া কুটীরের সর্ব্বস্ব লইয়া কুটীরস্বামীকে পোড়াইয়া মারিয়াছে। ভয়ে আর সেথায় থাকিলেন না, রোমাঞ্চিত কলেবরে তাহার বিপরীতদিকের পথ আশ্রয় করিলেন। বিপরীতদিকের পথে গৃহে যাইতে যদিও একটু বেশী ঘোর হইত তবুও নিরাপদ ভাবিয়া তাহাতে স্বীকৃত হইলেন। পথে যাইতে যাইতে শিবাদল দূরে ডাকিয়া উঠিল, পেচক কর্কশস্বরে মাথার

উপর দিয়া দ্রুত উড়িয়া গেল, তিনি আতঙ্কে কাঁপিয়া উঠিলেন—সত্বত গৃহে পঁহুছিতে পারিলে বাঁচেন। ত্বরা যাইতে লাগিলেন। তাঁহার সম্মুখ দিয়া একজন কে ঝম ঝম করিয়া চলিয়া গেল। অন্ধকারে ভাবিলেন কোন স্ত্রীলোক হইবে লুকাইয়া পিতৃগৃহে রাতারাতি পলায়ন করিতেছে। ভাবিয়া তাহাকে কিছু জিজ্ঞাসা করিবার জন্য তাঁহার মন সহসা আকুল হইল, তিনি ঈষদুচ্চৈঃস্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন "কে যাও গো?" উত্তর পাইলেন "সাধু"। তখন বুঝিলেন ঝম ঝম শব্দটা চিমটের। ঐ উত্তরের পর তিনি আর তাহাকে কিছু জিজ্ঞাসা করিলেন না। কে সাধু কে অসাধু এই রাত্রিতে মাঠের মাঝখানে কে জানিবে! এইরূপ সন্দিগ্ধচিত্ত হইয়া,—তিনি একে ভয়ে অস্থির—তাহার সঙ্গে আর কিছু কথাবার্ত্তা কহিলেন না। হয় তো পশ্চাৎদিক হইতে নীরবে আসিয়া তাঁহাকে ঠেঙাইয়া মারিবে, ইহা ভাবিয়া তিনি এক একবার পিছন ফিরিতে ফিরিতে একেবারে পূর্ব্বাপেক্ষা আরো দ্রুত গৃহাভিমুখে প্রস্থান করিতে লাগিলেন।

১৫

নবগ্রামের অন্তর্গত এক ছোট পল্লিতে একটী আমগাছের তলায় দ্বিতীয় শূর্পনখা সদৃশী এক কুৎসিৎ রমণী দাঁড়াইয়া আছে। দাঁড়াইয়া ভ্রুকুটি ভঙ্গীময়-লোচনে কেবলি কাঁদিতেছে ক্রন্দনের কথা কেহ তাহাকে কিছু জিজ্ঞাসা করিলে বাঘিনীর ন্যায় ক্রোধে উন্মত্তা হইয়া লোকজনকে মারিতে যাইতেছে—বিকট দশনপংক্তি একত্রিত করিয়া অতিশয় জঘন্য অশ্লীল গালি বর্ষণ করিতেছে। তাহাতে লোকজন কেহ ভয়ে সরিয়া যাইতেছে, কেহ হাসিতেছে, কেহ নানারূপে তাহাকে রঙ্গ করিতেছে। যাহার যাহা খুসি তাহাই করিতেছে। কি বিড়ম্বনা তাহার? দগ্ধ নাক মুখ লইয়া তাহার জনসমাজে আসিতে ইচ্ছা হয় নাই, কিন্তু তাহার নিজের অমন কামকমনীয় মুখ, যাহার বলে সে কতজনকে স্ববশীভূত করিয়াছে, তাহার আজি এই দুর্দ্দশা! ইহা কিছুতেই তাহার সহ্য হয় নাই, লোকালয়ে আসিয়া সারাইতে ইচ্ছা হইয়াছে, তাই গ্রামের অন্তর্গত এক পল্লীতে দাঁড়াইয়া আছে—যদি কাহারো নিকট হইতে কোন ঔষধ সাহায্য পায়। কিন্তু আসিয়া মহা বিড়ম্বনায় পতিত হইয়াছে, লজ্জায় কাহারো নিকট হইতে কিছু চাহিতে পারিতেছে না। না পারিয়া

ভাল কথা। যে সকল ক্ষত্রিয়ের পয়সা আছে, যাহারা ধনী, তাহারা কি রোজগার ছেড়ে দিয়ে নিষ্কর্ম্মা বসে থাকে? দেখ কীর্ত্তি বিনা জীবন নিষ্ফল, কিছু নয়। আমাদের ক্ষেত্র পরিপক্ক ফসলে ছেয়ে গেছে, তুমি যদি জমী দেখিতে আরম্ভ কর, তাহলে ক্ষেত্র নষ্ট হয় না, রক্ষা পায় আর তাহ'লে জ্ঞাতগোষ্ঠীর সকলে বলবে, যে, 'বাঃ বাঃ কালুর পুত্র বেশ কাজের।' দেখ কথাইত আছে "ক্ষেতী খৎমা ক্ষেতী"—যে ক্ষেতে ক্ষেত্রপতি নিজে গিয়া দেখে সেই ক্ষেতেই ভাল ফসল হয়।" নানক তাঁহার পিতা কালুর এই সকল কথা শুনিয়া বলিলেন, "পিতা আমি আলাদা নিজে ক্ষেত করেছি, তাতেই লাঙ্গল দিয়েছি, আর আমার জমী বেশ হয়েছে। আর ঐ জমীতে প্রচুর ফসল হয়েছে। আমি ঐ জমী বেশ ভাল করেই দেখছি। তবে অন্য ক্ষেতের খবর আমি রাখিনে।" নানকের এই কথা শুনিয়া কালু কিছুক্ষণ স্তব্ধ হইয়া রহিলেন, লোকদের দেখাইয়া বলিতে লাগিলেন, "দেখ এ কি পাগলের মত বলে।" নানককে বলিলেন "তুমি আলাদা ক্ষেত আবার কবে থেকে করলে? আচ্ছা এবারে এখন আমাদের জমীর ফসল সব পেকে গেছে; তোমার যদি তাই ইচ্ছে হয়, ত, আসছে বার থেকে আমি তোমার আলাদা ক্ষেতই করে দেব, দেখব তুমি কেমন সে জমী ভাল করে কর!" গুরুনানক পিতাকে ফের বলিলেন, "পিতা! আমি এখনই নূতন ক্ষেত করেছি; আমার ক্ষেত ফসলে ভরে গেছে।" কালু তাঁহার কথার গভীর অর্থ না বুঝিয়া বলিলেন, "কৈ আমি ত তোমার এ ক্ষেত দেখি নাই।" তাহাতে নানক বলিলেন "আমি যে ক্ষেত করেছি তাহা তুমি দেখতেই পাবে।" এই বলিয়া তিনি এক পদ উচ্চারণ করিলেন—

মন্ হালী কিরসাণী করণী
সরম্ পাণী তন্‌ক্ষেৎ।
নামবীজ সন্তোখ্ সোহাগা
রখ্ গরীবী বেস্।
ভাও করম কর্ জম্মসী
সে ঘর ভাগঠ দেখ্।
বাবা মায়া সাথ্ ন হোয়্

ইন্ মায়া জগ মোহেয়া বিরলা বুঝে কোয়॥

কালু ইহার অর্থ জিজ্ঞাসা করিলে, গুরুনানক তাঁহার পিতাকে ঐ পদের অর্থ বুঝাইয়া বলিলেন "এই যে আমার মনকে সৎসঙ্গে নিযুক্ত করিয়াছি, ইহাই আমার ক্ষেত্রে লাঙ্গল দেওয়া হইয়াছে। শরীররূপ ক্ষেত্রে শুভকর্ম্মরূপ চাষ করিয়াছি। শ্রমসাধন আমার ক্ষেত্রে জলসেক এবং পরমেশ্বরের নামজপ আমার ক্ষেত্রে বীজবপন। সন্তোষ অবলম্বনই ক্ষেত্রে সোহাগা * হইয়াছে। ঈশ্বরে ও তাঁহার প্রিয় কর্ম্মে যে প্রীতি তাহাই বীজের অঙ্কুরস্বরূপ। সেই ভাগ্যবান যে এমন ক্ষেত্রের শস্য গৃহে আনিতে পারিয়াছে। আর অন্য যে সকল ক্ষেত্ররচনা ও সকল নশ্বর, সঙ্গে যাইবে না, উহা পরমেশ্বরের কাছ হইতে ভুলাইয়া আমাদিগকে দূরে লইয়া যায়।" গুরুনানকোচ্চারিত পৌড়ীর সুগভীর অর্থের প্রতি কালু মনোযোগ দিলেন না। তিনি এ সকল বালকের প্রলাপ ভাবিয়া নানকের চিত্তকে অন্য বিষয়ে আকৃষ্ট করিবার চেষ্টা করিলেন। কালু বলিলেন—"বৎস! তুমি যদি ক্ষেত না করিতে চাও ত ব্যাপার কর, দোকান কর। আমাদের ক্ষত্রিয়েরা না হয় ক্ষেত করে, না হয় বাণিজ্য ব্যবসায় করে।" যে নানক পরমেশ্বরের নামজপরূপ বীজবপনের জন্য ক্ষেত্র কর্ষণ করিয়াছেন, তিনি যে সহজ ব্যাপারী তাহা কালু বুঝিতে পারেন নাই। নানক যে মহা-ব্যবসায় কার্য্যে মনপ্রাণ নিয়োগ করিয়াছেন গুরুনানক তাঁহার পিতাকে তাহাও বলিলেন—

হাণ হট্ট কর্ আরজা
সচ্ নাম কর্ বথ্।
সুরৎ সোচ্ কর্ ভাণ্ডসাল্
তিস্ বিচ্ তিসনো রখ্।
বণজারিয়া সেও বণজ্ কর্
লেয় লাহা মন্ হস্॥

"হে পিতা আমি দোকানও খুলিয়াছি। মনুষ্যের দেহের যে আয়ু তাহারি

* ক্ষেত্র কর্ষণের পর যে উঁচুনীচু মাটী সমান করিয়া দেওয়া হয় তাহাকেই 'সোহাগা' বলে।

উপর তার ভয়ানক হিংসে, আর তার সর্ব্বনাশ করবার জন্যে আমার সর্ব্বনাশের চেষ্টা, আর আমার সর্ব্বনাশের জন্য ভানুমতীর ভোজবাজী। আর একজন কে বলছিলো, ভানুমতী লোক বশ করবার জন্যে, লোকের সর্ব্বনাশের জন্যে নাকি ঐন্দ্রজালিক বিদ্যাও শিখেছে, আর ফকিরচাঁদ, কালী ও তার বৃন্দে প্রভৃতিকেও শিখিয়েছে। ভয়ানক মেয়ে, ও সব কর্ত্তে পারে। ও যে তলেতলে আমাকে আয়ত্ত কর্ত্তে চায়, আমাকে বিয়ে কর্ত্তে চায়, বিয়ে করেই দুদিন পরেই আমাকে তুচ্ছ কত্তো ও অপরকে ডাকতো। আমি তা জান্‌তেম না। আমি এক সময়ে অনেক আগে ওকে ভাল জান্‌তেম।—

হ্যাঁরে ভানুমতী! তোর সব ভান!

হ্যাঁরে ভানুমতী
তোর এই মতি
যাই হোক্ তোর ইন্দ্রজাল
প্রকাশিবে পরে কিছুকাল।

তুই ঐন্দ্রজালিক মোহে অনেককে ডুবিয়েছিস, তোর ইন্দ্রজালের দ্বারা অনেকে পুড়েছে, ম'রেছে, অনেকের সর্ব্বনাশ হ'য়েছে।

হ্যাঁরে ভানুমতী! সব ভান! মতি,
তোর ভয়ানক
কি ভীষণ লোক!

ভানুমতি তোর ভান ভণ্ডামি ক্রমশঃ লোকে আরও চিন্‌বে! তোর ইন্দ্রজাল নাহি রবে চিরকাল। তোর ইন্দ্রজালরূপ মাকড়সার জালে যে একবার প'ড়েছে তার আর নিস্তার নেই; কিন্তু মনে থাকে কাল-ধর্ম্মবিহগ তোকে একদিন খণ্ডবিখণ্ড ক'রে ফেলে ধ্বংস ক'রে ফেল্‌বে। ভানুমতি তোর মিথ্যা প্রবঞ্চনা, শঠতা, তোর ফিকির তোর ইন্দ্রজালে প'ড়ে কেউ সবটা ধর্ত্তে পারচে না, কিন্তু কালে তোর ইন্দ্রজাল ভেদ হ'তে থাকবে; তখন তোর মতির প্রায়শ্চিত্ত হবে। তোর বাহিরে মধু ভিতরে বিষ, কার সাধ্য ধরে। ধর্ম্ম তাঁর জ্বলন্ত সত্য ক্রমে তোর ঐন্দ্রজালিক মিথ্যা মায়ামোহ সমুদয় ভেদ করতঃ প্রকাশ করিয়া দেবে। তোর বাহিরে মধু ভিতরে বিষ সকলেই বুঝতে পারবে। ত্রাহি মধুসূদন ত্রাহি মধুসূদন! ভগবন্ এ বিষময়

সংসারের ইন্দ্রজাল, এ সব জাল জালিয়াতিগিরি আর আমার ভাল লাগে না, আমাকে এ সব থেকে তুমি রক্ষে কর, আমাকে উদ্ধার কর, আমাকে মুক্তি দাও। তোমার চরণে বারবার নমস্কার করি, তোমার চরণে শরাণাগত হলেম।" এইরূপে সুরেশ বিধাতাকে নমস্কার করিয়া ও পত্রটী পকেটে পূরিয়া উঠিয়া গেলেন।

১৮

উপবনে সুরেশ চিন্তিত মনে বেড়াইতে লাগিল ও কিছুক্ষণ পরে পুনরায় উপবনস্থিত পুষ্করিণীতীরে আসিয়া উপবেশন করিল ও পুনরায় পত্রটীর কথা ভাবিতে লাগিল!—ভাবিতে ভাবিতে আবার বলিয়া উঠিল "হ্যাঁ পত্রে যে লেখা আছে,—'আমার স্ত্রী আমাকে না দেখতে পেয়ে—অনেক দিন আমাকে না দেখতে পেয়ে, শুনলেম আমার অনুসন্ধানে সে যেন অর্দ্ধোন্মত্তা হ'য়ে বেরিয়েছিল, তার পর আর তাকে কেউ খুঁজে পাচ্চে না।' তাকে কে যেতে ব'লেছিল? আমি দুদিন পরে আসতুমই, সে মেয়েমানুষ সে কেন একা কোন্ সাহসে আমাকে খুঁজতে গেল। এইবার চতুর্দ্দিকে লোক পাঠিয়ে দিই—কোথায় গেছে তার ঠিক নেই। আর বড় ইচ্ছে হচ্চে তাকে এই চিঠিটা একবার দেখাই।——উঃ সেই দুশ্চারিণীটার কি বুদ্ধি! সে ও শ্যামা মিলে চুবড়ির মধ্যে আমাকে একবার মারবার কল্পনা ক'রেছিল। উঃ আস্ত সব মায়াবিনী! শ্যামা—কালীর মাথাও ঐ ভানুমতী খেয়েছে। এখন কালী নাকি এক সাধুর সেবাদাসী হ'য়েছে।" এইরূপ আপনার মনে ভয়ব্যাকুলিতচিত্তে সুরেশ বলিতেছে—কথা কহিতেছে—চিঠি দেখিতেছে, এমন সময় একজন জটাধারী তাঁহার সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইল। সুরেশ তাড়াতাড়ি পত্রটী মুড়িয়া শশব্যস্ত হইয়া তাঁহাকে বসাইবার উদ্যোগ করিল। জটাধারী ঈষৎ হাসিলেন, শ্বেতশ্মশ্রুতে হাত বুলাইতে লাগিলেন। সুরেশ একটু অপ্রতিভ হইলেন—ভাবিলেন, পত্রটী জটাধারীর সম্মুখে অমন ব্যস্তসমস্ত হইয়া মুড়িলেন, জটাধারী কি মনে করিলেন। পরে সত্বর প্রকৃতিস্থ হইয়া বলিলেন "সাধু আপনার সংবাদ কি? হিমালয় বিন্ধ্যাচল কতশত স্থান, কত দৃশ্য আপনারা প্রায় দেখে থাকেন, এই দেখুন আমরা এখানে প'ড়ে আছি, আমাদের দুর্ভাগ্য আমরা আপনার মত তেমন কোন শোভাই দেখিনি। জটাধারী নীরব হইয়া রহিলেন।

ভিনিস ভ্রমণ।

২

প্রত্যুষে উঠিয়াই হাত মুখ ধুইয়া লইলাম এবং প্রাতরাশের অপেক্ষায় রহিলাম। আমাদের দেশে ইচ্ছামত সময়ে ভোজনাদি করা যাইতে পারে, কিন্তু পাশ্চাত্যদেশে সব বিষয়ই একটী বাঁধাবাঁধি নিয়মের দ্বারা আবদ্ধ। খাইবার, বেড়াইবার, বিশ্রাম করিবার, খেলিবার প্রভৃতি যাবতীয় দৈনন্দিন কার্য্যসমূহের নির্দ্ধারিত সময় আছে, আর সেই সেই কার্য্যগুলি ঠিক সেই সেই সময়ের মধ্যে করিতেই হইবে। না বলিবার যো নাই। একেবারে একেলা থাকিতে পারিলে অনেকটা স্বেচ্ছামত নিয়ম বা অনিয়মের বশবর্ত্তী হইয়া চলিতে পারা যায় কিন্তু যেখানে পাঁচজনের সহিত বসবাস করিতে হইবে সেখানে নিয়ম ভঙ্গ করা বড়ই সুকঠিন। দেখিতে পাইতেছি ভোর হইয়াছে, সূর্য্যের স্নিগ্ধ উজ্জ্বল রশ্মি বাতায়ন ভেদ করিয়া শয়নকুটীর আলাকিত করিতেছে, ক্ষণে ক্ষণে মনুষ্যপদশব্দ শ্রুতিগোচর হইতেছে, আর আমিও শয্যার উপর এপাশ ওপাশ ফিরিয়া মুহুর্মুহু আমার ঘড়ীর কাঁটা নিরীক্ষণ করিতেছি—কখন্ ৮টা বাজে, কেননা ৮টা না বাজিলে ভদ্রলোকের উঠিবার নিয়ম নাই। উঠিয়াই শীঘ্র শীঘ্র প্রাতঃকৃত্য সমাপন করিলাম ও যথাসময়ে প্রাতরাশ (ব্রেক্‌ফাষ্ট) করিয়াই আনন্দোল্লাসে সমীপবর্ত্তী সমুদ্রোপকূলে ছুটিলাম। গতমাসের 'পুণ্যে' ভিনিসের যে ছবি দেওয়া গিয়াছিল সে দৃশ্যটী একেবারে সমুদ্রকূলস্থিত ভিনিসের প্রধান হর্ম্ম্যাবলীর। সম্মুখের কারুকার্য্যসমন্বিত বৃহৎ প্রাসাদটী ভিনিসের প্রাচীন রাজপ্রাসাদ। এইস্থানেই ভিনিসরাজগণ, ডোজেরা (Doges) বাস করিতেন, এই নিমিত্ত ইহার নাম ডোজের প্রাসাদ। বামে ভিনিসের প্রধান Square বা মুক্তপ্রাঙ্গন। ইহার ইটালিয়েন নাম—"পিয়াজ্জা সান্ মার্কো", অর্থাৎ সেণ্ট মার্কোর স্কয়ার। এই স্থানটী এত মনোহর যে ইহার মত এমন সুন্দর দৃশ্য সমগ্র ইউরোপের মধ্যে আছে কিনা সন্দেহ। আমি প্রথমদিবস সমগ্র ভিনিস দেখিবার নিমিত্ত কুতূহলী হইয়া বিশেষ বিশেষ স্থান সূক্ষ্মভাবে না দেখিয়া

পদযুগলকে একেবারে ছাড়িয়া দিলাম। যেখানে যত ক্ষুদ্র গলি হউক না কেন সেইখান দিয়াই চলিতে লাগিলাম। কত পুল কত খাল পার হইলাম, কিন্তু কোথায় যে যাইতেছি তাহার ঠিকানা নাই। আমি জানি যে সমুদ্র পরিবেষ্টিত ক্ষুদ্র সহর মধ্যে আমার হারাইবার ভয় নাই, যাইতে যাইতে নিশ্চয়ই সমুদ্রকূলে আসিয়া পড়িতেই হইবে। এবং সমুদ্রকূলে আসিলেই সহজেই গন্তব্যস্থানে যাইতে পারিব? মাঝে মাঝে দেখিতে পাই ভিনিসিয়ান জলশকট —যাহা 'গণ্ডোলা' (Gondola) নামে অভিহিত, ইতস্ততঃ দ্রুতগতিতে চলিতেছে। আমি অনায়াসেই এই গণ্ডোলার সাহায্যে যথাইচ্ছা তথা যাইতে পারিতাম, কিন্তু এই গণ্ডোলাগুলি অতি ক্ষুদ্র খালের মধ্যে প্রায়ই যায় না। তাহা ছাড়া আমার ইচ্ছা জগদ্বিখ্যাত ভিনিস সহরের ভিতর বাহির দুইই দেখিব। বাহ্যিক দৃশ্যের ত কথাই নাই, ভিনিসে প্রবেশমাত্র তাহার যথেষ্টই নয়নগোচর হয়। ভিনিসের বাহ্যিক দৃশ্যটী বাস্তবিকই এত সুন্দর যে ইহাকে একটী অমরাপুরী বলিলেও অত্যুক্তি হয় না—যেন কোন সুনিপুণ চিত্রকরের একটী আদর্শ চিত্র পৃথিবীর আমোদ ও তৃপ্তির জন্য কোন প্রদর্শনী মধ্যে প্রদর্শিত হইতেছে। যতই দেখা যাউক না কেন যেন আমাদের কৌতূহল চরিতার্থ কিছুতেই হয় না। যাহা হৌক ভিনিসে পদার্পণ করিয়াই ত ইহার সৌন্দর্য্যে কিছু মুগ্ধ হইতে হইয়াছিল, কিন্তু যখন প্রাতঃকালীন নীল নভোমণ্ডলে প্রদীপ্ত সূর্য্যের হৃদয়গ্রাহী কিরণজাল ছাইয়া ফেলিল তখন এড্রিয়াটিক মহিষীর (The Queen of the Adriatic) রূপলাবণ্যের এক অপূর্ব্ব বিকাশ দৃষ্ট হইল—সেই সৌন্দর্য্যের সেই মাধুর্য্যের এমন অনির্ব্বচনীয় মুগ্ধকর শক্তি যে একেবারেই মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত নিস্পন্দভাবে আত্মহারা হইয়া রহিলাম, এবং আত্মহারা হইয়াই তাহার বক্ষের মধ্যে বিচরণ করিতে লাগিলাম। যতটা পারিলাম ঘুরিলাম। যদিও ভিনিসের প্রধান রাস্তাগুলি খালবিশেষ, তথাপি পদব্রজে যাইবার নিমিত্ত সরু সরু বিস্তর রাস্তা আছে। যেখান দিয়া যাই, দেখি স্থানগুলি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, এক একটী স্থান অতিশয় নির্জ্জন। মধ্যে মধ্যে অনেক ছোট বড় স্কয়ার (square) অর্থাৎ মুক্ত প্রাঙ্গন দেখিতে পাইলাম। কিন্তু সহরের মধ্যে দোকান বাজার বিশেষ কিছু নাই। সব প্রধান প্রধান স্থানে আছে। ক্ষুদ্র সহর, অনায়াসেই বাজার হাট করা যায়। আমার ঘুরিয়া আসিতে তিন চারি

অবশেষে সাধ্বী বিমলা সেই রাত্রেই সামান্য স্ত্রীর মত গৃহকার্য্যে ব্যাপৃতা হইয়া সুরেশের খাবার আয়োজন করিবার জন্য কার্য্যক্ষেত্রে গেলেন।

সুরেশের আগমনের পর, বিমলার আগমন সংবাদ পাইয়া তার পর দিন প্রাতে নবগ্রামে যেন উৎসব পড়িয়া গিয়াছিল।

পুণ্য।

চাহিনা জানিতে আমি পুণ্য বলে কারে।
কি সুধর্ম্ম, কি কুধর্ম্ম, কে বা কর্ম্মবীর,
এই সব তর্কজালে হইয়ে অধীর,
চাহিনা লভিতে শান্তি তব দরবারে
ওহে বিংশশতাব্দির ধর্ম্ম-যুধিষ্ঠির!
আমি করিয়াছি সার সৌন্দর্য্যের সারে;
আমি করিয়াছি সার সেই সারাৎসারে,
সারা বিশ্ব আহা যাঁর পূজার মন্দির!
হে শিব-সুন্দর-দেব, শারদী শেফালী
দেয় যথা, দেয় যথা আপনারে ডালি,
প্রভাতের রাগরক্ত চরণ-কমলে,
দেহ-পুষ্প, চিত্ত-পুষ্প, সব দিব ঢালি,
তব পদ-কোকনদে, ফুল্ল শতদলে!
এগো যদি নহে পুণ্য, পুণ্য কারে বলে?

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ সেন।

নিবেদন।

এ দেহ-মন্দির ত্যজি' ওগো অন্তর্যামী!
অন্বেষিব কোথা তোমা করিতে অর্চ্চনা?
মানস-কুসুমপুঞ্জ ত্যজি' বিশ্বস্বামী!
কোন্ পুষ্পে পুষ্পাঞ্জলি করিব কল্পনা?
ত্যজিয়ে হৃদয়-অশ্রু কোন্ সিন্ধু-নীরে
তোমার শ্রীপাদ-পদ্ম দিব ধৌত করি'?
সুন্দর নির্ম্মল আত্মা দূরে পরিহরি'
কোন উপচারে তব দিব অর্ঘ্য ভরে'?
এ জীবন-শঙ্খ ফেলি' আরতির কালে
পার্থিব সে কোন বাদ্যে পূরিব অঙ্গন?
রক্ষিয়ে মরম-শত্রু আর কার গলে
সুশাণিত খড়্গ মোর করিব অর্পণ?
পূজিতে তোমারে তাই অন্তর-অন্তরে
প্রবেশিনু আজি প্রভু, হের কৃপা করে'!

শ্রীজীবেন্দ্র কুমার দত্ত।

চিত্রে অপ্রতিম ভাব।

সেই পরমপুরুষ আদিকারণ স্বইচ্ছায় এই বিশ্বপ্রকৃতি সৃজন করিয়াছেন। তাঁহারই বিচিত্রভাবে বিচিত্রসৌন্দর্য্যশালিনী হইয়া এই প্রকৃতি শোভমানা হইয়া বিরাজ করিতেছে। এই বিচিত্রপ্রকৃতির যথাসাধ্য প্রতিকৃতি অনুকৃতিতে কৃতিত্ব লাভ করিয়া আমরা সেই পরমানন্দের কণামাত্র আনন্দ উপভোগ করিতেছি।

প্রকৃতির মধ্যে অনুপম বৈচিত্র্য না থাকিলে কাহারও তাহার অনুকরণ করিতে সেরূপ ইচ্ছা হইত না। স্বভাবে কেবলি বিচিত্রতা!—এই দেখ এখানে পাদপরাজি কুসুমভূষণে ভূষিত; হোথায় কুসুমমণ্ডিত লতামণ্ডপ; উপবন, রমণীয় সরোবর কি আশ্চর্য্য সৌন্দর্য্য বিস্তার করিতেছে!—দূরে আকাশে পর্ব্বতে কনককিরণাঙ্কিত নীরদমালা, তরুণতপনে সৌম্যস্বপনে, নিদ্রাজাগরণে আলোকে ছায়ায় প্রকৃতির মাঝে কি অনুপমচিত্রসকল অনুক্ষণ চিত্রিত হইতেছে! সকলি দৃষ্টিপথে পতিত হইতেছে, আনন্দপূর্ব্বক দেখিতেছি। দেখিয়াই কি জানি কেন, পুনরায় চক্ষু মুদ্রিত করিতে ইচ্ছা করে; তাহার অর্থ, বহির্দৃশ্য দেখিয়াই তাহা আবার ক্ষাণিকক্ষণ ভিতরে দেখিতে ইচ্ছা করে। এই ভিতরের দেখাই আদৎ—প্রকৃত জিনিষ। প্রকৃতির মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া যে দেখি সেই দেখাই প্রকৃত দেখা। বহিঃস্বভাবকে বাহিরে দেখিয়াই অন্তরের স্বভাবের কাছে আনিয়া যে সামঞ্জস্য বিধান করিতে পারে, সেই দেখে সেই প্রকৃত দেখে। প্রকৃতিকে এইরূপে প্রকৃত দেখা শুধু বাহ্যিক চক্ষু থাকিলেই সম্ভবে না। বহির্দৃষ্টি ও অন্তর্দৃষ্টি এই উভয় প্রকার দৃষ্টির সহায়তায় প্রকৃত দেখা যায়। তাহা যদি না হইত, তাহা হইলে সকলেই দেহীমাত্রেই যাহার বাহিরের দুটো চোখ আছে, দেখিতে পাইত। প্রকৃতিকে প্রকৃতরূপে দেখিতে চিত্রকবিরাই সক্ষম। তাঁহারা তাঁহাদের দর্শনবিদ্যারূপী গুণময়ী মায়ার দ্বারাই যেন প্রকৃতিকে দেখেন ও তাহার অনুকরণ করেন। চিত্রকবিদিগের গুণময়ী মায়া পবিত্রা ও গোপনীয়া। তাহারই বলে তাঁহারা যখন যেখানে প্রকৃতির

ছবি প্রকৃত দেখিতে পান, সেখানে অপরেরা সেরূপ পায় না। তাঁহারা যে ছবি রচনা করেন তাহা অপরে পারে না।

যে সকল চিত্রকবিদের গুণময়ী মায়া যত অধিক ততই তাহাদিগকে বাহিরে দেখিতে গুণহীন—যেন নির্গুণ। এই গুণময়ী মায়াই জ্ঞানদৃষ্টি ছাড়া আর কি হইতে পারে? ইহাই জ্ঞানরশ্মি। এই জ্ঞানরাশ্মির ন্যায় সূক্ষ্মরশ্মি আর নাই। আজকাল বিজ্ঞান জগতে 'এক্স রেস্' 'এন্ রেস্' প্রভৃতি কত সূক্ষ্মরশ্মিসমূহ বাহির হইতেছে, তাঁহারা চক্ষুর দৃষ্টির বহির্ভূত পদার্থসমূহকে তাহাদের আবরণ ভেদ করিয়া দৃষ্টিপথে আনীত করিতেছে, তখন সুসূক্ষ্ম জ্ঞানরশ্মির তো কথাই নাই। চিত্রকবিদের মধ্যে এই সুসূক্ষ্ম জ্ঞানরশ্মিকে যিনি যতটা আয়ত্ত করিতে পারেন, তিনি ততটা প্রকৃতির মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া প্রকৃতিকে দেখিতে সমর্থ হয়েন। চিত্রকবিরা যখন প্রকৃতির মধ্যে তাঁহাদিগের জ্ঞানরশ্মি সাহায্যে গুণময়ী মায়া বিস্তার করিয়া প্রকৃতির ছবিসকল অনুকরণ করিতে থাকেন, তখন সাধারণ লোকে তাঁহাদিগকে যেন অসাধারণ শক্তিসম্পন্ন মায়াবীরূপে আশ্চর্য্যভাবে দেখে!

এই যে গুণময়ী মায়ার ভাব ইহা ভগবানেরই মায়ার ছায়া। প্রকৃতি দেখিলেই আমরা তাহা বুঝিতে পারি। প্রকৃতির পানে চাহিয়া দেখিলেই কি মনে হয়? মনে হয় কে যেন মহান গুণী তাঁহার গুণময়ী মায়ার প্রভাবে এই সকল রচনা করিয়াছেন! কিন্তু এত বড় গুণী হইয়াও তিনি যেন নির্গুণরূপে জগতে প্রতিভাত হয়েন। শ্রীমদ্ভাগবতে আছে:—

"ভগবান স্বয়ং নির্গুণ হইয়াও কার্য্যকারণাত্মিকা নিজ গুণময়ী মায়ায় প্রথমতঃ এই চরাচর বিশ্বের সৃষ্টি করিয়াছেন। পশ্চাৎ সেই সমস্ত গুণ, যখন আকাশাদিরূপে প্রকাশিত হইল, তখন তৎসমুদয়কে যেন আপনার গুণ বলিয়াই জ্ঞান করিয়া সকলের অভ্যন্তরে বিরাজ করিতেছেন। কিন্তু বাস্তবিক তাঁহার অভিমান নাই; কারণ, তিনি বিশুদ্ধ চিৎস্বরূপ।"

(শ্রীমদ্ভাগবত—১ম স্কন্ধ ২য় অধ্যায়।)

প্রকৃত চিত্রকবি হইলে এই জগতের বিচিত্র ছবি বুঝিতে পারেন, নির্গুণ ভগবানের গুণময়ী মায়াও উপলব্ধি করিতে পারেন, বুঝিতে পারেন যে, ভগবানের অসংখ্যরূপ কার্য্য চলিতেছে, তাঁহার শোভার সীমা নাই; তাঁহার

অসংখ্য হস্ত, পদ, মস্তক, অনন্ত কর্ণ, অনন্ত নাসিকা। প্রকৃত চিত্রকবিরা একরূপ যোগীদের মত। যোগীদের ন্যায় তাঁহারা জ্ঞানচক্ষুর দ্বারা দেখেন। শাস্ত্রে আছে "যোগিগণ প্রভূত জ্ঞানরূপ চক্ষু দ্বারা দর্শন করিয়া বলিয়া থাকেন;—পুরুষরূপ ভগবানের অসংখ্য অদ্ভুত হস্ত, পদ, মস্তক, কর্ণ ও নাসিকা।" *

এই অপ্রতিম ওঙ্কার ভগবান পরমেশ্বরের চিত্রকবি যোগিগণ একটা আশ্চর্য্য সুন্দর আদর্শপ্রতিমা প্রস্তুত করিয়া সাধারণ জনগণের ভক্তি প্রেম আকর্ষণ করিতে সকল দেশেই চেষ্টা করিয়াছেন। আজকালকার অনেক ইউরোপীয় পণ্ডিতের মত যে ঈশ খৃষ্টের ছবি চিত্রকবিকল্পিত। চিত্রকবি খৃষ্টের যে মূর্ত্তি কল্পিত করিয়াছেন তাহা এখনো জগতে আদর্শরূপে খৃষ্টের জীবন্তমূর্ত্তিরূপে বিরাজ করিতেছে, প্রসিদ্ধ হইয়া গিয়াছে। আমাদের দেশেও ঐরূপ চেষ্টা হইয়া গিয়াছে—অমূর্ত্ত ঈশ্বরকে সাধারণের বোধগম্য করিবার জন্য অনেক মূর্ত্তি কল্পনা হইয়া গিয়াছে।

যদি সহস্ররূপে চন্দন, স্বর্ণের দ্বারা তাঁহার প্রতিমা কল্পিত করি, যদি মানব সৌন্দর্য্যের আদর্শ করিয়া তাঁহার মূর্ত্তি গঠিত করি, তবুও কি তাঁহার প্রতিমা হয়?

বৈদিক ঋষিরা বলেন, "ন তস্য প্রতিমা অস্তি যস্য নাম মহদ্‌যশঃ—তাঁহার প্রতিমা নাই, তাঁহার নাম মহদযশ। তিনি যে এই বিশ্ব ছবি করিয়াছেন এই বিশ্ব সৃষ্টি করিয়াছেন, তাঁহার মহৎ যশ চতুর্দ্দিকে পরিব্যাপ্ত। তাঁহার মহৎ যশেই, তাঁহার মহিমাতেই তিনি প্রতিষ্ঠিত। উপনিষদে আছে "স ভগবঃ কস্মিন প্রতিষ্ঠিতইতি স্বে মহিম্নি।" শিষ্য গুরুকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন "সেই ভগবান কাহাতে প্রতিষ্ঠিত আছেন?" আচার্য্য উত্তর দিলেন—"স্বীয় মহিমাতেই তিনি প্রতিষ্ঠিত।"

পরমেশ্বরের প্রতিমা নাই তাঁহার মহিমাতেই তাঁহাকে জানা যায়। শুধু প্রতিমাতে কতদূর বুঝিতে পারি? সকল আত্মাই আপন আপন মহিমায় প্রতিষ্ঠিত, কারণ আত্মা সে পরমাত্মারই ছায়া। প্রতিমা কতদিন

* শ্রীমদ্ভাগবত—১ম স্কন্ধ ৩য় অধ্যায়।

থাকে, মহিমাই আসলে থাকে। যে চিত্রকবি চিত্র-প্রতিমার মধ্যে আত্মার অন্তরের মহিমাটুকু ফুটাইতে সমর্থ, বুঝিতে হইবে তিনি ততটা উন্নত ও মহান। যিশু খৃষ্টের ছবিতে ও সাধারণ মানুষের ছবিতে পার্থক্য তো কিছু নাই। তাঁহার যেমন নাক চোখ আছে, অন্য মানুষেরও সেইরূপ নাক চোখ আছে। তবে তফাৎ কোথায়? শুধু মহিমায়। খৃষ্টের চিত্রে চিত্রকবি যে মহিমাটুকু জাগাইয়া দিগাছেন, তাহাতেই খৃষ্টের মূর্ত্তি জগতে প্রতিষ্ঠিত হইয়া রহিয়াছে। খৃষ্টমূর্ত্তি, প্রতিমার অন্তরস্থ মহিমার দ্বারাই জগতে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারিয়াছে। বিশ্বে যত মূর্ত্তির প্রতিষ্ঠা হইয়াছে, সকলি নিজ নিজ মহিমার দ্বারা। জীবাত্মা যে প্রতিষ্ঠিত সেও নিজ মহিমাকে অবলম্বন করিয়া। কোন প্রতিমা যখন সমাদৃত হয় তাহারও কারণ প্রতিমার অন্তরস্থ মহিমাটুকু। কিন্তু ক্ষণভঙ্গুর প্রতিমার কি সাধ্য অন্তরের অপ্রতিমত্বকে প্রতিষ্ঠা করে?

শ্রীহিতেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

"কছবাহ" রাজবংশ।

[৭]

'কছবাহ'দিগের ধুন্ধার প্রদেশে আগমন সম্বন্ধে ভিন্ন ভিন্ন আখ্যান দৃষ্ট হয় যথা—প্রথম টড সাহেবের আখ্যান, দ্বিতীয় ক্যানিংহাম সাহেবের আখ্যান, তৃতীয় ভাট্ ও চারণগণের আখ্যান এবং চতুর্থ কছবাহ-বংশাবলীর আখ্যান।

'কছবাহ'দিগের ধুন্ধার দেশে প্রথম আগমন সম্বন্ধে ৪টী ভিন্ন ভিন্ন আখ্যান।

প্রথমতঃ টড্-সাহেবের আখ্যান বলিতেছি। তেজ-কর্ণ বা ধূলেরাওজীর পিতা সোঢ়পাল দেবজী তাঁহাকে নিতান্ত শিশু

১ টড্-সাহেবের আখ্যান।

রাখিয়া পরলোক গমন করেন। অবসর বুঝিয়া তাঁহার পিতৃব্য বলপূর্ব্বক গয়ালীয়ারের সিংহাসন অধিকার করিয়া লইলেন। ধূলেরায়ের মাতা পুত্রের প্রাণনাশ আশঙ্কায় ভীত হইয়া তাঁহাকে একটা চুপড়ীর ভিতরে লইয়া ছদ্মবেশে রাজ্যত্যাগ করিলেন। এইরূপে কছবাহরাজমহিষী কিয়দ্দূর গিয়া ক্ষুৎপিপাসায় কাতর হইয়া পড়িলেন। তিনি মস্তক হইতে চুপড়ীটি নামাইয়া ভূমিতলে রাখিলেন ও ফলমূলাদি অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। পরে ফিরিয়া আসিয়া দেখিলেন যে একটী ভীমাকার কালসর্প চুপড়ীর উপর চক্রবিস্তার করিয়া রহিয়াছে। তিনি তৎক্ষণাৎ উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিলেন। তাঁহার ক্রন্দনধ্বনি শুনিয়া জনৈক সন্ন্যাসী তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তিনি এই আশ্চর্য্য দৃশ্য দর্শন করিয়া ধূলেরাওর মাতাকে বলিলেন—"ভদ্রে! ক্রন্দন করিও না। এই পুত্র রাজা হইবে তাহারই এই পূর্ব্বলক্ষণ।" ধুন্ধাররাজ্যস্থাপয়িতা ধূলেরাওর মাতা বলিয়া উঠিলেন—"ভবিষ্যৎ অনেক দূরের কথা। এক্ষণে ক্ষুধাতৃষ্ণায় প্রাণবিয়োগ হইতেছে।" এই কথা শুনিয়া সন্ন্যাসী তাহাকে 'খো-গ্রামের রাস্তা দেখাইয়া দিয়া বলিলেন—"'খো'-গ্রামের মীনা রাজা বালমসিংহের নিকট গমন করিলে নিশ্চয় গ্রাসাচ্ছাদনের কোন না কোন উপায় হইতে পারে। 'খো'-গ্রাম বর্ত্তমান জয়পুর নগরের চার পাঁচ ক্রোশ দূরে অগ্নিকোণে পর্ব্বতের ক্রোড়ে অবস্থিত। অনন্তর ধূলেরাও-জননী চুপড়ীটি মাথায় তুলিয়া লইয়া খো-গ্রামের পথ দিয়া চলিতে লাগিলেন। দৈবযোগে তথায় পৌঁছিবামাত্র বৃদ্ধ মীনারাজ বালন সিংহজীর জনৈক পরিচারিকার সহিত তাঁহার পরিচয় হইল। তাঁহার চেষ্টায় তিনি বালনসিংহজীর রাজবাটীতে পাচিকার পদ প্রাপ্ত হইলেন। তিনি এমন সুন্দর রন্ধন করিলেন যে বৃদ্ধ মীনারাজ তাহা অস্বাদ করিয়া যৎপরনাস্তি প্রীত হইলেন ও তাঁহাকে ডাকাইয়া পাঠাইলেন। ধূলেরাওর মাতা আসিলেন। তিনি আত্মপরিচয় দিলেন—তাঁহার রাজবংশ প্রকাশিত হইয়া পড়িল। তদবধি বালনসিংহ তাঁহাকে ভগিনী ও তৎপুত্র ধূলেরাওকে ভাগিনের স্বরূপ স্বগৃহে স্থান দিলেন। হায় বালনসিংহজী জানিতেন না তিনি কালসর্প পোষন করিতেছেন। ধূলেরাও দিন দিন চন্দ্রকলাবৎ বাড়িতে লাগিলেন।

যখন তিনি যৌবনে পদার্পণ করিলেন রালনসিংহজী খো-গ্রামের কর দিয়া তাঁহাকে দিল্লী প্রেরণ করিলেন। তৎকালে বীলন দেবের বংশের 'তঁবর' ক্ষত্রিয় রাজপুতেরা দিল্লীর অধীশ্বর ছিলেন। রালনসিংহ ও অন্যান্য মীনারাজ-দিল্লীর অধীনস্থ করদরাজা ছিলেন।

ধূলেরাও দিল্লীতে পাঁচ বৎসর কাল অবস্থিতি করিলেন। তাঁহারা রাজা হইবার ইচ্ছা বলবতী হইয়া ধর্ম্মজ্ঞান একেবারে বিলুপ্ত করিয়া দিল। তিনি রালনসিংহকৃত পূর্ব্বোপকার বিস্মৃত হইলেন।

"রাজত্ব লভিতে কত রাজপুত্রগণ।
পিতৃহত্যা মহাপাপ করে আচরণ॥"

ধূলেরাও রাজ্যলোভে এইরূপ মহাপাপ করিলেন। দেওয়ালীর দিনে মীনাগণ একত্রিত হইয়া স্নান ও পিতৃতর্পণাদি করিয়া থাকে; এই দিবস তাহারা কোন অস্ত্রশস্ত্র গ্রহণ করে না। এই অবসরে ধূলেরাও একদল রাজপুত সঙ্গী লইয়া বৃদ্ধ মীনারাজ রালনসিংহজীকে সপরিবারে বিনাশ পূর্ব্বক স্বয়ং 'খো'র রাজা হইলেন।

এই শেষ মীনারাজ রালনসিংহজীর প্রস্তরপ্রাসাদ অদ্যাপিও 'খা'-গ্রামে বর্ত্তমান আছে। এই প্রাসাদের পূর্ব্বদিকে একটী বৃহৎ জলকুণ্ড আছে। এই জলকুণ্ডের একধারে একটী বিরাট বটবৃক্ষ বিশালছায়া বিস্তার করিতেছে; ভীষণ লোমহর্ষণস্মৃতি ইহার সহিত জড়িত আছে;—এই বটবৃক্ষের তলেই মীনাদিগের সর্ব্বনাশ হইয়াছিল। এখানে একটী দেবীমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত আছে। প্রবাদ আছে—মীনাদিগের অভ্যুন্নতিকালে প্রতিবৎসর আশ্বিন ও চৈত্রমাসের নবরাত্রিতে একটী ব্যাঘ্র আসিয়া এই দেবীমন্দিরে আরতি দর্শন করিত। পূর্ব্বে এই বাঘ একটী রমণীকে ভক্ষণ করিয়াছিল—প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ এইরূপ মন্দিরে আসিত।

এই ঘটনা প্রযুক্তই বোধ হয় জয়পুর রাজগণ ঝাল্‌নায় (জয়পুরের অন্তর্গত প্রদেশ) ব্যাঘ্র শীকার করিতে যাইবার পূর্ব্বে এই দেবীমন্দিরে পূজা চড়ান। নতুবা তাঁহাদের চারে বাঘ পড়ে না।

মীনারা দেবী উপাসক। খোর মীনাদিগের রাজলক্ষ্মীর সঙ্গে সঙ্গে একে

একে তাহাদিগের কুলদেবীরাও 'কছবাহ'দিগের কুলদেবীস্বরূপা হইলেন। *

রালনসিংহজী "চাঁদো" (চন্দ্র) সম্প্রদায়ের মীনা ছিলেন। এই কারণে তৎগোত্রিয় মীনাদিগের 'খো'-গ্রামে অবস্থান করিবার নিষেধ আছে। কথিত আছে—"চাঁদো" সম্প্রদায়ের কোন মীনা ক্রমান্বয় ছয়মাসকাল 'খো'গ্রামে বাস করিলে পূর্ব্বোক্ত দেবীমন্দির হইতে আপনা আপনি নাগারা ধ্বনি হইতে থাকে।—মীনাদিগের কুলদেবতা কছবাহদিগের রক্ষয়িত্রী হইয়াছেন।

মীনারাজ রালনসিংহ সম্বন্ধে একটি ক্ষুদ্র গল্প আছে। রালনসিংহজীর সোড়ী নামে এক রাণী ছিলেন। একদা রাজা ও রাণী খোর পাহাড় হইতে তীর ছুড়িয়াছিলেন, যেখানে রাণীর তীর প'ড়িয়াছিল, সেইস্থানটিতে সোড়ী রাণীর "বাওড়ী" বা জলকুণ্ড আছে। যেখানে রাজার তীর পড়ে, তথায় রাজার "বাওড়ী" আছে। খো দেশে একটী ভবিষ্যৎ বাণী প্রচলিত আছে যে, হাজার বৎসর পরে মীনারা পুনরায় 'খো' ফিরিয়া পাইবে।

ধূলেরাও খোর রাজা হইয়াই বড়পূজর রাজপুত দ্যোসাপতি রণমলজীর পুত্রীর পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন। রণমলের পুত্র সন্তান ছিল না, সুতরাং তাঁহার মৃত্যুর পর ধূলেরাওজী দ্যোসার সিংহাসন প্রাপ্ত হইলেন। এই কারণে ধূলেরাও সাধারণতঃ "বর রাজা" নামে অভিহিত হইয়া থাকেন। †

[১১]

ধূলেরাওজী এইরূপে ধুন্ধার রাজ্যের ভিত্তি স্থাপন করিলেন। ক্যানিং হ্যাম সাহেবের মতে খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে কছবাহ'রা গয়ালীয়ার হারাইয়া ছিলেন। দ্বাদশ শতাব্দি শেষ হইতে না হইতেই ধুন্ধার দেশে রাজ্য দৃঢ়বদ্ধ করিলেন। টড্ সাহেবের মতে সাত শত বৎসর, ক্যানিংহ্যাম সাহেবের মতে সার্দ্ধ আট কি নয় শত বৎসর কাল কছবাহ'রা নরবর—গয়ালীয়ারে অবস্থিতি করিয়াছিলেন। ধূলেরাওর ধুন্ধার রাজ্যের সূত্রপাতের পর হইতে সাত শত বা তদধিক বৎসর কছবাহ'রা রাজস্থানে রাজত্ব করিয়া আসিতেছেন। ধুন্ধার, অম্বর ও জয়পুর এই ভিন্ন ভিন্ন নামে

ধুন্ধার রাজ্যপত্তন।

* অম্বরের বর্ণনায় পশ্চাৎ দ্রষ্টব্য।

† পশ্চাৎ দ্রষ্টব্য।

খ্যাত ধূলেরাওজীর নবপ্রতিষ্ঠিত রাজ্য নানা ভাগ্যবিপর্য্যয়ের পর, আজ রাজস্থানের মধ্যে শীর্ষস্থানীয় হইয়াছে। *

শ্রীনগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়।

স্বর্গীয় কেশবচন্দ্র ব্রহ্মানন্দের নব কুমারের শুভ জাত-কর্ম্ম।

ব্রহ্মস্তোত্র। †

হে করুণা-বিধান বিশ্ব-নিধান বিধাতা পুরুষ! আমরা যখন যে প্রকারে অবস্থান করিলে স্বচ্ছন্দে জীবন ধারণ করিতে পারি, তুমি আমাদিগকে তখন সেইরূপেই রক্ষা করিয়া আপনার অপার করুণা বিস্তার করিতেছ। তুমি

* রাজা রাজেন্দ্র লাল মিত্রের পুস্তকে লিখিত আছে যে, তিনি গোয়ালীয়ার গড় হইতে এক পাষাণলিপি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ইহাতে এইরূপ লিখিত আছে যে তঁবররাজপুত'রা কছবাহ'দিগের হস্ত হইতে গয়ালীয়ার কাড়িয়া লইয়াছিল ও কছবাহদিগকে তথা হইতে তাড়াইয়া দিয়াছিল। ৯৪৪ সম্বতে এই তঁবররাজপুতদিগের লক্ষণ নামক জনৈক পুরুষ গয়ালীয়ারে রাজত্ব করিতেছিলেন। ইহাতে স্পষ্টই প্রতীত হয় যে, ৯৪৪ সম্বতের পূর্ব্বেই কছবাহরা গয়ালীয়ার হারাইয়া ছিলেন। কোন কোন বংশাবলীতে ধূলেরাও'র দ্যোসা অধিকার কাল সম্বৎ ৯৩৩ প্রদত্ত আছে।

† স্বর্গীয় পিতামহদেব পূজ্যপাদ শ্রীমদ্দেবেন্দ্র নাথ ঠাকুর মহোদয় স্বর্গীয় কেশব চন্দ্র ব্রহ্মানন্দের জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীযুক্ত বাবু করুণাচন্দ্র সেন মহাশয়ের শুভ জাতকর্ম্মোপলক্ষে যে ব্রহ্মস্তোত্র উচ্চারণ করিয়াছিলেন সেই সময়ে স্বর্গীয় পূজ্যপাদ পিতৃদেব হেমেন্দ্রনাথ ঠাকুর তাহা তৎক্ষণাৎ লিখিয়া লইয়াছিলেন। কতদিন পূর্ব্বে পূজ্যপাদ পিতৃদেব এই ব্রহ্মস্তোত্রটী হরিতালাক্ত কাগজে সযত্নে লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিয়া গিয়াছেন। ইহা ২৮ শে পৌষ ১৭৮৪ শকে লিখিত। এক্ষণে ১৮২৬ শক চলিতেছে।

সমস্ত বিশ্ব-ব্যাপারকে আমাদিগের অবস্থার উপযোগী করিয়া জীবের কল্যাণ বর্দ্ধন করিতেছ। তুমি জরায়ু-সমাবৃত গর্ভকে এবং সদ্যোজাত শিশুকে যে প্রকার যত্নে রক্ষা কর, তাহার উপমা আর কোথাও নাই। গর্ভ সংস্থান হওয়া, গর্ভ রক্ষা পাওয়া, এবং গর্ভ পালিত হওয়া, ইহার এক একটি বিষয়েতে তোমার অপার মহিমা প্রকাশিত রহিয়াছে। যে অন্ত্রময় উদর মধ্যে এক বিন্দু মাত্রও অপর পদার্থ স্থান পাইতে পারে না, সেখানেও গর্ভস্থ সন্তানকে সংস্থাপন করিয়া পালন কর। তুমি সেই গর্ভের মধ্যে যেন বিরলে বসিয়া স্বহস্তে তাহার ভাবি-প্রয়োজন-সাধন চক্ষু কর্ণাদি ইন্দ্রিয়-সকল নিপুণরূপে রচনা কর এবং তাহার মুগ্ধকর মুখেতে শ্রীসৌন্দর্য্য সাধন কর। আবার যখন সে এক লোক হইতে লোকান্তরে আসিবার ন্যায় বায়ুশূন্য তিমিরাবৃত জরায়ুশয্যা পরিত্যাগ করিয়া আলোকময় পৃথিবীতে আসিয়া উত্তীর্ণ হয়, তখনো তোমার করুণা অগ্রসর হইয়া স্নেহ-রূপে তাহাকে আলিঙ্গন করে। তোমার প্রেম তখন পিতামাতার মনে স্নেহরূপে অবতীর্ণ হয় এবং সুহৃদ্‌গণের আনন্দ-কোলাহল মধ্যে প্রেমার্দ্র হইয়া তাঁহারা পুত্রের মুখচন্দ্রমা নিরীক্ষণ করেন। শিশুসন্তানের প্রতি তোমার এমনি প্রেম, যে, তাহার প্রতি কাহারো দ্বেষভাব হইবার সম্ভাবনা নাই। যাহার মন মোহেতে এককালে বিকৃত হইয়া না যায়, এবং যাহার নিষ্ঠুর অন্তঃকরণ হইতে দয়া এককালে প্রস্থান না করে, সে আর কোন মতে স্তন্যপায়ী শিশুর প্রতি শত্রুতা করিতে পারে না। তুমি বালককে সকলের স্নেহের আস্পদ করিয়া নির্ম্মাণ করিয়াছ। চুম্বক-মণি যেমন লৌহ প্রাপ্ত হইলে আপনা হইতে তাহাকে আকর্ষণ করে, দুগ্ধ-পোষ্য বালকের মুখ-মণ্ডলও সেইরূপ নরনারীর স্নেহকে আকর্ষণ করে। হা! জগদীশ! তোমার মহিমা আমরা কতই কীর্ত্তন করিব। তুমি যখন সঙ্কীর্ণ গর্ভাশয় জরায়ুর মধ্যে সর্ব্বাবয়ব-সম্পন্ন মনুষ্য-সন্তানকে রক্ষা কর, এবং তাহার প্রাণ রক্ষার জন্য গর্ভধারিণীর উদর হইতেই তাহার ভোজন পান বিধান কর এবং অবশেষে স্বয়ং ধাত্রী হইয়া তাহার প্রসবক্রিয়া সম্পাদন কর; তখন সেই বালক ভূমিষ্ঠ হইলে যে তাহাকে যত্ন পূর্ব্বক রক্ষণ ও পোষণ করিবে, তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি? তুমি আমাদিগকে কোন অবস্থাতেই বিস্মৃত হও না। শৈশবাবস্থায় যখন আমাদের আত্মরক্ষার ও আত্মপোষণের কোন শক্তিই

ছিল না, যখন আমরা ক্ষুৎপিপাসাতে পীড়িত হইলেও আপনা হইতে অন্ন-পান আহরণ করিতে পারিতাম না, যখন আমরা অতি লঘু বিপদকেও অতিক্রম করিতে অক্ষম ছিলাম, তখন তুমি পিতামাতার মনে কেবল এক স্নেহ দিয়া আমাদের সকল অভাব মোচন করিয়াছ। যখন আমরা তোমাকে জানিতেও পারি নাই, এবং তোমার নিকটে প্রার্থনা করিতেও পারি নাই, তখনও তোমার করুণা মর্ত্ত্যলোকে আবির্ভূত হইয়া আমাদিগকে প্রতিক্ষণে রক্ষা করিয়াছে, অতএব আমরা অদ্য তোমার সেই সকল করুণা স্মরণ করিয়া শ্রদ্ধা ও প্রীতি পূর্ব্বক তোমাকে নমস্কার করিতেছি, তুমি আমাদের বিশুদ্ধ প্রীতি গ্রহণ কর।

আলিপুর।

বীরভূম, মহাপ্রতাপশালী, স্বাধীন, মহারাজ বীরসিংহের নামানুসারে স্থাপিত। অনেকে অনুমান করেন, মহাবীর ভীম কর্ত্তৃক ইহার নাম বীরভূম হইয়াছে। মহাত্মা হাণ্টার সাহেবের লিখিত বিবরণে অবগত হওয়া যায় যে, ভীর নামক অসভ্য জাতির বাস বলিয়া, উহা বীরভূম নামে অভিহিত হইয়াছে। ইহার উত্তরে মুঙ্গের, এবং রাজমহাল, দক্ষিণে বর্দ্ধমান এবং পাচিত, (বাঙ্কুরা), পুর্ব্বে রাজসাহি, এবং পশ্চিমে মুঙ্গের ও পাচিত। এই স্বাধীন রাজ্যমধ্যে, আকৃথোকৃরা নামক গ্রামে, বীরশ্রেষ্ঠ ভীমসেন হিড়িম্ব নামক রাক্ষসকে বিনাশ করতঃ, তদীয় সহোদরা হিড়িম্বার পাণি গ্রহণ করেন। হিড়িম্বার গর্ভে ঘটোৎকচের জন্ম হয়।

মহাবীর বীরসিংহ, প্রথম হিন্দুরাজা। ফতেসিংহ ও চৈতনসিংহ, তাঁহার সহোদর। মুর্শিদাবাদের অন্তর্গত বীরভূম, বীরসিংহ স্বীয়ভ্রাতা ফতেসিংহকে প্রদান করেন; এতদ্বারা সপ্রমাণ হইতেছে, যে মুর্শীদাবাদও বীরভূমের অন্তর্গত। মহারাজ বীরসিংহ আসাদুল্লাখাঁ কর্ত্তৃক বিনাশিত হন। আসাদুল্লা তৎসঙ্গে বিনাশিত হন।

বীরভূমের অধিপতিগণ

স্বাধীন

(১) জোন্‌দ খাঁ
(২) বাহাদুর খাঁ (রনমস্ত খাঁ)
(৩) খোজা কমল খাঁ
(৪) আসদুল্লা খাঁ
(৫) বৈদ্যজমা খাঁ
(৬) আজমতজমা খাঁ
(৭) আহম্মদজমা খাঁ
(৮) মহম্মদ আলি খাঁ
(৯) আস্‌দ্‌জমা খাঁ
(১০) বাহাদুরজমা খাঁ
(১১) মহম্মদজমা খাঁ
(১২) দোয়ারজমা খাঁ
(১৩) জহরজমা খাঁ

মহাবীর আলিলখি খাঁ এই বংশসম্ভূত। তিনি স্বীয় পিতার সহিত বিবাদ করিয়া, রাজ্য গ্রহণ না করিয়া, মুর্শীদাবাদের অধীশ্বরের আশ্রয় গ্রহণ করিলেন এবং স্বীয় বীর্য্যবলে প্রধান সেনাপতি বলিয়া বিদিত হইলেন। নবাবের আদেশক্রমে ইংরাজগণকে পরাভূত করিয়া বন্দী করিলেন; তাঁহারা নির্ম্মল বায়ুর অভাবে অনেকেই মানবলীলা সম্বরণ করিলেন। ইহাই অন্ধকূপহত্যা। আলিলখি ইংরাজাধিকৃত রাজ্য গ্রহণ করতঃ উক্ত রাজ্য আলিপুর নামে অভিহিত করিলেন। এখনও আলিপুরে, আলিলখির নাম লুপ্ত হয় নাই। এক্ষণে এই স্থানে ছোট লাটের বাসভবন।

শ্রীগোলোক বিহারী দে।

বাঙ্গালী।

শীশ আর করতালি খুব শিখেছ বাঙ্গালী!
সভামাঝে বুক বেঁধে, শুধু বাক্য জাল ফেঁদে,
যেন রাশি চোরাবালি হুজুকে মাতাও খালি;
বক্তৃতায় দীপ্ত আঁখি, কাজের বেলায় ফাঁকি—
তবু এ সবের জন্য, প'ড়ে যায় ধন্য ধন্য
বিখ্যাত বাঙ্গালী জাতি জগতের অগ্রগণ্য!
হলেই বা পেটরোগা, বক্তৃতায় ভারি রোকা
বসিবে মধুর আঁখি—আফিসের পোষাপাখি—
কলমের ঠোঁট তুলি পড়িবে কেরাণী বুলি;
দাঁড়ে বসে কাকাতুয়া—বুলি যেন চোকা চোকা!
দুকাঠার জমীদার—রাজা নাম চাহি তার—
যে না পাইল তা সেধে, মরিল সে মনোখেদে—
লইবেরে শিরে তুলি মলিনতা পদধূলি;
এমনি বাঙ্গালী ছার বুঝে কে মহিমা তার!

শ্রীঋতেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

সিদ্ধ ডিমের কারি।

(নূতন প্রকার।)

উপকরণ।—পেঁয়াজ কুঁচা আধ পোয়া, ঘি আধ পোয়া, দই আধ পোয়া, আদা এক তোলা, ধনে-বাটা এক তোলা, শুক্নালঙ্কা দুইটী, হলুদ-বাটা আধ তোলা, মাংসের ব্রথ্ তিন পোয়াটাক, ময়দা দুই তোলা, নুন আধতোলাটাক, ছাড়ান কড়াইশুটি আধ ছটাক, তেমতি বা বিলাতী বেগুন আধ পোয়া, হাঁসের ডিম পাঁচটা।

প্রণালী।—প্রথমে আধসের পাঁটার বা ভেঁড়ার হাড় আনিয়া ডেড় সের বা দুই সের জলে চড়াইয়া দাও। এই সঙ্গে ইহাতে পাঁচ ছয়টা ডিম সিদ্ধ করিতে দাও। ঘণ্টা দুই পরে জল মরিয়া তিন পোয়াটাক থাকিলে, হাঁড়ি নামাইয়া ব্রথ্টা ছাঁকিয়া রাখ। সিদ্ধ ডিমগুলাকে খোলা ছাড়াইয়া আস্ত বা আধখানা করিয়া চিরিয়া রাখিয়া দাও।

এইবারে আরেকটী হাঁড়িতে ঘি চড়াইয়া তাহাতে পেঁয়াজকুঁচা ছাড়। খুন্তি দিয়া নাড়িতে থাক। দু তিন মিনিটের মধ্যেই পেঁয়াজগুলা লালচে লালচে হইয়া আসিলেই, ঘি হইতে উঠাইয়া রাখ। এখন এই ঘিয়েই দই, আদা-বাটা, ধনে ও লঙ্কা-বাটা এবং হলুদ-বাটা ছাড়। ক্রমাগত খুন্তি দ্বারা নাড়িয়া নাড়িয়া কষিতে থাক। কষিবার কালে একটু একটু জলের ছিটা দিয়া কষিবে। খুন্তি দ্বারা হাঁড়ির তলা ঘষিয়া ঘষিয়া কষিতে হইবে। মিনিট পাঁচ ছয়ের মধ্যে মশলা বেশ লাল হইয়া আসিলে ময়দা-গোলা মাংসের ব্রথ্টা ঢালিয়া দাও। প্রথমে একটুখানি ব্রথে ময়দাটা বেশ গুলিয়া লইয়া পরে সেইটা সমস্ত ব্রথে মিশাইতে হইবে। এখন অর্দ্ধেক করিয়া কাটা ডিমগুলা, বিলাতী বেগুন, কড়াইশুটি ছাড়। নুন দাও। নাড়িতে থাক। পেঁয়াজ-ভাজা ছাড়। দু এক ফুট ফুটিলে নামাইয়া রাখ।

ভোজন বিধি।—লুচি, রুটী দিয়া অথবা পাঁউরুটী দিয়া খাও, বেশ লাগিবে।

মাংসের বা মাছের ইষ্টু-দোল্মা।

(খাদ্যপাক।)

উপকরণ।—পাঁটার বা ভেঁড়ার কিমামাংস আধ সের, গরমভাত আধ-পোয়াটাক, পেঁয়াজের রস এক কাঁচ্চা, নুন আধ তোলাটাক, গোলমরিচ-গুঁড়া সিকি তোলা, ডিম দুইটা, নাউ-পাতা মাঝারি ধরণের পনের ষোলটী, মাংসের হাড় আধসের, রসাল কাগজিনেবু একটী।

প্রণালী।—মাংস আনিয়া হাড় ও চর্ব্বি বাছিয়া কিমা কর। আধপোয়া-টাক্ গরম ভাত উহার সঙ্গে মিশাইয়া মাখিয়া রাখ। পেঁয়াজের রসটুকু সব এবং সিকি তোলা নুন ও দুয়ানি ভর গোলমরিচ-গুঁড়া উহাতে মিশাও। একটা ডিমের লাল ও সাদা অংশ ফেটাইয়া লইয়া মাংসে মাখিয়া রাখ। পনেরটী নাউপাতায় কিছু কিছু মাংস পুরিয়া তারপরে মুড়িয়া সূতা দ্বারা বাঁধিয়া দাও।

মাংসের হাড়গুলা সের দুই জল দিয়া পূর্ব্ব হইতে আরেকটী হাঁড়িতে মন্দা আঁচে চড়াইয়া দিবে। দুইসের জল মরিয়া মরিয়া যখন একসেরে দাঁড়াইবে তখন তাহা উঠাইয়া রাখিবে।

এইবারে এই সুপে নাউপাতায় মোড়া দোল্মাগুলি সাজাইয়া মন্দা আঁচে আগুনে চড়াও। হাঁড়ি ঢাকিয়া রাখ। ঘণ্টা দেড় ধরিয়া সিদ্ধ হউক। তারপরে হাঁড়ি নামাইয়া দোল্মাগুলি আলাদা একটী পাত্রে উঠাইয়া রাখ। আর হাঁড়ির মধ্যে যে ঝোলটুকু (পোয়াটাক) থাকিবে তাহাতে আধপোয়া দুধ ও একটা ডিমের লাল অংশ মিশাও। নুন সিকি তোলাটাক্ ও গোল-মরিচ-গুঁড়া এক নুনের চামচ উহাতে দাও। ঝোলটা ঠাণ্ডা হইলে তবে এই সব দিবে, নহিলে দুধ ছিঁড়িয়া যাইতে পারে। একবার অল্পক্ষণের জন্য আগুনে চড়াও। ক্রমাগত হাতা দিয়া নাড়। একটু ঘন ঘন হইলেই নামাও। বরাবর একদিকে হাতা নাড়িতে হইবে। উল্টাপাল্টা ভাবে নাড়িলে দুধ ছিঁড়িয়া যাইতে পারে। ডিসে বা কোন গভীর পাত্রে প্রথমে

দোল্মাগুলি সাজাইয়া রাখিয়া পরে গ্রেভি অর্থাৎ ঝোলটা ঢালিয়া দিবে। কোপ্তাগুলির উপরে নেবুর রস দিয়া দিবে।

এইরূপে মাছেরও করা যায়। সেস্থলে মাছের একটী একটী করিয়া কাঁটা বাছিয়া লইতে হয়। নাউপাতার অভাবে কুমড়াপাতা বা রাঙামোতা প্রভৃতি শবজীর পাতাতেও দোল্মা বাঁধা যাইতে পারে।

ভোজন বিধি।—পাঁউরুটীর সঙ্গে খাইতে বেশ লাগিবে। ডিনারে একটী ডিস্‌রূপে যাইতে পারে। লুচির সঙ্গেও খাইলে কিছু খারাপ লাগিবে না।

চা।

আজ কাল আমাদের দৈনিক পান ভোজনের মধ্যে চা একটী অত্যাবশ্যকীয় আহার্য্য হইয়া উঠিয়াছে। কি বড় লোক, কি গরীব লোক, হিন্দু হউক আর অহিন্দু হউক, চা সকলেই পান করিয়া থাকেন, সকলেই চায়ের পক্ষপাতী হইয়া পড়িয়াছেন। এমন কি চাকর দাসীরাও তাহাদের মনিবের অনুকরণ করিতে শিখিয়াছে; আর খোকা বাবুদের ত কথাই নেই—বাপ মারা চা পান করেন, তাহারা ভাবেন কি অমৃতই পান করিতেছেন। "আমাদের বেলায় শুধু দুধ দেওয়া হয়, তা হবে না, আমরাও ঐ খাব" বলিয়া ক্রন্দন ধরিলে কাজেই তাহাদের সান্ত্বনার জন্য দুধের সহিত দুই চারি চামচ চা মিশাইয়া দিতে হয়। ক্রমে তাহারাও এক একটি প্রধান চা-খোর হইয়া পড়েন। অতএব চা টা আর সখের জিনিষের মধ্যে গণনীয় নহে। দশ বৎসর আগে চা পানের এত আদর ছিল না এখন যেমন হইয়াছে। তখন চা হইলেই হইত; ভালই হউক আর মন্দই হউক সে বিষয়ে কদাচিৎ দৃষ্টি থাকিত। কেননা চায়ের ভাল মন্দ বিচার করিবার শক্তি অল্প লোকেরই ছিল। এখনও যে আমাদের মধ্যে বেশী লোকের হইয়াছে তাহা খুবই সন্দেহ। তখন চা পান করা বড় লোকের চিহ্ন ছিল। সাধারণ লোকের মধ্যে যদি কেহ এক পোয়ালা চা পান করিত তাহা হইলে নিজেকে গৌরবান্বিত

মনে করিত এবং বন্ধুবর্গের নিকট সে সু-খবর শতবার উল্লেখ না করিয়া থাকিতে পারিত না।—যদিও এই উদ্ভিদ পদার্থটী এখন প্রায় সকলেরই উপর আধিপত্য স্থাপন করিতে সক্ষম হইয়াছে কিন্তু ইহা যে কিরূপে প্রস্তুত হয় ও ইহার গাছই বা কত বড় ও ইহা কি প্রকারে চাষ করা যায় এই সকল বিষয় অল্প লোকেরই জানা আছে। যাহা হৌক পাঠকগর্গ যাহাতে চা সম্বন্ধে দুই একটি কথা কহিতে পারেন, আমরা তাঁহাদের উপকারার্থে এই প্রস্তাবে ইহার কিঞ্চিৎ যথার্থ বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়াছি।

ইউরোপীয় পণ্ডিতগণ সচরাচর বলেন যে, চার আদি উৎপত্তি স্থান চীন-দেশ। চীনেরাই ইহা প্রথম আবাদ করে ও তাহাদের মধ্যেই চা পান প্রথা বহুকাল হইতে প্রবর্ত্তিত আছে। আমাদের দেশে যেমন তুলসী, পুঁইশাক, পেঁয়াজ প্রভৃতির সৃষ্টি সম্বন্ধে আজগুবী গল্প শুনিতে পাওয়া যায়, তেমনি চীন-দিগের মধ্যেও চা এর উৎপত্তি সম্বন্ধে অদ্ভুৎ গল্প প্রচলিত আছে। একজন ডচ্ পর্য্যটক ষষ্ঠ শতাব্দীতে চীনদেশ ভ্রমণ করিয়া তাঁহার ভ্রমণ বৃত্তান্তে লিখিয়া গিয়াছেন, যে, চায়ের উৎপত্তি সম্বন্ধে চীনদিগের মধ্যে একটি কুসংস্কারমূলক গল্প আছে।—জনৈক বৌদ্ধ রাজবংশীয় মহাপুরুষ বহুকাল হইল ভারতবর্ষ হইতে চীনদেশে গমন করেন। সেখানে কঠোর সন্ন্যাস ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া ধর্ম্ম প্রচারের সহিত বিশুদ্ধ চিত্তে কালাতিপাত করিতেছিলেন। এক দিন অত্যধিক পরিশ্রমে ক্লান্ত হইয়া আহারাদি করিয়াই নিদ্রামগ্ন হইলেন। কিন্তু সে দিবস বৌদ্ধরীত্যনুযায়ী তাঁহার উচিত ছিল অনশনে থাকিয়া ধর্ম্মা-লোচনা করতঃ জাগ্রত অবস্থায় রাত্রি যাপন করেন। এই অপরাধে তিনি যারপর নাই দুঃখিত হইলেন এবং নিজেকে ধিক্কার দিয়া দুই চক্ষুর পাতা কাটিয়া ভূমিতে নিক্ষেপ করিলেন; পর দিবস প্রাতঃকালে তিনি আশ্চর্য্য হইয়া দেখিলেন, সেই দুই মাংস খণ্ডের মধ্য হইতে দুইটি বৃক্ষ উৎপন্ন হইয়াছে। তিনি ভাবিলেন এই বৃক্ষ দুইটী কোন বিশেষ অভাবমোচনের জন্য জগদীশ্বর প্রেরণ করিয়াছেন। তিনি তাহার গোটাকতক পত্র ছিন্ন করিয়া ভক্ষণ করিলেন। ভক্ষণ করিবামাত্র তাঁহার শরীর সতেজ ও চিত্ত প্রফুল্ল হইয়া উঠিল। এইরূপে চা বৃক্ষের আবিষ্কার হইল। এই গল্প হইতে আভাস পাওয়া যাইতেছে যে, চা বৃক্ষ সর্ব্বপ্রথম ভারতবর্ষেই উৎপন্ন হয়, পরে চীনে

লইয়া যাওয়া হয়। আর চক্ষুর পাতা হইতে উৎপন্ন এই কথার মর্ম্ম হইতে ইহার গুণাগুণ সম্বন্ধে এই বুঝা যায় যে; চা একটি নিদ্রাবিরোধী সামগ্রী।

ডাক্তার ব্রেসনাইডার একজন খ্যাতনামা রুষ পণ্ডিত। তিনি পিকিন্ রাজধানীতে রুষের রাজপ্রতিনিধির সহিত থাকিতেন। তিনি চীন ভাষায় বিশেষ পারদর্শী ছিলেন ও তাঁহার চীন সাহিত্যে যথেষ্ট ব্যুৎপত্তি ছিল। তিনি লিখিয়াছেন যে "পেণ্ট সাও" নামক একটি অতি প্রাচীন চীনগ্রন্থে চা বৃক্ষের উল্লেখ দৃষ্টি হয়। এই গ্রন্থটি খ্রীষ্টীয় শতাব্দীর ২৭০০ বৎসর পূর্ব্বে প্রণয়ন করা হইয়াছিল। "রাইয়া" নামক আর একটি গ্রন্থেও এরূপ উল্লেখ আছে। সে গ্রন্থটি ৫০০ হইতে ৬০০ খ্রীষ্টীয় শতাব্দীর পূর্ব্বে লিখিত হয়। অতএব দেখিতে পাওয়া যাইতেছে, যে, চা পান করা চীনদিগের মধ্যে একটি অতি প্রাচীন প্রথা। ভারতবর্ষ হইতেই যে চা চীনদেশে প্রথম প্রেরণ করা হয় তাহার বিশেষ প্রমাণ নাই। চা শব্দটি চীনদেশীয়; ভারতবর্ষের কোন প্রাচীন গ্রন্থে চা শব্দের মোটেই উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় না। কিন্তু তাই বলিয়া যে ভারতবর্ষে একেবারেই চা গাছ ছিল না, তাহা নয়। ইউরোপীয় উদ্ভিদ-তত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণ বলেন, আসাম দেশে চা বৃক্ষ আপনা হইতেই উৎপন্ন হইয়া থাকে। কাছাড় ও আসামের উত্তর ভাগে ইহা যে স্বাভাবিক ভাবে জঙ্গলের মধ্যে উৎপন্ন হয়, তাহা প্রায় ৭০ বৎসর অতীত হইল প্রথম আবিষ্কৃত হইয়াছে। সেখানে ইহাকে আম্র বৃক্ষের ন্যায় বৃহৎ বৃক্ষ আকারে পাওয়া গিয়াছিল। এবং এখনও অরণ্য মধ্যে, ইহা সেই ভাবে উৎপন্ন হইতেছে। ১৮২৩ খৃষ্টাব্দে যখন আসাম, ব্রহ্মদেশ হইতে ছিন্ন হইয়া ইংরাজ শাসনাধীনে আনীত হয়, তখন ব্রুস নামক দুই ইংরাজ পর্য্যটক, চায়ের চারা ও বীজ আনয়ন করেন। এই নমুনা চীনজাতীয় চা বৃক্ষের সহিত মিলাইয়া প্রমাণ করা হইল ইহা যথার্থ চা। তখন হইতে চা আবাদের প্রতি ইংরাজদের দৃষ্টি আকৃষ্ট হইল। ভারতবর্ষে যে চা হইতে পারে, তাহা তাঁহাদের বিশ্বাস ছিল না। তাঁহারা জানিতেন যে উহা চীনদেশেরই একমাত্র উদ্ভিজ্জ। এক্ষণে যেই, সেই ভ্রম সংশোধন হইল, অমনি সকলেই আগ্রহের সহিত চা আবাদে মনোনিবেশ করিলেন। ভারত গবর্ণমেণ্ট চীনদেশ হইতে বীজ আনাইয়া ভারতবর্ষের নানা স্থানে রোপন করিয়া পরীক্ষা করিতে লাগিলেন কোথায় ভালরূপ হইতে পারে। যাঁহারা

চা আবাদ করিতে প্রস্তুত তাঁহাদিগকে যথেষ্ট সাহায্য ও উৎসাহ প্রদান করিতে লাগিলেন। যেখানে টাকা পাওয়া যায় ইংরাজকে সেইদিকে দ্রুত-তার সহিত যাইতে দেখিতে পাওয়া যায়। তাঁহারা বরাবর চীনদেশের চা পান করিয়া আসিতেছেন এবং সেই চা খুব দরে বিক্রয় হয়। অতএব এখন তাঁহারা দেখিলেন তাঁহারা স্বয়ংই নিজ রাজ্য মধ্যে সেই চা উৎপন্ন করিতে পারেন এবং তাহাতে যথেষ্ট অর্থোপার্জ্জনও হইবে।

ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর সপ্তদশ শতাব্দীর কার্য্যবিবরণী পাঠে জানা যায় যে ১৬৬৪ খৃঃ উক্ত কোম্পানী দ্বারা ইংলণ্ডের রাজাকে ২ পাউণ্ড চা উপঢৌকন স্বরূপ প্রদত্ত হইয়াছিল। সেই চা সংগ্রহ করিতে কোম্পানীকে প্রত্যেক পাউণ্ডের জন্য ৩০ টাকা ব্যয় করিতে হইয়াছিল। দুই বৎসর পরে আবার ২২ পাউণ্ড চা ইংলণ্ডের রাজাকে প্রেরণ করা হয়, তাহার প্রত্যেক পাউণ্ডের মূল্য ৩৭৷৷০ সাঁইত্রিশ টাকা আট আনা। এই সময় ইংলণ্ডে খুব অল্প মাত্রায় চা রপ্তানী করা হইত। তাহা কেবল লক্ষপতি ব্যতীত আর কাহারও ক্রয় করিবার সাধ্য ছিল না। কেননা সাধারণতঃ এক পাউণ্ড চার মূল্য ৭৫৲ হইতে ১৫০৲ পর্য্যন্ত উঠিত। ক্রমশই শতাব্দীর শেষ ভাগে লণ্ডনের কতিপয় বিখ্যাত সাধারণ খাদ্যালয়ে পিয়ালা করিয়া চা বিক্রয় হইত। যাঁহারা চা সংগ্রহ করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন, তাঁহারা যথেষ্ট লাভ করিতে লাগিলেন। কথিত আছে পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে পর্ত্তুগীজদের সহিত চীনবাসীদের ব্যবসা বাণিজ্যের প্রথম সূত্রপাত হয়। এবং সেই সময় তাহারা ইউরোপে কিছু কিছু চা লইয়া যাইত।

ইউরোপীয় প্রাচীন সাহিত্যের মধ্যে বিখ্যাত নাবিক মার্কো পোলোর জীবন চরিতে চায়ের উল্লেখ আছে। এই পুস্তকটি ১৫৪৫ খৃঃ রচিত হয়। ইহাতে লিখিত আছে যে মার্কো পোলো একজন পারস্য দেশীয় ব্যবসায়ীর নিকট হইতে এক প্রকার নূতন পানীয় প্রস্তুত করিতে শিখিয়াছিলেন। ইহার প্রায় ৫০ বৎসর পরে আর একজন ইউরোপীয় পর্য্যটক লিখিয়া যান যে চীনেরা একজাতীয় উদ্ভিদ হইতে পেষণ করিয়া একপ্রকার মুখরোচক রস বাহির করিয়া মদ্যের ন্যায় পান করে। য়ুরোপীয়দের অনুমানে ইহা চা পত্রের রস ব্যতীত আর কিছুই নহে।

ভারতবর্ষে চায়ের চাষ আরম্ভ হইবার অনেক পূর্ব্ব হইতেই ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী চীনদেশ হইতে চা আনয়ন করিয়া ইউরোপে বিক্রয় করিতেছিল। চা ব্যবসায়ে তখন এই কোম্পানীর একমাত্র অধিকার ছিল। আর কোনও ব্যবসায়ীর ইংলণ্ডে চা আমদানী করা আইনানুযায়ী নিষেধ ছিল। তাহারা প্রায় দুই শত বৎসরাবধি নির্ব্বিশেষে এই বাণিজ্যের উপর একাধিপত্য করিয়া আসিতেছিল। অতঃপর ১৮৩৩ খৃঃ সে অধিকার হইতে বঞ্চিত হয় এবং তখন হইতে সকলকেই চা ব্যবসায়ে সমান অধিকার দেওয়া হইল। এখন হইতে সকলেরই চা ব্যবসায়ের দিকে দৃষ্টি পড়িল। কেননা ইহা একটি অত্যন্ত লাভকর ব্যবসায়। স্বর্গীয় মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর বলিতেন, ভারতবাসীর মধ্যে সর্ব্বপ্রথম তাঁহার পিতা লোকবিশ্রুত স্বর্গীয় দ্বারকানাথ ঠাকুর মহোদয় চায়ের ব্যবসায় সূত্রপাত করেন। এই সূত্রে তিনি নানা-স্থানে দেশবিদেশে চা প্রেরণ করিতেন। এই সময়ে ভারতগবর্ণমেণ্ট চা-কর দিগকে বিনা করে চা বাগান প্রস্তুত জন্য জমী দিতে প্রতিশ্রুত হইলেন। বিনা মূল্যে গভর্ণমেণ্ট চার চারা যোগাইতে লাগিলেন। এইরূপে গভর্ণমেণ্ট সাহায্য প্রাপ্ত হইয়া অনেকগুলি কোম্পানীর সৃষ্টি হইল। আসামই চার জন্য উপযুক্ত স্থান স্থির করিয়া চা-করগণ এই জঙ্গলময় প্রদেশ অভিমুখে দা কুড়াল লইয়া ছুটিল। তখন আসাম একপ্রকার অজানিত স্থান ছিল। এই পার্ব্বত্য ও জঙ্গলপূর্ণ প্রদেশে এমন কিছু ছিল না যে বাহ্য জগতের দৃষ্টি আকর্ষণ করিবে। বরং ইহা অত্যন্ত অস্বাস্থ্যকর থাকায় ইউরোপীয় পর্য্যটকগণ সেখানে যাইবার জন্য একটুও ব্যগ্রতা দেখাইতেন না। চার আবিষ্কার হইবার পর আসামের নৈসর্গিক প্রকৃতির পরিবর্ত্তনের সূত্রপাত হইল। যে আসামের নিবিড় জঙ্গল মধ্যে ব্যাঘ্র ভল্লুকাদি কত শত হিংস্র জন্তুরা নিশ্চিন্ত ভাবে বিচরণ করিত, যে আসামের অস্বাস্থ্যকর ভূমিনিচয় মানবের অগম্য ও শস্যশ্যামল শূন্য ছিল সেই আসামের বক্ষস্থলে আজ সহস্র শ্বেত পদ নিপীড়িত করিতেছে, সে ভয়াবহ জঙ্গল আজ "সুজলা সুফলা শস্যশ্যামলা" সুন্দর চা বাগানে পরিণত হইয়াছে। সেখানে বন্য শার্দ্দুল ও ভল্লুকের পরিবর্ত্তে, আজ অসংখ্য ভারতীয় কুলীর উচ্চ কলরব শুনা যাইতেছে।

সাংখ্যস্বরলিপি।

(কেটে যায় রে বেলা।)

ভূপালী—কাওয়ালি।

এসেছি একেলা যেতে হবে একেলা
ছেড়ে যেতে হবে একদিন এ খেলা;
ভগ্নপ্রায় মনোরথে
প্রাণ যায় মহাপথে
বৃথা যাতায়াতে কেটে যায় রে বেলা।
বৃথা কোলাহলে কেটে যায় রে বেলা।

তা । ২ (স্থা) । ৩ । ০ । ১ ॥
মা । ৪ । ৪ । ৪ । ৪ ॥

২.....
স্থাঃ— সা সা ধা পা । গা পা গা
স্থাঃ— এ সে ছি — । এ কে লা

রে । সা সা সা ধা । সা রে গা২ ।
২
— । যে তে হ বে । এ কে লা ।

গা গা পা ধা । পা ধা পা ধা ।
ছে ড়ে যে তে । হ বে এ ক ।

২									
সা	সা	রে	।	সা৪	।	(স্ত)ঃ—			
দিন্	এ	থে	।	লা	।	(স্ত)ঃ—			
গা	গা	পা	পা	।	পা	পা	পা	পা	।
ভ	গ্ন	প্রা	য়	।	ম	নো	র	থে	।
পা	ধা	সা	সা	।	সা	সা	সা	সা	।
প্রা	ণ	যা	য়	।	ম	হা	প	থে	।
সা	রে	রে	রে	।	রে	রে	গা	গা	।
বৃ	থা	যা	তা	।	য়া	তে	কে	টে	।
রে	সা	নি	ধা	।	পাঃ৪	॥			
যা	য়	রে	বে	।	লা	॥			
২									
সা	রে	রে	রে	।	রে	রে	গা	গা	
বৃ	থা	যা	তা	।	য়া	তে	কে	টে	
গা২	মা	পা	।	গা৪	॥				
যায়	রে	বে	।	লা	॥				

শ্রীহিতেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

ওঁ

পুণ্য

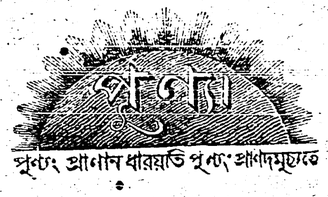

পুণ্যং প্রাণান্ ধারয়তি পুণ্যং প্রাণদমুচ্যতে

যোগ।

মানস সরসীমাঝে শুভ্র পদ্মবন
ফুটিয়াছে স্তরে স্তরে আকুলি পবন।
ভালে মোর একাধারে ভায় শত চন্দ্র ;—
চির সোমরস শুভ্র ঝরে রসনায় ;
প্রাণ অপ্লাবিত সদা বিমল সুধায়।
মধুর ধ্বনিত নাদ অনাহত মন্ত্র
সঘন গগনে বাজে ;—মহাযন্ত্র কিবা
নবস্বরে বাজিতেছে নিত্য নিশিদিবা ;
সপ্তলোকে প্রসারিত আনন্দ ঝঙ্কার।
অনন্ত বিদ্যুৎ পুঞ্জ আলোকের চক্র
খেলিছে চৌদিকে বিশ্বে ; অসীম সমগ্র
জ্যোতির্ম্ময় মহাকাশ বিরাজে অন্তরে ;—
হৃদিমাঝে সমুজ্জ্বল জ্যোতির সাগরে
জ্বলে পরিপূর্ণ এক বিরাট ওঙ্কার।

শ্রীঋতেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

চা।

যতগুলি চা কোম্পানীর সৃষ্টি হইল তন্মধ্যে "আসাম কোম্পানী"ই সর্ব্ব-প্রথম। এই কোম্পানী ১৮১০ খৃষ্টাব্দে কার্য্য আরম্ভ করে। এবং এখনও ইহার কার্য্য সুচারুরূপে চলিতেছে। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ আরও যে সকল কোম্পানীর সৃষ্টি হইল তাহাদের মধ্যে অনেককেই ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া অচিরেই কর্ম্মভূমি হইতে অবসর গ্রহণ করিতে হইয়াছিল। তাহার কারণ এই। আসাম কোম্পানীর দিন দিন উন্নতি দেখিয়া ইংরাজগণ মনে করিল চা ব্যবসায়ে সদ্য সদ্যই প্রভূত অর্থোপার্জ্জন করিতে পারা যায় এবং এসম্বন্ধে আর কোন বিশেষ খবর সংগ্রহ না করিয়াই স্থির করিল যে, যে কোন প্রকারেই হউক চা বাগান প্রস্তুত করিতে হইবে ও যত শীঘ্র পারা যায় উহা হইতে চা উৎপন্ন করিতে হইবে। কেবল যে আসাম প্রদেশেই চা চাষ আরম্ভ হইল তাহা নয়। ভারতবর্ষের সর্ব্বত্রই চা বাগানের সৃষ্টি হইল। তখনও লোকে সম্পূর্ণ জানিত না যে চা গাছ, সকল প্রকার ভূমিতে হয় না। জলবায়ুর উপরে ইহার সফলতা নির্ভর করে। প্রথমতঃ, আসাম প্রভৃতি স্থানের যেরূপ জল বায়ু ও ভূমির অবস্থা সেরূপ না হইলে চা ভালরূপ জন্মাইবে না। মানুষের পক্ষে যে সব স্থান সাধারণতঃ অস্বাস্থ্যকর চায়ের পক্ষে তাহাই উৎকৃষ্ট। দ্বিতীয়তঃ, বায়ু শুষ্ক না হইয়া ইহাতে জলীয় বাষ্পের ভাগ বেশী থাকা প্রয়োজন। এই সমুদয় আবশ্যকীয় বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য না করিয়া ইংরাজ চা-করগণ সকল প্রকার ভূমিতেই চা বাগান প্রস্তুত করিতে আরম্ভ করিল। সে সকল ভূমি চা আবাদের অনুপযুক্ত হওয়াতে তাহাদের কার্য্যের উন্নতি না হইয়া ক্রমে অবনতিই হইতে লাগিল। চা কোম্পানীর সৃষ্টিকর্ত্তাগণ ইংলণ্ডে বসিয়াই চার কার্য্য চালাইতে চান। ব্যবসার জন্য যাহা কিছু মূলধন আবশ্যক তাহাই তাঁহারা মুক্তহস্তে সংগ্রহ করিতে লাগিলেন, আর যাহা কিছু কর্ত্তব্য সে সকল কর্ম্মচারীদিগের উপর ন্যস্ত রহিল। কর্ম্মচারীগণ প্রভুদিগের আজ্ঞামত কার্য্য না করিলে তাঁহারা অসন্তোষ প্রকাশ করেন। কাজেই ভবিষ্যতের উপর

দৃষ্টি না করিয়া উপস্থিত লভ্য যাহাতে শীঘ্র শীঘ্র বৃদ্ধি পায় তাহার জন্য তাহারা প্রাণপণে চেষ্টা করিতে লাগিল। এই কর্ম্মচারীরা আবার তাহাদের বিদেশীয় প্রভুদের মস্তকে হাত বুলাইয়া নিজেদেরও সুবিধা করিতে ছাড়িল না। কর্ত্তৃপক্ষগণ শুনিলেন যে একটি বৃক্ষপরিপূর্ণ প্রস্তুত চা বাগান বিক্রয় আছে, অমনি আদেশ আসিল অবিলম্বে বাগানটি ক্রয় করা হউক। স্থানীয় কর্ম্মচারীগণ বেশ জানেন যে বাগানটি একটি জঙ্গলী ভূমি ব্যতীত আর কিছু নহে। ইহাতে চা আবাদ করিতে হইলে ইহাকে এখন ভাল করিয়া পরিষ্কার করিতে হইবে। চার পাঁচ বৎসর পরে ইহা হইতে ফসল উৎপন্ন হইবে। কর্ম্মচারীগণ এইরূপে কর্ত্তৃপক্ষীয়গণকে প্রবঞ্চনা করতঃ নিজেরাই যথেষ্ট উপার্জ্জন করিতে লাগিলেন। এই সব নানা কারণে লাভের পরিবর্ত্তে অনেক কোম্পানীকে ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হইয়াছিল। এবং তাহাদের অনেকের অস্তিত্বও লোপ পাইয়া গেল। যে সকল কোম্পানী অবশিষ্ট রহিল তাহারা অতি সতর্কতা ও বিচক্ষণতার সহিত কার্য্য চালাইতে লাগিল, যাহাতে তাঁহাদের ঐরূপ দুর্দ্দশা না হয়। তাহাদের অধ্যবসায় বশতঃ এক্ষণে চা ব্যবসায় এত উন্নতি লাভ করিয়াছে এবং ইহাতে চা-করগণও যথেষ্ট লাভ করিতেছেন। এতাবৎ কাল চীনেদেরই চা ব্যবসায় একচেটিয়া ছিল এবং যদিও সে চা ভারতবর্ষের চা অপেক্ষা নিকৃষ্ট তথাপি তাহা সমগ্র ইউরোপে উচ্চমূল্যে বিক্রয় হইত। প্রথমতঃ চীনদেশ হইতে উপযুক্ত চা-কর আনয়ন করিয়া তাহাদিগের দ্বারা ভারতবর্ষের চা বাগানের কার্য্য করিয়া লওয়া হইত। পরে যখন ইংরাজ চা-করগণ চা বাগানের কার্য্য প্রণালী সম্বন্ধে সম্পূর্ণ পারদর্শিতা লাভ করিলেন তখন হইতে তাঁহারা চীনে চা ব্যবসায়ীদিগের উচ্ছেদ সাধনে যত্নপর হইলেন। এক্ষণে চীনদেশীয় চার আর সে মর্য্যাদা নাই ও ইহার বিক্রয়ও অনেক পরিমাণে হ্রাস হইয়া গিয়াছে।

এক্ষণে দেখা যাউক আমাদের দেশে চায়ের অবস্থাটা কিরূপ দাঁড়াইয়াছে। ১৮৯১-৯২ সালের হিসাব অনুযায়ী সমগ্র ভারতবর্ষে সর্ব্বশুদ্ধ ১০,০৪,৫৩৫ বিঘা জমীতে কেবল চা আবাদ করা হইয়াছিল এবং তাহাতে প্রায় ১৫,১৫,০০০ মন চা উৎপন্ন হয়; তাহা হইলে এক বিঘা জমীতে গড়ে ১½ মন চা পাওয়া গিয়াছিল। এই সকল জমী হস্তগত করিতে ও ইহাতে চা উৎপন্ন করিতে চা-করদিগকে প্রায় ২১ কোটি টাকা মূলধন স্বরূপ ব্যয় করিতে হইয়াছে। ইহার

মধ্যে ইংরাজরাই পাঁচ ভাগের চারি ভাগ দিয়াছে। তাঁহাদের এতগুলি টাকা ভারতের মধ্যে আবদ্ধ থাকাতে তাঁহারা যে বিশেষ উদ্বিগ্ন চিত্তে ভারতকে রুষের করালগ্রাস হইতে রক্ষা করিবার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিবেন তাহা আর আশ্চর্য্য কি? এই টাকাতে যে কেবল চা-করদিগেরই সুবিধা হইতেছে তাহা নয়—কত শত দেশীয় নর নারীও প্রতিপালিত হইতেছে তাহার সংখ্যা নাই।

মার্চ্চ বা ফাল্গুণ চৈত্র মাসে চায়ের বীজ বপন করিতে হয়। একেবারেই চা বাগানে বীজ বপন করা হয় না। প্রথমতঃ চারাগাছ করিবার নিমিত্ত স্বতন্ত্র ভূমি প্রস্তুত করা আবশ্যক—সেই ভূমিতে বীজ বপন করিয়া এক বৎসর অতীত হইলেই অঙ্কুরিত চারাগাছগুলিকে স্থানান্তরিত করিয়া বাগানে পাঁচ ফুট অন্তর সারি সারি রোপণ করিতে হয়। প্রথম তিন বৎসর হইতে পাঁচ বৎসর কাল পর্য্যন্ত চা পত্র চয়ন করিবার রীতি নাই। কিন্তু শীত ঋতুতে প্রত্যেক বৎসরেই গাছগুলিকে ছাঁটিয়া দেওয়া হয়—যাহাতে ৩।৪ ফুটের উচ্চ না থাকিতে পারে। এপ্রেল মাসে চয়ন আরম্ভ হয় এবং ডিসেম্বর মাসে শেষ হয়। প্রত্যেক বৃক্ষ হইতে পত্র বৎসরে ৩।৪ বারের অধিক চয়ন করা হয় না। কোন কোন স্থানে বিশেষতঃ পার্ব্বত্যপ্রদেশে এপ্রেল মে বা বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ মাসে যে সকল পত্র চয়ন করা হয় তাহা হইতেই উৎকৃষ্ট চা প্রস্তুত হয়; কিন্তু অন্যান্য স্থানে, আসাম প্রভৃতি প্রদেশে আগষ্ট ও সেপ্টেম্বরের অর্থাৎ ভাদ্র আশ্বিন মাসের পত্রই উৎকৃষ্ট। পত্র চয়ন কার্য্য কুলীর দ্বারা সম্পন্ন হইয়া থাকে। এই নিমিত্ত এক একটী চা বাগানে অনেকগুলি করিয়া কুলি নিযুক্ত করিতে হয়। এই কুলিদিগের মধ্যে পূর্ণবয়স্ক পুরুষ, স্ত্রীলোক ও বালকদিগকে চিলানে অর্থাৎ দলে দলে স্বতন্ত্রভাবে বিভক্ত করা হয়। এইরূপ এক একটী দল এক একটী সর্দ্দারের অধীনে থাকে, এবং সর্দ্দারগণও মুহুরীর তত্ত্বাবধারণে কার্য্য করে। চা বাগানের কামঝারী অর্থাৎ যাবতীয় কার্য্যের দায়ীত্ব মুহুরীদের উপর অর্পিত থাকে।

পত্র চয়ন কালে কুলীরা একটী করিয়া লম্বা ঝুড়ি লইয়া যায়, এবং পার্ব্বত্যপ্রদেশে এই ঝুড়িগুলিকে পৃষ্ঠদেশে বন্ধন করিয়া রাখে, যাহাতে ইতস্ততঃ ঘুরিয়া বেড়াইতে অসুবিধা না হয়। বৃক্ষের সমস্ত পত্র ছাড়িয়া দিয়া

তাহারা শাখার অগ্রভাগের কেবলমাত্র তিনটী করিয়া কচি পত্র অঙ্গুলি দ্বারা ছিন্ন করিয়া লয়। বৃক্ষগুলি ক্ষুদ্র ও বহুশাখাবিশিষ্ট হওয়াতে ইহাদের প্রত্যেকটী হইতে অনেকগুলি পত্র পাওয়া যায়।

দার্জিলিং প্রভৃতি পার্ব্বত্যপ্রদেশের চা বাগানগুলি এমন সঙ্কটাপন্ন স্থানে স্থিত যে সেখান হইতে পত্র সংগ্রহ করা কি কঠিন ব্যাপার তাহা যাঁহারা দার্জিলিং গিয়াছেন তাঁহারাই অবগত আছেন। পাহাড়ের গাত্রদেশে বৃক্ষগুলি স্তরে স্তরে উঠিয়াছে। ঊর্দ্ধদেশে পাহাড়ের সমুন্নত শিখা, নিম্নে ভয়ঙ্কর গভীর উপত্যকা। একবার পদস্খলন হইলে আর রক্ষা নাই—অস্থি মাংস চূর্ণবিচূর্ণ হইয়া যাইবার সম্ভাবনা।

এক একজন কুলী দিবসে ১৩।১৪ সের চা পত্র চয়ন করিতে পারে, কিন্তু সাধারণতঃ ৭।৮ সের চয়ন করিয়া থাকে। ইহার বেশী চয়ন করিলে সের প্রতি এক পয়সা হিসাবে অতিরিক্ত পুরস্কার দেওয়া হয়।

এক বিঘা জমীতে প্রায় ৬৭০টী চা বৃক্ষ উৎপন্ন হইতে পারে এবং তাহা হইতে প্রতি বৎসর প্রায় দেড় মন হইতে দুই মন চা প্রাপ্ত হওয়া যায়। এই দুই মন চা উৎপন্ন ও প্রস্তুত করিতে প্রায় মোটের উপর ৩২ টাকা ব্যয় হয়। এবং ইহা ৪২ টাকায় বিক্রয় করিতে পারিলে মন প্রতি ৫ টাকা লাভ থাকে। অতএব চা ব্যবসায় যে বিশেষ লাভকর তাহা স্পষ্টই প্রতীয়মান হইতেছে। চাউল গম প্রভৃতি নিত্য আবশ্যকীয় দ্রব্যাদিতে ইহার অর্দ্ধ লাভ থাকে কিনা সন্দেহ। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে চা সকল প্রকার জলবায়ুতেই উৎপন্ন হয় না—ভূমি ও জল বায়ুর তারতম্যের উপর চা-চাষের ফলাফল নির্ভর করে। নিম্ন ভূমিতে চা অধিক পরিমাণে উৎপন্ন হয়, কেননা নিম্নভূমি উচ্চভূমি অপেক্ষা আর্দ্র ও উষ্ণ এবং বায়ুর আর্দ্রতা ও ঈষদুষ্ণতাই চায়ের পক্ষে হিতকর। এই হেতু দার্জিলীং প্রভৃতি উচ্চপ্রদেশ অপেক্ষা আসাম প্রভৃতি নিম্নভূমিতে প্রায় দ্বিগুণ চা উৎপন্ন হইয়া থাকে। আসামের উত্তর বিভাগই চার আদর্শ ক্ষেত্র। বিশেষতঃ যখন সূর্য্যের উত্তাপ প্রবল থাকে অথচ মাঝে মাঝে বৃষ্টিবর্ষণ হয় তখন ক্ষেত্র পূর্ণ চা বৃক্ষগুলি চা-করদিগের সহিত উল্লাসে নৃত্য করিতে থাকে। ফেব্রুয়ারী মার্চ্চ ও এপ্রেল মাসে বৃষ্টিবর্ষণ হইলে প্রচুর ফসল উৎপন্ন হইয়া থাকে।

এখন দেখা যাউক বাজারে যে চা বিক্রয় হয় তাহা কি প্রণালীতে প্রস্তুত করা হয়। সাধারণে মনে করিতে পারেন চার প্রস্তুত প্রণালী ত কিছুই নহে—অতিশয় সহজসাধ্য—বৃক্ষ হইতে পত্র ছিন্ন করতঃ তাহা রৌদ্রে শুষ্ক করিয়া লইয়া টিনের মধ্যে পুরিলেই হইল। তারপর আমরা সেই টিনবদ্ধ রৌদ্রশুষ্ক চা পত্র গরম জলে সিদ্ধ করিয়া পান করি। চা-চাষ ও প্রস্তুত করিতে হইলে বিশেষ বৈজ্ঞানিক বিদ্যার আবশ্যক। বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়া অবলম্বন না করিলে চা ব্যবসায়ে কৃতকার্য্য হওয়া অতিশয় দুঃসাধ্য। চা একটী আমাদের সখের জিনিষ—সখের জিনিষ উৎকৃষ্ট না হইলে উহা লোকের চিত্ত আকর্ষণ করিতে পারে না। যাহা কেবল উদর পুরণের জন্য আবশ্যক, না হইলে চলিবে না, তাহা যেমনই হউক না কেন তাহাতেই অনেকে সন্তুষ্ট; ক্রেতা ও ব্যবসায়ী উভয়েরই সমান প্রয়োজন। কিন্তু চায়ের ন্যায় সখের দ্রব্য না হইলেও চলে—শরীর ধারণ ও পোষণের নিমিত্ত কিছুমাত্র আবশ্যক নাই। অতএব ইহা হইতে আমরা বাঞ্ছনীয় পরিতৃপ্তি না পাইলে ইহা ব্যবহার করিব কেন? বিজ্ঞানের সাহায্য ব্যতীত যেমন ব্যবসায়ের উন্নতি হইতে পারে না, তেমনি বৈজ্ঞানিক উপায় অবলম্বন না করিলে বিলাসিতার উপকরণগুলি ও বিলাসিতায় উৎকর্ষসাধন হইতে পারে না। সুতরাং অনেক বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিতগণ বিশেষ পরীক্ষার দ্বারা স্থির করিয়াছেন কি প্রণালীতে চা উৎপন্ন ও প্রস্তুত করিতে পারিলে ইহার গুণের সমধিক উন্নতি হইতে পারে—ইহা হইতে উৎকৃষ্ট ফল লাভ করিতে পারা যায়।

কুলিরা দিবসান্তে যেমন তাহাদের পাত্রপূর্ণ চা পত্রগুলি সঞ্চয় করিয়া আনিতে লাগিল একটী কর্ম্মচারী তাহা তৎক্ষণাৎ তৌল করিয়া লইতে লাগিল। তৌল সম্পূর্ণ হইলে পত্রগুলিকে কিঞ্চিৎ শুষ্ক করিবার নিমিত্ত ২।৩ ঘণ্টা রৌদ্রের উত্তাপে ছড়াইয়া রাখা হইল। কার্য্যতঃ একেবারে রৌদ্রের উত্তাপে রাখা হয় না। চা কুঠীগুলি দ্বিতল বা ত্রিতল এবং উহার মেজেগুলি খুব প্রশস্ত, উপরে লৌহের বা কাষ্ঠের ছাত। শুষ্ক করিতে হইলে এই উপরকার মেজেতে ছড়াইয়া রাখা হয়। ছাত উত্তপ্ত হইলে তাহারই উত্তাপে চা পত্রগুলি অর্দ্ধ শুষ্ক হইয়া যায়। পত্রগুলি নাড়াচাড়া পাইয়াও যেন আস্ত থাকে সে বিষয়ে বিশেষ যত্নবান হওয়া উচিত। বর্ষা ঋতুতে কিম্বা রৌদ্র না থাকিলে

ইহা যন্ত্রের সাহায্যে উত্তপ্ত বায়ু দ্বারা শুষ্ক করা হয়। এইরূপে অর্দ্ধ শুষ্কাবস্থা প্রাপ্ত হইলে যাঁতার ন্যায় বিশেষ যন্ত্রের দ্বারা সেই পত্রগুলিকে মর্দ্দন করা হয়। অর্দ্ধশুষ্ক করিবার উদ্দেশ্য পত্রগুলি নরম থাকে—মর্দ্দন করিবার সময় গুঁড়া না হইয়া যায়। মর্দ্দিত হইলে ইহার আভ্যন্তরিক রস, যাহা এক প্রকার তৈলাক্ত পদার্থ, পত্র মধ্য হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পত্রের উপরিভাগে লিপ্ত হইয়া যায়। এই রসটাই চায়ের প্রধান অংশ, এবং চা গরম জলে সিক্ত করিলে ইহাই জলে দ্রব হইয়া জলকে রক্তবর্ণে রঞ্জিত করে, যাহা আমরা অতি তৃপ্তির সহিত পান করি। চা পত্র এই তৈলাক্ত রসের আধার মাত্র।

মর্দ্দিত হইবার পরক্ষণেই পত্রগুলি একটী যন্ত্রের মধ্যে রাখিয়া অগ্নির উত্তাপে আবার কিঞ্চিৎ শুষ্ক করিতে হয়—এইরূপে ইহার জলীয় ভাগটা বাষ্পাকারে চলিয়া যায়। এক্ষণে এইগুলি আর একটী গৃহে বড় বড় তারের বা কাষ্ঠ পাত্রে রাখিয়া ভিজা বস্ত্র দিয়া ঢাকিয়া রাখিতে হয়। এইরূপ ভাবে এক বা দুই দিন রাখিলে পত্রের মধ্যে রাসায়নিক ক্রিয়ার সঞ্চার হয় এবং পত্রগুলি এই ক্রিয়াবশতঃ আপনা আপনিই কিঞ্চিৎ উত্তপ্ত হইয়া যায়। এই ক্রিয়াটী ভালরূপ সম্পন্ন হইলে চায়ের গন্ধ ও স্বাদেরও উন্নতি হয়। পরে উপরিউক্ত যন্ত্রের দ্বারা উত্তমরূপে শুষ্ক করিয়া লওয়া হয়। শুষ্ক হইলে পত্রগুলি কৃষ্ণবর্ণের হইয়া যাইবে এবং হস্ত মধ্যে পেষণ করিলে মচ মচ করিবে। এই ত গেল চায়ের প্রস্তুত প্রণালী। এক্ষণে চাগুলিকে ছাঁকিয়া লইয়া বড় ও ছোট পাতাগুলিকে পৃথক করিতে হইবে। পাতাগুলি প্রথমে একটী সরু ছাঁকনি দিয়া ছাঁকা হইল। ইহার মধ্য হইতে যে পাতা পড়িল তাহা এক নম্বরের চা হইল। বাকী যাহা রহিল তাহা মাঝারি ছিদ্রের ছাঁকনি দ্বারা ছাঁকা হইল। ইহার মধ্য হইতে যে চা পাওয়া গেল তাহা ২ নম্বরের হইল। তৃতীয় ছাঁকনির ছিদ্র প্রথমটী দুইটী অপেক্ষা মোটা, এবং অবশিষ্ট ভাগ ইহার দ্বারা ছাঁকিয়া লওয়া হইল। যাহা পড়িল তাহা ৩ নম্বরের চা হইল। বাকী যাহা রহিয়া গেল একটী যন্ত্রের দ্বারা টুকরা টুকরা করিয়া কর্ত্তন করতঃ ১ নম্বরের চায়ের ন্যায় করা হইল, এবং আয়তন অনুযায়ী ১, ২ বা ৩ নম্বরের চায়ের সহিত মিশ্রিত করিয়া দেওয়া হইল। এই বিভিন্ন নম্বরের চা ভিন্ন ভিন্ন নামে অভিহিত হয়। পরে সদ্যপ্রস্তুত গরম গরম চাগুলিকে বড় বড়

সিন্দুক মধ্যে ঠাসিয়া, যাহাতে বায়ু প্রবেশ করিতে না পারে এরূপ ভাবে, দৃঢ়রূপে আবদ্ধ করা হইল। সেই সব সিন্দুক পূর্ণ চা কলিকাতায় প্রেরণ করা হয়, এবং কলিকাতা হইতে দেশ দেশান্তরে রপ্তানি হইয়া থাকে।

দারজিলীং ও আসামজাত চা এক জাতীয় নহে। দারজিলীং চা চীন-দেশীয় বীজ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, কিন্তু আসাম চা আসামের স্বভাবজাত চা বৃক্ষের বীজোৎপন্ন। প্রথম জাতি অপেক্ষা দ্বিতীয় জাতির পত্র কিছু বড় হইয়া থাকে। এই দুই জাতীয় চায়ের মধ্যে স্বাদে কিঞ্চিৎ পৃথক আছে। দারজিলীংয়ের চায়ের এক প্রকার সুমিষ্ট সৌরভ পাওয়া যায় তাহা আসামজাতীয় চায়ের নাই। কিন্তু শেষোক্ত চায়েতেও উহার এক বিশেষ সৌরভ আছে যাহার জন্য অনেকে আসাম চা পছন্দ করেন। যাই হউক চায়ের ভাল মন্দ আস্বাদ অনেকটা ব্যক্তিগত রুচির উপর নির্ভর করে।

শ্রীযোগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়।

কুসুম ও যৌবন।

১

সুষম কুসুম কত, হাসে মধুমাসে,
ঝরে পড়ে পরক্ষণে হয় ধূলিসাৎ;
অনৃত এ প্রাণো তব যৌবনেতে হাসে
কালের কবল করে শেষে অন্তঃসাৎ।

২

খেলাধূলা করো আজ, পারো যতক্ষণ,
পরদিন ভবপার ছাড়ো যদি হায়—
কি জানি কি ঘটে প্রতিক্ষণে অনুক্ষণ—
কে জানে কোন্ পারে, এ দেহতরী ধায়!

শ্রীনগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়।

JOTINDRO NATH DUTTA
JANMABHUMI OFFICE

হ্যারিয়েট মার্টিনো।

যাঁহারা বলেন যে স্ত্রীলোকদিগের বুদ্ধি পরিচালন দ্বারা কোনও কর্ম্ম করিবার শক্তি নাই, মহিলাগণ কেবল সন্তান পালন করিতেই জানেন, স্বীয় বুদ্ধি বিবেচনা দ্বারা কিছুই করিতে পারেন না, তাঁহারা একবার গার্গী, মৈত্রেয়ী, ম্যাডাম ডা ষ্টিল, হ্যারিয়েট মার্টিনো প্রভৃতি খ্যাতনামা প্রাচ্য এবং প্রতীচ্য মহিলাগণের জীবনী আলোচনা করুন।

অদ্য আমরা যাঁহার জীবনের সংক্ষিপ্ত আভাস দিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি সেই পরম বিদুষী পাশ্চাত্য মহিলা হ্যারিয়েট মার্টিনো কি অসীম প্রতিভাসম্পন্না ছিলেন! বিজ্ঞান, রাজনীতি, তত্ত্বজ্ঞান, শিল্পবিদ্যা প্রভৃতি যাবতীয় গুরুতর বিষয় অতি সূক্ষ্মভাবে ও বহুদর্শিতার সহিত আলোচনা করিয়া গিয়াছেন।

জন্মাবধি ইনি অত্যন্ত রুগ্না ছিলেন। আশৈশব তিনি আঘ্রাণ শক্তি বিহীনা এবং বিশ বৎসর বয়স হইতে প্রায় একেবারে বধির হইয়া গিয়াছিলেন। কিন্তু হ্যারিয়েটের এই বধিরতা তাঁহার কোনও কষ্টের কারণ না হইয়া বরঞ্চ সুখের বিষয়ই হইয়াছিল। বহির্জগতের কোলাহল হইতে এরূপে চিরকালের জন্য পরিত্রাণ লাভ করিয়া নির্ব্বিঘ্ন চিত্তে কাগজ কলমের মধ্যে স্বীয় প্রাণ ঢালিয়া দিয়াছিলেন।

তাঁহার কোনও গ্রন্থের একস্থানে তিনি নিজে লিখিয়া গিয়াছেন যে "আমার মনে হয় যে আমাদের শ্রবণেন্দ্রিয় প্রভৃতি ইন্দ্রিয় সকলের সমভাবে চালনা হইলে মনের মধ্যে যে সমুদয় ভাব বর্ত্তমান থাকে তাহাতে প্রবলরূপে মস্তিষ্ক চালনা করিলেও আমাদের বিশেষ কোনও কষ্ট হয় না। কিন্তু এই ইন্দ্রিয় সকলের কার্য্যকারী শক্তি না থাকিলে যদি আমাদিগকে একাগ্রচিত্তে মস্তিষ্কের চালনা করিতে হয়, তাহা হইলে আমাদের মস্তিষ্কের কার্য্য অতিশয় ভারবহ হইয়া উঠে—মস্তিষ্ক লেশমাত্র বিশ্রাম অনুভব করিতে পারে না। যাঁহাদের পঞ্চেন্দ্রিয় সমভাবে কার্য্য করিতেছে তাহাদের অপেক্ষা যে আমাদের

ন্যায় বধিরের জীবনে অধিকতর কষ্ট ও পরিশ্রমের সহিত কার্য্য করিতে হয় তাহা তাঁহারা বুঝিতে পারেন কিনা সন্দেহ।”

হ্যারিয়েট মর্টিনো যে ফরাসী বংশোৎপন্না ছিলেন তাহা তাঁহার নাম হইতেই বুঝা যায়। ইঁহার পিতৃপুরুষগণ প্রোটেষ্টাণ্ট খৃষ্টীয় ধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন, সেই জন্য কোনও বিশেষ কারণে ফরাসী আইনানুযায়ী ফরাসীদেশ হইতে বিতাড়িত হইয়া তাঁহারা ইংলণ্ডের নরিচ প্রদেশে আসিয়া বসবাস করিয়াছিলেন। ইংলণ্ডে এই বংশ সামাজিক এবং ধর্ম্ম সম্বন্ধে স্বাধীন চেতার জন্যই প্রসিদ্ধ। ১৮০২ খৃষ্টাব্দে হ্যারিয়েট এই বংশে জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহারা আট ভাই ভগিনী। তন্মধ্যে ইনি ষষ্ঠ। ইঁহার পিতা একজন অত্যন্ত সদাশয় ব্যক্তি ছিলেন। ইনি যদিও খুব ধনী ছিলেন না তবুও তাঁহার অবস্থার তুলনায় তাঁহার সন্তানদিগকে খুব ভাল করিয়া শিক্ষা দিয়াছিলেন। তৎকালে আজ-কালের ন্যায় এরূপ উচ্চশিক্ষা বালিকাদিগকে দেওয়া হইত না, কিন্তু হ্যারিয়েট, জেম্‌স্ মার্টিনো নামক তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার নিকট হইতে স্বীয় চেষ্টাগুণে এইরূপ ধরণের উচ্চশিক্ষা লাভ করিয়াছিলেন।

আশৈশব হ্যারিয়েট অত্যন্ত চিন্তাশীলা ছিলেন। তিনি ধীর মনে গভীর ভাবে চিন্তা করিতে পারিতেন। চিন্তা করিবার কালে তিনি বাহিরের বিষয় হইতে এত অন্যমনস্ক হইতেন যে সেই সময় চক্ষুর সম্মুখে একটা কোন বস্তু ধরিলেও তাহা তাঁহার দৃষ্টি আকর্ষণ করিত না। তাঁহার আত্মীয়েরা তাঁহার এই ভাবকে মস্তিষ্কের কোনও রোগ বলিতেন। এই অন্যমনস্ক ভাবের বিষয় হ্যারিয়েট নিজে যাহা যাহা বলিয়া গিয়াছেন তাহার মধ্যে একটি মাত্র উদাহরণ দিলেই পাঠকগণ বুঝিতে পারিবেন যে তিনি একটা কোনও বিষয় কত গভীরতার সহিত চিন্তা করিতেন। “১৮১১ খৃষ্টাব্দে নভোমণ্ডলে যখন একটি বৃহৎ ধূমকেতুর উদয় হয় সেই সময় আমার বয়স নয় বৎসর। প্রায় প্রত্যহ রাত্রে আমাদের সমস্ত পরিবারগণ ঐ ধূমকেতু নিরীক্ষণ করিবার জন্য আমার পিতার কার্য্যালয়ের জানালায় গিয়া দাঁড়াইতেন। আমিও তাঁহাদের সহিত গমন করিতাম। তাঁহারা সকলেই উহা দেখিতেন ও আনন্দ প্রকাশ করি-তেন। উহা দেখিবার জন্য আমার চেষ্টার কোনও ত্রুটি হইত না—কিন্তু তবুও আমি উহা দেখিতে পাইতাম না। পিতামাতা ভ্রাতাভগ্নিগণ সকলেই

একবাক্যে বলিতেন ‘তুমি দেখতে পাচ্ছ না? ঐ যে! এটা যে একটা বড় রেকাবীর ন্যায়! বলনা কেন যে তবে তুমি চাঁদকেও দেখতে পাচ্ছ না!’ তাঁহারা এইরূপ বলিলেও আমি ধূমকেতুর কিছুই দেখিতে পাইতাম না, কেবল নিরাশার তীব্র যাতনায় আমার প্রাণ ফাটিয়া যাইত। আমার এখন মনে হয় যে তখন আমি ধূমকেতুর আকৃতিটা ভিন্ন প্রকারের কল্পনা করিয়া লইয়া দেখিতে যাইতাম সুতরাং সেই মনগড়া বস্তুকে যতই চক্ষু বিস্তার করিয়া দেখি না কেন দেখিতে পাইতাম না।” বহির্জগতের প্রতি হ্যারিয়েটের এরূপ অন্যমনস্ক ভাবের জন্য তাঁহার সমবয়স্ক বালিকাগণ তাঁহার সহিত বড় বেশী মিশিত না; এই কারণে তিনি নিজেও সকলের নিকট হইতে দূরে দূরে থাকিতেন। কিন্তু মনুষ্য কি বিনা কর্ম্মে থাকিতে পারে? কখনই না। ভগবানের রাজ্যে একটি প্রাণীরও চুপ করিয়া বসিয়া থাকিবার আদেশ নাই। সকলেই ভাল হউক মন্দ হউক, কোনও না কোন কর্ম্ম করিবেই করিবে। অতএব হ্যারিয়েট মার্টিনো বাহিরের আমোদ প্রমোদ হইতে বঞ্চিত হইলে অন্তর্জগতের আনন্দের মধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন। তিনি পুস্তকের কীট হইয়া পড়িলেন। তাঁহার ভ্রাতা জেম্‌স্ যে সমুদয় বিষয় বিদ্যালয়ে শিক্ষা লাভ করিতেন মিস্ মার্টিনো সেইগুলি তাঁহার নিকট হইতে নিজের আয়ত্তাধীন করিতে চেষ্টা করিতেন। সাহিত্য তাঁহার জীবনের একমাত্র অবলম্বন হইল। কিন্তু ছোট বেলায় তিনি সঙ্গীত ও বাদ্য খুব ভাল রকম শিক্ষা করিয়াছিলেন। আমরা অগ্রেই বলিয়া গিয়াছি যে বিশ বৎসর বয়ক্রম হইতে তিনি প্রায় সম্পূর্ণরূপ বধির হইয়া গিয়াছিলেন সুতরাং বেশীদিন সঙ্গীত ও বাদ্যের চর্চ্চা রাখিতে পারেন নাই। তাঁহার বৃদ্ধ বয়সে যদি কেহ তাঁহার নিকট সঙ্গীতের বিষয় উল্লেখ করিত কিম্বা কেহ দূর হইতে কোনও কথা বলিতেছেন দেখিলে তিনি হঠাৎ উৎকর্ণ হইয়া শুনিতে যাইতেন ও চমকিয়া উঠিতেন। তাঁহার মনে কি একটা যেন ভাবের উদয় করিয়া দিত। পূর্ব্বের ন্যায় যেন তিনি ফ্রক-পরিহিত একটি ছোট বালিকা, টুলে বসিয়া সঙ্গীত, বাদ্য অভ্যাস করিতে-ছেন ও ভাইভগ্নিদের কোলাহলধ্বনি শুনিতেছেন এই সমুদয় মনে হইত এবং নিমেষের জন্য তাঁহাকে ঐ মধুর পূর্ব্বস্মৃতি সকল অভিভূত করিয়া ফেলিত।

কিছুকাল পরে ইঁহার পিতার সাংসারিক অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় হওয়াতে

ঘৃণিত জ্ঞানে দুইবারই সে প্রস্তাবে অসম্মত হইয়া অস্বীকার করেন। ইহা দ্বারা, তাঁহার মন কিরূপ উচ্চ ভাবে পূর্ণ ছিল তাহারই পরিচয় পাওয়া যাইতেছে। তিনি পুনরায় স্বীয় স্বাস্থ্যলাভ করিলে একখানি বৃহৎ গ্রন্থ তিন খণ্ডে শেষ করিয়া বাহির করেন। ইহাতে তিনি প্রাচীন এবং আধুনিক কালের "গেম" আইনের তুলনা করিয়া ইহাদের ফলাফল দেখাইয়া দিয়াছেন। ইহার পর মিস্ মার্টিণো প্রাচ্য জগত দর্শন করিতে ইচ্ছুক হইয়া ১৮৪৬ খ্রীষ্টাব্দে মিসর, পালেস্তাইন, গ্রীস, সিরিয়া এবং আরব প্রভৃতি দেশসমূহ পরিদর্শন করিয়া "বর্ত্তমান এবং অতীত প্রাচ্য জীবন" নাম দিয়া একটি গ্রন্থ প্রকাশ করেন। পরে তিনি তত্ত্বজ্ঞান সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করিয়া "হিষ্টরী অফ ইংলণ্ড ডিউরিং থার্টি ইয়ার্স্ পিস্" এবং "গৃহ শিক্ষা" লিখিয়া প্রভূত যশ লাভ করিয়াছিলেন। এই সকল গ্রন্থ ব্যতীত তিনি লণ্ডনে মাসিকপত্র ও সংবাদপত্রসমূহে বহুতর প্রবন্ধ লিখিতেন।

ইংলণ্ডের যে গ্রামে হ্যারিয়েট বাস করিতেন তাহার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য অতিশয় মনোহর। তিনি সেই সৌন্দর্য্য রস পান করিয়া কঠোর বিদ্যাচর্চ্চার মধ্যেও তাঁহার মনকে সদা প্রফুল্ল রাখিতে পারিতেন।

তাঁহার বুদ্ধিবৃত্তি কেবলমাত্র লেখনী পরিচালনেই বদ্ধ ছিল না; তাঁহার প্রতিভা নানা বিষয়ে প্রত্যক্ষ কার্য্য করিয়া গিয়াছে। তাঁহার সেই কুটির, বাগান ও চাষবাস সমুদয় এরূপ সুচারু ভাবে সম্পন্ন করিতেন—এবং চাষের এত উন্নতি করিয়াছিলেন যে তাহা নিকটস্থ কৃষকদিগের হিংসার ও আশ্চর্য্যের বিষয় হইয়া উঠিয়াছিল। হ্যারিয়েট প্রায়ই অগ্ন্যাধার উনানের নিকট বসিয়া তাঁহার পাড়াপ্রতিবাসী এবং কৃষক বন্ধুগণকে হাস্যকর গল্প বলিয়া ও সংবাদ-পত্রাদি পাঠ করিয়া আমোদ দিতেন। গ্রামের সকলে তাঁহার অত্যন্ত ভক্ত ছিল। যে কেহ একবার তাহার সংশ্রবে আসিত সকলেই তাঁহার অমায়িক ব্যবহার, পরোপকারিতা, বিনয় সরলতা প্রভৃতি গুণে মুগ্ধ হইয়া তাঁহার অনুগত হইয়া পড়িত। কেহ কখনও ইঁহার নিন্দাবাদ করিতে সক্ষম হন নাই। ইঁহার মৃত্যুতে দেশশুদ্ধ সকলেই শোক প্রকাশ করিয়াছিলেন—ইংলণ্ড একটি রত্নচ্যুত হইয়াছিল।

শ্রীসুষমা দেবী।

বসন্তে বরষা।

আজি এই বসন্তের নবীন প্রভাতে
না থামিতে বাঁশীস্বর শেষ রজনীর,
প্রকৃতির উপবনে শ্যামল ছায়াতে
পূরব গগনে দেখা না দিতে মিহির,
না ফুটিতে ফুলকলি বসন্ত পবনে,
না উঠিতে কুহুতান, না আসিতে অলি,
পিকবধূ কুহরিত নিকুঞ্জ কাননে
কেনরে বরষা তুই দরশন দিলি!
ফুলগুলি ঝরে গেল কঠিন পরশে
তোর হায়! আজি তারা ধূলায় লুটায়!
বাঁশরীও থেমে গেল গভীর নিরাশে,
আচম্বিতে চলে গেল দখিনে মলয়!
দুখভরে অলি গেল গুঞ্জরি ফিরিয়া,
প্রভাতের আলো গেল ডুবিয়া তিমিরে,
প্রকৃতির অঙ্গ হতে লইল মুছিয়া
শ্যাম ছবি, অবিরল বরষার নীরে।

শ্রীঃ দেবী।

অভাগিনী।

(গল্প।)

১

পিতামাতা যখন সস্নেহে শান্তিময়ী সুশীলা কন্যাটীর নাম রাখিয়াছিলেন, যমুনা, তখন কি মুহূর্ত্তের জন্যও তাঁহারা ভাবিয়াছিলেন যে তাঁহাদের শত আদর-যত্ন এবং অনুরাগ সত্ত্বেও কন্যাটী অদৃষ্টের বিরাগভাজন হইয়া ভবিষ্যতে দুঃখের জীবন যাপন করিবে? যমুনা ধনী বংশের সুন্দরী কন্যা না হইলেও, সে যে সংসার-রাজ্যের একটী শান্তিময় দীন কুটীরে পিতার অতুল আদর এবং পরম স্নেহময়ী জননীর অধিকাংশ স্নেহটুকু অধিকার করিয়া সেই ক্ষুদ্র-দীন রাজত্বের অধিশ্বরী হইয়াছিল তদ্বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই।

যমুনা তাহার সাধ্বী জননীর অনুকরণে তাহার হৃদয় গঠন করিয়াছিল। প্রত্যহ প্রাতে উঠিয়া তাহাকে সাংসারিক দৈনন্দিন কার্য্যে ব্যস্ত থাকিতে দেখা যাইত। দরিদ্রের কন্যা, দাস দাসী নাই, সুতরাং যমুনাকেই সকল কর্ম্ম গুছাইয়া করিতে হইত। কর্ম্মকুশলতায় সে অদ্বিতীয় ছিল। সকল কর্ম্মই সে স্বয়ং সম্পন্ন করিতে চেষ্টা করিত, অথচ তাহার প্রকৃতির মধ্যে এমন একটু কোমলতা, এমন একটু ধৈর্য্য, এমন একটু প্রশান্ত ভাব লক্ষিত হইত যে, তাহাকে দেখিলে বোধ হইত, এমন একটী শান্ত, কোমল ও ক্ষীণপ্রাণা বালিকার দ্বারা কখনই এতগুলি কার্য্য সম্পাদিত হওয়া সম্ভবপর নয়। বালিকা স্বভাবতই ক্ষীণাঙ্গী ছিল।

বালিকার বিবাহের বয়স আগত হইলে, তাহার পিতা সেই আঁধার কুটীরের আলোক স্বরূপা কন্যাটীকে কি করিয়া পরের হস্তে বিসর্জ্জন করিবেন তদ্বিষয়ে চিন্তিত হইলেও পরমেশ্বরের যথা বিধানে যথা সময়ে বিবাহিত হইয়া বালিকা কোনও এক মধ্যবিত্ত গৃহস্থের গৃহে আলো করিতে চলিয়া গেল।

যমুনার পিতৃগৃহে একটা বিষাদের ছায়া পড়িল। তাহার অন্যান্য ভ্রাতা

সত্ত্বেও সে জনকজননীর বড় আদরের, বড় সাধের স্নেহময়ী কন্যা ছিল। পিতা কর্ম্মক্ষেত্র হইতে ফিরিয়া কন্যার মুখ দেখিয়া হৃদয় শান্ত করিতেন। মাতা কন্যার শান্তিময়ী মূর্ত্তি দেখিয়াই এতদিন আনন্দে যাপন করিতেছিলেন। অকস্মাৎ একটা ঝটিকা বহিয়া গেল। পিতা দেখিলেন, যে তাঁহাকে তৃষ্ণায় জল, ক্লান্তিতে সেবা, নিরাশায় শান্তি দান করিত, সে পরের অধিকারে চলিয়া গিয়াছে। পিতা অত্যন্ত বিষন্ন হইলেন। মাতার হৃদয় আঁধার হইয়া গেল। যমুনার মাতা আর যমুনাকে ফিরিয়া আসিতে দেখেন নাই। যমুনা প্রথম স্বামী গৃহে যাইয়া আর ফিরিয়া আসিতে না আসিতেই তিনি ইহলোক হইতে চিরদিনের জন্য বিদায় গ্রহণ করেন। নূতন অবলম্বন হইতে না হইতে অভাগিনী বালিকা তাহার প্রধান স্নেহের অবলম্বন হারাইল। অদৃষ্ট এমনিই কঠোর!

২

যমুনা যখন অশ্রুর উৎস ছুটাইয়া প্রথম পিতৃগৃহ ত্যাগ করিয়া শ্বশুরালয়ে আসিয়াছিল, তখন তাহার স্বামী শ্যামাচরণ বি এ উপাধি লাভ করিবার জন্য দূরে কলিকাতায় কোনও মেসের একটী কক্ষ অধিকার করিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষারূপ মহাযুদ্ধে জয়লাভ করিবার জন্য তাহার পাঠ্যপুস্তকরূপ যুদ্ধক্ষেত্রে একটা রীতিমত আখড়াই দিতে মহা ব্যতিব্যস্ত ছিলেন। সুতরাং শ্বশুরালয়ে গিয়া যমুনা তাহার শ্বশ্রূ, শ্বশুর, দেবর, ননন্দা, এবং অন্যান্য দুই একজন দাস দাসী প্রভৃতিকে লইয়াই আপনার সংসার পাতিয়াছিল।

শ্যামাচরণ বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষার জন্য সতত ব্যস্ত থাকিলেও সে যে যমুনার কথা ভাবিত না এমন নহে। সে যমুনার আগমন সংবাদ যথা সময়ে যমুনার নিকট হইতেই পাইয়াছিল। কিন্তু যমুনা তাহাদের বাটীতে আসিলে পর সে কিম্বা যমুনা, কেহ কাহাকেও আর পত্র লিখিতে সাহস করিল না। সেই জন্য শ্যামাচরণ পূর্ব্বাপেক্ষা যমুনার জন্য অধিকতর উদ্বিগ্ন থাকিত। তাহার সহপাঠীদের সহিত কথা কহিবার সময় সে মধ্যে মধ্যে প্রায়ই ভুলক্রমে অন্য অপ্রাসঙ্গিক কথা কহিয়া সময়ে সময়ে বড় অপ্রতিভ হইত। রাত্রিতে শয়নকালে শয্যায় আশ্রয় লইয়া নিদ্রিত হইবার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত সে তাহার নব প্রেমিকার জন্য বড়ই ব্যাকুল হইত। তাহার সেই শুষ্ক মুখের ম্লান হাসি

দেখিয়া অপর কেহই বুঝিত না, তাহার হৃদয়ে কি ব্যথা লুকাইত রহিয়াছে!

এইরূপে পরীক্ষার শেষদিন পর্য্যন্ত উত্তীর্ণ হইলে হর্ষোৎফুল্ল হৃদয়ের আনন্দ, চক্ষে উদ্ভাসিত করিয়া শ্যামাচরণ গৃহে ফিরিল। শ্যামাচরণ যে কেবল যমুনার প্রেমের জন্য ততটা ব্যাকুল থাকিত, তাহা নহে। তাহার চিন্তা,—তাহাদের বাটীতে পরিবারভুক্ত লোক এবং বাহিরের চাকর ইত্যাদি লইয়া পুরুষের সংখ্যা অধিক; অধিকন্তু তন্মধ্যে দুই তিনটী যুবকও ছিল এবং তাহাদের চরিত্র বিষয়ে শ্যামাচরণ পূর্ব্ব হইতেই সন্দিগ্ধ ছিল বলিয়া যমুনার জন্য সে অত্যন্ত উদ্বিগ্ন থাকিত। এই সন্দেহের বশবর্ত্তী হইয়া শ্যামাচরণ বাটীতে কোনও সংবাদ না দিয়াই গৃহে ফিরিল। সন্দিগ্ধ হৃদয় হইলেও যমুনার প্রতি তাহার ভালবাসা অক্ষুণ্ণ ছিল বলিয়া বাটী ফিরিবার সময় সে কয়েকটী উপহার সামগ্রী লইয়া আসিতেও ভুলে নাই। বেলা দ্বিপ্রহরের সময় শ্যামাচরণ বাটী আসিল।

শ্যামাচরণ অন্দরে প্রবেশ করিয়াই দেখিল যমুনা কাহার হাতে পান দিতেছে। সেই সময় সে বোধ হয় কল্পনার চক্ষে যমুনার মুখে একটু হাসিও দেখিয়াছিল। কাহাকে পান দেওয়া হইতেছে, রোষে—ক্ষোভে শ্যামাচরণের আর তাহা দেখিবার অবসর রহিল না! গম্ভীর মুখে সে অন্য দিক দিয়া আপনার নির্দ্দিষ্ট গৃহে গেল।

৩

রাত্রি তখন প্রায় দশটা। শ্যামাচরণ বঙ্কিম বাবুর "কপালকুণ্ডলা" পাঠে মনঃসংযোগ করিয়াছিল। হঠাৎ কে আসিয়া তাহার পদে প্রণতা হইল। শ্যামাচরণ দেখিল, যমুনা। "কপালকুণ্ডলা" পড়া বন্ধ করিয়া শ্যামাচরণ যে কেদারায় বসিয়াছিল তাহার একপার্শ্বে যমুনার হাত ধরিয়া বসাইল। অনেক-ক্ষণ ধরিয়া কত কি কথা হইল। তাহার পর শ্যামাচরণ একটু প্রকৃতিস্থ হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "তখন কাহাকে পান দিতেছিলে?"

যমুনা। কৈ কখন?

শ্যামাচরণ সন্দিগ্ধচিত্তে উত্তর করিল, "যখন আমি বাটীতে আসিলাম!" যমুনা কহিল, "কেন, মাকে।"

শ্যামাচরণের তখন ভ্রম সংশোধন হইল। তখনকার মত সে আপন হৃদয়ের

সন্দেহ ঘুচাইয়া পুনরায় যমুনাকে স্নেহ ও ভালবাসার চক্ষে দেখিল।

শ্যামাচরণ যমুনার স্বভাব চরিত্র পর্য্যবেক্ষণ করিবার জন্য আসিয়াছিল, কিন্তু দুর্ভাগ্য বশতঃ তাহা হইল না, সে আসিবার পর তাহার মাতা তাহাকে বলিলেন, "দেখ্ শ্যাম, বৌমা অনেক দিন হ'ল এসেছে। বাপের বাড়ীর জন্য মনও ত কেমন করে। ওর বাপ নিয়ে যাবে বলে চিঠি লিখেছিলেন। আর এক সপ্তাহ পরেই পাঠাব' হ'বে।"

শ্যামাচরণ মুখে কিছু বলিল না। কিন্তু তাহার মনে মনে যেন কি একটা প্রতিহিংসা-বহ্নি জ্বলিয়া উঠিল। যমুনার কার্য্যাবলী পর্য্যবেক্ষণ করিতে সময় পাইবে না বলিয়া শ্যামাচরণের যত আক্রোশ হইল, তাহারই উপর। মনে মনে সন্দেহ পুনরায় দৃঢ় হইল। ভাবিল আমি আসিতে না আসিতেই পলায়নের উদ্যোগ! নিশ্চয়ই ইহার ভিতর একটা গূঢ় রহস্য নিহিত আছে। আমার পর্য্যবেক্ষণই বোধ হয় পাপিষ্ঠার গুপ্ত প্রণয়ের অন্তরায় হইয়াছে এবং সেইজন্যই কোনও প্রকারে এই স্থানান্তর গমনের উদ্যোগ হইতেছে। সে কাহাকেও কিছু বলিল না। নীরবে কূটানুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইল।

ইহার পর আর দুইদিন এই হতভাগ্য দম্পতী সুখে কালাতিপাত করিতে পারিয়াছিল। তাহার পর তৃতীয় দিবস হইতে শ্যামাচরণ কঠোর ভাব ধারণ করিতে লাগিল। সে কোনও দোষ দেখিতে না পাইয়া অবশেষে কল্পনা করিল যদি কোনও দোষ থাকে তাহা মিষ্টমুখে সংশোধন হইবার নহে। তিরস্কার এবং কঠোর ব্যবহারে হয়ত সে দোষ সংশোধিত হইতে পারে, এই ভাবিয়া আপন কল্পিত দোষারোপের উপর নির্ভর করিয়া তৃতীয় দিবস হইতে যমুনার প্রতি সে বড় কঠোর অত্যাচার আরম্ভ করিল। সংসারানভিজ্ঞা সাধ্বী, মাতৃহীনা, অসহায়া বালিকা এই কঠোরতার কারণ বুঝিল না। শ্যামাচরণ কোনও কার্য্যের জন্য তাহাকে আজ্ঞা করিলে সে অবিলম্বে তাহা সম্পন্ন করিয়া দ্বিতীয় আজ্ঞা পালন করিবার অপেক্ষায় যেন অপরাধীর মত আসিয়া দাঁড়াইত। তাহার কাতর চাহনি ও সিক্ত নয়ন দেখিয়া শ্যামাচরণের দয়া হইত। ভাবিত, "হায় হায় কেন এই অকলঙ্কা নির্দ্দোষ হৃদয়া বালিকার উপর বিনা দোষে অত্যাচার করি? ইহাতে কি আমার পাপ আছে? নিশ্চয়ই! কিন্তু হে দীনেশ! যদি এখনও ইহাতে কোনও কলঙ্ক থাকে, এই আশঙ্কায়

তাহা সংশোধন জন্য আমি এই কঠোর ব্রত অবলম্বন করিয়াছি, আমাকে ক্ষমা করিও।" পরমেশ্বরের নিকট এই অন্যায় ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া শ্যামাচরণ তাহার অত্যাচারের মাত্রা সমভাবেই রাখিল।

বালিকার কোনও দোষই ছিল না। অকারণে তিরস্কার করিলে তাহার চক্ষু ছল ছল করিত। সে কাতর নয়নে উদাস দৃষ্টিতে স্বামীর মুখপানে চাহিয়া থাকিত। শ্যামাচরণ কোনও অন্যায় প্রশ্ন করিলে, সে যদি তাহার উত্তর না দিত, তাহা হইলে শ্যামাচরণ বলিত, "আজকাল বড় অবাধ্য হইয়াছ; কোনও কথা জিজ্ঞাসা করিলে তাহার উত্তর দাও না।" আর যদি কখনও বালিকা ভয়ে ভয়ে কোনও প্রশ্নের উত্তর দিত, তখন দ্বিগুণ তিরস্কারের সহিত শ্যামাচরণ বলিত, "তুমি বড় উদ্ধত হইয়াছ। মুখের উপর জবাব দাও! হ'বে না কেন, আজকাল যে সাহস দিবার অনেক লোক হইয়াছে।" এইরূপে প্রত্যেক কথায়, প্রত্যেক ব্যবহারে সে যমুনাকে মনঃপীড়া দিতে লাগিল। শ্যামাচরণের অত্যাচার অসহ্য হইলে বালিকা কাঁদিয়া ফেলিত।

অনেক সময় এইরূপ ক্রন্দনে শ্যামাচরণের শত ক্রোধ এবং অত্যাচার কোথায় ভাসিয়া যাইত! তখন হতভাগ্য আপনাকে শত ধিক্কার দিয়া পুনরায় সেই প্রেম প্রতিমা বক্ষে ধারণ করিয়া স্বর্গের সুখ উপভোগ করিত। এইরূপ সুখে—দুঃখে, আদর এবং অত্যাচারে উভয়ের দিন কাটিতে লাগিল।

যাহার মন অত্যন্ত সন্দিগ্ধ সে সামান্য কারণে মনে মনে একটা নূতন সন্দেহ কল্পনা করিয়া লয়। শ্যামাচরণও সেইরূপ সন্দিগ্ধচিত্ত ছিল সুতরাং সে পুনরায় অন্য কোনও কারণে যমুনার প্রতি সন্দিহান হইলে অন্যরূপে তাহাকে উৎপীড়িত করিত। কোনও সময়ে সে, যমুনা কিছু লইয়া আসিলে তাহা গ্রহণ করিত না; সে কোনও আহার্য্য দ্রব্য আনিলে, ক্ষুধা নাই বলিয়া শ্যামাচরণ তাহা প্রত্যাখ্যান করিত। অনেক সময়ে যমুনা কোনও দ্রব্য স্পর্শ করিলে শ্যামাচরণ তাহাও গ্রহণ করিত না, এবং এমন কি দুই একদিন কথা না কহিয়াও তাহাকে কষ্ট দিতে চেষ্টা করিত। বলা বাহুল্য এই শেষোক্তরূপ ব্যবহারে দুঃখিনী বালিকা বড়ই পীড়িতা ও ব্যথিতা হইত। তখন দুই এক দিনের পর সে আর স্থির থাকিতে না পারিয়া কাতর ভাবে স্বামীর পদপ্রান্তে পড়িয়া, স্বামীর চরণে মুখ লুকাইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিত, "বল, আমি কি

অপরাধ করিয়াছি। বল, কেন তুমি আমায় প্রত্যাখ্যান করিয়াছ। কিসে তুমি সন্তুষ্ট হও জানিলে, আমি এখনই তাহা করিতে স্বীকৃত আছি। কিন্তু আমার একটী অনুরোধ রাখিও,—আমাকে পায়ে ঠেলিও না। দাসী করিয়া রাখিও, আমি তোমার সেবা করিতে পারিলেই কৃতার্থ হইব।"

এরূপ অভিনয়ের পর বোধ হয় আর কেহই স্থির থাকিতে পারে না, কিন্তু পাষাণ শ্যামাচরণ—পিশাচ শ্যামাচরণ প্রাণে প্রাণে দ্রবীভূত হইয়াও আত্মসংবরণ করিয়া সেই সময়ে কতকগুলি পাপ-প্রশ্ন করিয়া বালিকার শ্রবণ কলুষিত করিত। অভাগিনী যমুনা তখন পরমেশ্বর সাক্ষী করিয়া আপনার পবিত্রতা প্রমাণ করিতে চেষ্টা পাইত। সে জানিত না, তাহার নির্দ্দোষিতা প্রমাণ করিবার জন্য তাহার সন্দিগ্ধ স্বামীর নিকট সে আর কোনও সাক্ষ্য দিতে পারে কি না। এত জ্বালা, এত যন্ত্রণা সহিয়াও বালিকা একদিনও আপন সতীত্বের গর্ব্ব দেখাইতে যাইয়া ঘৃণা বা রোষের দৃষ্টিতে স্বামীর মুখের দিকে চাহে নাই। একদিনও স্বামীর প্রশ্নের উত্তর সে গর্ব্বিত বচন প্রয়োগ করে নাই।

৪

আরও তিন বর্ষ অতিবাহিত হইয়াছে। এখন শ্যামাচরণ আর পূর্ব্বমত সন্দিগ্ধ নহে। যমুনার কোমল এবং মধুর আচরণে সে শ্যামাচরণকেও কোমল স্বভাব করিয়া লইয়াছে। সতীত্বের এমন মধুর প্রভাব না থাকিলেই বা সতী স্ত্রী দেবীর আসন পাইবেন কেন?

যমুনা দূরদৃষ্ট লইয়াই বোধ হয় জগতে আসিয়াছিল। তাহার আপন মহিমা গুণে সে যে দুঃখের সংসারকে স্বর্গময় করিয়াছিল, সেখানে দানবের অত্যাচার আরম্ভ হইল।

শ্যামাচরণ মেডিক্যাল কলেজে অধ্যয়ন করিতেছিল। মেডিক্যাল কলেজে পাঠকালে ছাত্রগণকে যে অত্যধিক পরিশ্রম করিতে হয় তাহা বোধ হয় সকলেই জানেন। এই অধ্যয়ন কার্য্যে ব্যাপৃত থাকিয়া শ্যামাচরণ অজীর্ণ রোগাক্রান্ত হয়। এবং প্রথমাবস্থায় এই অজীর্ণ উপেক্ষিত হইয়া ক্রমে উদরাময়ে পরিণত হয়। চিকিৎসা চলিলেও পরীক্ষা কি করিয়া দিবে এই চিন্তা প্রবল হওয়ায় শ্যামাচরণের ক্রমে স্বাস্থ্যভঙ্গ হইতে লাগিল। একে

উদরাময়, তাহার উপর আবার স্বাস্থ্যভঙ্গ হেতু দুর্ব্বলতায়, পরিবারবর্গ সকলেই ভীত হইলেন। এই সময়ে শ্যামাচরণের এক মাতুল আসিলেন। তিনি সামান্য মাত্র ডাক্তারী জানিতেন। সুতরাং সকলে তাঁহাকে শ্যামাচরণের রোগমুক্তির উপায় জিজ্ঞাসা করিলে বিজ্ঞ ডাক্তার মহাশয় অনেকক্ষণ অবধি অধর দংশন পূর্ব্বক চিন্তা করিয়া তাঁহার টাকযুক্ত মস্তক চুল্‌কাইতে চুল্‌কাইতে গম্ভীর ভাবে বহিলেন, "আর অন্য কোনও ঔষধ সেবন করিতে হইবে না। আমি যে ঔষধ দিব তাহা সেবন করিলেই হইবে। আর এক কথা," বলিয়া, শ্যামাচরণের মাতার কাণে কাণে বলিয়া দিলেন "বৌমাকে যেন পিতৃগৃহে পাঠাইয়া দেওয়া হয়; তাহা হইলেই বাবাজীবন রোগ মুক্ত হইবেন।" ডাক্তার মাতুল মহাশয় বহু গবেষণায় উক্তরূপ ব্যবস্থা করিয়া প্রস্থান করিলেন।

সকলই হইল। যমুনা অনিচ্ছা সত্বেও পিতৃগৃহে নীত হইল। কিন্তু হইল না কেবল রোগমুক্তি। একে পরীক্ষার চিন্তা, তাহার উপর পতিপ্রাণা যমুনার অদর্শনে শ্যামাচরণ অত্যন্ত পীড়িত হইল। রোগ বাড়িল। সকলেই বুঝিলেন গৃহে মৃত্যুর ছায়া পড়িয়াছে।

শ্যামাচরণের অবস্থা মন্দ বুঝিয়া যমুনা পুনরায় আনীতা হইয়াছে। বিষাদময়ী এবার স্বামীর সহিত অন্তিম দেখা করিতে আসিয়াছে।

একদিন যমুনার অঙ্কে শ্যামাচরণের মস্তক রক্ষিত রহিয়াছে। শ্যামাচরণের মাতা পুত্রের মুখে জল দিতেছেন। পরিবারস্থ সকলে বিষাদমগ্ন। এমন সময়ে সেই ডাক্তার মাতুল মহাশয় আসিয়া বলিলেন, "একি, তোমরা এমন করিয়া দাঁড়াইয়া কেন?" রোগীর মস্তক যমুনার অঙ্কে দেখিয়া, বিজ্ঞতা প্রকাশ করিয়া বলিলেন, "রোগীর কষ্ট হইবে যে, রোগীর মস্তক নামাইয়া রাখা হউক।"

রোগীর মস্তক যমুনার অঙ্কচ্যুত হইলে শ্যামাচরণ চক্ষু মুদিল। সে চক্ষু আর ইহজগতে খুলে নাই।

* * * *

আমরা আজও দেখি, বিরসবদনা, দুঃখিনী বিধবা যমুনা অকাতরে বৈধব্য ব্রত পালন ও তাহার শ্বশ্রূর সাংসারিক কার্য্যে সহায়তা করে। দুঃখিনী শ্বশ্রূ-

ঠাকুরাণী দুঃখিনী বধূমাতাকে চক্ষে চক্ষে রাখেন, পাছে বাছার কষ্ট হয়। হায়, যমুনা হৃদয়ের যে যাতনা তাহা কে বুঝিবে? যখন স্বামীর স্মৃতি হৃদয়-তট উছলিয়া উঠে তখন বালিকা, ক্রন্দনে তাহার শোক সন্তপ্ত চিত্তকে শান্ত করিতে চেষ্টা করে। *

৺কালিদাস চক্রবর্ত্তী।

পুণ্য ভাণ্ডার।

চিঠি। †

কাকে ভালবাস?—চিঠিকে জিজ্ঞাসা কর। একটী সামান্য চিঠিতে কত ভালবাসা—কত প্রাণের কথা! সব চিঠির কথা ছেড়ে দাও—যাকে তুমি ভালবাস, সে যখন লেখে "তোমারই প্রাণের" ইত্যাদি, তখন সেই চিঠির আয়নার ভিতর দিয়ে তোমার হৃদয়ের বন্ধুর ছবি একেবারে কি স্পষ্ট দেখিতে পাও না? তুমি অনেক দিন প্রবাসে আছ—না? ঐ দেখ—একটু চেষ্টা করে দেখ—চিঠিতে তোমার ভগিনীর মুখ দেখিতে পাবে; তাঁহার দুই চোখ দিয়া অশ্রুধারা অনবরত ঝরিতেছে। কত কালের স্মৃতিপুষ্পগুলি চিঠিতে তোমার ভগিনী কত রকম করে সাজিয়ে রেখেছেন—একবার দেখিতে পাইতেছ কি? বাড়ী যেও না কিন্তু এই রকম চিঠির দ্বারা ভালবাসার আদান প্রদান কর। বাড়ী গেলেই চিঠি উঠে গেল—কিন্তু সেটা যেন না হয়। ফুলকে একেবারে বৃন্তচ্যুত কোরো না কিন্তু অশ্রুজল দিয়ে ফুল আরো বেশী ফুটাও।

---

* এই গল্পটী কোন প্রত্যক্ষ চিত্র অবলম্বনে লিখিত হইয়াছিল।

† ১৬ বৎসরে রচনা।

চিঠি হৃদয়ের স্বত উত্থিত গান। যেই তুমি চিঠি পড়, তখনি পুরাতন স্মৃতিগুলি হৃদয়ে প্রবেশ করে—হৃদয়ের তারে ঝঙ্কার দিয়া উঠে। এ গান নয় ত, পৃথিবীতে গান আর কি?

কোন প্রসিদ্ধ কবি বলিয়াছেন, যাহার হৃদয়ে সঙ্গীত নাই, তাহাকে বিশ্বাস করিবে না—যাহার হৃদয় হইতে মৃদু মধুর বীণাঝঙ্কার প্রতিধ্বনিত হইয়া না আইসে—তাহাকে কখনই বিশ্বাস করিবে না। সে ব্যক্তি, জগতে এমন কর্ম্মই নাই,—যতই কেন নিষ্ঠুর প্রকারের হউক না, যাহাতে হস্তক্ষেপ করিতে না পারে। উঃ সে হৃদয় কি ভয়ঙ্কর।

শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

সন্ধ্যা। *

গাও, গাও সন্ধ্যা, তুমি বিদায়ের গান গাও; গাও তুমি হৃদয় খুলিয়া বিরহের গান গাও। এ গান আমার বড়ই মধুর লাগে। কেন?—এ বিরহে মিলনের আভাস পাই। জানি যে, তুমি যাইতেছ পুনরায় আসিবার জন্য। যদি বুঝিতাম যে তুমি আজ চলিয়া গেলে আর ফিরিয়া আসিবে না, আজ যে গান গাহিলে সে গান আর শুনিতে পাইব না, যদি বুঝিতাম যে,—আজ তুমি যে অশ্রুছলছলমুখে বিদায় গ্রহণ করিলে, আজ যে মৃদুমন্দ বাতাসে হৃদয় হইতে দীর্ঘশ্বাস ফেলিলে, সে অশ্রুমুখ দেখিতে পাইব না, সে দীর্ঘশ্বাস আর শুনিতে পাইব না—ইহা যদি বুঝিতাম—তবে অন্তরে বিষাদের কি ঘোর অন্ধকার বিরাজ করিত, হৃদয় কি বিশাল মরুভূমিরূপে পরিণত হইত! তাই বলি তুমি বিরহের গাণ গাও; জানি যে, তোমাকে কাল আবার প্রাণ ভরিয়া আলিঙ্গন করিতে পাইব, তোমার অশ্রুমুখে চুম্বন করিতে পাইব, তোমার হৃদয় আমার হৃদয়ে প্রেমের দৃঢ় বন্ধনে বাঁধিয়া রাখিতে পাইব—তাই বলি যে তুমি বিদায়ের গান গাও; তোমার বিদায়কালীন বিলাপগীত আমার বড়ই মিষ্ট লাগে।

* ১৭ বৎসরে রচনা।

সন্ধ্যে—

আজ তুমি যে গান গাহিলে, প্রকৃতির হৃদয়ের স্তরে স্তরে তাহা গ্রথিত হইয়া গিয়াছে। ফুলেদের কাছে কান পাতিয়া শুনিতে পাই যে তাহারা অতি মৃদুস্বরে সুকোমল কণ্ঠে অবিরাম সেই গান গাহিতেছে; গ্রহনক্ষত্রদিগের পানে চাহিয়া দেখি যে তাহারাও সেই গান গাহিতেছে; আবার অন্তরের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া দেখি যে, সেথায়ও একটী গান অনুক্ষণ প্রতিধ্বনিত হইতেছে; সে গান সন্ধ্যার গান—বিরহের গান—মিলনের প্রথম গান।

তবে সত্য সত্যই তুমি বিদায় গ্রহণ করিতেছ? এই অবসরে একটীবার এস; আমার বুকের পরে তোমার সুকোমল মাথাটী থুয়ে কাঁদিয়া যাও, আর আমিও তোমার সহিত কাঁদিতে থাকি। তুমি যে অশ্রুজল ফেলিবে, তাহা প্রেমের বলে দৃঢ়তম বন্ধন হইয়া আমাদের উভয়ের হৃদয় একসূত্রে বাঁধিয়া দিবে—অবশেষে উভয়ের হৃদয় এক হৃদয় করিয়া দিবে। সে দিন কবে আসিবে? সন্ধ্যে সে আশা করিতে সাহস হয় না। প্রেমের পথ অতি দুর্গম পথ; সে পথ হইতে কখন যে চরণ স্খলিত হয়, তাহা কে বলিতে পারে?

শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

বাল্মীকির বিষাদোচ্ছ্বাস। *

অমাবস্যা তিথি। রক্তবসনা সন্ধ্যা দিবসের সমুদয় পাপ বহন করিয়া পবিত্র হইবার ইচ্ছায় সাগরে অবগাহন করিতেছে। সন্ধ্যার বিরহে দিগঙ্গনাগণ পূরবী রাগিণীতে বিরহের গীত গাহিয়া জগতের অশ্রু ঝরাইতেছে এবং দু একটী নক্ষত্র সেই সুমধুর গীত শুনিবার নিমিত্ত এধারে ওধারে মিটিমিটি চাহিতেছে। এই গীত শুনিয়া সমস্ত বিহগ শান্তিলাভের প্রত্যাশায় আপন আপন কুলায় অন্বেষণ করিতে চলিয়াছে; কেবল একটী সুবিস্তীর্ণ গহনকাননের অভ্যন্তরে

* ১৭ বৎসরে রচনা।

এক ক্রৌঞ্চমিথুন এখনও সোহাগের মায়ায় ভুলিয়া আছে। এতটা ভ্রমের ফল শোক ব্যতীত আর কি হইতে পারে? ঘর্ম্মাক্তকলেবর কৃতান্তসদৃশ দুই শবর চুপে চুপে—অতিচুপে—নিকটে আসিয়া সেই ক্রৌঞ্চমিথুনের প্রতি দুই নিষ্ঠুর শর হানিল। গহন কানন ক্রৌঞ্চপত্নীর শোকের করুণতানে প্রতিধ্বনিত হইয়া গেল। একটা শর ক্রৌঞ্চের প্রেমপূর্ণ হৃদয় বিদীর্ণ করিয়াছে, অপরটী লক্ষ্য অতিক্রম করিয়াছে। কেন সেই শরটা ক্রৌঞ্চীকেও ভেদ করিল না? কেন তাহারা একটীকে ইহজগত হইতে বিদায় দিয়া অপরটীকেও দিল না? আহা! ক্রৌঞ্চী ক্রৌঞ্চকে ঘিরিয়া ঘিরিয়া কত না কাঁদিতেছে! বাতাসে তরুলতার নিকট ক্রৌঞ্চীর বিরহের কথা বলিয়া মাঝে মাঝে দীর্ঘশ্বাস ছাড়িতেছে। সূর্য্যদেবও এই নিষ্ঠুর হত্যাকাণ্ড দেখিবার ভয়ে অগ্র হইতেই অদৃশ্য হইয়াছেন। ফুলেরা তরুলতার নিকট শোকের সেই কাহিনী শুনিয়া অবনতমস্তক হইয়া অবিরলধারে অশ্রুবর্ষণ করিতেছে। চন্দ্রমাও আজ রক্তপাত দেখিবার ভয়ে একেবারেই অদৃশ্য হইয়া রহিয়াছেন। প্রকৃতি যখন হিংসার বিপক্ষে এরূপ সহানুভূতি প্রদর্শন করিতে পারে, তখন মনুষ্যের হৃদয় হিংসাতে না জানি আরো কত কষ্ট অনুভব করিবে!

দূরেতে—সেই কাননের দূর অভ্যন্তরে—দস্যুদলপতি বাল্মীকি সঙ্গীবিহীন হইয়া আনমনে ঘুরিতেছিলেন। আজ এই নিস্তব্ধ অমাবস্যা রাত্রে সহসা তিনি আপনার হৃদয়ের কলুষিতভাব অস্পষ্টরূপে বুঝিতে পারিয়া পাগলের মত চঞ্চল হইয়া ঘুরিতেছিলেন। এমন সময়ে তাঁহার কর্ণে ক্রৌঞ্চীর করুণতান প্রবেশ করিল; তাঁহার হৃদয় আরো চঞ্চল হইয়া উঠিল। তখন তিনি ভাবিতে লাগিলেন যে, কোন দিন কোন শব্দ তাঁহার হৃদয় টলাইতে পারে নাই, কিন্তু আজ তাঁহার পাষাণ হৃদয় সামান্য এক ক্রৌঞ্চীর বিলাপে গলিয়া গেল কিরূপে? অবশেষে সেই শব্দ অনুসারে আসিতে আসিতে বাল্মীকি শবরদিগের নিকটে পৌঁছিলেন। সেথায় শবরদিগের রক্তাক্তহস্তে মৃত ক্রৌঞ্চ দেখিয়া ও ক্রৌঞ্চীর সেই আর্ত্তস্বর কানের কাছে শুনিয়া একেবারে জল হইয়া গেলেন—"অশনি গলিয়া গিয়া হইল অশ্রুজল"। তিনি আজ প্রেমের তত্ত্ব বুঝিতে পারিয়াছেন; তিনি আজ প্রেমের বিরহে যাতনা অনুভব করিয়া বিরহীর সহিত সহানুভূতি প্রকাশ করিতে শিখিয়াছেন। তাই আজ ক্রৌঞ্চীর বিরহে আপনাকেও

Figure 1

বিরহী বোধ করিয়া তাহার যাতনা অনুভব করিতেছেন, মর্ম্মান্তিক কষ্ট পাইতেছেন। এই দারুণ বেদনা সহ্য করিতে করিতে সহসা তাঁহার হৃদয় হইতে দেববাক্য বাহির হইল —

"মা নিষাদ প্রতিষ্ঠাংত্বমগমঃ শাশ্বতীঃ সমাঃ।
যৎক্রৌঞ্চমিথুনাদেকমবধীঃ কামমোহিতং॥"

শোকের দারুণ উচ্ছ্বাস তাঁহার মুখে শ্লোকত্ব প্রাপ্ত হইবামাত্র তিনি ক্ষণেক স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইলেন; ভাবিতে লাগিলেন যে, "একি ভাষা বলিলাম; কোথায় ইহা শিখিলাম?" তিনি একটা অপরিচিত ভাষায় আপনার হৃদয়ের যাতনা প্রকাশ করিলেন, কিন্তু জানেন না যে কি ভাষায় তাহা ব্যক্ত করিলেন! এই শোকোচ্ছ্বাস হইতেই তাঁহার হৃদয়ে প্রেমের প্রথম অঙ্কুর উৎপন্ন হইল! এই সময় তাঁহার জ্ঞান হইল যে এতদিন তিনি দস্যুদলপতি হইয়া আপনার কি অহিত সাধন করিয়াছেন। তিনি সমুদয় পরিত্যাগ করিয়া কঠোর তপস্যা আরম্ভ করিলেন। এই তপস্যার বলে, যিনি এককালে দস্যুদলপতি ছিলেন, আজ তিনি মহামুনিপদে বরিত হইয়াছেন এবং "যতদিন আছে রবি, যতদিন আছে শশি" ততদিন সমস্ত জগত এই মহামুনির পদতলে অবনতমস্তক হইবে।

শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

হিমাচল। *

তুষারমণ্ডিত হিমাচল নিস্তব্ধ—গভীর ধ্যানে নিমগ্ন। সংসারের কোলাহলের প্রতি—এই ক্ষুদ্র সংসারের ক্ষুদ্রতার প্রতি—ঐ মহান্ স্তব্ধ হিমগিরি কত না উপেক্ষার সহিত দৃষ্টিপাত করিতেছে! যেন ধরণীর পার্থিব সুখের প্রতি বীতস্পৃহ হইয়া ব্রহ্মলোকের শাশ্বত সুখ আস্বাদন করিবার নিমিত্ত উন্মুখ হইয়া রহিয়াছে। "প্রেয়ো বিত্তাৎ প্রেয়ঃ পুত্রাৎ প্রেয়োঽন্যস্মাৎ সর্ব্বস্মাৎ অন্তরতমঃ।"

---

* ১৭ বৎসরে রচনা।

সেই অন্তরতম সর্ব্বান্তর্যামী পরমপুরুষ বিত্ত হইতে প্রিয়, পুত্র হইতে প্রিয় এবং অন্যান্য সমুদয় অপেক্ষা প্রিয়তম। এই পরমাত্মাকে মহান্ প্রেমযোগ সাধনের দ্বারা লাভ করিয়া আর যেন সংসারের কোলাহল সে ভালবাসে না; তাই এই সমাহিত মহান্ পর্ব্বত প্রেমসাগর হৃদয়ে বদ্ধ করিয়া আপনাতে আপনি স্থির হইয়া আছে। সময়ে সময়ে যখন ইহার প্রেম উছলিত হইয়া উঠে, যখন এই উছলিত প্রেম ইহার হৃদয়ের ক্ষুদ্রতার মধ্যে বদ্ধ থাকিতে পারে না, তখন ভগ্নবাঁধ জলাশয়ের ন্যায় প্রেমধারা নদী হইয়া প্রেমের অনন্তসাগরে ধাবিত হয় এবং গমনকালে প্রেমকণায় চারিদিক সিক্ত করিয়া যায়। প্রেমের বলে পাষাণ-অন্তর মরুভূমি পর্য্যন্ত শস্যশ্যামলা হইয়া যায়।

শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

রামায়ণের সুমালিরাক্ষস ও আফ্রিকার সুমালিভূমি।

সকলেই প্রায় সংবাদপত্রে পড়িয়াছেন বোধ হয় যে, ইংরাজদের সঙ্গে সোমালিদের কেমন থাকিয়া থাকিয়া ঘোর যুদ্ধ হইয়া গেল! তথাপি ইংরাজেরা সুমালিদের 'কাবু' করিতে পারিল না। তাহাদের কাবু করা কি সহজ কথা তাহারা হইতেছে রাক্ষসের জাতি—কৃষ্ণকায় রাক্ষস জাতি। এই ঘোর কৃষ্ণকায় রাক্ষসজাতিকে আয়ত্ত করিবার জন্য শ্বেতকায় ইংরাজ জাতি প্রবৃত্ত।—এরূপ প্রবৃত্তি নূতন ব্যাপার নহে, কারণ প্রাচীন কালেও এ প্রকার ব্যাপার ঘটিয়াগিয়াছে—প্রাচীনকালে এই ভারতেই ঘটিয়াছিল। রামচন্দ্র তিনি সর্ব্বপ্রথমে সুমালি যুদ্ধ সংবাদ শ্রবণ করেন,—সেও শ্বেতকায় দেবসেনার সহিত কৃষ্ণকায় সুমালিদের যুদ্ধ হয়; ভারতের রাজা রামচন্দ্রের

সময় দশাননের সঙ্গে দেবতাদের যে যুদ্ধ হয়, তাহাতে সুমালি (সুমালিদের আদিপুরুষ) রীতিমত যুদ্ধ করেন। ইন্দ্রদেব এই সুমালিযুদ্ধে ছিলেন। প্রথম আর্য্যজাতি দেবতারা যাঁহাদের সঙ্গে সুমালিদের আদিপুরুষ রাক্ষসদের যুদ্ধ হয়। সেই একরূপপ্রথম সুমালিযুদ্ধ।

রাক্ষস সুমালি হইতেই বোধ হয় সুমালিজাতির উৎপত্তি হইয়াছে। এই সুমালিদের আয়ত্ত করিতে ইংরাজরূপী দেবতাদের কিরূপ বেগ পাইতে হইতেছে!—দেবসৈন্যদেরও রামায়ণের রাক্ষসশ্রেষ্ঠ সুমালিকে জয় করিতে বিশেষ বেগ পাইতে হইয়াছিল। দেবসৈন্যদের সাহায্যের জন্য রুদ্রগণ, আদিত্যগণ, বসুগণ, মরুদ্গণ এবং অশ্বিনীকুমারদ্বয়ও যোগদান করেন। রাক্ষসদের পক্ষে বিস্তর সৈন্য ছিল, দেবসৈন্য রাক্ষসদের বিরাট সৈন্য দেখিয়া ব্যাকুল হয়। যখন রাবণ কৈলাসশৃঙ্গ অতিক্রম করিয়া ইন্দ্রলোকে পৌঁছিল, তখন ইন্দ্রও রাবণের ভয়ে বিচলিত হয়েন ও ইন্দ্রকেও ইন্দ্রলোকে সমাগত আদিত্যগণ, বসুগণ, রুদ্রগণ, সাধ্যগণ এবং মরুদ্গণ প্রভৃতি সমস্ত দেবগণকে রাবণের বিরুদ্ধে যুদ্ধে প্রস্তুত হইবার জন্য বলিতে হইয়াছিল। ইন্দ্রের কথায় সকল দেবতারা রাজি হইলেন।

রাবণের তরফেও ঢের বীর মন্ত্রণাকুশল রাক্ষসবর ছিল।—মারীচ, মহাপার্শ্ব, মহোদর, প্রহস্ত, অকম্পন, নিকুম্ভ, শুক, সারণ, সংহ্রাদ, ধূমকেতু, মহাদংষ্ট্র, ঘটোদর, জম্বুমালী, মহাহ্রাদ, বিরূপাক্ষ, সুপ্তঘ্ন, যজ্ঞকোপ, দুর্ম্মুখ, দূষণ, খর, ত্রিশিরা, করবীরাক্ষ, সূর্য্যশত্রু, মহাকায়, অতিকায়, দেবান্তক এবং নরান্তক,—এই সকল মহাবীর্য্যবান রাক্ষস ছিল। ইহাদিগকে লইয়া সুমালি দেবসৈন্যদের সঙ্গে রণোদ্যোগ করিয়াছিল। এই সুমালি রাবণের মাতামহ ছিল। রামায়ণে আছে—ইনি এই সুমালি, বায়ু যেমন মেঘসকল ধ্বংস করিয়া ফেলে, সেইরূপ সে যারপর নাই ক্রুদ্ধ হইয়া নানাবিধ সুতীক্ষ্ণ অস্ত্রসমূহ দ্বারা সমস্ত দেবতাদিগকে সংহার করিতে লাগিল! তখন দেবসৈন্য রাক্ষসদের প্রচণ্ড আক্রমণ ও বিনাশসাধন সহ্য করিতে না পারিয়া চতুর্দ্দিকে ভাঙ্গিয়া পড়িল। দেবতাদের মহাত্রাস জাগিল। ইতিমধ্যে বসু ও আদিত্যগণ মহা উৎসাহসহকারে রাক্ষসসৈন্য বিধ্বস্ত করিবার জন্য প্রবৃত্ত হইল,

তাহাতে দেবতাগণ সেই বসুশ্রেষ্ঠ ও আদিত্যদ্বয়ের উৎসাহে পুনরায় রাক্ষসদের সহিত ঘোরতর যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন।—অনেক রাক্ষস বিনাশ করিতে লাগিলেন, রাক্ষসেরাও রাশি রাশি দেবতাদের নাশ করিতে লাগিল।—মহাব্যাপার!—এক্ষণে দেবতাদের দ্বারা অধিক রাক্ষস নিহত হইতেছে দেখিয়া 'সুমালি' আর থাকিতে পারিল না, পুনর্ব্বার নবোৎসাহে বিবিধ প্রহরণ লইয়া দেবসৈন্যের অভিমুখে ধাবিত হইল।—বায়ু যেমন মেঘ তাড়াইয়া দেয়, সেও সর্ব্বতোভাবে ক্রোধান্বিত হইয়া নানাবিধ শাণিত অস্ত্রসমূহের দ্বারা সেই সকল দেবসৈন্য বিনাশ করিতে লাগিল। "সমস্ত দেবতারা মিলিত হইয়া ও মহাবাণ বর্ষণ এবং শূল ও প্রাস প্রভৃতি নিদারুণ প্রহরণ দ্বারা আঘাতপ্রাপ্ত হইয়া রণস্থলে থাকিতে পারিলেন না।" দেখ সুমালি কি প্রকার দেবতাদের বিধ্বস্ত করিল! দেখিয়া মহাতেজা অষ্টমবসু সাবিত্র আর থাকিতে পারিলেন না; দেবসেনার মান রাখিবার জন্য মহাযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন—ভীষণ পরাক্রমে সুমালির সঙ্গে যুদ্ধ চালাইতে লাগিলেন। বসু সুমালির রথ প্রভৃতি সমস্ত বিনষ্ট করতঃ শেষে উল্কার ন্যায় প্রদীপ্ত গদারূপী আগ্নেয় অস্ত্র তাহার উপর নিক্ষেপ করিয়া তবে তাহাকে ধ্বংস করিতে সমর্থ হয়েন। দেবসৈন্যের সহিত রাক্ষসসেনার পাল লইয়া সুমালি যেরূপ ভীষণ যুদ্ধ দেখাইল ও দেবসৈন্যকে কম্পিত ও বিধ্বস্ত করিল, বর্ত্তমান সোমালিভূমির যুদ্ধে সুমালিঅধ্যক্ষ—সুমালি-মোল্লা সুমালিদের লইয়া ইংরাজরূপী দেবসৈন্যদের সেইরূপ বিধ্বস্ত করিল। তখনকার সুমালীর বীরত্বে ও এখনকার সুমালীর বীরত্বে কেমন একটী সামঞ্জস্য পাওয়া যায়।

পাঠকদের কৌতূহল বিশেষরূপে চরিতার্থ করিবার জন্য সুমালিচরিত্র পরিস্ফুট করিবার জন্য দেবসেনার সহিত রাক্ষসসেনার যুদ্ধের আনুপূর্ব্বিক বিবরণটী নিম্নে প্রদত্ত হইতেছে :—

"কৈলাসং লঙ্ঘয়িত্বা তু সসৈন্যবলবাহনঃ।
আসসাদ মহাতেজা ইন্দ্রলোকং দশাননঃ॥ ১
তস্য রাক্ষসসৈন্যস্য সমন্তাদুপযাস্যতঃ।
দেবলোকে বভৌশব্দো ভিদ্যমানার্ণবোপমঃ॥ ২

শ্রুত্বা তু রাবণং প্রাপ্তমিন্দ্রশ্চলিত আসনাৎ।
দেবানথাব্রবীত্তত্র সর্ব্বানেব সমাগতান্॥ ৩
আদিত্যাংশ্চ বসূন রুদ্রান্ সাধ্যাংশ্চ সমরুদ্গণান্।
সজ্জা ভবত যুদ্ধার্থং রাবণস্য দুরাত্মনঃ॥ ৪
এবমুক্তাস্তু শক্রেণ দেবাঃ শক্রসমা যুধি।
সন্নহ্যন্ত মহাসত্ত্বা যুদ্ধশ্রদ্ধাসমন্বিতাঃ॥ ৫
সতু দীনঃ পরিত্রস্তো মহেন্দ্রো রাবণং প্রতি।
বিষ্ণোঃ সমীপমাগত্য বাক্যমেতদুবাচ হ॥ ৬
বিষ্ণো কথং করিষ্যামি রাবণং রাক্ষসং প্রতি।
অহোঽতিবলবদ্রক্ষো যুদ্ধার্থমভিবর্ত্ততে॥ ৭
বরপ্রদানাদ্বলবান্ ন খল্বন্যেন হেতুনা।
তত্তু সত্যং বচঃ কার্য্যং যদুক্তং পদ্মযোনিনা॥ ৮
তদ্যথা নমুচির্ব্বৃত্রো বলির্নরকশম্বরৌ।
তদ্বলং সমবষ্টভ্য ময়া দগ্ধা তথা কুরু॥ ৯
ন হন্যো দেবদেবেশ ত্বদৃতে মধুসূদন।
গতিঃ পরায়ণং চাপি ত্রৈলোক্যে সচরাচরে॥ ১০
ত্বং হি নারায়ণঃ শ্রীমান্ পদ্মনাভঃ সনাতনঃ।
ত্বয়েমে স্থাপিতা লোকাঃ শক্রশ্চাহং সুরেশ্বরঃ॥ ১১
ত্বয়া সৃষ্টমিদং সর্ব্বং ত্রৈলোক্যং সচরাচরম্।
ত্বামেব ভগবন্ সর্ব্বে প্রবিশন্তি যুগক্ষয়ে॥ ১২
তদাচক্ষ্ব যথাতত্ত্বং দেবদেব মম স্বয়ম্।
অসিচক্রসহায়স্ত্বং যোৎস্যসে রাবণং বিভো॥ ১৩
এবমুক্তঃ স শক্রেণ দেবো নারায়ণং প্রভুঃ।
অব্রবীন্ন পরিত্রাসঃ কর্ত্তব্যঃ শ্রূয়তাঞ্চ মে॥ ১৪
ন তাবদেষ দুষ্টাত্মা শক্যো জেতুং সুরাসুরৈঃ।
হন্তুঞ্চাপি সমাসাদ্য বরদানেন দুর্জ্জয়ঃ॥ ১৫
সর্ব্বথা তু মহৎ কর্ম্ম করিষ্যতি বলোৎকটঃ।
রাক্ষসঃ পুত্রসহিতো দৃষ্টমেতন্নিসর্গতঃ॥ ১৬

যত্তু মাং ত্বমভাষিষ্ঠা যুধ্যস্বেতি সুরেশ্বরঃ।
নাহং তং প্রতিযোৎস্যামি রাবণং রাক্ষসং যুধি ॥ ১৭
নাহত্বা সমরে শত্রুং বিষ্ণুঃ প্রতিনিবর্ত্ততে।
দুর্লভশ্চৈব কামোঽয়ং বরগুপ্তাদ্ধি রাবণাৎ ॥ ১৮
প্রতিজানে চ দেবেন্দ্র ত্বৎসমীপে শতক্রতো।
ভবিতাস্মি যথাস্যাহং রক্ষসো মৃত্যুকারণম্ ॥ ১৯
অহমেব নিহন্তাস্মি রাবণং সপুরঃসরম্।
দেবতা নন্দয়িষ্যামি জ্ঞাত্বা কালমুপাগতম্ ॥ ২০
এতত্তে কথিতং তত্ত্বং দেবরাজ শচীপতে।
যুধ্যস্ব বিগতত্রাসঃ সুরৈঃ সার্দ্ধং মহাবল ॥ ২১
ততো রুদ্রাঃ সহাদিত্যা বসবো মরুতোঽশ্বিনৌ।
সন্নদ্ধা নির্যযুস্তূর্ণং রাক্ষসানভিতঃ পুরাৎ ॥ ২২
এতস্মিন্নন্তরে নাদঃ শুশ্রাব রজনীক্ষয়ে।
তস্য রাবণসৈন্যস্য প্রযুদ্ধস্য সমন্ততঃ ॥ ২৩
তে প্রবুদ্ধা মহাবীর্য্যা অন্যোন্যমভিবীক্ষ্য বৈ।
সংগ্রামমেবাভিমুখা অভ্যবর্ত্তন্ত হৃষ্টবৎ ॥ ২৪
ততো দৈবতসৈন্যানাং সংক্ষোভঃ সমজায়ত।
তদক্ষয়ং মহাসৈন্যং দৃষ্ট্বা সমরমূর্দ্ধনি ॥ ২৫
ততো যুদ্ধং সমভবদ্দেবদানবরক্ষসাম্।
ঘোরং তুমুলনিহ্রাদং নানাপ্রহরণোদ্যতম্ ॥ ২৬
এতস্মিন্নন্তরে শূরা রাক্ষসা ঘোরদর্শনাঃ।
যুদ্ধার্থং সমবর্ত্তন্ত সচিবা রাবণস্য তে ॥ ২৭
মারীচশ্চ প্রহস্তশ্চ মহাপার্শ্বমহোদরৌ।
অকম্পনো নিকুম্ভশ্চ শুকঃ সারণ এব চ ॥ ২৮
সংহ্রাদো ধূমকেতুশ্চ মহাদংষ্ট্রো ঘটোদরঃ।
জম্বুমালী মহাহ্রাদো বিরূপাক্ষশ্চ রাক্ষসঃ ॥ ২৯
মহাকায়োঽতিকায়শ্চ দেবান্তকনরান্তকৌ।
এতৈঃ সর্ব্বৈঃ পরিবৃতো মহাবীর্যৈর্ম্মহাবলঃ ॥ ৩০

রাবণস্যার্য্যকঃ সৈন্যং সুমালী প্রতিবেশ হ।
স দৈবতগণান্ সর্ব্বান্ নানাপ্রহরণৈঃ শিতৈঃ ॥ ৩১
ব্যধ্বংসয়ৎ সুসংক্রুদ্ধো বায়ুর্জলধরানিব।
তদ্দৈবতবলং রাম হন্যমানং নিশাচরৈঃ ॥ ৩২
প্রণুন্নং সর্ব্বতো দিগ্ভ্যঃ সিংহনুন্না মৃগা ইব।
এতস্মিন্নন্তরে শূরো বসূনানষ্টমো বসুঃ ॥ ৩৩
সাবিত্র ইতি বিখ্যাতঃ প্রবিবেশ রণাজিরম্।
সৈন্যৈঃ পরিবৃতো হৃষ্টৈর্নানাপ্রহরণোদ্যতৈঃ ॥ ৩৪
ত্রাসয়ন্ শত্রুসৈন্যানি প্রবিবেশ রণাজিরম্।
তথাদিত্যৌ মহাবীর্য্যৌ ত্বষ্টা পূষা চ তৌ সমম্ ॥ ৩৫
নির্ভয়ৌ সহ সৈন্যেন তদা প্রাবিশতাং রণে।
ততো যুদ্ধং সমভবৎ সুরাণাং সহ রাক্ষসৈঃ ॥ ৩৬
ক্রুদ্ধানং রক্ষসাং কীর্ত্তিং সমরেষ্বনিবর্ত্তিনাম্।
ততস্তে রাক্ষসাঃ সর্ব্বে বিবুধান্ সমরে স্থিতান্ ॥ ৩৭
নানাপ্রহরণৈর্ঘোরৈর্জঘ্নুঃ শতসহস্রশঃ।
দেবাশ্চ রাক্ষসান্ ঘোরান্ মহাবলপরাক্রমান্ ॥ ৩৮
সমরে বিমলৈঃ শস্ত্রৈরুপনিন্যুর্যমক্ষয়ম্।
এতস্মিন্নন্তরে রাম সুমালী নাম রাক্ষসঃ ॥ ৩৯
নানাপ্রহরণৈঃ ক্রুদ্ধস্তৎ সৈন্যং সোঽভ্যবর্ত্তত।
স দৈবতবলং সর্ব্বং নানাপ্রহরণৈঃ শিতৈঃ ॥ ৪০
ব্যধ্বংসয়ত সংক্রুদ্ধো বায়ুর্জলধরং যথা।
তে মহাবাণবর্ষৈশ্চ শূলপ্রাসৈঃ সুদারুণৈঃ ॥ ৪১
হন্যমানাঃ সুরাঃ সর্ব্বে ন ব্যতিষ্ঠন্ত সংহতাঃ।
ততো বিদ্রাব্যমাণেষু দৈবতেষু সুমালিনা ॥ ৪২
বসূনামষ্টমঃ ক্রুদ্ধোঃ সাবিত্রো বৈ ব্যবস্থিতঃ।
সংবৃতঃ স্বৈরথানীকৈঃ প্রহরন্তং নিশাচরম্ ॥ ৪৩
বিক্রমেণ মহাতেজা বারয়ামাস সংযুগে।
ততস্তয়োর্ম্মহদ্যুদ্ধমভবল্লোমহর্ষণম্ ॥ ৪৪

সুমালিনো বসোশৈব সমরেষ্বনিবর্ত্তিনোঃ।
ততস্তস্য মহাবাণৈর্ব্বসুনা সুমহাত্মনা ॥ ৪৫
নিহতঃ পন্নগরমঃ ক্ষণেন বিনিপাতিতঃ।
হত্বা তু সংযুগে তস্য রথং বাণশতৈশ্চিতম্ ॥ ৪৬
গদাং তস্য বধার্থায় বসুর্জগ্রাহ পাণিনা।
ততঃ প্রগৃহ্য দীপ্তাগ্রাং কালদণ্ডোপমাং গদাম্ ॥ ৪৭
তাংমূর্দ্ধ্নি পাতয়ামাস সাবিত্রো বৈ সুমালিনঃ।
সা তস্যোপরি চোল্কাভা পতন্তী বিবভৌ গদা ॥ ৪৮
ইন্দ্রপ্রমুক্তা গর্জ্জন্তী গিরাবিব মহাশনিঃ।
তস্য নৈবাস্থি ন শিরো ন মাংসং দদৃশে তদা ॥ ৪৯
গদয়া ভস্মতাং নীতং নিহতস্য রণাজিরে।
তং দৃষ্টা নিহতং সংখ্যে রাক্ষসাস্তে সমন্ততঃ ॥ ৫০
বিদ্রবন্ সহিতাঃ সর্ব্বে ক্রোশমানাঃ পরস্পরম্।
বিদ্রাব্যমাণা বসুনা রাক্ষসা নাবতস্থিরে ॥" ৫১

"মহাতেজা দশানন, সেনা, সেনাপতি এবং বাহনের সহিত কৈলাসশৃঙ্গ অতিক্রম করিয়া ইন্দ্রলোকে পৌঁছিল। দেবলোকগামী সেই রাক্ষস সৈন্যের রব, উচ্ছ্বলিত সমুদ্রের ন্যায় চারিদিকে প্রতিঘাত হইতে লাগিল। ইন্দ্র, রাবণ আসিয়াছে এই কথা শুনিয়াই আসন হইতে বিচলিত হইলেন। ইন্দ্রলোকে সেই সমাগত আদিত্যগণ, বসুগণ, রুদ্রগণ, সাধ্যগণ এবং মরুদ্গণ প্রভৃতি সমস্ত দেবগণকে পরিশেষে ইন্দ্র কহিলেন,—"আপনারা দুরাত্মা রাবণের সহিত যুদ্ধ করিবার অন্য অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত হউন! যুদ্ধে ইন্দ্রতুল্য শক্তিসম্পন্ন মহাবলশালী দেবগণ ইন্দ্রের এই কথা শুনিয়া সমরেচ্ছুক হইয়া সন্নাহ বন্ধন করিলেন। সেই ইন্দ্র রাবণের ভয়ে সর্ব্বতোভাবে ভীত হইয়া বিষ্ণুর নিকটে গিয়া তাঁহাকে এই কথা কহিলেন,— হে ভগবন! আমি কিরূপে রাক্ষস রাবণের প্রতিকার সাধন করিব? হায়! অত্যন্ত বলশালী সেই রাক্ষস যুদ্ধের নিমিত্ত আমার নিকটে আসিতেছে। রাবণ কেবল বরদান প্রভাবেই এরূপ বলশালী। সুতরাং পদ্মযোনী ব্রহ্মা যাহা করিয়াছেন, সেই কথা সত্যরূপে পরিণত করা আপনার উচিত। অতএব আপনার অপরিমিত শক্তি

আশ্রয় পূর্ব্বক আমি,—বৃত্র, বলি, নমুচি, নরক এবং শম্বর অসুরকে যেমন দহন করিয়াছি, কি উপায়ে রাবণের বধ হয়, আপনি যত্নপূর্ব্বক সেইরূপ অনুসন্ধান করুন। দেবদেবেশ মধুসূদন! সচরাচর ত্রিভুবন মধ্যে আপনি ভিন্ন অপর রক্ষাকর্ত্তা এবং আশ্রয় আর কেহই নাই। আপনি সনাতন পদ্মনাভ শ্রীযুক্ত নারায়ণ। আপনার দ্বারাই এই লোকসকল স্থাপিত হইয়াছে। অধিক কি, আপনিই আমাকে সুরপতি ইন্দ্র করিয়াছেন। হে ভগবন্! এই চরাচর সহ সমস্ত ত্রিভুবন আপনিই সৃষ্টি করিয়াছেন। যুগশেষে প্রলয়কালে আপনাতেই এই সমস্ত ভুবন প্রবেশ করিবে। অতএব হে বিভো দেবদেব! যে উপায় দ্বারা আমার জয় লাভ হয়, আপনি আমাকে সেই উপায়টী বলুন। অথবা আপনি অসি এবং চক্র ধরিয়া স্বয়ং সংগ্রাম করুন।" সেই দেব প্রভু নারায়ণ ইন্দ্রের এরূপ কথা শুনিয়া কহিলেন,—'অত্যন্ত ভীত হওয়া কর্ত্তব্য নহে, অতএব আমি যাহা বলি তাহা শুন। এই দুষ্টচরিত্র রাবণ বরদানদ্বারা শক্তি লাভ করিয়া দুর্জ্জয় হইয়াছে। অতএব সুর বা অসুর কেহই ইহাকে যুদ্ধে হারাইতে পারিবে না; এবং বধ করিতেও পারিবে না। এই রাক্ষস বলবশতঃ দুর্ণিবার হইয়া পুত্রের সহিত সকল প্রকার মহৎ কার্য্য করিবে, সহজজ্ঞানবলে ইহা আমি জানিয়াছি। দেবরাজ! তুমি বলিলে যে,—আপনি যুদ্ধ করুন; কিন্তু আমি এখন সেই রাক্ষস রাবণের সহিত প্রতিযুদ্ধ করিব না; কেননা সমরে শত্রুসংহার না করিয়া আমি ফিরি না। কিন্তু রাবণ বরপ্রভাবে সুরক্ষিত, অতএব তাহার সহিত যুদ্ধে আজ তাহার নিকটে কামনা পূর্ণ করা কঠিন। দেবরাজ শতক্রতো! আমি যেরূপে সেই রাক্ষসের মৃত্যুর কারণ হইব, তোমার নিকটে তাহা প্রতিজ্ঞা করিতেছি। পুরোগামী প্রধান প্রধান রাক্ষসগণের সহিত রাবণকে আমিই বধ করিব। যখন সময় আসিয়াছে জানিব, তখন দেবতাদিগের হৃদয়ে আনন্দ অনুভব করাইব। দেবরাজ! এই সকল বিষয়ই তোমাকে বলিলাম; মহাবল শচীপতে! তুমি নির্ভয় হৃদয়ে দেবগণসমভিব্যাহারে যুদ্ধ কর।' পরে রুদ্রগণ, আদিত্যগণ, বসুগণ, মরুদ্গণ এবং অশ্বিনীকুমারদ্বয় সন্নাহ পরিধান করিয়া তৎক্ষণাৎ পুরী হইতে রাক্ষসদিগের অভিমুখে যুদ্ধার্থ ধাবিত হইলেন। ইত্যবসরে—রাবণের সৈন্যগণ প্রাতঃকালে ভীষণ যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল। সুতরাং চতুর্দ্দিক হইতে

সেনাদিগের চীৎকারশব্দ কর্ণগোচর হইতে লাগিল। সেই মহাবীর্য্যশালী রাক্ষসেরা নিদ্রাত্যাগ করিয়া পরস্পরকে নিরীক্ষণ পূর্ব্বক হৃষ্টচিত্তে যুদ্ধের অভিমুখে অবস্থান করিতে লাগিল। তাহার পর দেবসৈন্যগণ সমরোদ্যত সেই অক্ষয় বিরাট সৈন্য দেখিয়া অত্যন্ত সংক্ষুব্ধ হইল। অবশেষে নানাপ্রকার অস্ত্রধারী দেব, দানব এবং রাক্ষসদিগের শব্দসঙ্কুল তুমুল যুদ্ধ আরম্ভ হইল। ইত্যবসরে রাবণের মন্ত্রী ঘোরদর্শন বীর রাক্ষসেরা যুদ্ধ করিবার জন্য উপস্থিত হইল;—মারীচ, মহাপার্শ্ব, মহোদর, প্রহস্ত, অকম্পন, নিকুম্ভ, শুক সারণ, সংহ্রাদ, ধূমকেতু, মহাসংষ্ট্র, ঘটোদর, জম্বুমালী, মহাহ্রাদ, বিরূপাক্ষ, সুপ্তঘ্ন, যজ্ঞকোপ, দুর্ম্মুখ দূষণ, খর, ত্রিশিরা, করবীরাক্ষ, সূর্য্যশত্রু, মহাকায়, অতিকায়, দেবান্তক এবং নরান্তক, এই সকল, নিশাচর মহাবীর্য্যবান রাক্ষসগণে পরিবেষ্টিত হইয়া রাবণের মাতামহ নিশাচর সুমালি সৈন্যমধ্যে প্রবেশ করিল। বায়ু যেমন মেঘ সকল ধ্বংস করিয়া ফেলে, সেইরূপ সে যার পর নাই ক্রুদ্ধ হইয়া নানাবিধ সুতীক্ষ্ণ অস্ত্রসমূহ দ্বারা সমস্ত দেবতাদিগকে সংহার করিতে লাগিল। রাম! সেই দেবসৈন্যদিগকে রাক্ষসগণ নিহত করিতে থাকিলে তাহারা সিংহাক্রান্ত মৃগরাজির ন্যায়, চারিদিকে ভগ্ন হইল। ইতিমধ্যে বসুগণের অষ্টম বলবান শূর সাবিত্র নামে প্রসিদ্ধ বসু, সেনাপরিবেষ্টিত হইয়া শত্রুসৈন্যগণকে বিত্রস্ত করতঃ রণভূমে প্রবেশ করিল। অপিচ ত্বষ্টা এবং পূষা নামক মহাবীর্য্যশালী আদিত্যদ্বয় নির্ভয়চিত্তে সসৈন্যে রণে প্রবৃত্ত হইলেন। পরে, 'রাক্ষসেরা যুদ্ধে নিবৃত্ত হয় না' তাহাদের এই কীর্ত্তি লোপ করিতে সঙ্কল্প করিয়া দেবতাগণ, রাক্ষসদিগের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। সেই সকল রাক্ষসেরা ঘোরতর নানাবিধ প্রহরণ সমূহ দ্বারা সমরস্থিত শত সহস্র দেবতাকে বিনাশ করিতে লাগিল। দেবতারাও যুদ্ধে মহাবলপরাক্রান্ত ভীষণ রাক্ষসদিগকে তীক্ষ্ণ অস্ত্রের আঘাতে যমালয়ে পাঠাইতে লাগিলেন। রাম! ইত্যবসরে রাক্ষস সুমালী ক্রুদ্ধ হইয়া বিবিধ প্রহরণ লইয়া সেই সৈন্যের অভিমুখে ধাবিত হইল। বায়ু যেমন মেঘ তাড়াইয়া দেয়, সেও সর্ব্বতোভাবে ক্রোধান্বিত হইয়া, নানাবিধ শাণিত অস্ত্রসমূহ দ্বারা সেই সকল দেবসৈন্য বিনাশ করিতে লাগিল। সমস্ত দেবতারাও মিলিত হইয়াও মহাবাণ বর্ষণ এবং শূল ও প্রাস প্রভৃতি নিদারুণ প্রহরণ দ্বারা আঘাত প্রাপ্ত হইয়া রণস্থলে থাকিতে

পারিলেন না। সুমালী কর্ত্তৃক দেবসৈন্য এইরূপে বিধ্বস্ত হইলে মহাতেজা অষ্টম বসু সাবিত্র ক্রুদ্ধ হইলেন। পরে সুস্থির এবং স্বীয় রক্ষিসেনায় পরিবৃত হইয়া পরাক্রম প্রকাশ পূর্ব্বক রাক্ষস সুমালাকে আঘাত করিতে করিতে যুদ্ধে নিবারণ করিলেন। তখন সেই যুদ্ধে অনুবর্ত্তী সুমালী এবং বসুর লোমহর্ষনকর ভীষণ সংগ্রাম হইতে লাগিল। সুমহাত্মা বসু, মহাবাণসমূহ দ্বারা তাহার পন্নগরথ বিনষ্ট করিয়া ক্ষণকাল মধ্যেই তাহার স্যন্দন পাতিত করিলেন। শত শত বাণ দ্বারা সমাচ্ছন্ন করিয়া রথ নষ্ট করিয়া তাহাকে নিহত করিবার জন্য সাবিত্র বসু গদাহস্তে লইলেন। তিনি কালদণ্ডের ন্যায় দীপ্তাগ্রা সেই গদা লইয়া সুমালীর মস্তকে প্রহার করিলেন। ইন্দ্র কর্ত্তৃক যেরূপ মহাবজ্র নিক্ষিপ্ত হইয়া গর্জ্জন পূর্ব্বক পর্ব্বতের উপর পতিত হয়, সেইরূপ উল্কার ন্যায় প্রদীপ্তা গদা তাহার উপরি পড়িয়া দীপ্তি পাইতে লাগিল। গদা দ্বারা তাহার শরীর ভস্মীভূত হইয়া গেল, অতএব তখন রণভূমে তাহার অস্থি, কি মাংস, কি মস্তক—কিছুই দেখা গেল না। সেই রাক্ষসেরা তাহাকে রণে নিহত দেখিয়া সকলে সম্মিলিত হইয়া রোদন করিতে করিতে চারিদিকে পলায়ন করিল। এমন কি, তাহারা বসুকর্ত্তৃক বিধ্বস্ত হইয়া রণক্ষেত্রে অবস্থিতি করিতে পারিলেন না।"

সুমালীকে পরাজয় করিতে ও ধ্বংস করিতে শেষে দেবসৈন্যদের অন্যতম শ্রেষ্ঠ অধ্যক্ষ বসুর আগ্নেয় অস্ত্র প্রয়োগ করিতে হইল। বসু মহাস্ত্রসম আগ্নেয় গদা সুমালীর উপর নিক্ষেপ করিলেন! আগ্নেয়চূর্ণ প্রভাবোৎক্ষিপ্ত গদাশনির দ্বারা সুমালীকে নিহত করিলেন।—প্রকৃতপক্ষে আগ্নেয় অস্ত্রের প্রভাবে—আগ্নেয় চূর্ণ প্রভাবে সুমালীর দর্পচূর্ণ করিলেন। ঠিক ইংরাজেরাও তাই, ইটালিয়েরাও তাই,—যা কিছু সুমালীদের উপর বীরত্ব চালাইতে পারিয়াছেন, তা কেবল তাহাদের আগ্নেয় অস্ত্রশস্ত্র ও দেবতাদের মত দ্যুতিমতী বুদ্ধির প্রভাবে।—প্রকৃতপক্ষে ইউরোপীয়েরা এখনও সুমালীদের তেমন কিছু করিয়া উঠিতে পারেন নাই। যদি তাঁহাদের মধ্যে কেহ সুমহাত্মা 'বসু' আবির্ভূত হয়েন তাহা হইলে সম্ভবতঃ সুমালী ভস্মসাধনে কৃতকার্য্য হইতে

পারেন। দেবসৈন্য ইংরাজদের, ইটালীয়দের বুদ্ধির কাছে রাক্ষসসৈন্য সুমালী-দের বুদ্ধিগর্ব্বখর্ব্ব হইয়া যায়।—আর বুদ্ধিই যার তারই বল—"বুদ্ধির্যস্য বলং তস্য নির্বুদ্ধেস্তু কুতোবলং?" বুদ্ধি যার বল তার নির্বুদ্ধির বল কোথায়? দেবসৈন্যদের মত সুমালীদের তো আর বুদ্ধিবল রণকৌশল নাই। সুমালী-দের বল আছে, বিক্রম আছে, কিন্তু সে দ্যুতিমতী শক্তি নাই, যাহার বলে দেবতাদের সঙ্গে অর্থাৎ সভ্যতম দ্যুতিমান জাতির সঙ্গে সক্ষম হইবে।

যাইহোক সুমালীরা যে একবার অসভ্য ছিল তাও নয়, তাহারাও অনেকটা সভ্য ছিল—রামায়ণে আছে, সুমালীর রক্তে গন্ধর্ব্ব ও রাক্ষসের রক্ত মিশ্রিত; তাহারা একেবারে রাক্ষস নহে; তাহাদের গন্ধর্ব্বের ভাবও আছে সৌন্দর্য্য আছে, রামায়ণে উত্তরকাণ্ডে আছে:—

"সুকেশং ধার্ম্মিকং দৃষ্ট্বা বরলব্ধঞ্চরাক্ষসম্।
গ্রামণীর্নামগন্ধর্ব্বো বিশ্রাবস্যসমপ্রভঃ ॥ ১
তস্য দেববতী নাম দ্বিতীয়া শ্রীরিবাত্মজা।
ত্রিষু লোকেষু বিখ্যাতা রূপযৌবনশালিনী ॥ ২
তাং সুকেশায় ধর্ম্মাত্মা দদৌ রক্ষঃ শ্রিয়ং যথা।
বরদানকৃতৈশ্বর্য্যং সা তং প্রাপ্য পতিং প্রিয়ম্ ॥ ৩
আসীদ্দেববতীতুষ্টা ধনং প্রাপ্যেব নির্দ্ধনঃ।
সা তয়া সহ সংযুক্তো বরাজ রজনীচরঃ ॥ ৪
অঞ্জনাদভিনিষ্ক্রান্তঃ করেণেব মহাগজঃ।
দেববতীং সুকেশস্তু জনয়ামাস রাঘব।
ত্রীনপুত্রান্ জনয়ামাস ত্রেতাগ্নিসমবিগ্রহান্ ॥ ৫
মাল্যবন্তং সুমালীঞ্চ মালিঞ্চ বলিনাং পরম্।
ত্রীংস্ত্রিনেত্রসমান্ পুত্রান্ রাক্ষসান্ রাক্ষসাধিপঃ ॥ ৬"

"সূর্য্যের তুল্য প্রভাবশালী গ্রামণী নামক এক গন্ধর্ব্ব ছিল। দেববতী নাম্নী তাঁহার এক কন্যা জন্মে। সেই কন্যা দ্বিতীয়া লক্ষ্মীর ন্যায় রূপযৌবনে ত্রিভুবনবিখ্যাতা হয়। সেই ধর্ম্মাত্মা গন্ধর্ব্ব—সুকেশ রাক্ষসকে ধর্ম্মপরায়ণ এবং লব্ধবর দেখিয়া তাহাকে, রাক্ষসলক্ষ্মীর ন্যায়, আপন কন্যা দান করেন। নির্ধন ব্যক্তি ধন লাভ করিয়া যেরূপ সুখী হয়, দেববতী বরপ্রভাবে ঐশ্বর্য্য-

শালী প্রিয় পতি পাইয়া সেইরূপ সুখিনী হইল। রজনীচর তাহার সহিত সম্মিলিত হইয়া, হস্তিনীর সহিত অঞ্জন নামক দিগ্‌গজসম্ভূত মহাহস্তীর ন্যায় অতীব শোভান্বিত হইল। "হে রাঘব! রাক্ষসপতি সুকেশ দেববতীর গর্ভে বলশালী মাল্যবান, সুমালী এবং মালী নামক লোচনত্রয়তুল্য রাক্ষসত্রয় উৎপাদন করিলেন।

ইহাদ্বারা পাঠক বুঝিতে পারিবেন সুমালীরা কিরূপ সভ্য ছিল, তাহারা নিতান্ত অসভ্য ছিল না।— তাহারাও সভ্য ছিল।—তাহারাও সভ্যতার নিয়ম পালন করিতে জানিত—তাহারাও সত্য সরলতা ও তপস্যাসাধনের মর্য্যাদা বুঝিত ও তৎসাধনে সক্ষম ছিল ও ব্রহ্মার বর লাভ করে। এই হেতু বেশ বুঝা যায় যে সুমালী ও তৎসম্পর্কীয় জাতিরাও মন্দ সভ্য ছিল না।—

ইংরাজ পণ্ডিতেরা বলেন "The Somalis are more civilised; they live in small towns, and carry on the trade of the sea coast. Taken collectively (for these three nations though very different seem to be of one original stock), they constitute one of the most widely extended races of the African continent."

তাহাদের মূর্ত্তি একেবারে ভীষণ রাক্ষসের মত নহে, তাহাদের মুখে সভ্যতার সৌন্দর্য্যও আছে; ইউরোপীয় পণ্ডিতেরা তাহা বারম্বার স্বীকার করিয়াছেন।

সুমালীরা যে একেবারে অসভ্য নহে তাহার অন্যতম প্রমাণ,—আদি সুমালী রাবণের মাতামহ ছিল। রাবণ কিরূপ ভৌতিক উন্নতি করিয়াছিলেন!—মনে থাকে তিনি কুবেরের কনিষ্ঠ ভ্রাতা! কুবেরের উৎকৃষ্ট ব্যোমযান ছিল;—পুষ্পকরথ ছিল!—আর রামায়ণ পাঠে জানা যায়, রাবণ হেন বিষয় ছিল না যাহাতে উন্নতি না করিয়াছিলেন। সেই রাবণের মাতামহ আদি সুমালী ছিলেন!

শ্রীহিতেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

মাইকেল মধুসূদন দত্তের কতিপয় অপ্রকাশিত পত্র। *

প্রিয় রাজ নারায়ণ,

তোমার ঈপ্সিত পত্র পাইয়া আমি অতিশয় খুশী হইয়াছিলাম; এতকালাবধি আমি যে কোন উত্তর লিখি নাই তজ্জন্য তোমার নিকট আমার ক্ষমা ভিক্ষা করা উচিত। কিন্তু আমি পূর্ব্ব হইতেই তোমায় সাবধান করিয়া দিতেছি যে তুমি কখনও প্রত্যাশা করিও না আমি চিঠিপত্র লেখালেখি সম্বন্ধে কোনও বাঁধাবাঁধি নিয়মের বশবর্ত্তী হইয়া চলিতে পারিব। স্বভাবতই আমি একটী কুঁড়ের বাদশাহ, আবার তাহার উপর আমাকে অনেক কার্য্য করিতে হয়। আমার আফিসেরই কাজকর্ম্ম রহিয়াছে। সাধারণতঃ আমি ৪।৫ ঘণ্টা আইনে মনোনিবেশ করি; আমি সংস্কৃত, লাটিন ও গ্রীক পাঠ করি, এবং আমাকে কিছু কিছু লিখিতেও হয়। এই সবগুলি একজন মানুষকে প্রাতঃকাল হইতে উষাকাল অবধি নিযুক্ত রাখিতে যথেষ্ট বলিতে পারা যায়, ও আরও কত। যাই হউক, এই আমি তোমারই সহিত আলাপাদি করিতে বসিলাম—আমার ঠিক আধ ঘণ্টা অবসর আছে যাহা আমি আমার এমন আর একটী বন্ধুকে পত্র লেখার ন্যায় প্রীতিকর কার্য্যে নিযুক্ত করিতে পারি, যাঁহার মর্য্যাদার কি মূল্য তাহা অবশেষে উপলব্ধি করিতে পারিয়াছি। কিয়দ্দিবস হইল তোমাকে ঐ নূতন (Drama) নাটকের একখানি পুস্তক পাঠাইবার নিমিত্ত আমি আমার প্রকাশককে পত্র লিখিয়াছিলাম। ইহার সম্বন্ধে তোমার কি মত জানিবার নিমিত্ত আমি অত্যন্ত উৎসুক হইয়া আছি। আমি ইচ্ছা করি আমাদের কাব্য অমিত্রাক্ষর ছন্দে লিখিত হইবে—গদ্যে নয়;

---

* এই পত্রগুলি দত্ত মহাশয়ের স্বহস্তে ইংরাজীতে লিখিত ও স্বাক্ষরিত। আসলপত্রগুলি কোনরূপে আমাদের হস্তগত হইয়াছে। আমরা সকল পত্রগুলির বঙ্গানুবাদ ও আসল বাহির করিতে স্বীকৃত রহিলাম।

৺ মাইকেল মধুসূদন দত্ত।

কিন্তু এই নূতনত্বটী ক্রমে প্রচার করিতে হইবে। যদি আমি জীবিত থাকি ও আরও নাটক রচনা করি, তোমায় নিশ্চয় করিয়া বলিতেছি আমি আমার লেখনীকে সাহিত্যদর্পণের বিশ্বনাথ মহাশয়ের রচিত নিয়মাবলীর গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ করিতে চাহি না। আমি ইউরোপের প্রসিদ্ধ নাটককারদিগকে আদর্শ করিয়া লিখিব। তাহা হইলে একটী প্রকৃত জাতীয় রঙ্গালয় সৃষ্টি করা হইবে। কিন্তু তুমি পদ্মাবতী সম্বন্ধে কি বলিতে চাহ আমি শুনিতে ইচ্ছা করি; অবশ্য তোমায় বলা বাহুল্য মাত্র যে প্রথম পরিচ্ছেদে যে গল্পটী আছে তাহা (Golden Apple) স্বর্ণ আপেল ফল নামক গ্রীক উপাখ্যানটী দেশীয় ছাঁচে গঠিত করা হইয়াছে।

তিলোত্তমা মুদ্রিত হইয়াছে, কিন্তু ছাপাখানা হইতে এখনও বাহির হয় নাই। যত শীঘ্র হয় তুমি একখানি পুস্তক পাইবে। শুনিয়াছি তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার তুমি একজন লেখক; ঐ পত্রিকায় ইহার সমালোচনা করিতে পার ত ভাল হয়। তাহা হইলে ইহার নিশ্চয়ই মর্য্যাদা বাড়িবে। যদি এই গ্রন্থখানির সমালোচনা লেখ, তাহা হইলে—মিনতি করিয়া বলিতেছি,—আমি তোমার বন্ধু বলিয়া আমার বিরুদ্ধে তোমার যাহা বলিবার আছে চাপিয়া রাখিও না। আমার সকল দোষ নির্ভয়ে উন্মুক্ত করিবে; যত কক্কুর সাহিত্য-লাঙ্গুল নাড়িয়াছে তাহাদের মধ্যে আমি একটী অতি নিরীহ শান্ত শিষ্ট জীব।

তোমার গুণবতী পত্নী তিলোত্তমা পাঠে খুশী হইয়াছেন শুনিয়া আমি যার পর নাই গৌরবান্বিত মনে করিতেছি। মহিলাগণের মধ্যে তিনিই প্রথম ইহা পাঠ করিয়াছেন, এবং তাঁহার অভিনন্দনে আমি বিশেষ সম্মানিত মনে করিতেছি। আমি রঙ্গলালের নিকট তোমার পত্রের সেই অংশটুকু পাঠ করি নাই। রঙ্গলাল সর্ব্বদাই আমার কাছে থাকে, কেননা, আমরা বাল্যকাল হইতেই খিদিরপুরে আছি এবং সে আমার মাতাঠাকুরাণীকে (ঈশ্বর তাঁহার আত্মাকে শান্তি সুখে রাখুন) মা বলিয়া ডাকিত। তাহার মনটী অতিশয় কোমল, আমার দৃঢ় বিশ্বাস ছন্দ রচনা সম্বন্ধে তাহার মত এই যে আমার লেখা তাহার অপেক্ষা কিছু বেশী ভাল। তাহার সম্বন্ধে আমার এই বিশ্বাস যে তাহার কবিরভাব —কোন রকম খেয়াল, বা কল্পনা থাকিতে পারে, কিন্তু তাহার রচনাপ্রণালী অস্বাভাবিক রকমের, সুতরাং ঘৃণার্হ। তাহার উন্নতি

হইতে পারে। মনে হইতেছে তিলোত্তমা তাহার মনে কোনরূপ ভাবের উদ্রেক করিয়া থাকিবে, ইহার পরেই তিনি যে কবিতাটী লিখিয়াছেন তাহা পাঠ করিলেই বুঝিতে পারিবে।

প্রিয় সুহৃদ্! তোমার গার্হস্থ্য দুশ্চিন্তা সকল ক্রমে যে দূর হইয়া যাইতেছে তাহা বিশেষ প্রীতিজনক। আমি জগদীশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিতেছি তোমাদের মঙ্গল করুণ এবং তোমরা সুখী হও। তুমি তাঁহার কৃপার সম্পূর্ণ উপযুক্ত পাত্র, কেননা তোমার প্রকৃতি নিষ্ঠাবান ও তোমার হৃদয় সরল ও উৎসাপূর্ণ—এমন লোককে সংসারের লোকে নিজের জ্ঞানগরিমায় মূর্খ উপাধি দিয়া থাকে। তুমি নিশ্চয় জানিবে আমি তোমার সহিত সাক্ষাৎ লাভ করিতে এবং (আমরা কতদূর সভ্যতার পথে অগ্রসর হইতে পারিয়াছি তাহা সমগ্র পৃথিবীকে দেখাইবার জন্য) দুইটী সাহেবিয়ানা চালের নব্য যুবকের ন্যায় তোমার সহিত সুরাপানের মত্ততালাভে কত ব্যগ্র হইয়াছি!

আমি এখন মেঘনাদ লিখিতেছি, কিন্তু খামখেয়ালী ভাবে। আশা করি বৎসরের শেষকাল নাগাৎ উহাটী সম্পূর্ণ হইতে পারে। ইহার আরম্ভসূচক পংক্তিগুলি তোমার মনের মত হইয়াছে শুনিয়া খুশী হইলাম। প্রিয় সুহৃদ, আমি না বলিয়া থাকিতে পারিতেছি না যে, যদিও আমি একটী উৎসাহপূর্ণ খৃষ্টীয় যুবক ও হিন্দু ধর্ম্মে আমার কিঞ্চিন্মাত্রও বিশ্বাস নাই, তথাপি আমাদের পূর্ব্বপুরুষদিগের উচ্চভাবময় চমৎকার পৌরাণিক আখ্যানগুলি (Mythology) আমি ভালবাসি। ইহা কবিত্বপূর্ণ; কাহারও একটু উদ্ভাবনা-শক্তি থাকিলে ইহা অবলম্বনে কত সুন্দর সুন্দর বিষয় রচনা করিতে পারে। তিলোত্তমা পুস্তক তোমায় প্রেরিত হইলেই আমায় ইহার (ক) গল্প, (খ) নায়ক নায়িকার চরিত্র, (গ) ভাব এবং (ঘ) ভাষা সম্বন্ধে একটী ঠিক এরিষ্টোটলের ন্যায় পত্র লিখিতে নিশ্চয়ই ভুল না। তোমাকে ইহার এমন ভাবে প্রকাশ্য সমালোচনা করিতে হইবে যাহাতে আমাদের দেশীয় ভ্রাতৃগণ অপক্ষপাতিতা ও বিশেষ দক্ষতার সহিত সারগর্ভ মতামত দেওয়া বিষয়ে একটী দৃষ্টান্ত পাইতে পারেন। দেশীয় সাহিত্য জগতে এখনও কত নূতন দেশ অনাবিষ্কৃত আছে! ঈশ্বর ইচ্ছায় আমার হস্তে আরও কিছু সময় থাকে—কবিতা, নাটক, সমালোচনা, উপন্যাস প্রভৃতি কত বিষয় লিখিবার আছে—ইচ্ছা করিলে সমগ্র গ্রীক ও রোমানজাতিদের সুনাম

পশ্চাতে রাখিয়া অধিকতর যশোপার্জ্জনে সক্ষম হইতে পারা যায়! আমার ইচ্ছা তুমি পুস্তকাদি সমালোচনার চর্চ্চা কর—এরিষ্টোটল্, লঞ্জিনাস্, কুইন্টিলিয়ান্, সাহিত্য দর্পণ, বিন্‌ক্, কেম্‌স্, অ্যালিসন্, অ্যাডিসন্, ড্রাইডেন্, এবং আরও কত শত আছে, জারম্যান শ্লিগেল্ ও বৃদ্ধ ব্লেয়ারের বক্তৃতাও বাদ দিই নাই। যদি সংস্কৃত ভাষার উপর তোমার যথেষ্ট আয়ত্ত না থাকে তাহলে একটী পণ্ডিত নিযুক্ত করিয়া তোমার আদেশ মত তাঁহাদের দ্বারা কার্য্য করিয়া লও।

বালেশ্বরের সেই স্থূলকায় বৃদ্ধ ডেপুটীমাজিষ্ট্রেট্‌টী এখন কোথায়? অনেক কাল আমি তাঁহাকে পত্র লিখি নাই, সেই হেতুই তিনি আমার প্রতি একটু চটিয়াছেন। অনুগ্রহ করিয়া আমার ভালবাসা তাঁহাকে দিও। তাহা হইলে আমি আশা করি তাঁহার বিরক্তির ভাবটা কিছু অপনীত হইবে, যেমন কথিত আছে একটী টব বা বাল্‌তী একটী বৃহদাকার তিমিকে শান্ত করিতে পারে।

কখন্ তুমি কলিকাতায় আসিবে? তোমার শিক্ষাবিভাগের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টকে অনুরোধ করিয়া তিলোত্তমা তোমার স্কুলের উচ্চশ্রেণীতে পাঠ্যপুস্তকরূপে চালাইতে পার কি? আবার তুমি নিজেই শিক্ষক! পুস্তকটী নিশ্চয়ই একটী গভীর ভাব উদ্রেক করিতে পারিবে।

বন্ধুবর, কএক মাস গত হইল আমার স্ত্রীর কোন ইংলণ্ডবাসী আত্মীয়ের মৃত্যু উপলক্ষে আমার এখনও শোক চিহ্ন ধারণ করিতে হইতেছে। আমি দুঃখের সহিত বলিতেছি তোমাকে কোন সংবাদ দিতে পারিলাম না। আমি এত কাল নির্জ্জনাবাসে ছিলাম—বিখ্যাত পরলোকগতদিগের গ্রন্থাদির মধ্যে ডুবিয়া তাঁহাদিগের সহিতই বাক্যালাপে নিযুক্ত ছিলাম এবং এই দৃশ্যমান জীবিত জগতের প্রতি কিছুমাত্র লক্ষ্য রাখি নাই। আধুনিক সংবাদপত্র সমূহের অধিকাংশই—কি দেশীয়, কি ইংরাজী, আমি ঘৃণার চক্ষে দেখি। তাহাতে যাহা লেখা থাকে তাহা নিশ্চয়ই অপাঠ্য।

প্রিয় সুহৃদ, এক্ষণে বিদায় হই। আমাকে সর্ব্বদা লিখিও, কিন্তু আমার নিকট হইতে শীঘ্র শীঘ্র প্রত্যুত্তরের প্রত্যাশা রাখিও না। গৌর আমাকে না পারিয়া আমার আশা ত্যাগ করিয়াছে।

আমার হৃদয়ের সুবিমল প্রীতি লইবে।

আন্তরিক স্নেহের

মাইকেল মধুসূদন দত্ত

১৫ই মে ১৮৬০।

বাবু রাজ নারায়ণ বসু।

পুঃ—তোমার গুণবতী পত্নী দেখছি তিলোত্তমার মহিলা পাঠিকাদিগের মধ্যে প্রথম নন্। গ্রন্থকারের স্ত্রী বলিতেছেন তিনিই ইহা প্রথম পাঠ করিয়াছিলেন।

ম, দ।

আমের লক্ষ্ণৌ মোরব্বা।

(খাদ্যপাক।)

উপকরণ।—বেশ বড় বড় ভাল জাতের আঠারটী কাঁচা আম (ল্যাঙড়া বা বোম্বাই আম হলে ভাল হয়), চিনি আট সের, আম বিদ্ধ করিবার জন্য দুইটা ছুঁচ আবশ্যক।

প্রণালী।—আমগুলা বেশ করিয়া ছাড়াও, যাহাতে খোশায় সবুজ রং একটুও না থাকে। তারপর সমস্ত শাঁসগুলি মোটা রকম চাকা চাকা করিয়া কাট এবং সেইগুলিকে ছুঁচের দ্বারা বেশ করে এপিঠ ওপিঠ বিদ্ধ কর। এক্ষণে ঐ আমের চাকাগুলিকে একটী কলাই-করা তামার হাঁড়ি বা ডেকচির মধ্যে রাখ এবং তাহা জলে ভরিয়া দাও; অর্থাৎ এতখানি জল দিতে হবে যাতে আম্রখণ্ডগুলি জলে ডুবে থাকে। এইবার সিদ্ধ কর। যখন বেশ সিদ্ধ হইয়া যাবে, অথচ এমন হবে না যে গলিয়া যাবে, তখন এই আমের চাকাগুলি হইতে গরম জল ফেলিয়া দিয়া ঠাণ্ডা জলে দুই তিনবার ধুইয়া লও। তারপর একটা কম্বলের উপর চাদর বিছাইয়া তাহাতে সেই চাকাগুলি মুছে মুছে বিছাইয়া দাও। এক ঘণ্টা পরে যখন দেখিবে জল সব ঝরিয়া গেছে ও সিদ্ধ চাকাগুলি শুকাইয়া আসিয়াছে তখন সেইগুলিকে ওজন কর। আম ওজনে যাহা হইবে তার দ্বিগুণ পরিমাণ চিনি লইতে হইবে। আমরা যা আম লইলাম তাহা কমবেশী ওজনে চারসের হইতে পারে। ঐ আটসের চিনি হইতে চারসের চিনি লইয়া

খানিকটা জল দিয়া আগুনের উপর পাক কর। চিনির গাদ উঠিলেই তাহা ফেলিয়া দাও। পরে এক ছটাকটাক দুধ ঢেলে দাও, তাহা হলে ময়লা খুব পরিষ্কার হয়ে কেটে যাবে। রস বেশ ঘন ঘন হইলে আমগুলি একটা কাঁচের বা কলাই-করা গামলা বা উপযুক্ত পাত্রে বিছাইয়া গরম গরম রস ঢালিয়া দাও। ঠাণ্ডা হইলে বোতলের মধ্যে আমগুলি রাখিয়া রস ঢাল। ইহারর পর ফের এক হপ্তা বাদ বাকী চারসের চিনি লইয়া ঐরূপে রস প্রস্তুত করিয়া ঠাণ্ডা হইলে বোতলের মধ্যে ঢালিয়া দাও। এই রসে গাদ কাটিবার জন্য দুধের পরিবর্ত্তে সাত আট ফোঁটা নেবুর রস দিয়াও করা যায়।

এই মোরব্বা খাইতে খুব সুস্বাদু। ইহা দুই তিন বৎসর রাখিলে কিছুমাত্র খারাপ হয় না।

শ্রীসুদক্ষিণা দেবী।

লক্ষ্ণৌ পোলাও।

(খাদ্যপাক।)

উপকরণ।—পাঁটার বা ভেঁড়ার টাটকা মাংস তিন পোয়া, পেঁয়াজের রস আধপোয়াটাক, আদাবাটা এক তোলা, রসাল কাগজি নেবু দুইটা, ঘি এক পোয়া, ভাজিবার জন্য পেঁয়াজ এক পোয়া, নুন তিন তোলাটাক্, ব্রথের জন্য হাড় আধসের, দই এক পোয়া, পেঁয়াজ আস্ত দুইটী, লঙ্গ চব্বিশ পঁচিশটী, বড় এলাচ পাঁচ ছয়টী, দুধ আধসের, চাল পাঁচ ছটাক।

প্রণালী।—প্রথমে মাংস আনিয়া উহার সাদা ছাল ফেলিয়া ধুইয়া ফেল। খণ্ড খণ্ড করিয়া কাট। উহাতে পেঁয়াজের রস আধপোয়া, আদাবাটা এক তোলা, এক তোলা আন্দাজ নুন, ও দুইটা নেবুর রস মাখিয়া রাখ।

দু সের জলে আধসের হাড় কুচা কুচা করিয়া উহাতে দুটী আস্ত পেঁয়াজ ও এক গিরা আদা দিয়া দু সের জলে চড়াইয়া দাও। জল মরিয়া আধসেরটাক্ থাকিলে নামাইয়া ছাঁকিয়া ব্রথটা একটী পাত্রে রাখ।

একপোয়া ঘিয়ে কুচা করা পেঁয়াজগুলি ভাজ। নাড়িতে থাক। ছয় সাত মিনিটের মধ্যেই এই লালচে রং হইলে পেঁয়াজগুলি ঘি হইতে উঠাইয়া রাখ। এখন ঐ পেঁয়াজ-ভাজা ঘিয়ে আদাবাটা ও নেবুর রস প্রভৃতি মাখা

মাংসখণ্ডগুলা ছাড়। দই দাও কিছু জল দাও। শক্ত পাকা মাংস হইলে মাংস সিদ্ধ করিতে প্রায় তিন পোয়াটাক্ জল লাগিবে। সময়ও তিন কোয়ার্টার লাগিবে। টাটকা কচি মাংস হইলে অল্প প্রায় পোয়াটাক্ জল লাগিবে এবং খুব অল্প সময়ের মধ্যেই সিদ্ধ হইয়া যাইবে। হাঁড়ি ঢাকা দিয়া রাখিবে কেবল মধ্যে মধ্যে নাড়িয়া দিবে। হাতা দ্বারা টিপিয়া যখন মাংস বেশ সিদ্ধ হইয়া গিয়াছে দেখিবে তখন নামাইয়া রাখিবে।

এক্ষণে আধসেরটাক্ ঘ্রথে চাল ছাড়িয়া চড়াইয়া দাও। মিনিট দশের মধ্যে আধ সিদ্ধ হইয়া গেলে নামাও।

এবারে মাংস, ভাত, দুধ, দশ পনেরটী লঙ্গ ও ভাজা পেঁয়াজ, তিনটী বড় এলাচের গুঁড়া ও দুটী বড় এলাচের আস্ত দানা ও সিকি তোলা নুন দিয়া সব এক সঙ্গে চড়াইয়া দাও। নরম আঁচে চড়াও। মিনিট পনেরর মধ্যে জল মরিয়া গেলেই নামাও। এই সময়ে সমস্তক্ষণ নাড়িতে হইবে তাহা না হইলে ধরিয়া যাইতে পারে। পেঁয়াজ ভাজাটা সব শেষে পোলাওয়ের উপর ছড়াইয়া দিলেও বেশ হয়।

ভোজনবিধি।—কণ্ট্রি ক্যাণ্টেন বা অন্য কোন কারি বা কালিয়া দিয়া খাও।

সাংখ্যস্বরলিপি।

বাহার—ঝাপতাল।

অচল ঘন গহন গুণ গাও তাঁহারি।
গাও আনন্দে সবে রবি চন্দ্র তারা।
সকল তরু রাজি, সাজি ফুল ফলে গাওরে
বিহঙ্গকুল গাও আজি মধুরতর তানে।
গাও জীবজন্তু আজি যে আছ যেখানে,
জগত পুরবাসী সবে গাও অনুরাগে।
মম হৃদয় গাও আজি মিলিয়ে সব সাথে,
ডাক নাথ, ডাক নাথ বলি প্রাণ আমারি॥

তালি। ১ । ২ (স্থ, স্ত) ভো। ৩ । ০ ॥
মাত্রা। ৩ । ২ । ৩ । ২ ॥

(স্থা)— রে পা । মা ধা পা । মা গাঃ মাঃ । রে সা সা । সা
(স্থা)— অ চ । ল ঘ ন । গ হ —। ন গু ণ । গা

রে । রে+রে নি । সা গা । মা+পা+পা । গা মা । মা পা পা
২
—। ও — তাঁ । হা — । রি — — । গা —। ও — আ

পা+পা । পা ধা পা । মা গা । রে+রে সা । সা+সা । রেঃ গাঃ
ন —। ন্দে স বে । র বি । চ — ন্দ্র । তা — । রা —

মাঃ পাঃ + পা ।
— — — ।

(স্ত)— গা গা । গা গা মা । মা পা পা । পাঃ মাঃ পা । ধা+ধাঃ
(স্ত)— স ক । ল ত রু । রা — জি । সা — জি । ফু —

নিঁঃ । ধা পা পা । মাঃ পাঃ ধা । পা মাঃ গাঃ মা । পা নি । নি নি
— । ল ফ লে । গা — —। ও রে — বি । হ —। ঙ্গ কু

নি । নি সা । ধা পা পা । মা ধা । মা গা মা । রে পাঃ মাঃ । পা + পা
২
ল । গা —। ও আ জি । ম ধু । র ত র । তা — —। নে —

মাঃ গাঃ । (ভো):— সা + সা । পা সা সা । সা + সা । সা
— — । (ভো):— গা — । ও জী ব । জ — । ন্ত

সা সা । সা রে । রে+রে নি । সা গাঃ রেঃ । গা+গা+গা । গা গা ।
আ জি । যে আ । ছ — যে । থা — — । নে — — । জ গ ।

গা গা মা । মা পা । পা পা পা । মা ধা । পা মা মা । মা
ত পু র । বা — । সী স বে । গা — । ও অ নু । রা

পাঃ মাঃ । পা + পা + পা । গা গা । গা গা মা । মা পা ।
— — । গে — — । ম ম । হৃ দ য় । গা — ।

পা পা পা । মা মা । ধা পা মা । মা পাঃ মাঃ । পা গা মা । পা নি । নি
ও আ জি । মি লি । স্নে স ব । সা — — । খে ডা ক । না — । থ

নি নি । নি র্সা । ধা পা পা । মা ধা । মা গা রে । রে পাঃ মাঃ । পা
ডা ক । না — । থ ব লি । প্র — । ণ — আ । মা — — । রি

+পা মাঃ গাঃ ॥ (স্থা-পু):— মাঃ
— — — ॥ (স্থা-পু):— আ

শ্রীসুষমা দেবী।

সুমালি।

[illegible]

ওঁ

পুন্যঃ প্রাণান ধারয়তি পুন্যঃ প্রাণদমুচ্যতে

দেবনামে অনাদর।

আমরা খাইতে শুইতে উঠিতে বসিতে ভগবানের নাম দেবতার নাম করিতে উপদেশ দানে পটু, কিন্তু দেবতার নামে ভগবানের নামে আমাদিগের বড় একটা আন্তরিক ভক্তিশ্রদ্ধা দেখিতে পাই না। ইংরাজীতে প্রবাদ আছে "Familiarity breeds contempt" অর্থাৎ 'অতিপরিচয় অবজ্ঞা উৎপাদন করে', সেই কারণে আমাদিগেরও বোধ হয় দেবতার প্রতি আন্তরিক শ্রদ্ধা ভক্তি অতি সামান্য পরিমাণে লক্ষিত হয়। কথায় কথায় গীতা হইতে শ্লোক আবৃত্তি পূর্ব্বক আমরা ধর্ম্মপ্রাণের বাহ্যিক মুখোষ পরিয়া লোকমুগ্ধ করিতে পারি, কিন্তু অন্তরে অন্তরে পেটে পেটে আমরা যে দেবতাকে বেশ অবজ্ঞা বা অনাদর চক্ষে দেখি তাহার যথেষ্ট প্রমাণ আছে। আমাদিগের মাতৃভাষা হইতে আমরা তাহার উদাহরণ দেখাইতে প্রস্তুত। দেবতার প্রতি, ভগবানের প্রতি যদি যথার্থই শ্রদ্ধা ভক্তি থাকিবে ত ভগবানের নাম লইয়া দেবতার নাম লইয়া অশ্লীলতা, যথেচ্ছাচারিতা, এবং ঘৃণা, অবজ্ঞা ও উপহাসচ্ছলে দেবতার নাম প্রয়োগ আমাদিগের মাতৃভাষা বঙ্গভাষায় এ সকল প্রচুর পরিমাণে স্থান পায় কেন? অথবা এই নৈয়ায়িক ও তার্কিকের দেশে বুঝি সকলি সম্ভবে। দেবতা ও ভগবানকেও ন্যায়ের ফাঁকির মধ্যে আনিয়া অভক্তি ও অশ্রদ্ধা প্রদর্শন করা কুটীল নৈয়ায়িক বা তার্কিকগণের অনেক সময়ে গৌরবের বিষয় হইতে দেখা যায়।

প্রথমেই 'দেব' শব্দকে সম্মুখে করিয়া আমাদিগের আলোচ্যপথে অগ্রসর হওয়া যাক। যে 'দেব' শব্দ বৈদিক ঋষিদিগের ধ্যানের ও জ্ঞানের এবং তপোলব্ধ সামগ্রী ছিল, যে 'দেব' শব্দের মাহাত্ম্যে সেই ঋষিযুগে সমগ্র জগৎ দ্যুতিমান হইয়া উঠিয়াছিল, বঙ্গভাষায় সেই 'দেব' শব্দের দুর্দ্দশা দেখিয়া কে না ধিক্কার দিবে। এই মহিমান্বিত গুরুগম্ভীর বৈদিক 'দেব' শব্দকে লইয়া যথেচ্ছরূপে পূতিগন্ধময় স্থানে প্রয়োগ করিতে বাঙ্গালী আমরা কিছুমাত্র কুণ্ঠিত নহি। আমরা কখনো উপহাসচ্ছলে কখনো অবজ্ঞার ভাবে নানা বিকৃতরূপে 'দেব' শব্দের অপব্যবহার করিয়া তৃপ্তি লাভ করি। 'অসুর' 'দৈত্য' 'দানব' প্রভৃতি 'দেব'-বিরোধী শব্দগুলিকে বরঞ্চ কতকটা ভয়ের ভাবে সম্মান দিয়া থাকি, যেমন আমরা বলি 'ও লোকটা ভীষণ অসুর' 'উহার শরীরে আসুরিক বল' কিন্তু পবিত্র দেব নামকে নিঃসঙ্কোচে নির্ভয়ে ইচ্ছামত অনাদর ও অবজ্ঞার স্থলে ব্যবহৃত করিয়া বঙ্গভাষায় আমরা বিকারসুখ উপভোগ করিতে কিছুমাত্র পশ্চাৎপদ নহি। যখন কোন ব্যক্তির উপরে ঘৃণা ও নিন্দাবাণ বর্ষণ পূর্ব্বক বলিয়া উঠি "যেমন দেবা তেমনি দেবী" তখন স্বর্গধামে দেবহৃদয়েও বুঝি উহা আঘাত না করিয়া যায় না। 'দেব' শব্দ যথার্থই যদি পূজার আস্পদ হয় তবে বঙ্গভাষায় সে শব্দের এরূপ অবমাননা কেন? আবার দেখুন "দিব্যিগালায়" এই দেব শব্দের অঙ্গীভূত 'দিব্য' শব্দের কি কদর্য্য ব্যবহার! কোথায় ঋষিদিগের 'দিব্য' শব্দের দীপ্ত মহিমা, আর কোথায় বঙ্গের ঘৃণিত "দিব্যিগালা"। বৈদিক ঋষি পঞ্চমস্বরে বলিয়াছিলেন "হে দিব্য ধামবাসী অমৃতের পুত্রসকল! তোমরা শ্রবণ কর; আমি তিমিরাতীত জ্যোতির্ম্ময় মহান পুরুষকে জানিয়াছি—

"শৃণ্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রাঃ
আযে ধামানি দিব্যানি তস্থুঃ।"

সে সুগম্ভীর উচ্চকণ্ঠে 'দিব্য' শব্দের কি মহত্ত্ব, আর এই ঘৃণিত শপথকালে 'দিব্য' শব্দের প্রয়োগে কি নীচতা, তাহা পাঠক একবার অনুধাবন করিয়া দেখুন। বেদে বাক্যকে 'দিব্য' বিশেষণে বিশিষ্ট করা হইয়াছে, যথা—

'দিব্যা বাক্'

ইহার মধ্যে কি দীপ্তি কি সৌন্দর্য্য, আর আমাদের 'দিব্যিগালা'য় কি কদর্য্য

অঘন্যতা! অবশ্য 'দিব্যজ্যোতি', 'দিব্যজ্ঞান', 'দেবভাব' এইরূপ গুরুগম্ভীর শব্দেরও বঙ্গভাষায় অভাব নাই, কিন্তু এ সকল শব্দ উপনিষদাদির ছায়ায় উৎপন্ন। এ সকল সুশিক্ষিতদিগের লিখিত ভাষায় স্থান পায়, কিন্তু কি ইতর কি ভদ্র সকলশ্রেণীর মধ্যে এরূপ অল্প লোকই আছেন যাঁহারা 'দিব্যিগালনের' মধুর সম্ভাষণ হইতে একেবারে মুক্ত। মাতা পিতা ও গুরু শাস্ত্রে দেবসম্মানে সম্মানিত; যথা, তৈত্তিরীয় আরণ্যকে—

'মাতৃদেবো ভব'
'পিতৃদেবো ভব'
'আচার্য্য দেবো ভব'

এই পবিত্র 'মাতৃ' শব্দ হইতে বঙ্গভাষায় কি কুৎসিৎ 'মাতৃদিব্যি' অর্থাৎ 'মাইরি' 'বল্ মাইরি' কথার সৃষ্টি হইয়াছে। যেমন আজকাল দশ পনের বৎসরের বালক এবং যুবকগণের মুখে চুরট ও সিগারেটের ছড়াছড়ি, সেইরূপ এই কুৎসিৎ 'মাইরি' দিব্যিগালনও বিদ্যালয়ের বালকগণের মুখে মুখে বিরাজমান। বঙ্গের এই 'দিব্যি'র হস্ত হইতে কেহই সহজে নিষ্কৃতি পায় নাই। ইতর শ্রেণীর লোকদিগের ত কথাই নাই, এমন কি অনেক ভদ্রগৃহস্থ পরিবারের মধ্যেও দিব্যিগালন দেখিয়াছি সহজ কথার ন্যায় প্রচলিত! মাতা, পিতা, আচার্য্য, পুস্তক, গঙ্গাজল প্রভৃতি যাহা কিছু মর্ত্ত্যভূমিতে পবিত্র বস্তু আছে বঙ্গের দিব্যিগালনের কলুষহস্ত তাহাকেই স্পর্শ না করিয়া যায় নাই; এমন কি স্বয়ং ভগবানও বাদ যান নাই। 'মায়ের গা ছুঁয়ে দিব্যি' 'ছেলের মাথার দিব্যি' 'বই ছুঁয়ে দিব্যি' 'গঙ্গাজল ছুঁয়ে দিব্যি' 'গুরুর দিব্যি' ত আছেই; এতদ্ব্যতীত কোন কোন পরিবারে 'ঈশ্বরে দিব্যি' বলিতেও শুনিয়াছি।

এইবারে আমরা দেখাইব বিশেষ বিশেষ দেবতার নাম লইয়া বঙ্গভাষায় কিরূপ অনাদর অভক্তি ভাবের ছড়াছড়ি হইয়াছে। কতস্থলে ব্যঙ্গবিদ্রূপচ্ছলে, কতস্থলে ঘৃণা উপেক্ষা ও উপহাসের সহিত, কতভাবে এবং কতরূপে যে বঙ্গভাষায় নানা দেবতার নাম কলুষিত হয় তাহার ইয়ত্তা নাই। সর্ব্বাগ্রে 'রাম' নাম লইয়া আমাদিগের কথার যাথার্থ্য প্রতিপাদনে প্রবৃত্ত হই। শ্রীরাম চন্দ্র হিন্দুর শ্রেষ্ঠ অবতার।—সাক্ষাৎ ব্রহ্মরূপে হিন্দুরা ইঁহাকে দেখিয়া

থাকেন। ভারতের সর্ব্বত্র ইনি দেবতারূপে পূজ্য। অনেকে রামের প্রতি অতিভক্তি প্রদর্শনের জন্য এমন কি পুস্তকের পৃষ্ঠা গণনাসূত্রে অথবা যে কোন সূত্রে হউক ১ উচ্চারণ করিবার কালে এক না বলিয়া রাম নাম লয়েন—১, ২, ৩ না বলিয়া 'রাম দুই তিন' বলিয়া থাকেন; অর্থাৎ ইহাতে 'রাম' নাম এক বা একমেবাদ্বিতীয়ং এর স্থান অধিকার করিতেছে ইহাই সূচিত হয়। কিন্তু এই অতিভক্তির ফলে বঙ্গভাষায় রাম নামের মাহাত্ম্য নষ্ট হইয়াছে বৈ বর্দ্ধিত হয় নাই। কোন ঘৃণিত দ্রব্য ইন্দ্রিয়গোচর হইলেই হিন্দু স্বভাবতই "রাম রাম" উচ্চারণ করেন। কিন্তু ক্রমাগত কলুষিত পদার্থের সংস্পর্শে এমন পবিত্র শব্দ "রাম" নামও কলুষিত না হইয়া যাইতে পারে না। প্রথমে যদিও ঘৃণা জয়ের জন্য দেবনাম স্মরণ হইতে ইহার সূত্রপাত, তথাপি ইহা আজ কাল পূর্ব্বভাব হইতে ভ্রষ্ট হইয়া নিজেই যেন ঘৃণাবাচক হইয়া দাঁড়াইয়াছে। 'রাম' নাম যে ঘৃণা, অবজ্ঞা, উপেক্ষা ও উপহাস ব্যঞ্জক শব্দরূপে অধিকস্থলে ব্যবহৃত হয়, নানা উদাহরণ দ্বারা আমরা তাহা প্রমাণ করিব। যাহা হিন্দুর বিরাগভাজন—অখাদ্য, অশ্রাব্য বা অদর্শনীয় তাহাই বঙ্গে 'রাম' শব্দবাচ্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে। তাই হিন্দুর অখাদ্য পক্ষী 'রামপাখী' নামে অভিহিত হয়। গরু হিন্দুর পূজ্য—অবধ্য, ছাগ হিন্দুর বধ্য—অশ্রদ্ধার পাত্র। ছাগের প্রতি অবজ্ঞা বা ঘৃণা প্রদর্শনের জন্য আমরা বলি "রামছাগল"। অবশ্য আপনারা বলিবেন, এস্থলে 'রাম' শব্দ বৃহদ্বাচক। কিন্তু দেখুন গরুও ত ছাগলের ন্যায় দুই জাতীয় আছে; এক রামছাগলের ন্যায় বৃহৎ জাতীয় পাহাড়ী গরু, আর এক নিম্নভূমির ক্ষুদ্রকায় গরু। কিন্তু পাহাড়ী গরুকে আমরা কৈ ত 'রাম গরু' বলি না, কিন্তু অন্য নামে যেমন 'নাগরা গরু' ইত্যাদি নামে বলিয়া থাকি। 'রামছাগলে' রাম শব্দ কতকটা বৃহদ্ব্যঞ্জক হইলেও উহা যে অবজ্ঞা বা ঘৃণার ভাবে প্রযুক্ত হইয়াছে সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। কেননা ছাগল হিন্দুর চক্ষে হেয় জীব—অশ্রদ্ধার পাত্র। সচরাচর বঙ্গবাসী হিন্দুদিগের বিশ্বাস 'ছাগল গৃহের অমঙ্গলপ্রার্থী'—'ছাগল চায় গৃহে মানুষ না থাকে, খট্‌খটে ডাঙ্গায় সে একলা বিচরণ করে'। আর গাভী লোক চায়, সেবা চায়—উহা লক্ষ্মী-স্বরূপা। আরো অন্যান্য উদাহরণ আমাদের কথার স্বপক্ষে সাক্ষ্য দিতেছে। বর্দ্ধমান বীরভূম অঞ্চলে গ্রামবাসী হিন্দুরা ঢেঁড়স্ খায় না; উহা মুসলমানের

খাদ্য, এই কারণে হেয় পদার্থ বলিয়া গণ্য। ঢেঁড়সকে হিন্দুরা হেয় চক্ষে দেখে বলিয়া উহার নাম দিয়াছে "রাম ঝিঙ্গা" অর্থাৎ ঝিঙ্গা জাতীয় শবজীর মধ্যে উহা ঘৃণ্য বা অখাদ্য। এই যে নীরস চিমটি ইহা যে কিরূপ অপ্রিয় তাহা আর কাহাকেও বলিতে হইবে না। এমন যে অপ্রিয় চিমটি তাহাকে 'রাম' নামের সহিত সংশ্লিষ্ট করিয়া ব্যঙ্গচ্ছলে বলা হয়—'রাম চিমটি'; যথা, 'এসো এক রাম চিমটি দিই' অর্থাৎ এক স্থূল চিমটি দিই। এস্থলে রাম শব্দ বৃহদ্ব্যঞ্জক হইলেও এইরূপ অবজ্ঞা ও উপহাস সহকারে হেয় পদার্থের প্রতি প্রযুক্ত হওয়ায় উহার নীচার্থ ব্যক্ত হইয়া পড়িয়াছে—'রাম' নাম কলুষিত হইয়াছে বলিতে হইবে। কোন ভাল বিষয় বা ভাল বস্তু সূচিত করিবার জন্য বঙ্গভাষায় রাম নামের ব্যবহার সচরাচর প্রায় দেখা যায় না। যে কদলী প্রদর্শনে সকলকে অবজ্ঞা করা যায়, যে কদলী বনুবংশীয়দিগের প্রিয় খাদ্য বলিয়া সাধারণের এক উপহাস ও অবজ্ঞার চিহ্ন হইয়া পড়িয়াছে, সেই হেয় বস্তু রম্ভার বৃহত্ত্ব প্রদর্শন কালে অমনি 'রাম' নাম যুক্ত করিয়া "রাম রম্ভা" বলা হইয়া থাকে। আরেকটী উদাহরণ দেখাই, সংস্কৃতে রামধনুকে ইন্দ্রধনু বা ইন্দ্রায়ুধ বলে। আমরা বাঙ্গলায় রামধনু বলি। কেন? কেবল বৃহৎ ধনুকাকৃতি বলিয়াই যে আমরা বৃহত্ত্ব জ্ঞাপনের জন্য রামধনু বলি তাহা নয়, উহা অদর্শনীয় পদার্থ বলিয়া অবজ্ঞার ভাবে উহা বাঙ্গলায় 'রামধনু' নামে অভিহিত হয়। মনুতে আছে—

"ন দিবীন্দ্রায়ুধং দৃষ্ট্বা কস্যচিদ্দর্শয়েদ্বুধঃ"

"আকাশে ইন্দ্রধনু দেখিয়া পণ্ডিত ব্যক্তি কাহাকেও দেখাইবেন না।" শাস্ত্রে ইহা অদর্শনীয় হেয় পদার্থরূপে গণ্য হইয়াছে বলিয়া বাঙ্গলায় ইন্দ্রধনুর পরিবর্ত্তে 'রামধনু' শব্দ প্রচলিত হইয়াছে। যেখানে হেয় ভাব, অবজ্ঞার ভাব সেইখানেই বঙ্গভাষা রাম শব্দ অগ্রে করিয়া চলিয়াছেন। যেমন অতি ক্ষুদ্রকায় ব্যক্তিকে উপহাসচ্ছলে অবজ্ঞা সহকারে বলা হয় "ক্ষুদে রাম", "বেঁটে রাম", "কুটকুটে রাম", "পুঁচকে রাম", "নেংটী রাম", "হাঁদা রাম", "বোকা রাম", "হাবা রাম", "গবা রাম", "ভোঁদা রাম", "পক্ষী রাম" (খুব রুগ্ন লোককে ঘৃণাসহকারে বলা হয়), "আত্মা রাম" (এস্থলে অবজ্ঞা বা উপহাস-চ্ছলে বলা হয়, যথা, "আত্মারাম শুকাইয়া গেল") ইত্যাদি। আবার কোন

ব্যক্তির অদ্ভুতরূপ দেখিলে অনেকে উপহাসচ্ছলে বলেন "বাঞ্ছারাম আর কি" "পেরুরাম আর কি"। হিন্দুস্থানে কিন্তু রাম নামের সদা সর্ব্বদা ব্যবহার থাকিলেও উহাদিগের মধ্যে রাম নামের প্রতি শ্রদ্ধা আদর কিছুমাত্র হ্রাস হয় নাই—উহার মাহাত্ম্য এখনও প্রবল। বন্ধুতে বন্ধুতে সাক্ষাৎ হইলে উহারা মধুর সম্ভাষণে যখন "রাম রাম" বলে তখন তাহা বড়ই মিষ্ট লাগে। আবার পশ্চিমবাসীদিগের "জয় সীতারাম" ইত্যাদি বাক্য রামের মহত্ত্ব প্রাণে জাগ্রত না করিয়া যায় না। রাম নাম ত দূরে থাক্ রামানুচর হনুমান দেবের নামটীও এমন কি হিন্দুস্থানীদিগের বড়ই প্রিয়। যে নামে সম্বোধন করিলে বাঙ্গালী হয়ত গালাগালি বুঝিয়া চটিয়া লাল হইবেন পশ্চিমবাসীরা সেই হনুনাম নাম অতি আদরে নিজ পুত্রের নাম রাখিতে উদ্যত।

এইবারে আরেকটী দেবতার নাম বলিব যাঁহার নাম-সৌন্দর্য্য কলুষিত হইয়া বাঙ্গলায় এক অতি জঘন্যরূপে পরিণত হইয়াছে। এই নাম সাক্ষাৎ লক্ষ্মীদেবীর নাম 'শ্রী'। অবশ্য এই শ্রী শব্দের সুশ্রী যে বঙ্গভাষায় একেবারে লুপ্ত হইয়াছে তাহা বলিতেছি না। শ্রী বঙ্গভাষায় রূপবতী হইয়া আছেন সত্য, কিন্তু সংসর্গদোষে উহার রূপমাধুরী চলিয়া গিয়া কোন কোন স্থলে অতি জঘন্য কুরূপে পরিণত হইয়াছে দেখা যায়। তাহার উদাহরণ 'ছিঃ' শব্দ। এই 'ছিঃ' শব্দ যাহা ঘৃণাব্যঞ্জক তাহা শ্রী শব্দেরই বিকৃত রূপ। এই 'শ্রী', শব্দের যে এই 'ছিঃ' রূপ দুর্দ্দশা তাহা সহসা মনে আনিতেও ঘৃণা হয়। 'শ্রী'তে 'ছি'তে একেবারে বিপরীত ভাব। কোথায় সৌন্দর্য্যের আধার শ্রী আর কোথায় মলিনতা ও বিকৃতির আধার 'ছি'। অতি ঘৃণিত দ্রব্য দেখিলে বা শুনিলে বা আঘ্রাণ করিলে আমরা 'ছিঃ ছিঃ' শব্দে কর্ণে অঙ্গুলী প্রদান করি, চক্ষু মুদ্রিত করি অথবা নাসিকাগ্রে অঙ্গুলী দিয়া নিশ্বাস রোধ করি। এই শ্রী শব্দকে আবার একটু সহজ করিয়া আমরা "ছিরি" করিয়া লইয়াছি। এই "ছিরি"ও সচরাচর ঘৃণা ও ব্যঙ্গ মিশ্রিত উপহাসচ্ছলে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। যথা "কি ছিরি আর কি" "চমৎকার ছিরি" ইত্যাদি। এই 'ছিঃ' শব্দ হইতে ঘৃণাব্যঞ্জক 'ছ্যা' ছোঃ' প্রভৃতি শব্দগুলিও প্রসূত হইয়াছে।

শুদ্ধ শ্রী বা লক্ষ্মী দেবী কেন, হিন্দুর অধিকাংশ দেব দেবীই বঙ্গভাষায় শ্রীহারা হইবার উপক্রম হইয়াছে। কোন কুবিষয় ইন্দ্রিয়গোচর হইলে অনেকে

বলিয়া উঠেন 'দুর্গাদুর্গা' 'শিবশিব' অথবা 'হরেকৃষ্ণ' 'রাধাকৃষ্ণ' ইত্যাদি। এই দেবনামগুলির যদিও এক্ষণে সম্পূর্ণ কদর্য্য অর্থ দাঁড়ায় নাই তথাপি মনে হয়, যে, আর অল্পকাল মধ্যে এই শব্দগুলি দেববাচক না হইয়া কদর্য্য অর্থ জ্ঞাপক হইবে,—হয় ঘৃণা বা অবজ্ঞাসূচক, না হয় তুচ্ছ বিষয়জ্ঞাপক হইবে। অবশ্য এ দেবনামগুলি ঘৃণা জয় করিবার জন্য, কুভাব মন হইতে অপসারিত করিবার জন্যই উচ্চারিত হয়; কিন্তু এত বাড়াবাড়িরূপে অতিমাত্রায় প্রচলিত হইতে চলিয়াছে যে ইহার বিশুদ্ধ ভাব দেব-অর্থ আর বেশী দিন বুঝি টিঁকে না।

অনেকগুলি দেবনাম, দেখা যায়, দেবতাদিগের হেয় প্রকৃতির গুণে বঙ্গভাষায় হেয় বা অনাদরের পাত্র হইয়া উঠিয়াছে। যেমন যমদেব। কথায় বলে 'যমভূত' 'যেন যম'। দেবী চণ্ডীও এই উগ্রপ্রকৃতির কারণে অনাদরের পাত্র। কেহ কোন কার্য্যে বিঘ্ন ঘটাইলে আমরা তাহাকে তৎক্ষণাৎ "আস্ত ভাঙ্গা মঙ্গল চণ্ডী" নামে অভিহিত করি। কিম্বা কোন কোপনস্বভাবা স্ত্রীর প্রতি 'চণ্ডী' উপাধি বর্ষণ না করিয়া ছাড়ি না। এতদ্ভিন্ন 'উড়নচণ্ডী' ত যেখানে সেখানে ব্যবহৃত হয়। এইরূপ অশ্রদ্ধাপূর্ণ ভাষা প্রয়োগে দেবী চণ্ডীর প্রতি হিন্দু-হৃদয়ের বড় একটা শ্রদ্ধা আছে বলিয়া সহজে মনে না হওয়াই সম্ভব। বিশুদ্ধিকারিতা প্রভৃতি নানা গুণের কারণে অগ্নিদেব যেমন হিন্দুর শ্রদ্ধার পাত্র, তেমনি উগ্র দাহকারিতার জন্য উহা অবজ্ঞারও পাত্র না হইয়া যায় নাই। তাই সচরাচর উগ্র ক্রোধী ব্যক্তির সঙ্গে অবজ্ঞার ভাবে অগ্নির তুলনা দেওয়া হয়—"যেন অগ্নিশর্ম্মা"। আবার কুরূপের গুণেও অনেক দেব দেবীর নাম অবজ্ঞাসহকারে অথবা বিকৃতরূপে উচ্চারিত হয়; যেমন, 'কালীভূত' বা 'কেলেভূত' বলা হয়। 'কালীকৃষ্ণ' না বলিয়া 'কেলেকিষ্টি' বলা হয়। অবশ্য আপনারা যদি বলেন, এস্থলে 'কালী' প্রকৃতি শব্দগুলি দেববাচক নহে, কিন্তু রূপবাচক, তাহা হইলে ইহাও স্বীকার্য্য যে, যখন ঐ একই শব্দ দেববাচকও বটে তখন উহা ঐরূপভাবে অবজ্ঞাসহকারে উচ্চারণ না করাই শ্রেয়। যমভগ্নী দেবী যমুনার নামও কৃষ্ণ বর্ণের জন্য ঘৃণা ও অনাদর-ব্যঞ্জক হইয়া উঠিয়াছে; যথা, 'কালিন্দীভূত'। কালিন্দী যমুনার এক নাম। বঙ্গভাষায় 'শং' শব্দের অতি জঘন্য দশা। দেবতার কুরূপই তাহার কারণ।

'শং শব্দো মঙ্গলার্থঃ' সংস্কৃতে যে 'শং' শব্দের উচ্চ মহান মঙ্গল অর্থ উহার দিব্য মাহাত্ম্য প্রকাশ করে, বাঙ্গলায় তাহার ঘৃণিত জঘন্য অর্থে পরিণতি দেখিয়া অবাক হইতে হয়। এই 'শং' শব্দের অন্তরে দেবনাম লুক্কায়িত। মঙ্গলরূপ শিবের নাম শঙ্কর হইতেই বঙ্গের 'শং' শব্দের উৎপত্তি। এই ভস্মলিপ্ত কদাকার ভূতপ্রেতবেষ্টিত মহাদেব শিবের নাম শঙ্কর হইতে আমাদিগের ঘৃণা বিভৎস ও উপহাসমিশ্রিত 'শং' কথা আসিয়াছে। গত বর্ষের সমাপ্তি বা লয় কালে চৈত্র সংক্রান্তির দিন লয়মূর্ত্তি শঙ্করের অপরূপ রূপের অনুকরণ হয়। শৈবসম্প্রদায়ের সন্ন্যাসী সাধুরাই এই দিনে উৎসব করেন। 'শং' তামাসা এই উৎসবের অঙ্গীভূত। বস্তুতঃ সন্ন্যাসীর 'সং' হইতে বা সংক্রান্তির 'সং' হইতে এই শং শব্দের উৎপত্তি হয় নাই। বঙ্গভাষায় শং শব্দে অতি জঘন্য বা কদাকার রূপের প্রতিই সচরাচর ঘৃণার সহিত প্রযুক্ত হয়। প্রচ্ছন্ন-রূপধারীর প্রতিও অবজ্ঞার ভাবে 'শং' শব্দ প্রযুক্ত হয়। ইংরাজী sham শব্দের সহিত আমাদের এই শং শব্দের কোনরূপ সম্বন্ধ থাকিতে পারে। মঙ্গলকারী শংকরের এই মঙ্গলবাচক 'শং' শব্দের বঙ্গভাষায় এই ঘৃণিত অর্থ কোথা হইতে আসিল? স্বয়ং মহাদেব শংকরের জঘন্যরূপই ইহার কারণ। মহাদেব শিবের অন্তরে মহান মঙ্গলভাব প্রচ্ছন্ন, কিন্তু তাঁহার বহির্মূর্ত্তি অতি জঘন্য। একটী হিন্দুস্থানী গানে শিবকে তাই লক্ষ্য করিয়া বলা হইতেছে—

"মহাযোগযোগী অত জঘ্ন রূপ"

জঘন্যরূপ শিবের কথা ছাড়িয়া দিলেও এমন যে লোকপ্রিয় দেবতা কৃষ্ণ তাঁহারও নাম হাস্য উপহাসচ্ছলে বড় অল্প ব্যবহৃত হয় না। কোন ব্যক্তির ভাবভঙ্গী বা চলন যদি কাহারও মনোমত না হয়—অপ্রিয় বোধ হয়, তাহা হইলে সে কেমন রঙ্গসহকারে বলিয়া উঠে "ধিনি কৃষ্ণ তিনি তা" বা 'যেন ত্রিভঙ্গ নটবর এলেন' "গোবর্দ্ধন আর কি"। এই সকল বাক্যপ্রয়োগ বড় একটী হিন্দুর দেবভক্তির পরিচায়ক নহে। এই সকল অনাদরবাচক শব্দগুলি বাঙ্গালীর মুখে মুখে। বাঙ্গালী হিন্দু অহিন্দু সকলই প্রায় নিঃসঙ্কোচে এইরূপ বাক্যসমূহ ব্যবহার করিয়া যান—তখন তাঁহারা এটুকু ভাবেন না যে ইহাতে দেবনামেও আঘাত পড়ে। স্বরূপের জন্য হিন্দুর দেবতা কার্ত্তিক বিখ্যাত। কিন্তু কার্ত্তিকের যে গুম্ফবিশিষ্ট হিন্দুস্থানী ছাঁদে মস্তকে বিঁড়া দিয়া মূর্ত্তি গড়া হয় তাহা আজ

কালের বাঙ্গালী নব্য হিন্দুর চক্ষু তৃপ্ত করিতে পারে না, তাই কাহারও রূপ বা মূর্ত্তি বা চেহারা উপহাস করিবার কালে তাঁহাদের মুখে শুনিতে পাইবেন "যেন কার্ত্তিক আর কি"। 'গণেশ' 'নন্দগোপাল' প্রভৃতি দেবনামগুলিও বাঙ্গালীর কাছে ঐরূপ অবজ্ঞা বা উপহাসবাচক হইতে আরম্ভ হইয়াছে। আমরা এ পর্য্যন্ত যাহা দেখাইলাম তাহাতে পাঠক বুঝিলেন বঙ্গভাষায় দেবনামে শ্রদ্ধা অপেক্ষা অবহেলা অশ্রদ্ধা অনাদর ও অবজ্ঞার ভাবই বিশেষ ভাবে উঁকি মারিতেছে।

এই যে দ্যুলোকস্থ সূর্য্য চন্দ্র ইহারাও হিন্দুর দেবতা। প্রকৃতির এই দুই দেবতাও বঙ্গভাষায় বিশেষ শ্রদ্ধা বা সমাদর লাভ করে নাই। দেখ বেদে ঋষিমুখে সূর্য্য চন্দ্রের কি মহিমা কীর্ত্তিত, আর বঙ্গের ছড়ায় তাহাদের কি অধোগতি কি দুর্দ্দশা। সূর্য্য চন্দ্র প্রকৃতির এমন দুই সুন্দর বস্তুকেও বঙ্গের ছড়াকবিগণ মাতুল সম্বোধনে সম্বোধিত করিয়া সব মাটী করিয়া দিয়াছেন। সূর্য্য চন্দ্রকে মামা বলিলে উহাতে প্রকৃতির মহান সৌন্দর্য্যের ভাব দেবভাব কিছুমাত্র থাকে না—কবিত্ব হৃদয় হইতে পলায়ন করিবার চেষ্টা করে। বাঙ্গলার মাতুল সম্বোধনে সূর্য্য চন্দ্রের স্বর্গীয় সৌন্দর্য্য নষ্ট করিয়া দেয়। "সূর্য্যি মামার বিয়েটা আয় রঙ্গ হাটে" "চাঁদা মামা টি দিয়ে যা" এই সকল ছড়া বঙ্গহৃদয়ের নিতান্ত লঘুতার পরিচায়ক। বঙ্গগৃহে মাতুল সম্পর্কটী পিতার ন্যায় গুরু-গম্ভীর নহে, মাতুলের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক অনেকটা লঘুভাবের। মাতুলের সঙ্গে ভগ্নীপুত্রের অভিমানটা গোষাকরাটা চলে, তাই ছড়াকবি গাহিয়াছেন—

তাই তাই তাই
মামার বাড়ী যাই
মামারা ভাত দিলে না গোষা ক'রে যাই!

বঙ্গদেশে সূর্য্যদেব বস্তুতই যে অবজ্ঞার চক্ষে হেয় চক্ষে দৃষ্ট হয়েন, হিন্দুর যজ্ঞোপবীতকালীন আচার প্রথা হইতেও তাহার পরিচয় পাওয়া যায়। বঙ্গে প্রসিদ্ধি আছে যজ্ঞোপবীত কর্ম্মে শূদ্রবৎ সূর্য্যের মুখ দেখিতে নাই। সূর্য্য শূদ্রবৎ গণনীয়। সূর্য্য চন্দ্রের ন্যায় অন্যান্য গ্রহদেবতারাও বাঙ্গালীর হৃদয়ে কম বিরাগভাজন নহে। ঋষিরা যে মঙ্গল গ্রহের এমন শুভ 'মঙ্গল' নাম দিলেন আমরা তাহাকে অমঙ্গলের আধার বলিয়া গণ্য করি এবং 'হাতেপাঁজী

মঙ্গলবার' ইত্যাদি বাক্যে তাহার কুৎসা রটনায় ব্যস্ত। আর শনিগ্রহের ত কথাই নাই। দেবনামের সংস্পর্শ যাহাতে আছে তাহাই দেখিতেছি কোন না কোনরূপে বাঙ্গালীর কাছে অসম্মানিত হইয়াছেন। কামচারী নারদ ঋষির সঙ্গে দেবর্ষি উপাধি যুক্ত, তাই সেই নামও বুঝি কলহের কারণ রূপে বঙ্গীয় সমাজে গণ্য হয়। এই সঙ্গীতাচার্য্য উদারপ্রকৃতি বীণাধারী ঋষির নাম লইয়া যখন কলহক্ষেত্রে লোকে 'নারদ নারদ' বলিয়া উপহাসের চীৎকার করে তখন আমাদের লঘুচিত্ততার কথা সহজেই বদ্ধমূল না হইয়া যায় না।

বঙ্গভাষায় যে, দেবনামগুলি এমন অনাদরভাবে অবজ্ঞার ভাবে প্রযুক্ত হইয়াছে তাহার কারণ কি? তাহার একটী কারণ নহে। দেবনামে অনাদর শুদ্ধ একটী পথ দিয়া নহে, নানাপথ দিয়া, নানা ভাবের মধ্য দিয়া বঙ্গভাষায় আসিয়া প্রবেশ করিয়াছে। প্রথম কারণ বাঙ্গালীর মুখে দেবনামের ছড়াছড়ি। বাঙ্গালী আলস্যসহকারে হাই তুলিবেন, তখনও 'হরিবোল' বলিবেন। বাঙ্গালী শুইতে যাইবেন তখনও তন্দ্রাবশে 'দুর্গানাম' লইবেন। এইরূপে বৃথা দেবনাম লইতে লইতে দেবনামের প্রতি অশ্রদ্ধা ও অভক্তি উদয় ছাড়া আর কি ফল হইতে পারে! কোথায় দেবনামের জন্য কঠোর তপস্যা সাধনা, আর কোথায় দেবনাম আলস্যের অঙ্গরূপে পরিণত! বাইবেলে যথার্থই বলিয়াছে "Thou shalt not take the name of the Lord thy God in vain" অর্থাৎ "তোমরা বৃথা দেবনাম লইও না।" ইহা খৃষ্টীয় দশধর্ম্ম শাসনের (Ten commendments) অন্যতম শাসন। সমাজে ব্রাহ্মণের একাধিপত্য এবং তজ্জন্য উহাদিগের আত্মাভিমানও উহার দ্বিতীয় কারণ। ব্রাহ্মণেরা বঙ্গে ভূদেবতারূপে পূজ্য হইয়া উঠিয়াছিলেন। ক্রমে তাঁহারা দর্পভরে সেই দেবত্বপদ অধিকারে রাখিতে নিজেরাই সচেষ্ট হইলেন; তাহারই ফলে হিন্দু ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে আপনাদিগকে দেবশর্ম্মা নামে অভিহিত করিবার এক প্রথা প্রচলিত হইল। পত্রের বা লিপির নিম্নে নিজনাম স্বাক্ষর করিবার কালে ব্রাহ্মণেরা'অমুক চন্দ্র দেবশর্ম্মা' এইরূপ লিখিয়া থাকেন; এই রীতি নিতান্ত গর্ব্বসূচক ও হিন্দুব্রাহ্মণদিগের হীনতার পরিচায়ক। যে দেবতা তোমার ঈশ্বর বা পূজার সামগ্রী সেই 'দেব' নাম তোমার নামের সঙ্গে যুক্ত করিয়া দিয়া আত্মাভিমান চরিতার্থ কর কেন? ঋষিদিগের বংশসম্ভূত বলিয়া বরঞ্চ

আপনাদিগকে 'ঋষিশর্ম্মা' বল 'মুনিশর্ম্মা' বল তাহাতে দোষ নাই, কিন্তু 'ভর্গো দেবস্য ধীমহি' বলিয়া নিত্য গায়ত্রী পাঠকোলে যে দেব শব্দে প্রাণের দেবতা ভগবানকে পূজা কর, সেই নাম নিজনামের সহিত যুক্ত করিয়া 'দেবশর্ম্মা' নামে নিজেকে কলুষিত করা সামান্য পাপ নহে। অদ্বৈতবাদকে দেবনামে অশ্রদ্ধার তৃতীয় কারণ বলিয়া মনে হয়। ঈশ্বরের সমকক্ষ হইতে গিয়া অদ্বৈতবাদী ক্ষুদ্র মানব, কেবল আপনাকে পূর্ণ ব্রহ্ম বলিয়া পরিচয় দেন না, তিনি অশ্ব গর্দ্দভ সম্মুখে যাহাকে দেখিতে পান তাহাকেই ঈশ্বরের আসনে বসাইতে কুণ্ঠিত হন না। অল্পদিন হইল একজন ঘোর অদ্বৈতবাদী স্পষ্টই দেখাইয়া বলিয়াছিলেন— "এই যে ঘোঁড়া গাধা দেখিতেছেন ইহারাও ঈশ্বর"। এইরূপ ভীষণ মত যখন দেশের লোকে সহজে আলিঙ্গন করিতে প্রস্তুত তখন সেখান হইতে যে দেবভক্তি পলায়ন করিবে তাহার আর আশ্চর্য্য কি? দেবতার প্রতি অশ্রদ্ধার আরও একটী কারণ হিন্দুর বহু দেবতা—অসংখ্য দেবতা! সকল হৃদয়ে সকল দেবতা কিছু সমান সমাদর লাভ করিতে পারে না। যিনি, যে দেবতাকে শ্রদ্ধা ভক্তি করেন তদ্ভিন্ন অন্য দেবতার সম্বন্ধে তাহার সে শ্রদ্ধাভক্তি হওয়া অসম্ভব, কাজেই ক্রমে অশ্রদ্ধা ও অনাদরে পরিণত হওয়া সহজ। এককালে ভক্ত মূসার প্রতি তাই পরমেশ্বরের দৈববাণী হইয়াছিল "I am the Lord thy God Thou shalt not have strange gods before me." "আমিই তোমাদের এক ঈশ্বর। আমার সম্মুখে তোমরা নানা কল্পিত দেবতার উপাসনা করিও না।"

সকল দেবতার উপর যিনি তিনি এক পরমেশ্বর। "য একোঽ বর্ণো" 'তিনি কোন জাতি বর্ণের অন্তর্ভুক্ত নহেন। আমরা তাঁহারি শরণাপন্ন হই।' হৃদয়ের তুচ্ছভাব—দেবনামে অনাদর পরিহারের জন্য আইস আমরা সেই সকল দেবতার দেবতা এক ভুবনেশ্বরকে জ্ঞাত হই এবং উচ্চৈঃস্বরে উপনিষদের ঋষিবাক্য ঘোষণা করিয়া বলি—

"তমীশ্বরাণাং পরমং মহেশ্বরং তং দেবতানাং পরমঞ্চ দৈবতম।
পতিং পতীনাং পরমং পরস্তাৎ বিদাম দেবং ভুবনেশমীড্যং॥"

শ্রীঋতেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

ব্রাহ্মসমাজের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস।

প্রথম অধ্যায়—রক্ষণশীলতা ও উন্নতিশীলতা।

সাধারণ মানবের স্বভাবই এই যে পুরাতন কোন কিছুর কিছুমাত্র পরিবর্ত্তন দেখিলেই তাহারা অস্থিরতা প্রকাশ করে। পরিবর্ত্তনটা ভাল কি মন্দ তাহা বিবেচনা করিবার প্রয়োজনই বোধ করে না—পরিবর্ত্তন মাত্রকেই প্রথম হইতেই মন্দ বলিয়া সাধারণ লোকে ধারণা করিয়া থাকে। এমন কি, মন্দ অভ্যাসও কালক্রমে চিরপরিচিত বন্ধুর ন্যায় হইয়া উঠে—তখন যাহারা তাহার কুফল ভোগ করে, তাহারাই তৎবিরুদ্ধে পরিবর্ত্তন সংঘটনের ঘোর বিরোধী হইয়া উঠে। এই রক্ষণশীলতা অবশ্য ভগবানের প্রতিষ্ঠিত সৃষ্টিরক্ষার এক অপূর্ব্ব কৌশল। ইহার অভাবে সৃষ্টিধ্বংস হইয়া যাইত। মনুষ্যসমাজে এই নিয়ম কার্য্য করিতে বিরত থাকিলে মানবের সমাজরক্ষণ এবং তৎসঙ্গে সামাজিক উন্নতি প্রভৃতি কিছুই হইতে পারিত না—প্রত্যুত মানবকুলের অস্তিত্বই দেখিতে পাইতাম কি না সন্দেহ। রক্ষণশীলতা একদিকে জড়েরও স্বাভাবিক ধর্ম্ম, অপরদিকে ইহা জীবদিগেরও জীবনরক্ষার এক প্রধান সহায়। ইহারই ফলে যখন কেহ আমাকে সজোরে আঘাত করে, আঘাতকারীও তখন আমার নিকট হইতে ঠিক তত জোরে প্রতিঘাত পাইয়া থাকে। এই রক্ষণশীলতার গুণেই আমাদের জীবনের প্রতি এত মায়ামমতা ও মৃত্যুর প্রতি এত গুরুতর ভয়।

এই রক্ষণশীলতার ও প্রত্যেক জীবজন্তুর কর্ম্মবেষ্টনের মধ্যে একটা সীমা আছে। মনুষ্যও এই নিয়মের ব্যতিরেকস্থল নহে। রক্ষণশীলতার সেই সীমা অতিক্রম করিলেই মনুষ্য নির্জ্জীব জড়পদার্থে পরিণত হয় বলিলেও চলে। এই প্রকার নির্জ্জীব মানব নিজের মনুষ্যত্বের কেন্দ্রভূমি হারাইয়া পরিধিচক্রে হাতড়াইতে থাকে। সে নিজের মঙ্গলামঙ্গল স্বাধীনভাবে চিন্তা করিতে পারে না, নিজের উন্নতি কিসে হয় জানে না; কেবল অপর পাঁচ জনের মুখাপেক্ষা

করিয়া কোন প্রকারে সুখে দেহযাত্রা নিষ্পন্ন করিতে পারিলেই কৃতার্থ হয়। এই সকল মানবের মূলমন্ত্র "আপনারা পাঁচজনে যাহা করেন।" এই সকল অতি-রক্ষণশীল ব্যক্তি মানব নামের অনুপযুক্ত সামাজিক জীবমাত্র। মোটের উপর দেখা যায় যে যাহারা যত রক্ষণশীল, তাহারা ততটা অপর পাঁচজনের উপর নির্ভর করিতে বাধ্য হয়, ততটা সামাজিকতার বশীভূত হইয়া পড়ে। তাহার কারণ এই যে নিজেকে কোন বিষয় ভাবিয়া চিন্তিয়া স্থির করিতে হইবে, ইহা ভাবিলেই তাহারা মুহ্যমান হইয়া পড়ে। এই কারণে সামাজিকতা বা অপর পাঁচজনের অনুষ্ঠিত বা উপদিষ্ট আচার ব্যবহার রক্ষা করিবার অপর নামই রক্ষণশীলতা। এই প্রকার সামাজিকতায় যে যথেষ্ট দৌর্ব্বল্য প্রকাশ পায় তাহা বলা বহুল্য।

রক্ষণশীলতার বিপরীত হইল উন্নতিশীলতা। উন্নতিশীল ব্যক্তি অপর পাঁচজনের কথার উপর নির্ভর না করিয়া আপনার উপর নির্ভর করতঃ নিত্য নূতন বিষয়ের প্রতি ধাবমান হয়। প্রাচীনের প্রতি ভক্তি অপেক্ষা নবীনের প্রতি আসক্তিই তাহাকে অধিকার করিয়া থাকে। সে নিজে যাহা ভাল মনে করে তাহাই সম্পন্ন করিবার চেষ্টা পায়। আত্মনির্ভরশীল বলিয়া সে সামাজিকতার অপেক্ষা রাখে না। উন্নতিশীলতার সর্ব্বপ্রধান অঙ্গই হইল আত্মনির্ভর। কিন্তু রক্ষণশীলতার ন্যায় উন্নতিশীলতারও একটী সীমা আছে। সেই সীমার বাহিরেই স্বেচ্ছাচার। অতিরিক্ত সামাজিকতা বা রক্ষণশীলতায় যেমন দৌর্ব্বল্য প্রকাশ পায়, সেইরূপ অতিরিক্ত উন্নতিশীলতায় স্বেচ্ছাচার আসিয়া পড়ে। সীমার ভিতরে আত্মনির্ভরের ভাব হৃদয়ে এক অভূতপূর্ব্ব বল প্রদান করিয়া থাকে এই বলপ্রভাবেই উপনিষদ্‌কার ঋষিরা ব্রহ্মোপাসনা প্রতিষ্ঠিত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

অতিরিক্ত উন্নতিশীলতার ফলের জাজ্বল্যমান দৃষ্টান্ত ফরাসিবিপ্লবের সময় ফ্রান্সের অবস্থা। সেই এক কাল, যখন ফ্রান্সের অধিবাসীগণ সকলেই সামাজিকতার বাঁধ সম্পূর্ণ তিরোহিত করিয়া একেবারেই উন্নতির চরম শিখরে অধিরোহণ করিবার অভিলাষ করিতেন। ফলে দাঁড়াইল অশ্রুতপূর্ণ স্বেচ্ছাচার। ভগবানের রাজ্যে সেরূপ ভীষণ স্বেচ্ছাচার চিরস্থায়ী হইতে পারে না। ইহার প্রতিবিধানের সূত্র ধরিয়া রক্ষণশীলতা আসিয়া সামঞ্জস্যের পথ দেখাইয়া

দিল। স্বেচ্ছাচারী ফ্রান্স বলিয়াছিল যে "ধর্ম্ম চাহিনা", কিন্তু সেই ধর্ম্মকে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করিয়া তবে ফ্রান্স স্বেচ্ছচোরের হস্ত হইতে বহুল পরিমাণে নিষ্কৃতি লাভ করিল।

অতিরিক্ত সামাজিকতার ফলের জাজ্বল্যমান দৃষ্টান্ত আমাদের এই ভারতবর্ষ। যে স্বাধীনতার বলে প্রাচীন ভারত উন্নতির পথে দ্রুতপদে অগ্রসর হইতে সমর্থ হইয়াছিল, সেই স্বাধীনতা হারাইয়া শত শত বৎসর পরাধীনতার পেষণযন্ত্রের নিম্নে পড়িয়া ভারতবাসী এরূপ নির্জীব হইয়া পড়িয়াছে যে এখন তাহাদিগকে জড় সামাজিক জীব বলিলেও অত্যুক্তি হইবে না। ভারতে ইংরাজ অভ্যুদয়ের পূর্ব্বে ভারতবাসীগণ, বিশেষত বঙ্গবাসীগণ এই জড়ত্বের চরম সীমায় উঠিয়াছিল—তখন তাহারা নিজের মঙ্গলামঙ্গল জগতের হিতাহিত চিন্তা করিয়া কার্য্য করিতে ভুলিয়া গিয়াছিল। কথায় কথায় পিতৃপিতামহ ও অপর পাঁচজনের দোহাই দিয়া গড্ডলিকাপ্রবাহের ন্যায় চিরপ্রচলিত আচার ব্যবহার, কার্য্যকলাপ, ভাল হউক বা মন্দ হউক, অনুষ্ঠান করিয়া নিজেকে সুখী বোধ করিত। ঈশ্বরের নিয়মে মানবরাজ্যে যেমন স্বেচ্ছাচার চিরাধিপত্য বিস্তার করিতে পারে না, সেইরূপ চিরজড়ত্ব ও স্থায়িত্ব লাভ করিতে পারে না। মঙ্গলময় পরমেশ্বর মনুষ্যকে কেবল জড়পদার্থ করিয়াই গড়েন নাই যে সে কেবল রক্ষণশীল ও সামাজিক জীবমাত্র হইয়া স্থির থাকিবে। তাহাই যদি হইত, তাহা হইলে আজ মানবজাতি সভ্যতার উচ্চশিখরে আরোহণ করিতে সমর্থ হইত না—বদ্ধপুষ্করিণীর জলের ন্যায় সেই রক্ষণশীলতা ক্রমশ অস্বাস্থ্যকর হইয়া মানবকুলের ধ্বংসসাধন করিত। যখন ভারতবাসীগণ জড়ত্বের* চরম সীমায় উঠিয়াছিল, সেই মুহূর্ত্তে ভারতের পূর্ব্বগগনে জড়ত্বনাশের দুন্দুভি বাজিয়া উঠিল—শুভক্ষণে ইংরাজজাতি ভারতের রাজপদে অভিষিক্ত হইলেন, স্বাধীনতার, আত্মনির্ভরের অন্তর্হিত স্রোত কোথা হইতে আসিয়া পুনঃপ্রবাহিত হইতে লাগিল। কোথা হইতে এক দরিদ্র বঙ্গবাসী রাজা

* জড়ত্ব বলিতে মানসিক ও আধ্যাত্মিক জড়ত্বই প্রধানত বুঝিতে হইবে। এক প্রতাপাদিত্য উঠিলেন কি এক রণজিৎসিংহ উঠিলেন, তাহাতে জাগ্রতভাব কিছুই প্রকাশ পায় না. বরঞ্চ সমগ্র জাতিগত একটা অন্ধ গড্ডলিকাপ্রবাহের ভাবই অধিকতর পরিস্ফুট হইয়া পড়ে।

রামমোহন রায় ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠিত করিয়া সেই নূতন প্রবাহিত স্বাধীনতার জয়কেতুরূপে ভারতবাসীর হস্তে সমর্পণ করিয়া গেলেন।

রক্ষণশীলতা ও উন্নতিশীলতার সামঞ্জস্যপথই প্রকৃত উন্নতির পথ, প্রকৃত মঙ্গলের পথ। উপযুক্ত কাল ও ক্ষেত্র বুঝিয়া যিনি এই সামঞ্জস্য দেখাইতে পারেন, তিনিই জগতের প্রকৃত উপকারক। যাঁহারা রক্ষণশীলতার মোহে পড়িয়া আত্মার স্বাধীনতা বিসর্জ্জন দিয়া বিলাসমোহে আকণ্ঠ নিমগ্ন থাকেন, অথবা যাঁহারা উন্নতিশীলতার দোহাই দিয়া স্বেচ্ছাচারকে বন্ধুবোধে আলিঙ্গন করেন, তাঁহাদের কেহই এই সামঞ্জস্য পথের আবিষ্কারে সমর্থ হয়েন না। যে সকল ক্ষণজন্মা মহাপুরুষ রক্ষণশীলতা ও উন্নতিশীলতা উভয়কেই আত্মীয় বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন, উভয়েরই মর্য্যাদা উপলব্ধি করিতে সমর্থ হইয়াছেন, তাঁহারাই এই সামঞ্জস্য প্রদর্শন করিতে সক্ষম এবং ইহাতেই তাঁহাদের মহাপুরুষত্ব। তাঁহারা নিজের সুখকে গণনার মধ্যে আনেন না, সুতরাং তাঁহাদিগকে পরের মুখাপেক্ষা করিয়া থাকিতে হয় না, প্রতি কথায় সামাজিকতার নিকটে অবনতমস্তক হইয়া চলিতে হয় না। তাঁহারা পুরাতন প্রথা প্রভৃতির মধ্যে ভালটুকু রক্ষা করিয়া নূতন যাহা কিছু ভাল তাহাও বিচার পূর্ব্বক অবলম্বন করিতে কুণ্ঠিত হয়েন না। তাঁহারা যেমন একদিকে রক্ষণশীল, অপরদিকে সেইরূপ আত্মনির্ভরশীল ও স্বাধীনতার মূর্ত্তিমান অবতার।

মহাপুরুষগণ মঙ্গলের পথ, সামঞ্জস্যের পথ দেখাইয়া দিলে ক্রমে জনসাধারণ তাহা ধীরে ধীরে গ্রহণ করিতে থাকে। সাধারণত এক একটী মহাপুরুষের এক একটী মূলভাব থাকে; সেই মূলভাব যখন অপর কোন ব্যক্তির হৃদয়ে প্রতিধ্বনিত হয়, তখন সেই ব্যক্তি সেই মহাপুরুষের পথাবলম্বী হয়। এইরূপে যখন অনেকগুলি ব্যক্তি কোন মহাপুরুষের মতানুসারী হয়, তখন সেই মহাপুরুষের পরিধিস্বরূপে একটী সমাজ গঠিত হইল বলা হইয়া থাকে। সূর্য্য হইতে পৃথিবী প্রভৃতি গ্রহ সকল উৎপন্ন হইয়াছে বলিয়া তাহারা যেমন ন্যূনাধিক পরিমাণে সূর্য্যের সহিত সমধর্ম্মী, সেইরূপ যখন মহাপুরুষের ভাবকেন্দ্র হইতে ভাবকণা যাইয়া তাঁহার সমাজস্থ ব্যক্তিগণের ভাবসকল গঠিত করিয়া দেয়, জীবনকে নূতন ছাঁচে ঢালিয়া নবতর শক্তি প্রদান করে, তখন বলা বাহুল্য যে প্রত্যেক সমাজ তাহার কেন্দ্রস্থল মহাপুরুষের সহিত ন্যূনাধিক

পরিমাণে সমধর্ম্মী হইবে।

রাজা রামমোহন রায় একজন মহাপুরুষ, কারণ তিনি রক্ষণশীলতা ও উন্নতিশীলতার মধ্যে সামঞ্জস্যের পথ আবিষ্কার করিয়া জনসাধারণের জন্য তাহা উপযুক্ত করিতে পারিয়াছেন। এই সামঞ্জস্যই হইল তাঁহার প্রতিষ্ঠিত ব্রাহ্মসমাজের মূলপ্রাণ। বলা বাহুল্য যে তাঁহার প্রতিষ্ঠিত ব্রাহ্মসমাজ (ব্রাহ্মসমাজ গৃহ নহে) তাঁহারই ভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া ন্যূনাধিক পরিমাণে তাঁহারই মতানুসরণ করিয়া চলিয়া আসিতেছে। রাজা রামমোহন রায় হইতেই ব্রাহ্মসমাজের উৎপত্তি, সুতরাং সাধারণত ব্রাহ্মসমাজ মাত্রেই তাঁহার ভাবচ্ছায়া প্রভাব বিস্তার করিবেই। কেবল রামমোহন রায় কেন, যে সকল মহা-মহাপুরুষের অভ্যুদয়ে ব্রাহ্মসমাজের উৎপত্তি ও স্থিতি, তাঁহাদের সকলেরই ভাবচ্ছায়া ব্রাহ্মসমাজকে গঠিত করিয়াছে এবং করিবে। ব্রাহ্মসমাজের ইতিবৃত্ত লিখিতে গেলে এই সকল মহাপুরুষগণের ভাবকেন্দ্রে যাইয়া দেখিতে হইবে যে তাঁহাদের জীবন কি ভাবে গঠিত, তবে তাহাদের পরিধিস্বরূপ ব্রাহ্মসমাজের প্রাণ সুতরাং তাহার উন্নতি ও অবনতির কারণ বুঝিতে পারিবার সম্ভাবনা থাকে।

এখন কথা হইতেছে যে বামনের চন্দ্রমাধারণের চেষ্টার ন্যায় আমার এই গুরুতর কর্ম্মে অবতরণের কারণ কি? আমি জানি যে আমি এই কার্য্যের উপযুক্ত নহি, কিন্তু তথাপি অন্তত কিয়ৎকালের জন্য মহাপুরুষদিগের সঙ্গলাভ করিব এবং ব্রাহ্মসমাজ যে ব্রহ্মনামকে মূলমন্ত্র করিয়াছেন, সেই প্রাণবিমোহন ব্রহ্মনামে কিয়ৎকালের জন্য ডুবিয়া থাকিতে পারিব, ব্রহ্মের সহিত অন্ততঃ ক্ষণকালের জন্যও প্রত্যক্ষ সংস্পর্শ অনুভব করিব, এই আশায় এই অসম-সাহসিক কার্য্যে, মহাপুরুষগণের সমালোচনায়, ব্রাহ্মসমাজের উপর মন্তব্য-প্রকাশ কার্য্যে অবতরণ করিয়াছি—আশা করি, সাধু মনীষীগণ আমার এই ধৃষ্টতা স্বীয় মহত্ত্ব ও ঔদার্য্যে ক্ষমা করিবেন।

শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

প্রশংসা-ভিখারী।

চারিদিকে দেখি, প্রশংসা ভিখারী
ভিক্ষুকের দল যত,
দয়া ও ধর্ম্মের মুখোস পরিয়া
কোলাহল করে কত।
দয়া মানবের হৃদয়ের ধন
হৃদয়ে বসতি করে;
হৃদয়ের কার্য্যে প্রকাশিত হয়
মুখে মুখে নাহি ফিরে।
ধূলি মুষ্টিমেয়, মানব প্রশংসা
কাণে শুনিবার তরে;
হৃদয়ের ধন, দয়ারে আমার
আহা উহুঃ করে সারে।
তোমার প্রশংসা, আত্মপ্রসাদে
হয়ে এরা অধিকারী
হীনবেশে কেন মানবের দ্বারে
বেড়ায় মা ভিক্ষা করি?
মুখের যে কার্য্য কোলাহলময়
দু দিনে ফুরায়ে যায়;
হৃদয়ের কার্য্য, চিরকাল ধরে
নীরবে সম্পন্ন হয়।

শ্রীভূপেন্দ্র বালা দেবী।

রামায়ণের সুমালিরাক্ষস ও আফ্রিকার সুমালিভূমি।

২

আফ্রিকার নৈঋতকোণে এই সুমালিজাতির বাস। ইহাদের দলবল আবিসিনিয়াতেও আছে; ইহারা আধুনিক ইজিপ্টের সুডান প্রদেশেও ছড়াইয়া পড়িয়াছে। গত শতাব্দির শেষাশেষি প্রায় ইউরোপীয়েরা এই সুমালিজাতিকে জানিতে পারিয়াছেন—জানিয়াছেন যে হ্যাঁ—সুমালী বলিয়া আফ্রিকায় এক জাতি আছে বটে; কিন্তু ইউরোপীয়দিগের কতকাল পূর্ব্বে হিন্দুদিগের সহিত—ভারতের অধিবাসীদিগের সহিত ইহাদের সংশ্রব ছিল! ভারত হইতেই—ভারতসমুদ্র পার হইয়াই সুমালিজাতি আফ্রিকায় যাইয়া উপনিবেশ স্থাপন করে।—বলিতে গেলে প্রকৃতপক্ষে ইহারা প্রাচীন ভারতেরই লোক। ইহাদের ধর্ম্ম আগে ভারতের ধর্ম্ম ছিল। এখন এই সুমালিদের অধিকাংশ লোকই মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছে। এই জাতিকে ইউরোপীয় পণ্ডিতেরা প্রধানতঃ সেমিটিক পুঞ্জের সহিত সম্বন্ধসূত্রে গ্রথিত হামিটিক পুঞ্জের অন্তর্গত বলিয়া ধরেন। কোনো কোনো গ্রন্থকার ইহাদের কালো রঙের উপর প্রধানতঃ ঝোঁক দিয়া বলেন যে "এরা নিগ্রোবংশ সম্ভূত; আবার কেচিদের মতে এরা 'সেমাইত' এমন কি আর্য্যজাতির মধ্যেও পড়ে; তাঁহারা বলেন, যে, কেবল দেশের দোষে ইহারা কালো, নচেৎ ইহারা আর্য্য।—বাস্তবিক তাহাদের ছবি দেখিয়া তাহাদিগকে একেবারে অনার্য্য বলিয়া কিছুতেই মনে হয় না। ছবির দ্বারা যাহা বুঝা যায়, তাহাতে আর সংশয় থাকে না, যে তাহারা কুৎসিৎ নয়। তাহারা সুগঠিত, তাহাদের চক্ষু বেশ পরিস্ফুট, তাহাদের ভ্রূযুগল বেশ প্রশস্ত ও উচ্চ, তাহাদের মাথার খুলিও বেশ দীর্ঘ।—নিগ্রোদের যে রকম মাংসপেশীর ভাব সেরূপ তাহাদের নয়। এবিসিনিয়ার 'আগাউ'জাতির সঙ্গে তাহাদের অনেকটা সাদৃশ্য আছে বলিয়া বিদেশীয় পণ্ডিতেরা অনুমান করেন। সাধারণতঃ পুরুষদের কিঞ্চিৎ রক্তাভ হইতে ঘন পিঙ্গলবর্ণের মাঝামাঝি রং; সুমালি মেয়েদের রং কখনো কখনো গৌরবর্ণ

হইতেও দেখা যায়; আর তাহাদের বেশীভাগই সুন্দরী, দেখিতে ভাল। আধুনিক সুমালিরা পোষাক পরে ঠিক হাবসিদের মত। উহারি মধ্যে আবার যাহারা কোন মানুষকে যুদ্ধে বা কোনোরূপে হত করে, তাহাদের বিশেষ সম্মানও আছে; তাহারা সুমালিদের কোনো কোনো গোষ্ঠীর মধ্যে বড় মান পায়; তাহারা বিশেষ শিরোভূষণ ব্যবহার করিতে পায়, এবং তাহাদের মাথার উপরে একটী করিয়া অষ্ট্রীচ পক্ষীর পালক বিরাজ করে।

সুমালীরা তাহাদের অপরাপর কুটুম্বজাতি অপেক্ষা দেখিতে ভাল, দেহের গঠন অতি সুন্দর; বিষুবরেখার নিম্ন ও জুবানদীর মোহানা হইতে উত্তরাভিমুখে এবং আফ্রিকার অত্যন্ত পূর্ব্বাংশে, জুবানদীর উত্তর ও পূর্ব্বদিকে যে সকল সুমালী বাস করে, তাহারা বড় বলবান, প্রবল ও সংখ্যায় অধিক। অন্যান্য সুমালিদের অপেক্ষা তাহাদের শারীরিক সৌন্দর্য্য অধিক; তাহাদের যাঁহারা দেখিয়াছেন, তাঁহারাই তাহাদিগকে অত্যন্ত সুন্দর বলিয়া বর্ণন করিয়া গিয়াছেন,—তাহাদের ডিম্বাকৃতি মুখমণ্ডল, উচ্চ ও গোলাকার ললাট সম্পন্ন, ওষ্ঠাধর কঠিন, শ্রেণীবদ্ধ দন্তশোভাযুক্ত এবং নেত্র উজ্জ্বল।—

সুমালিদের দীর্ঘ কেশ স্কন্ধদেশ পর্য্যন্ত ঝুলিয়া থাকে। আমাদের রামায়ণে যে লেখা আছে, যে, মাতার দিক হইতে তাহারা গন্ধর্ব্বের ভাব ও রক্ত পাইয়াছে ইহা সত্য মনে হয়। গন্ধর্ব্বেরা পূর্ব্বে দীর্ঘ কেশ রাখিত।

সুমালিজাতি অনেক শাখা দলে বিভক্ত; তাহারা রণপ্রিয় ও গোঁড়া মুসলমান; বর্ষা ঢাল, ছোট ছোট তরবারি সতত তাহারা প্রাচীন মিসরীদের মত সঙ্গে রাখে ও ব্যবহার করে—একটু কোন বিবাদেই তাহারা অস্ত্র চালাইতে উদ্যত হয়। বেশীভাগ তাহারা যাযাবরজীবন পছন্দ করে, কিন্তু অনেকে তাহাদের মধ্যে এখন নানা সহরে বসতি স্থাপন করিয়াছে। তাহাদের মধ্যে অনেকে পশুপালক, কৃষীজীবি, ও বাণিজ্যপ্রিয়। খুব সম্ভব এই বাণিজ্যসূত্রেই সুমালিজাতি ভারতসমুদ্র পার হইয়া আফ্রিকায় যাইয়া উপনিবেশ স্থাপন করে।

পূর্ব্বে যে বলিয়া আসিলাম যে, সুমালীদিগকে ইউরোপীয় পর্য্যটক ও পণ্ডিতদের কেহ কেহ সভ্য ও আর্য্যজাতির মধ্যে কল্পনা করিয়া তুষ্ট হয়েন; তাহাদের কল্পনা ও গণনায় আমি দোষ দিতে পারি না, কারণ প্রাচীন ভারতীয়

পণ্ডিতেরাও রামায়ণের সুমালীর জন্মসম্বন্ধে যাহা লিখিয়া গিয়াছেন, তাহাতে সুমালিজাতিকে একেবারে অসভ্য কাফ্রিজাতি বলা যায় না। স্থানের গুণে অনেকে কালো হইয়া যায়, সেইরূপ সুমালিরাও অনেকটা হইয়া গিয়াছে।—

সভ্যাসভ্যতার চিহ্ন, আকার প্রকার গঠনাদির দ্বারা বিশেষরূপে বুঝিতে পারা যায়,—সুমালিদের চেহারায় ধরিতে পারা যায়, যে, তাহারা নিতান্ত অসভ্য নহে; সভ্যতার ছায়ায় তাহারা অনেক দিন হইতে বাস করিতেছে। কালো রং হইলেই যে অসভ্যজাতি হইবে এরূপ সিদ্ধান্ত বাতুলতা মাত্র। সাহেবেরা অনেকটা এই সিদ্ধান্তে মত্ত হইয়া কৃষ্ণকায় জাতিমাত্রকেই অবহেলা চক্ষে দেখেন, ভাবেন তাহারা অসভ্যজাতি। এটা তাঁহাদের সম্পূর্ণ ভ্রম। আকার প্রকার গঠনাদির দ্বারা প্রকৃতপক্ষে আমরা জাতীয় চরিত্রগঠন বুঝিতে পারি। সাহেবদের মধ্যে যাহারা মহা পণ্ডিত তাঁহারা এটী বুঝিয়াছেন যে, কালো রঙে সভ্যাসভ্যতা নির্ণয় হয় না! রাজা রামমোহন রায়ের সঙ্গে তাহার সহকারী কর্ম্মাধ্যক্ষরূপে রামরতন বলিয়া একজন ব্রাহ্মণ বিলাতে যায়; তাহার বর্ণ ছিল, যেমন আমাদের দেশের পিঙ্গলবর্ণ হয় তেমনি; কিন্তু তাহার আকার প্রকার গঠনাদি সুন্দর ও সুপুরুষোচিত ছিল, তাহার শারীরিক গঠনাদি ও মাথার গঠনপ্রকার বিচার করিয়া বিলাতীয় পণ্ডিতেরা ককেশীয় অর্থাৎ আর্য্যজাতীয় বলিয়া ঠিক করিয়াছিলেন। সুমালীদেরও 'গড়ন' দেখিয়া বুঝা যায় যে তাহারা নিতান্ত অসভ্য নহে!—সুমালিদের বীরত্বের কথাও আমাদের ভারতীয় গ্রন্থকারেরা যেমন লিখিয়া গিয়াছেন, এখনও তাহাদের সেই বীরত্বের দৃষ্টান্ত আমরা জ্বলন্ত দেখিতে পাইতেছি;—একবার দেবসৈন্যদের সঙ্গে সুমালীপ্রমুখ রাক্ষসেরা এবং স্বয়ং সুমালি কিরূপ যুদ্ধ করিয়াছিলেন, কিরূপ দেবসৈন্যদের বিধ্বস্ত করিয়াছিলেন দেখাইয়াছি, এখন সুমালিরা বর্ত্তমান দেবসৈন্য ইউরোপীয়দের কিপ্রকারে বিধ্বস্ত করিল, তাহার একটা সংক্ষিপ্ত ছবি পাঠকবর্গকে দিই, তুলনায় বুঝিতে পারিবেন যে প্রাচীন ইতিহাস কেমন সত্য। আমরা বরাবর আমাদের প্রাচীন কাব্যশাস্ত্রসমূহকে ইতিহাস-চক্ষে দেখিয়া বহুদিন হইতে তাহার ঐতিহাসিক সত্যতা প্রতিপন্ন করিতে বিশেষ চেষ্টা করিয়াছি। বহু বিদ্বান লোককে, আমাদের ইতিহাস নাই, আমাদের বিজ্ঞান নাই, আমাদের কোন কিছুতে যথার্থ বিজ্ঞান নাই, এরূপ

বলিয়া আমাদের শাস্ত্রসমূহকে হট করিয়া উড়াইয়া দিতে দেখিয়াছি।—আমাদের আত্মীয় অনেকে এইরূপ পাশ্চাত্যভাবে একেবারে অতিমাত্রায় চড়িয়া আমাদের দেশের সত্য সকল উড়াইয়া দিতে বসিয়াছিলেন, তখন তাঁহাদের বিরুদ্ধে বলে কার সাধ্য? যাহা বলিব তাহাই উড়াইয়া দিবেন, ভাবিলাম দুদিন পরে তাঁহাদের আমাদের কথায় সায় দিতে হইবে। এখন আর কিছু বলিব না, ধৈর্য্য ধরিয়া থাকি। ঠিক তাহাই হইল, দেখিলাম, ফিরিয়াছেন, কিন্তু ফিরিতে ফিরিতে আবার এমনি অধিক দূরে গিয়াছেন, যে সে আধিক্যে আবার আমাদের সত্যসমূহ পুনরায় ঢাকা পড়িবার উপক্রম হইয়াছে। আধিক্যমোহযুক্ত চক্ষে ঐতিহাসিক সত্য নির্ণয় করা বড়ই কঠিন। নিঃস্বার্থভাব চাই, নিরপেক্ষভাব চাই, তবে যথার্থ ঐতিহাসিক তত্ত্বনির্ণয় করা যায়, নচেৎ ইতিহাসের সত্যতা ঠিক করা বড়ই দুঃসাধ্য ব্যাপার। যদি ইতিহাস ঠিক বুঝিতে চাও সমতা চাই। এই সমভাবকে হৃদয়ে ধরিয়া আমরা বুঝিতে পারিতেছি—যে কোন্ পুরাতন যুগে সুমালিরা যে বীরত্ব দেখাইয়াছে এখনও প্রায় সেই সুমালীচরিত্র আমরা ইউরোপীয় দেবতাদের সঙ্গে উহাদের যুদ্ধে দেদীপ্যমান দেখিতেছি। এখন সুমালিমোল্লা সুমালীবংশধরেরা ইউরোপীয়দের সেইরূপ বিধ্বস্ত করিয়াছে:—১৩১০ সালের বৈশাখের সুমালি যুদ্ধের কথা মনে পড়ে? কর্ণেল প্লঙ্কেট তাঁহার সমুদয় সৈন্য ও সেনানীসহ কিরূপে নিহত হয়েন! প্লঙ্কেট প্রমুখ ইউরোপীয় দেবসৈন্যদের সঙ্গে যখন সুমালিদের যুদ্ধ হয় তখন সুমালীরা আশ্চর্য্য নির্ভীকতা ও সাহসের পরিচয় দিয়াছিল।—তাহারা ভয়ানক রণমত্ত হইয়া যুদ্ধ করে, এরূপ রণমত্ততার ছবি সচরাচর দেখা যায় না।—ইংরাজের মেকসিম কামানের মুখে রাশি রাশি সুমালি বিনষ্ট হয়; কিন্তু সম্মুখবর্ত্তী সুমালিদের পতন হইতে না হইতেই পশ্চাদ্বর্ত্তী সুমালীরা আসিয়া ইংরাজের কামানের—আগ্নেয় বাণের সম্মুখে আসিয়া নির্ভয়ে উপস্থিত হয়। যতক্ষণ দূর হইতে শ্বেতকায় দেবসেনারা আগ্নেয় অস্ত্রের প্রভাব দেখাইতে সমর্থ হয়েন ততক্ষণ সুমালিরা বৃটিষবাহিনীর উপর তেমন বল প্রকাশ করিতে সমর্থ হয় নাই, কিন্তু সময়ে আগ্নেয় অস্ত্রের কিঞ্চিৎ অভাব বুঝিয়াই সুমালিরা বর্ষার সাহায্যে ইউরোপীয় সেনাদিগকে নিপাত করিতে সমর্থ হয়। তাহাদের হস্তে কর্ণেল প্লঙ্কেটের সেনাদল নিহত হয়, মেজর গফের সেনাদল পরাস্ত হয়; ইংরাজদেবতাদের বহু সেনা ও বহু সেনানী

সুমালীযুদ্ধে হত হয়. এই সুমালিযুদ্ধে ইংরাজের প্রায় পঁচাত্তর লক্ষ টাকা ব্যয় হয়, পঁচাত্তর লক্ষ কি তাহার অপেক্ষা অধিক ব্যয় হইয়াছে বলিয়া মনে হয়।—প্লঙ্কেটবিভ্রাটে অন্যান্য ইউরোপীয় দেবতারা বুঝিল যে রাক্ষসের কাছে কৃষ্ণকায়ের কাছে শ্বেতকায় দেবতাদের পরাজয় হওয়াতে ইউরোপীয় দেবতাদের মান হানি হইয়াছে। প্লঙ্কেটবিভ্রাটে ইউরোপীয় দেবসেনাদের পরাজয় হয়, তৎসঙ্গে সুমালিদের উৎসাহ বৃদ্ধি পায় ও সুমালিমোল্লার সেনাদলে অনেক সুমালি আসিয়া প্রবেশ করে;—ইংরাজ সেনাপতিরা বলিয়া গিয়াছেন, "প্লঙ্কেট ও তাঁহার সেনাদল বিধ্বস্ত হইবার পর, গুম্বুরীযুদ্ধে বৃটিষসেনার পরাজয়ের পর, সুমালি অধ্যক্ষের সৈন্যদলে লোক বৃদ্ধি পায়: তাহাতে তাহার লোক হয় আশী হাজার বর্ষাধারী পদাতিসেনা এবং তিন হাজার সর্ব্বপ্রকার অস্ত্রশস্ত্রধারী অশ্বসাদী;"—রামায়ণের সুমালিযুদ্ধে ইন্দ্র যেমন বিচলিত হয়েন, সেইরূপ ইংরাজ সমরসচিব ব্রডরিক মহোদয়কে বিচলিত হইতে হইয়াছিল; তিনি ঈষৎ যেন ব্যাকুলিতচিত্তে বলেন "সুমালিদেশের যেখানে আমাদের সৈন্যসামন্ত যায়, ও যুদ্ধবিগ্রহ হয়, সেস্থানে অধিকার বা প্রভুত্বস্থাপনেচ্ছা আমাদের ছিল না। আমরা শুদ্ধ সমুদ্রতীরে বন্দরগুলির উপর আধিপত্য স্থাপনের অভিলাষ করিয়াছিলাম; যে সকল সুমালিদলের সহিত আমাদের সখ্যতা আছে, তাহা আমরা রক্ষা করিতে চাই। সুমালীদের গৌরবের আমরা কিঞ্চিৎ লাঘব করিয়াছি; তাহাদের প্রতিপত্তিতে আমরা কিঞ্চিৎ আঘাত দিতে সমর্থ হইয়াছি, বাস্ তাহা হইলেই যথেষ্ট হইল; আর বৃথা আমাদের ইটালীর অধিকৃত সুমালিদেশে গিয়া রণক্রীড়া করা উচিত নহে।"

রামায়ণে দেবতারাও সুমালির দলের সঙ্গে—রাক্ষসদের সঙ্গে যুদ্ধ করিতে ভীত হয়েন, এখনও তাই দেখি ইউরোপের দেবতারাও এই সুমালীদের সঙ্গে যুদ্ধ করিতে ভীত হইয়া উঠেন। এই যে সুমালীযুদ্ধ ইহাকে আমরা এক কথায় বলিতে পারি যে এই যুদ্ধ দেবরাক্ষসযুদ্ধ; প্রাচীন ভারতের গ্রন্থপাঠে জানিতে পারি যে দেবতাদের সঙ্গে দৈত্য, দানব, অসুর প্রভৃতির ঘোর যুদ্ধ হয়! এ যুদ্ধও দেবরাক্ষস যুদ্ধ। ইহা দেবদৈত্য দেবদানব বা দেবাসুর যুদ্ধ নয়; ইহা দেবরাক্ষস যুদ্ধ। কারণ সুমালীরা, দৈত্য, অসুর বা দানব জাতীয় নহে,

তাহারা প্রকৃতপক্ষে রাক্ষসজাতি!—যদিচ তাহাদের মাতার দিক হইতে তাহারা গন্ধর্ব্বের রক্ত প্রাপ্ত হইয়াছে।

এই সুমালিদের অন্যতম শাখা হইতেছে গালা, ও দানাখিল জাতি! গালা, দানাখিল ও সুমালি ইহারা তিনটী জাতি মূল একটী জাতি হইতে বাহির হইয়াছে। এই জাতিত্রয়ের ভাষায় মধ্যে কেমন সাদৃশ্য আছে। কিন্তু এখনকার সুমালিদের ভাষা তাহাদের মুসলমান ধর্ম্ম দীক্ষার পর হইতে অনেকটা পরিবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছে। একে তাহারা মুসলমান ধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়াছে, তাহার উপর আবার তাহারা অন্যান্য জাতির সঙ্গে বাণিজ্যসূত্রে সম্বদ্ধ। তাহারা বাণিজ্য করিতে বেশ জানে, এবং বুদ্ধিমান। কৃষ্ণকায় জাতি বলিয়া শ্বেতকায় আর্য্যেরা তাহাদের অসভ্য বর্ব্বর বলিয়া পদদলিত করিতে যান, শেষে চমকিয়া উঠেন, স্পর্শ করিয়া জানিতে পারেন কৃষ্ণকায় জাতিটী বড় সামান্য নহে—কালসর্পবিশেষ!—দেখিয়া শুনিয়া শ্বেতকায় দেবসৈন্যেরা মহাত্রস্ত হইয়া উঠিয়াছেন, সুমালিমোল্লার সঙ্গে সন্ধিস্থাপনে প্রয়াসী হইয়াছেন—অপেক্ষায় রহিয়াছেন—কখন তাঁহাদের মধ্যে রামায়ণের সুমালীনাশক মহাত্মা বসুর ন্যায় একজন 'বসু'র আবির্ভাব হইবে!

কি বিক্রম সুমালিজাতির! সুমালিজাতি 'হচ্চে' রাবণের মাতামহের বংশধর। বিক্রম তো হইবারই কথা। একবার সুমালিযুদ্ধের সময় জেনারল ম্যানিং খবর দিলেন যে ত্রিশজন সেনা ব্যতীত সমুদয় ইংরাজসৈন্য সুমালিহস্তে প্রাণত্যাগ করিয়াছে! এই যুদ্ধে এগারজন সেনাপতি মারা পড়েন; এই যুদ্ধেই ছিলেন কর্ণেল প্লঙ্কেট; তিনিও মারা পড়েন, তাঁহার দশজন সহযোগী মারা পড়েন, সাতজন কাপ্তেন ও তিনজন লেফ্‌টেনেণ্ট মারা পড়েন। এই সুমালিযুদ্ধটী পূর্ব্বোক্ত গুম্বুরীর যুদ্ধ,—১৩০৩ সালের ১৭ই এপ্রেলে ঘটে। এই সুমালিরাও 'ধর্ম্মযুদ্ধ' জেহাদের মর্ম্ম জানে; সুমালিমোল্লা আপন সেনাদের সন্ন্যাসীসৈন্যরূপে, ধর্ম্মসেনারূপে পরিণত করিয়া আপনি তাহাদের ধর্ম্মনেতা সন্ন্যাসীরূপ ধারণ করিয়াছেন।—এবং ধর্ম্মনেতারূপে তাহাদের শত্রুজয়ার্থ পরিচালনা করিতে উদ্যত!—ধর্ম্মোন্মত্ত সুমালিসৈন্যদিগকে তাই ইংরাজ ও হাবসিসৈন্য একত্র হইয়াও পারিয়া উঠে নাই; হাবসি অর্থাৎ আবিসিনীয় সৈন্যগণ ইংরাজ সৈন্যদের রীতিমত সাহায্য করে। তথাপি পারিয়া

উঠিলেন না!

এখন মোল্লার সঙ্গে ইটালী ও ইংরাজের, সঙ্গে আপাততঃ সন্ধি স্থাপিত হইয়াছে! সুমালিমোল্লা এখন ফের সুমালিদের কর্ত্তা হইয়া উঠিয়াছেন! মোল্লার জয় হইয়াছে! ইংরাজী বা য়ুরোপীয় দেবতারা আর মোল্লাকে Mad বলিতে চাহেন না। সংবাদ পত্রে সুমালীমোল্লার জয়ের কথা যাহা প্রকাশিত হয় হাতা উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

THE MULLAH'S TRIUMPH.

"The history of the Italian negotiations with the Mullah (who, it may be noted is no longer styled the "Mad" Mullah) was told in full by Signor Tittoni in the Italian Chamber of Deputes A detailed report of the proceedings is published in the Times, from which it appears that after mentioning the condition of the Mullah into Italian territory and of the anxiety which was felt as to the security of the Italian colony in view of the hostility incurred by Italy on account of the support it had given to the British expedition, Signor Tittoni related Mission into Northern Somaliland to see if it was not possible to come to some agreement with the Mullah, since it was not possible for the Italian Government to undertake such a war as England had recently carried on at an expense to herself of more than £4,000,000 sterling. This Mission he entrusted to Cavalier Pestalozza, who was able to treat personally with the Mullah, and succeeded in signing an agreement for the general pacification of the country. To this agreement the two Sultans of Obbia and of the Mijurtains have also consented, and in this manuer there has been secured the pacification of the whole of Northern Somaliland. The agreement provides for the general pacification, in the interests Italy, of all that region which is protected by her, and also in the interests of England. Every dispute which may arise between the Mullah and the dependents of the English Government, or between the Mullah and the depen-

dants of the English Government will be settled by means of a mixed commission presided over by an Italian delegate. The Mullah places himself under the protection of the Italian Government and under the Italian flag. He is authorized to construct for himself a permanent residence at a determined point of the coast (with the consent of the Sultans of Obbia and of the Majurtains) governing the territory landlords. On the territory administered by the Mullah there shall be liberty of commerce. The Mullah pledges himself to "prohibit the importation of arms and ammunition and to prevent, in the most absolute fashion, the traffic and commerce in slaves." The Italian Government shall have the right of establishing at the seat tf the Mullah a representative with his own guards and of instituting a douane. The Signor concluded thus: 'His Majesty's Governmet in this treaty concluded with the Mullah having proceeded in full understanding with the English Government, the latter has naturally guarauteed us on its part the observance of the condition to which we have pledged it towards the Mullah." Not a few difficulties had to be overcome to arrive at this solution, which by assuring the general peace puts an end to raids and massacres and removes the danger of those conflicts which have cost England so much in blood and money. The pacification of the Mullah obtained by Italy by dint of persevering labour has drawn still closer the bonds of friendships between England and Italy."

শ্রীহিতেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

সোণায় অরুচি।

(উপন্যাস।)

উপক্রমণিকা।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

"সোণায়-অরুচি"—পাঠক কখন শুনিয়াছেন কি? এই বিংশ শতাব্দীর গহণার মরসুমে কখন কাহারো সোণায় অরুচি হইয়াছে,—এমন কথা শুনিয়াছেন কি? আর আপনি অলঙ্কার-গর্ব্বকারিণী বঙ্গের সুন্দরী পাঠিকা—এই বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে অলঙ্কার লাভ লোভে, অর্থহীন—সঙ্গতিহীন দরিদ্র স্বামীদলন মহামরসুমে, কখন কাহারো "সোণায় অরুচি"—এই অদ্ভুত কথা শুনিয়াছেন কি? বোধ হয় শুনেন নাই। আমি কিন্তু—শোনা তো দূরের কথা, স্বয়ং স্বচক্ষে—"সোণায় অরুচি" দেখিয়াছি, আর দেখিয়াছি বলিয়াই সেই অপূর্ব্ব কাহিনী আপনাদের অবগতির জন্য এখানে লিখিতে বসিয়াছি।

রজনী রঞ্জন শর্ম্মা আমার বাল্য সুহৃৎ। শৈশব হইতে আমি ও রজনী রঞ্জন একই বিদ্যালয়ে একই শ্রেণীতে,—ঢাকা কালেজিয়েট স্কুলে পাঠ করিতেছিলাম। আমার পিতা ঢাকা সহরে ডেপুটীমাজিষ্ট্রেটি করিতেছিলেন, আর রজনীরঞ্জনের পিতা হরকান্ত বিদ্যারত্ন মহাশয় ঢাকা সহরে একটা ইংরাজি বিদ্যালয়ে সংস্কৃত সাহিত্যের অধ্যাপকের কার্য্য করিতেন। আমাদের উভয়েরই বাসা একস্থানে,—উভয়েরই বাড়ী বিদেশে; আমাদের বাড়ী হুগলী জেলায়, রজনীদের বাড়ী যশোহরে। সুতরাং বিদেশে বিদেশীয় জনের মধ্যে যে আত্মীয়তা স্থাপন হয়, দেশে তাহার শতাংশের একাংশও হয় কিনা সন্দেহ। তাই, উভয় বাড়ীর মধ্যে আত্মীয়তাও যথেষ্ট জন্মিয়াছিল। তারপর রজনী রঞ্জন আমাপেক্ষা অধিক প্রতিভাশালী ছাত্র দেখিয়া আমার গুণগ্রাহী পিতাও রজনীরঞ্জনকে অত্যধি স্নেহ করিতেন। এমনই ভাবে রজনীর সহবাসে,

আমার প্রথম জীবনের কয়েক বৎসর বড় সুখে কাটিয়া গেল। কয়েক বৎসর পর আমরা উভয়েই ঢাকা কলেজিয়েট্ স্কুল হইতে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলাম। আমি দ্বিতীয় বিভাগে—রজনীরঞ্জন মাসিক বিংশ মুদ্রা বৃত্তি সহকারে প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হইলেন।

ঠিক সেই সময়ে, আমাদের পরীক্ষার ঠিক পরেই, পিতৃদেবঠাকুর দীর্ঘ কয় বৎসর পর, তিন মাসের বিদায় লইয়া দেশে গেলেন—সেই সঙ্গে আমার আশৈশবের ঢাকার বাসও উঠিল। আমি ঢাকা হইতে বাড়ী আসিয়া বসিলাম। এদিকে আমাদের পরীক্ষার ফল বাহির হইবার পূর্ব্বেই রজনীর পিতা বিদ্যারত্ন মহাশয়ের একখানি পত্র পাইলাম। বিদ্যারত্ন মহাশয় লিখিয়াছিলেন যে, "আগামী ২৭ শে জ্যৈষ্ঠে, ফরিদপুরের সদর আলা, চব্বিশ পরগণা জেলা নিবাসী শ্রীযুক্ত রাধাচরণ বন্দোপাধ্যায় মহাশয়ের কনিষ্ঠা কন্যা শ্রীমতী পঙ্কজিনী দেবীর সহিত, রজনীর বিবাহ হইবে।" আমি রজনীর শৈশব সুহৃৎ—রজনীর পিতা বিদ্যারত্ন মহাশয় ও রজনীরঞ্জনের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা মোহিনী রঞ্জন বাবু—উভয়ে আমাকেও রজনীর ন্যায় সমধিক স্নেহ করিতেন; তাই রজনীর বিবাহ উপলক্ষে আমাকে তাঁহাদের গৃহে যাইবার জন্য নিমন্ত্রণ ও বরাবর অনুরোধ করিয়া পত্র লিখিয়াছেন। এবং পিতার অনুমতির জন্য পিতাকেও অনুরোধ করিয়া পৃথক একখানি পত্র লিখিয়াছিলেন। কিন্তু হঠাৎ সে সময়ে আমার বিমাতৃদেবী অত্যন্ত কাতর হওয়ার জন্য, রজনীর বিবাহোৎসবে যোগ দিয়া হৃদয়ে সুখানুভব করিতে পারিলাম না। এদিকে তিন মাস ছুটি কাটিলে পর, পিতৃদেবঠাকুর এবার উত্তর বঙ্গের কোন জেলায় বদলি হইলেন। সুতরাং অগত্যা আমিও দীর্ঘকাল পরে, জীবনে এই প্রথম পরমারাধ্য পিতৃদেবের স্নেহক্রোড় পরিত্যাগ করিয়া কলিকাতা আসিয়া প্রেসিডেন্সী কালেজে এফ্, এ, পড়িতে লাগিলাম। ইতিপূর্ব্বে রজনীর সহিত আমার যুক্তি ছিল যে, সে যদি প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া মাসিক কুড়ি টাকা করিয়া বৃত্তি পায়, তবে প্রেসিডেন্সী কালেজে এফ্. এ, পড়িবে। কিন্তু কলিকাতা আসিয়া কুড়ি টাকা বৃত্তি পাওয়া সত্ত্বেও, রজনীকে কলিকাতা আসিতে বিরত দেখিয়া আমি নিজেই স্বতঃ প্রবৃত্ত হইয়া তাহাকে একখানি পত্র লিখিলাম। পত্রে অন্যান্য কথার পর লিখিলাম যে,—"আমি প্রেসিডেন্সী কালেজে ভর্ত্তি হইয়াছি,

—তুমিও সত্বর আসিয়া ভর্ত্তি হইবে।”

পত্র লিখিবার প্রায় এক সপ্তাহ পরে রজনীর পত্র পাইলাম। রজনী পত্রে লিখিয়াছেন যে, তাঁহার বিবাহের ঠিক এক সপ্তাহ পরে হঠাৎ তাঁহার পিতার মৃত্যু, সংসারে একমাত্র রজনীর অগ্রজ মোহিনী রঞ্জন বাবুর সামান্য চাকুরী—যৎসামান্য উপার্জ্জন; সুতরাং এত বড় বৃহৎ পরিবার প্রতিপালন করিবার পর, তাঁহার দ্বারায় রজনীর কলিকাতা পাঠের কোনই সাহায্য হইতে পারে না; বরং রজনীরঞ্জন কলিকাতা অধ্যয়ন না করিয়া ঢাকা কালেজে পড়িলে, তাঁহার বৃত্তির কয়েকটী টাকা হইতে সংসারের অনেক সাহায্য হইতে পারে,—এই সব ভাবিয়া চিন্তিয়া রজনীরঞ্জন কলিকাতা পাঠের সঙ্কল্প পরিত্যাগ করিয়া, ঢাকা কালেজে পড়াই স্থির করিয়া ঢাকা কালেজেই ভর্ত্তি হইয়াছেন।

এমনই অবস্থায় দুই বৎসর অতীত হইয়া গেল। এই দুই বৎসরের মধ্যে রজনীর সহিত আর আমার সাক্ষাৎ হয় নাই। তবে প্রায় প্রতি মাসেই রজনীর নিকট হইতে দুই তিনখানি পত্র পাইতাম, এবং আমিও মাস মাস দুই চারিখানি পত্র লিখিতাম। এমন ভাবে দুই বৎসর পর আমরা এফ্, এ, পরীক্ষা দিলাম। আমি প্রেসিডেন্সী কালেজ হইতে—রজনীরঞ্জন ঢাকা কালেজ হইতে পরীক্ষা দিলেন।

* * * *

যথাসময়ে এফ্, এ, পরীক্ষার ফল বাহির হইল। আমি পূর্ব্বমত প্রেসিডেন্সী কালেজ হইতে দ্বিতীয় বিভাগে, আর আমার সেই শৈশব সুহৃৎ রজনী রঞ্জন এবার ঢাকা কালেজ হইতে এফ্, এ, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া, প্রথম দশম স্থানের মধ্যে তৃতীয় স্থান অধিকার করিয়া মাসিক পঁচিশ টাকা বৃত্তি পাইয়াছেন। আমি রজনীর এবারকার কৃতকার্য্যতা দেখিয়া তাহাকে কলিকাতা প্রেসিডেন্সী কালেজে বি, এ, পড়িবার জন্য জেদ করিয়া একখানি পত্র লিখিলাম। পত্রে লিখিলাম,—“তোমার অত্যধিক কৃতকার্য্যতায় আমি মুগ্ধ হইয়াছি। এখন তোমার মত প্রতিভাশালী লোকের পক্ষে কলিকাতা আসিয়া, বিশ্ববিদ্যালয়ের শ্রেষ্ঠ কালেজ—প্রেসিডেন্সী কালেজে বি, এ, পড়াই কর্ত্তব্য, বিশেষতঃ এবার তুমি পঁচিশ টাকা বৃত্তি পাইয়াছ। তারপর, তোমার শ্বশুর সদর আলা, মাস মাস বিপুল অর্থ উপার্জ্জন করিতেছেন; সুতরাং

তাঁহাকে লিখিলেই, তিনি তোমার মত প্রতিভাশালী জামাইকে অধ্যয়ন জন্য মাস মাস বিশ পঁচিশ টাকা সাহায্য করিতে কখনই কুণ্ঠিত হইবেন না। এমন অবস্থায় কালবিলম্ব না করিয়া কলিকাতা আসিও।”

ঠিক নির্দ্দিষ্ট দিনে রজনীর পত্র পাইলাম। রজনী আমাকে লিখিয়াছিলেন যে,—

“প্রিয়তম সুহৃৎ অমর! তোমার পত্র পাইলাম। এতদিন—এই ক' মাস যেমন মনঃকষ্ট পাইতেছিলাম, এখন তোমার পত্র পড়িয়া আমার সে মনঃকষ্ট কতকাংশে দূর হইল। তুমি আবার আমাকে কলিকাতা যাইয়া প্রেসিডেন্সী কালেজে পড়িবার উপদেশ দিয়াছ; আমারও আন্তরিক ইচ্ছা ছিল যে, এফ্, এ, পাসের পর পঁচিশ টাকা বৃত্তি পাইলে প্রেসিডেন্সী কালেজেই বি, এ, পড়িব। কিন্তু আমার দুর্ভাগ্যক্রমে, এখন আর তাহা ঘটিয়া উঠিতেছে না। এতদিন, পিতার মৃত্যুর পর, দাদার আশীর্ব্বাদে আমাকে সংসারের কোন ভাবনাই ভাবিতে হইতেছিল না; কিন্তু, সম্প্রতি ক' মাস হইতে, অত্যধিক শারীরিক ও মানসিক পরিশ্রম— কঠোর অর্থচিন্তা প্রভৃতিতে অগ্রজ মহাশয়, হটাৎ কঠিন রোগগ্রস্ত হইয়াছেন। এতদিন এ অবস্থায়ও তিনি চাকুরী করিলেন; কিন্তু, সম্প্রতি তাঁহার শারীরিক অবস্থা দেখিয়া বাধ্য হইয়া তাঁহাকে শিক্ষকতা কার্য্য হইতে ছাড়াইয়া বাড়ী আনিয়া বসাইতে হইয়াছে। আমাদের সাংসারিক অবস্থা তুমি জানিতেছ, যতক্ষণ এক পয়সা উপার্জ্জন করিব, ততক্ষণ অন্ন—উপার্জ্জন বন্ধ হইলেই কঠোর অন্নচিন্তায় চারিদিক অন্ধকার দেখিতে হয়। ইতিপূর্ব্বে পিতৃদেবঠাকুরের মৃত্যুর পর হইতেই, তাঁহার উপার্জ্জন বন্ধ হইয়াছিল। এখন অগ্রজ মহাশয় পীড়িত, সুতরাং তাঁহারও উপার্জ্জন নাই। সম্প্রতি সংসারের এতগুলি দিন যাপনের উপায় আমি ভিন্ন দ্বিতীয় আর কেহ নাই। বোধ হয়, বৃত্তি না পাইলে, এইখানেই আমার আশৈশবের তীব্র অধ্যয়ন স্পৃহার সমাপ্তি করিতে হইত; কিন্তু বৃত্তির মায়ায় কালেজ ছাড়িতে পারিতেছি না। এখন আমাদের সংসারের অবস্থা এমনই শোচনীয় দাঁড়াইয়াছে যে, আমার বৃত্তির কয়েকটি টাকা এবং অগ্রজ মহাশয়ের নব পরিণীতা বালিকা পত্নীর পিতৃপ্রদত্ত অলঙ্কার-বিক্রয়লব্ধ অর্থের উপর নির্ভর করিয়া বড় কষ্টে দিন কাটাইতে হইতেছে। আমরা দুঃখ পাই তাহাতে

কোন ক্ষতি নাই; কিন্তু দাদা যে বড় কষ্ট পাইতেছেন,—ইহাই সমধিক দুঃখের কারণ হইয়াছে। একে ভীষণ রোগযন্ত্রণা, তারপর, কঠোর অন্নচিন্তা —এই উভয় চিন্তায় তাঁহাকে একেবারে জীবন্মৃত করিয়াছে। আমি যদিও সাধ্যানুসারে, তাঁহার যত্নের কোন ত্রুটি করিতেছি না, তবুও আমি যে অহরহ দারুণ অর্থচিন্তায় বিব্রত হইয়াছি,—এই ভাবনাই তাঁহার হৃদয়ে দারুণ শেলাঘাত করিতেছে। কিন্তু, অমর, ভাই! কি করিব—উপায় নাই, সবই আমার জন্মজন্মান্তরের কর্ম্মফল। এতদিন, জীবনের এই দীর্ঘকালও আমরা দরিদ্র ছিলাম—পিতৃদেবঠাকুর ও অগ্রজ মহাশয় বড় কষ্টে যাহা উপার্জ্জন করিতেন, তাহাতেই বড় কষ্টে আমাদের দিন কাটিতেছিল,—বড় কষ্টে আমাদের দিন কাটিলেও চিত্তে বিমল সুখ ছিল—মনে পর্য্যাপ্ত শান্তি ছিল। কিন্তু দুর্ভাগ্য আমার—এখন সে দারিদ্র্য পূর্ণ মাত্রায় আছে, শুধু শান্তি নাই,—শান্তির পরিবর্ত্তে ঘোর অশান্তি আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। তারপর, আমার ধনশালী সদর আলা শ্বশুরের কথা লিখিয়াছ? তিনি সদর আলা সত্য, উচ্চ রাজকর্ম্মচারী তাহাও সত্য। কিন্তু, অমর! অমন ইতরমনা লোক সংসারে কখন দেখিয়াছি বলিয়া আমার মনে হয় না। তিনি আমার কলিকাতায় কেন, বিলাত যাইয়া পড়িবারও সম্পূর্ণ ব্যয়ভার বহন করিতে স্বীকৃত আছেন, যদি আমি আমার অগ্রজ মহাশয়ের স্নেহপাশ চিরদিনের জন্য ছিন্ন করিয়া, সদর আলা তিনি—তাঁহারই আশ্রয় গ্রহণ করি। অমর, শুনিলে তুমি আশ্চর্য্যান্বিত হইবে, কোথায় আমায় আমার শ্বশুরের ন্যায় উচ্চশিক্ষিত ব্যক্তি, যদি বুঝিবার দোষে আমরা ভাইয়ে ভাইয়ে বিবাদ বিসম্বাদ করি, একতা নষ্ট করি, পৃথকান্ন হই, তবে তিনিই আমাদিগকে সতত সদুপদেশ দান করিয়া আমাদের ভ্রাতৃবিচ্ছেদ দূর করিবেন—ভ্রাতায় ভ্রাতায়, পরস্পরে পরস্পরে যাহাতে স্নেহ ও প্রীতি বৃদ্ধি হয় তাহারই উপায় করিবেন; না, লিখিতে ঘৃণা ও লজ্জা হয়, তিনি স্বয়ং, আমি যাহাতে আমার শৈশবের সেই আশ্রয়দাতা, আমার একমাত্র আপনার জন আমার সেই অগ্রজ মহাশয়,—তাঁহারই স্নেহপাশ ছিন্ন করিবার জন্য সতত আমার কর্ণকুহরে ভ্রাতৃবিচ্ছেদরূপ সুধা বর্ষণ করিয়া আসিতেছেন। তখন, এ হেন উপযুক্ত শ্বশুরের নিকট হইতে অধ্যয়নের সাহায্য পাইবার সম্ভাবনা যতটা, বুদ্ধিমান তুমি—তুমি তাহা সহজেই বুঝিতেছ।

তারপর, আমাদের অবস্থা এখন বড় খারাপ—বড় দুঃসময় পড়িয়াছে পাছে অনটনে পড়িয়া, তাঁহারই প্রদত্ত তাঁহার দুহিতা,—আমার স্ত্রীর গায়ের অলঙ্কার বেচিয়া খাইয়া বসি, এই ভয়ে এবার আমার স্ত্রীকে স্বামীগৃহে পাঠাইবার সময়ে তাঁহার গায়ের একখানি গহণাও তাঁহার সঙ্গে পাঠাইয়া দেন নাই। বরং যাহাতে আমাদের ভ্রাতায় ভ্রাতায় বিচ্ছেদ ঘটে, তাহারই যথোচিত উপদেশ দান করিয়া আমার দুঃখদারিদ্র্যপূর্ণ জীবনের সব শান্তিনাশ মানসে পাঠাইয়া দিয়াছেন। পাছে, অধ্যয়ন করিব বলিয়া তাঁহার নিকট হইতে অর্থ লইয়া, সেই টাকা সংসারে ব্যয় করি, এই বিশ্বাসে তিনি আমার শিক্ষার্থে এক কপর্দ্দকও সাহায্য করিতে প্রস্তুত নহেন। আমিও দিন দিন তাঁহার ও তাঁহারই দুহিতার ইতর প্রকৃতি দেখিয়া দেখিয়া ঘৃণা ও লজ্জায় আপনার মরমে আপনি মরিয়া রহিয়াছি। এবং, এমন নীচমনা লোকের অর্থে স্পর্শ পর্য্যন্ত করিতেও ঘৃণা বোধ করি। তোমাকে কতকি লিখিব ভাবিয়াছিলাম, কিন্তু পারিলাম না। তুমি এখান হইতে যাওয়ার পর, কি জানি কেন, বুঝি এখন আমি শনির হাতে ক্রীড়াপুত্তলে পরিণত হইয়াছি! যাহা হউক, তুমি মধ্যে মধ্যে আশাপূর্ণ—উৎসাহপূর্ণ পত্র লিখিয়া আমার চিত্তের মালিন্য দূর করিতে যত্ন ও চেষ্টা করিও। আর কি লিখিব, মনে হয়, এখন একবার তোমাকে দেখিলে বড় সুখী হইতাম,—হৃদয়ে বড় শান্তি পাইতাম। কিন্তু সে সুখ আমার অদৃষ্টে ঘটে কৈ? আমি অদৃষ্টে নির্ভর করিয়া ঢাকায়ই পড়িতেছি,—যেমন ফল হয় জানিতে পারিবে। সতত তোমাদের কুশল সংবাদে সুখী করিবে।" ইতি

তোমারই শ্রীরজনীরঞ্জন।

আমি রজনীর পত্র পড়িয়া, তাহার ভাগ্য বিপর্য্যয় ভাবিয়া আপনার মনে একটা দারুণ আঘাত পাইলাম।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

দেখিতে দেখিতে এমনই ভাবে দুই বৎসর কাটিয়া গেল। দুই বৎসর পর, অর্থাৎ আমার ঢাকা ছাড়িবার ঠিক চারি বৎসর পর, আবার কলিকাতায় রজনীর সহিত আমার সাক্ষাৎ হইল। এবার বি, এ, পরীক্ষা দিবার জন্য

রজনীরঞ্জন কলিকাতায় আসিয়া আমাদের ছাত্রাবাসেই উঠিয়াছিলেন। আমি দীর্ঘ চারি বৎসর পর রজনীরঞ্জনকে দেখিয়া—রজনীর বর্ত্তমান শারীরিক ও মানসিক অবস্থা দেখিয়া একেবারে চমকিয়া উঠিলাম। রজনীরঞ্জনেরা চির দরিদ্র সত্য, কিন্তু সেই চির দারিদ্র্যতার মধ্যেও রজনীদের গৃহে সকলের মুখে সতত যে প্রীতি প্রফুল্লতার মোহন হাসি দেখিতে পাইতাম, তেমন প্রীতি প্রফুল্লতা—তেমন সরল ও মধুর হাসি, কোন অর্থশালী ধনীর গৃহে কখন দেখি নাই,—জীবনে কোন দিন দেখিতে পাইব বলিয়াও মনে হয় না। তারপর, স্বয়ং রজনীরঞ্জন—রজনীরঞ্জন যেন বিধাতার অপূর্ব্ব সৃষ্টি। অতি শৈশবে আমি মাতৃহীন,—বিমাতার সংসারে আমি প্রতিপালিত; দণ্ডে দণ্ডে বিমাতার মর্ম্মান্তিক বাক্য যন্ত্রণায় আমার হৃদয়ের নিভৃততম প্রদেশে সতত যে আঘাত লাগিত, আমার সে অসহ্য হৃদয় যাতনা, একমাত্র শৈশব সুহৃৎ রজনীরঞ্জন অথবা রজনীরঞ্জনের অগ্রজ মোহিনী রঞ্জন বাবুর নিকট গেলেই—একমাত্র তাঁহাদের স্নেহপূর্ণ—আশাপূর্ণ, আশ্বাসপূর্ণ মধুর বচনে দূর হইত। এ হেন প্রিয়ংবদ রজনীরঞ্জনের বর্ত্তমান অবস্থা দেখিয়া আমার বুকের রক্ত শুকাইয়া যাইতেছিল। এতদিন যে রজনীরঞ্জন লোকের তিরস্কার ও অপমান, শ্রদ্ধা ও স্নেহ—সর্ব্বাবস্থায় সমানভাবে সরলতাপূর্ণ মধুর হাসিতে আপনার দেবতুল্য মধুর চরিত্রের মাধুর্য্য বিকীরণ করিতেছিল, আজ দীর্ঘ চারি বৎসর পর, সেই রজনীরঞ্জনের সেই চির প্রফুল্লবদনে অসহ্য মানসিক কষ্ট ও গভীর বিষাদের ঘন কালিমায় আচ্ছন্ন করিয়া দিয়াছে দেখিয়া আমার হৃদয় ভাঙ্গিয়া আসিল। প্রথম সাক্ষাতে কুশলাদি প্রশ্ন জিজ্ঞাসার পর, একে একে তাঁহার বিষাদের কারণগুলি শুনিয়া, বেশ বুঝিতে পারিলাম যে, পিতার মৃত্যু—মোহিনীরঞ্জনের কঠোর ব্যারাম, সঙ্গে সঙ্গে আয়ের পথ এককালিন রুদ্ধ; তারপর, প্রাণাধিক পত্নীর সতত দুর্ব্ব্যবহার—সদর আলা শ্বশুরের সতত লাঞ্ছনা, দিবা রাত্রি কঠোর অর্থচিন্তা, এই সব মিলিয়া মিশিয়া অকালে রজনীরঞ্জনের সেই প্রেম প্রীতিপূর্ণ প্রফুল্ল বদনে বিষাদের কালিমা পড়িয়া গিয়াছে।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

বি, এ, পরীক্ষার পর, একেবারে দীর্ঘ দশ বর্ষ অতীত হইয়া গেল। এই দশ বর্ষ মধ্যে, রজনীর সহিত আমার আর একবার মাত্র সাক্ষাৎ হইয়াছিল,—সাক্ষাৎ হইয়াছিল কলিকাতায়—সেনেট্ হলে, এম্, এ, পরীক্ষা দিবার কালে। তারপর আর সাক্ষাৎ হয় নাই, তবে পত্রাদি পূর্ব্বের ন্যায়ই চলিতেছিল।

দীর্ঘ দশ বর্ষ পরে রজনীর সহিত আমার সাক্ষাৎ হইল—পাটনায়। আমি তখন পাটনার সবডেপুটী কালেকটার নিযুক্ত হইয়া চট্টগ্রাম হইতে পাটনায় প্রেরিত হইয়াছিলাম। ইতি পূর্ব্বে, এম্, এ, পাসের পরই রজনীরঞ্জন বাঙ্গলার শিক্ষা বিভাগে প্রবেশ লাভ করেন এবং অল্প দিন কৃষ্ণনগর কালেজে অধ্যাপকের কাজ করিয়া, পাটনা কালেজে প্রেরিত হন, এবং এ পর্য্যন্ত পাটনা কালেজেই ছিলেন। বলিতে ভুলিয়া গিয়াছি যে, সে বৎসর রজনী রঞ্জন বি, এ, পরীক্ষা দিয়া কলিকাতা হইতে যান, সেই বৎসরই বি, এ, পরীক্ষার কয় মাস পর, রজনীরঞ্জনের অগ্রজ মোহিনীরঞ্জন বাবু কয়েক বৎসর কঠোর রোগযন্ত্রণা ভুগিয়া, ইহ সংসার হইতে চির বিদায় লইয়া যান।

আমি সপরিবারে পাটনায় আসিয়া, প্রথমতঃ আমার সেই শৈশব সুহৃৎ রজনীরঞ্জনের বাসায় উঠিয়া, রজনীরঞ্জনেরই আতিথ্য গ্রহণ করিলাম। দীর্ঘ-কাল পরে আবার রজনীকে পাইয়া মনে একটা বিমল সুখ হইল; কিন্তু সেই সঙ্গে রজনীর বর্ত্তমান অবস্থা দেখিয়া বড় দুঃখও হইল। এখন রজনী রঞ্জন আর শৈশবের সেই চির প্রফুল্ল রজনীরঞ্জন নাই—অনেক পরিবর্ত্তন হইয়াছে। আশৈশব চির দরিদ্র রজনীরঞ্জন এখন মাসে মাসে তিন শত টাকা বেতন পাইতেছিলেন, বড় পদে—পাটনা কালেজের অধ্যাপকের বড় পদে নিযুক্ত ছিলেন। কিন্তু দরিদ্র রজনীর চরিত্রে একটুমাত্র কলঙ্কও স্পর্শ করে নাই; বরং সরলতা, উদারতা প্রভৃতি অনন্ত গুণে তাঁহার বাল্যের সেই দেবচরিত্র আরও উদ্ভাসিত হইয়াছে। তবে বড়ই পরিতাপ ও দুঃখের বিষয় যে, দরিদ্র রজনীর শৈশবের সেই বিমল ও স্বর্গীয় মোহন মধুর হাসি আর নাই; তৎপরিবর্ত্তে গভীর দুঃখ ও গভীর নিরাশার ঘন কৃষ্ণমেঘে আমার সেই বাল্য সুহৃদের সেই প্রীতি প্রফুল্ল বদনমণ্ডলে গভীর কালিমা সঞ্চার

করিয়াছে। তারপর, আহারে—বিহারে, প্রতি বাক্যে—প্রতি কার্য্যে সতত সেই হৃদয়ভেদী গভীর নিরাশা ও মর্ম্মান্তিক দুঃখ প্রকটিত হইতেছিল।

এমনই অবস্থায় প্রিয়তম সুহৃদের গৃহে এক পক্ষ অবস্থান করিবার পর, আমি নিজে পৃথক বাসা করিলাম এবং পরিবার লইয়া বাস করিতে লাগিলাম। আমি পৃথক বাসা করিয়া বাস করিতে লাগিলাম, সত্য, কিন্তু রজনীরঞ্জনদের সহিত সম্পর্কটা দিন দিনই ঘনাইয়া আসিতেছিল। এমন কি দুই চারি দিন পরে পরেই, আমার স্ত্রী পুত্রেরা রজনীদের বাসায় যাইতেন, আবার রজনীর স্ত্রী এবং বিধবা ভগিনী হৈমবতী ও অপরাজিতা প্রভৃতিরাও আমাদের বাসায় আসিতেন। সেই সঙ্গে আমাকেও মধ্যে মধ্যে রজনীদের বাসায় নিমন্ত্রণাদি রক্ষা করিতে হইত—প্রফুল্ল মুখে রক্ষাও করিতাম। কিন্তু, দুঃখের বিষয়, রজনীরঞ্জন এখন কঠোর ব্রহ্মচর্য্যাবলম্বন করিয়াছিলেন,—প্রত্যহ দিনান্তে সায়ংকালে একবার মাত্র হবিষ্যান্ন গ্রহণ করিতেন, তাহাও যেমন তেমন নয়—কঠোর। তুচ্ছ প্রাণধারণ জন্য যেটুকু দরকার—যেটুকু না হইলে জীবন রক্ষাই হয় না, শুধু সেইটুকুই গ্রহণ করিতেন। অন্য কোন প্রকার বিলাসিতার দ্বারায় নিজের দেবোপম চরিত্র কলঙ্কিত করিতেন না। সুতরাং আমি দুই চারি দিন পরে পরেই রজনীর গৃহে নিমন্ত্রিত হইলেও, উহার প্রতিদান করিতে পারিতাম না,—রজনীকে কোন দিন নিমন্ত্রণ করিয়া চারিটি খাওয়াইতে পারিতাম না। কিন্তু রজনীকে কোন দিন নিমন্ত্রণ করিয়া খাওয়াইতে না পারিলেও, সে জন্য আমার চিত্তে কখন কোন অভিমান জন্মিত, অথবা তাঁহার নিমন্ত্রণ গ্রহণে কখন কুণ্ঠিত হইতাম,—তাহা নহে।

এমনই ভাবে দেখিতে দেখিতে পাটনায় আসিয়া আমার দুই মাস কাটিয়া গেল। দুই মাস পরে, একদিন রাত্রিতে আহারাদি সমাপন করিয়া, শয্যায় শুইয়া শুইয়া আপনার মনে গিরীন্দ্র মোহিনীর "শিখা" কাব্য পাঠ করিতেছিলাম। শয্যার উপর আমারই পার্শ্বে আমার স্বর্ণকুসুমতুল্য শিশুপুত্রটী নিদ্রার ক্রোড়ে শায়িত হইয়া, শান্তিদায়িনী নিদ্রায় দিবসের ক্লান্তি দূর করিতেছিল। আমি শুইয়া শুইয়া, আপনার মনে "শিখা" পাঠ করিতেছি, এমন সময়ে আমার প্রাণাধিকা পত্নী অনঙ্গমুঞ্জরী তাম্বূল চর্ব্বণ করিতে করিতে আসিয়া,—প্রেমভরে আমার মুখচুম্বন করিয়া কহিলেন,—"তোমায় আজ ক'দিন হতে

একটা কথা বলিব বলিব মনে করি; কিন্তু তোমার এই চাঁদ মুখখানি দেখিলে সবই ভুলিয়া যাই",—এই বলিয়া আবার প্রেমভরে আমার মুখচুম্বন করিলেন।

আমিও এবার হাতের পুথি দূরে রাখিয়া, প্রেমভরে অনঙ্গমুঞ্জরীকে বুকের উপর টানিয়া লইয়া, প্রেমভরে তাঁহার মুখচুম্বন করিয়া কহিলাম,—"কি জিজ্ঞাসা করিবে,—অনঙ্গ!"

অনঙ্গ এবার আপনার সুন্দর মুখে একগাল সুন্দর হাসি হাসিয়া কহিলেন,—"একটা মজার কথা বলিব; যা হ'ক, পাটনায় এসে একটা নূতন জিনিষ দেখিলাম।"

আমি। "কি নূতন জিনিষ দেখিলে,—অনঙ্গ।"

অনঙ্গ। "বলিতেছি।" এই বলিয়া, একবার আপনার সেই কোমল করপল্লবে আপনার সেই চারু বদন-বিন্যস্ত ঘন কৃষ্ণ কুন্তলরাশি অপসারিত করিয়া হাসিয়া কহিলেন,—"তোমার শৈশব সুহৃদের বিষয় কিছু বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করিয়াছ কি?"

আমি। কার—রজনীর?

অনঙ্গ। হাঁ, তাঁহারই।

আমি এবার আগ্রহভরে কহিলাম,—"কি লক্ষ্য করিব—অনঙ্গ।"

অনঙ্গ। কিছুই কি কর নাই।

আমি। করিয়াছি,—কতকটা লক্ষ্য করিয়াছি বৈ কি?

অনঙ্গ। কি দেখিয়াছ।

আমি। শৈশব হইতে যাহা লক্ষ্য করিয়া আসিতেছিলাম, এখন রজনীর পবিত্র দেবচরিত্রে সেই সবই উজ্জ্বলভাবে দেখিতেছি।

অনঙ্গ। কি দেখিতেছ।

আমি। আর কি দেখিব? শৈশবের সেই সরলতা—সেই অমায়িকতা, সেই ধীর ও সংযত দেবচরিত্র প্রতি কার্য্যে প্রতি বাক্যে রজনীর বর্ত্তমান চরিত্রে প্রতিভাত হইতেছে। আর এই সব দেখিয়া আমার মনে হয়, যতদিন রজনী রঞ্জন এই নশ্বর জগতে থাকিবেন, ততদিন এই সব অনন্ত গুণরাশি এমনই ভাবে তাঁহার পবিত্র দেবচরিত্রে প্রতিভাত হইতে থাকিবে?

অনঙ্গ। ইহা ছাড়া আর কিছু লক্ষ্য করিয়াছ কি ?

আমি। আর কি লক্ষ্য করিব,—বল।

অনঙ্গ। আচ্ছা, রজনী বাবু অত বড় চাকুরী করিতেছেন—মাসে মাসে তিন শত টাকা বেতন পাইতেছেন; কিন্তু, কৈ, তাঁহার কচি কচি ছেলে মেয়েদের গায়ে একখানিও সোণার গহণা নাই কেন,—লক্ষ্য করিয়াছ ?

আমি। না, লক্ষ্য করি নাই। তবে বোধ হয়, পাটনায় যুয়োচোরদের প্রাদুর্ভাব খুব বেশী,—পাছে ছেলে মেয়েদের গায়ে সোণার গহণা দেখলে, ছেলে চোরেরা গহণার লোভে ছেলে মেয়ে চুরি করে নিয়ে গিয়ে, অর্থের লোভে তাহাদের প্রাণ নষ্ট করে, এই ভয়ে বুঝি তাদের গায়ে অলঙ্কার দেয় নাই।

অনঙ্গ। আচ্ছা, নয় সেই জন্য ছেলে মেয়েদের গায়ে গহণা নাই, কিন্তু রজনী বাবুর স্ত্রীর গায়েও তো একখানি সোণা নেই। হাতে দু'গাছি শাঁখার বালা, আর সেই নোয়া,—ইহা ছাড়া আর কোন সোণাদানা ত এই দু মাসের মধ্যে তার গায়ে দেখি নাই।

এবার আমি হাসিয়া কহিলাম,—"তা কেমন করে বলবো—বল।"

অনঙ্গ। আর সেই রজনী বাবু, এত বড় একটা চাকুরী করিতেছেন,—মাসে মাসে বিপুল অর্থ উপার্জ্জন কচ্ছেন, কৈ, তাঁহারও তো বুকে একটা সোনার চেইন ঘড়ি, অথবা আঙ্গুলে একটা হীরে কাটা অঙ্গুরীয় দেখতে পাই নাই,—ইহারই বা কারণ কি ? এখনকার দিনে, লোকের বাড়ীতে খাবার থাকুক, আর না থাকুক,—একটা সিল্কের জামা, এক জোড়া বিলেতি জুতো, আঙ্গুলে একটা সোণার অঙ্গুরী ও বুকে একটা চেইন থাকবেই থাকবে—ইহাই বর্ত্তমান সভ্যতার একটা প্রকৃষ্ট লক্ষণ; আর এ সংসারে শুধু রজনী বাবুতেই এ পার্থক্য দেখিতেছি কেন ?

আমি। জানি না। তবে বোধ হয়, আশৈশবের সেই সরলতা বশতঃই রজনীর বাবুগিরিতে এই ঘোর বিতৃষ্ণা। আর তাই তাঁহার গৃহে সোণা-দানার বড় একটা কারবার নেই।

অনঙ্গমুঞ্জরী এবার ইতস্ততঃ করিয়া কহিলেন,—"আমার তাহা বিশ্বাস হয় না। মনে হয়, কি জানি কি একটা গুরুতর কারণ বশতঃ রজনী বাবুর স্বর্ণে

এই ঘোর বিতৃষ্ণা জন্মিয়াছে,—নহিলে, এখনকার এই ঘোর কলিকালে এমন ভাবে সোণায় কাহারো কখন অরুচি হয় না।"

অন্যমনে আমি কহিলাম,—"হইতে পারে ? বুঝি তোমার অনুমানই ঠিক।"

অনঙ্গ। তোমার উপর আমার একটা ভার রহিল, যে, এই ঘটনার প্রকৃত কারণ কি, রজনী বাবুকে জিজ্ঞাসা করিবার পর আমাকে বলিবে।

আমি। এ ভার আমার উপর না দিয়ে, বরং তুমি তো রজনী বাবুর স্ত্রীকে অথবা তাঁহার ভ্রাতৃবধূ বা ভগিনীকে জিজ্ঞাসা করিতে পারো।

অনঙ্গ। আমি জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম; কিন্তু সন্তোষজনক উত্তর পাই নাই। এখন তুমি একবার জিজ্ঞাসা করিয়ে দেখ।

আমি। আচ্ছা, রজনীকে সব জিজ্ঞাসা করিবার পর, তোমাকে বলিব।

অনঙ্গ। আর একটা কথা।

আমি। কি ?

অনঙ্গ। রজনী বাবু এ জীবনে এত কঠোর ব্রহ্মচর্য্যাবলম্বন করিয়াছেন কেন,—তাহারও কারণ জানিতে চাহি।

আমি। বোধ হয় ইহাই রজনীর রুচি।

অনঙ্গ। তবুও একবার জিজ্ঞাসা করিও,—তিনি কি বলেন, শুনিব।

আমি। আচ্ছা।

এমনই ভাবে আমাদের স্বামী স্ত্রীতে আরও অনেক কথাবার্ত্তা হইল,—কথাবার্ত্তা হইল, রজনীরঞ্জন, রজনীরঞ্জনের পত্নী পঙ্কজিনী, তাহার বিধবা ভগিনী হৈমবতী ও বিধবা ভ্রাতৃজায়া অপরাজিতা প্রভৃতির সম্বন্ধে। এবং অনঙ্গমুঞ্জরীর প্রত্যেক কথায় পরিষ্কার বুঝিতে পারিলাম যে, আমার প্রেমাস্পদ শৈশব সুহৃৎ রজনী রঞ্জন ও তাঁহার পরিবারস্থ পুরমহিলাদের কুটিলতাশূন্য সরল ও মধুর ব্যবহারে অনঙ্গমুঞ্জরী মুগ্ধা। আরও বুঝিলাম যে, আশৈশব সহরবাসিনী অনঙ্গ, জীবনের এই এতদিন মধ্যে, একদিনও কাহারও নিকট এমন হৃদয়ভরা সরল ও মধুর ব্যবহার কখন পান নাই। আজ বিদেশে—পাটনায়, আমার পূর্ব্ববঙ্গবাসী বিদেশীয় বন্ধু রজনীরঞ্জন ও তাঁহারই পরিবারবর্গের নিকট হইতে জীবনে এই সর্ব্বপ্রথম হৃদয়-খোলা প্রকৃত ভালবাসা পাইয়াছেন; আর পাইয়াছেন বলিয়াই

তাঁহাদের মধুর ব্যবহারে বড়ই মুগ্ধা হইয়াছেন।

এমনই ভাবে গালগল্প করিতে করিতে, অল্পক্ষণ পরেই অনঙ্গ আমার বুকের উপর ঘুমাইয়া পড়িলেন। অনঙ্গ ঘুমাইয়া পড়িলে পর, আমি নিজে নিজে আপনার মনে রজনীরঞ্জনের "সোণায় অরুচি"র কারণ ভাবিতে লাগিলাম,—ভাবিতে লাগিলাম সত্য; কিন্তু কোনই মীমাংসা করিতে পারিলাম না। সুমীমাংসা করিতে না পারিয়া আবার ভাবিতে লাগিলাম এবং সঙ্গে সঙ্গে এই রহস্য জানিবার জন্য আমার মনে একটা প্রবল স্পৃহার সঞ্চার হইল। এমনই ভাবে ভাবিতে ভাবিতে রাত্রি কাটিয়া গেল,—এই চিন্তায় রাত্রিতে বড় একটা ভাল নিদ্রা হইল না।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

এই ঘটনার ঠিক দুই দিন পরে, একদিন অপরাহ্ণে পথে রজনীর সহিত সাক্ষাৎ হইল। প্রথম সম্ভাষণেই রজনী আমাকে বলিল—"আজকার গেজেট্ দেখিয়াছ।"

আগ্রহভরে আমি কহিলাম,—"না, দেখি নাই,—কেন? কি হইয়াছে।"

রজনী। আমাকে কটক কালেজে বদলি করেছে।

আমি। কটক কলেজে—সত্যি।

রজনী। "হাঁ, সত্যি।" এই বলিয়া উভয়ে কথোপকথন করিতে করিতে আমাদের বাসায় আসিয়া উপস্থিত হইলাম।

বাসায় আসিয়া বসিবার পর আমি কহিলাম,—"কোথায় মনে করিয়াছিলাম যে, দীর্ঘকাল পরে তোমার সহিত সাক্ষাৎ হ'লো, আবার কিছুদিন তোমার সহবাসে অতিবাহিত করিয়া সুখী হবো, না, দু মাস যেতে না যেতেই আমার সে বড় আশায় ছাই পড়লো?"

রজনী এবার একটা দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া কহিলেন,—"কি করিব, অমর! উপায় নাই। তোমাকে পাইয়া আমার চিত্তের মলিনতা কতকাংশে দূর হইয়াছিল। মনে করিয়াছিলাম যে, দীর্ঘ দশ বৎসরের অসহ্য হৃদয়-যাতনার পর, আবার কিছু দিন তোমার সহবাসে হৃদয়ে শান্তি ভোগ করিব। কিন্তু আশৈশব আমি বিধাতার হস্তে তুচ্ছ ক্রীড়াপুত্তল,—যেমন

খেলাইতেছেন, তেমনই খেলিতেছি—দুঃখ করিয়া কি করিব।" এই বলিয়া আবার একটা হৃদয়ভেদী গভীর নিশ্বাস পরিত্যাগ করিলেন।

আমি। এখন তবে কবে পাটনা হ'তে উঠছ।

রজনী। আগামী সোমবারে উঠিব।

আমি। যাও। আমিও এখান হ'তে কটকে যাবার চেষ্টা দেখিব,—আমার মামাশ্বশুর সেক্রেটেরিয়েটের হেড আসিস্ট্যাণ্ট।

রজনী বাধা দিয়া কহিলেন,—"তুমি কটকে যাবার চেষ্টা না ক'রে ঢাকা বা রাজশাহী যাবার চেষ্টা দেখিও। আমিও কটকে যাবার পথে কলিকাতা হয়ে যাবো। মনে করেছি, কটক হ'তে হয় ঢাকা, নয় রাজশাহী কালেজে বদলি হবার চেষ্টা করিব।"

আমি। করিও,—আমিও সেই চেষ্টা দেখিব।

এমনই ভাবে আরও অনেক কথাবার্ত্তা হইল। তারপর রজনী কহিলেন,—"তবে এখন আসি,—সন্ধ্যা হ'য়ে এলো; এখনই আবার স্নান করিতে হবে।"

আমি। তোমার সহিত আমার একটা বিশেষ কথা আছে।

রজনী অতীব আগ্রহের সহিত কহিলেন,—কি কথা,—অমর।

আমি। শুনিবে কি? কথা কয়টা বোধ হয় বড় গোপনীয়; কিন্তু গোপনীয় হইলেও আমাকে বলিতে হইবে; বিশেষতঃ আমার স্ত্রী অনঙ্গমঞ্জরীর অনুরোধ।

রজনী এবার আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া কহিলেন,—কি কথা—অমর। আর তোমায় না বলিব,—এমন কথা আমার কি আছে—বল।

আমি। আমার স্ত্রী অনঙ্গ, তোমার ছেলে মেয়েদের গায়ে—তোমার স্ত্রীর গায়ে কোন সোণার গহণা পরতে না দেখে, তাঁহার দৃঢ় ধারণা জন্মেছে যে, বোধ হয় সোণায় তোমার অরুচি জন্মেছে। কেন? আজিকার এই সভ্যতার দিনে বাঙ্গালীর ঘরে ঘরে সোণাদানার জন্য ঘোর অশান্তি—ঘোর মনোমালিন্য উপস্থিত; আর তুমি এত বড় একটা চাকুরী করিতেছ—মাসে মাসে বিপুল অর্থোপার্জ্জন কচ্ছ; অথচ তোমার স্ত্রী পুত্রের গায়ে সোণাদানার নামগন্ধ নেই, তোমার নিজের বুকেও একটা সোণার চেইন ঘড়ি

অথবা অঙ্গুলীতে একটা অঙ্গুরীয় পর্য্যন্ত নেই,—এটা বড় আশ্চর্য্যের কথা। সে রাত্রিতে অনঙ্গ আমায় এ বিষয় জিজ্ঞাসা করেছিল; কিন্তু আমি কোন প্রকৃত উত্তর দিতে পারি নাই। শেষ তাঁহারই—অনঙ্গমুঞ্জরীর নির্ব্বন্ধাতিশয্যে, তাঁহার নিকট স্বীকার করিয়াছিলাম যে, ইহার প্রকৃত কারণ কি, তোমাকে একবার জিজ্ঞাসা করিব এবং জিজ্ঞাসা করিবার পর তাঁহার কৌতূহল নিবারণ করিব।

এবার হৃদয়ের গভীরতম প্রদেশ হইতে আবার একটা হৃদয়ভেদী দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া রজনী কহিলেন,—"আর সে অতীত কাহিনী শুনে কি কর্ব্বে—ভাই, শুধু মনে একটা কষ্ট পাইবে।"

আমি। আমার দুঃখের কথা ভাবিও না; তবে যদি তোমার বলিবার বিশেষ কোন বাধা থাকে—মনে যদি কোন কষ্ট পাও, তবে বলিয়া কাজ নেই।

বিষন্ন বদনে রজনীরঞ্জন কহিলেন,—"অমর, তোমার মত সুহৃদের নিকট কোন কথা গোপন করিবার আমার নাই। সত্যই আজ ক বছর হতে সোণায় আমার ঘোর অরুচি জন্মেছে—সত্যই ক বছর পূর্ব্বে কঠিন প্রতিজ্ঞা করেছি জীবনে কখন স্বর্ণ স্পর্শ করিব না এবং আজি দীর্ঘ একাদশ কি দ্বাদশ বর্ষ মধ্যে একবার এক মূহুর্ত্তের জন্যও কখন সোণা ছুঁই নাই,—যত দিন বাঁচিব ততদিন ছুঁইব না। আশীর্ব্বাদ করিও, জীবনে যেন এই কঠিন প্রতিজ্ঞা পালন করে মরতে পারি।" কথা কয়েকটী বলিতে এবার রজনীর চোখে বর্ষার বারিধারার ন্যায় অশ্রুধারা প্রবাহিত হইল।

কথা বলিতে রজনীর চোখে জল দেখিয়া, আমার মনেও একটা বড় আঘাত লাগিল। মনে হইল, হয়ত আমিই তাঁহার সেই শোক দুঃখ পরিপূর্ণ অতীত স্মৃতি জাগাইয়া দিয়া, আজি আবার তাঁহার নয়নে জল দেখিলাম। আমি মনে আঘাত পাইলেও মুখ ফুটিয়া বড় একটা কিছু বলিতে পারিলাম না, শুধু বাক্‌শূন্য হইয়া রজনীর পাশে বসিয়া রহিলাম। এদিকে অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত নীরবে অশ্রুপাত করিয়া, বোধ হয় হৃদয় যাতনা কতকাংশে লাঘব হইল, তাই আপনার নয়ন জল মুছিয়া রজনীরঞ্জন কহিলেন,—"সোণায় আমার অরুচি দেখিয়া, এ পর্য্যন্ত অনেকেই আমাকে এ প্রশ্ন করিয়াছেন;

কিন্তু আপনার মনের বিকার বশতঃ কাহারো প্রশ্নের উত্তর দিই নাই—দিতে পারি নাই; উত্তর দিতে চেষ্টা করিলেই অতীতের সেই নির্ম্মম স্মৃতি মনে হইয়া বুক ভাঙ্গিয়া আইসে।" এই বলিয়া আবার আপনার পরিধেয় বসনাগ্র-ভাগে নয়নজল মুছিলেন।

আমি রজনীকে বালকের ন্যায় কাঁদিতে দেখিয়া, ধীরে ধীরে স্নেহপূর্ণ কণ্ঠ-স্বরে কহিলাম,—"ছি ভাই, কান্না কেন? তুমি পুরুষ মানুষ—বিদ্বান ও বুদ্ধিমান; তোমাকে উপদেশ দিবার শক্তি আমার নাই। তবে আশৈশব আমাকে যে প্রীতির চক্ষে দেখিয়া আসিতেছ, সেই সাহসেই দুই একটা উপদেশ দিতে সমর্থ হইতেছি।" এই বলিয়া ক্ষণকাল নীরবে আপনার মনে আপনি কত কি ভাবিলাম। তারপর ধীরে ধীরে কহিলাম,—"আমি বেশ বুঝিতেছি যে, জীবনে এই এতদিন, তুমি বুকে এই তীব্র বিষের ডালি বহিয়া মরিতেছ; কিন্তু ভাই—উপায় কি? সংসার—কর্ম্মক্ষেত্র। এখানে সকলকেই আপন আপন কর্ম্মার্জ্জিত ফল ভোগ করিতেই হইবে, আর সেই ফল ভোগ করিবার জন্যই তো সংসারে আসিয়াছি। তখন হৃদয় হইতে শোক দুঃখ একেবারে দূর করিয়া হৃদয়ে শান্তি সঞ্চয় করাই মনুষ্যত্ব।

আমার কথায় বিষাদের মলিন হাসি হাসিয়া রজনীরঞ্জন কহিলেন,—"অমর, ভাই! উপদেশ দেওয়া বড় সহজ; কিন্তু পালন করা বড় কঠিন! আমিও এতদিন—এতদিন কেন? এখনও সকলকে এমনই উপদেশ দিয়া আসিতেছি; অথচ সত্য কথা বলিলে তুমি হাসিবে, সেই উপদেশদাতা আমি—আমি যখনই একাকী থাকি, একাকী যখন নীরবে নিজের অতীত জীবনের ইতিহাস পর্য্যালোচনা করি তখনই আমার হৃদয়ে গভীর বিষাদরাশি স্তরে স্তরে আসিয়া আমার হৃদয় আচ্ছন্ন করিয়া ফেলে। শেষে কতক্ষণ নীরব অশ্রুপাতের পর, হৃদয় জ্বালার কতকটা নির্ব্বাণ হয়। আর বলিতে কি, ঠিক এমনই ভাবে আমার শোকপূর্ণ—দুঃখপূর্ণ, ঘোর অশান্তিপূর্ণ জীবনের এই দীর্ঘ একাদশ বর্ষ কাল কাটিয়া গিয়াছে। যতদিন বাঁচিব—যতদিন এ পাপ দেহ অনন্ত কালসাগরে মিশাইতে না পারিব, ততদিন ঠিক এমনই ভাবে কাঁদিতে কাঁদিতে আমার বিষাদপূর্ণ জীবনের শেষ হইবে।" এই বলিয়া নীরব হইলেন।

এতক্ষণে একে একে আমি সব বুঝিলাম। বুঝিলাম যে, অসময়ে মোহিনী রঞ্জন বাবুর অকাল মৃত্যুই রজনীরঞ্জনের বিষাদের একমাত্র প্রধান কারণ। অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত আপনার মনে আকাশ পাতাল কত কি ভাবিলাম, তারপর দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া কহিলাম,—"সবই বুঝি; কিন্তু যাহা হইবার হইয়াছে—তাহা আর ফিরিবে না, ফিরিবার নয়; তখন আত্ম-হৃদয়বলে, যতটা স্থির হইতে পার, সতত তাহারই চেষ্টা দেখ। তুমি পুরুষ মানুষ—তুমিই যদি এতটা কাতর হও, তবে না জানি তিনি—তোমার হতভাগিনী ভ্রাতৃজায়া,—তিনিই বা কি করিয়া আপনার মনে প্রবোধ দিবেন।"

রজনী। "হাঁ, তা ঠিক; তবে কি জানি কেন মনে হয়, বুঝি তিনি এ কর্কশ সংসারক্ষেত্রের কেহ নহেন। নহিলে, এখন যে সব কার্য্যে আমার সম্পূর্ণ বিতৃষ্ণা, তিনি এখনও আমার ও আমার পত্নীর সুখসাধন মানসে সেই সব কার্য্যে আপনার মনোনিবেশ করিতে ভালবাসেন। একদিন যে পঙ্কজিনী—আমারই স্ত্রী পঙ্কজিনী প্রতি বাক্যে প্রতি কার্য্যে তাঁহার সহিত হিংসা দ্বেষ প্রভৃতি প্রকাশ করিয়া আপনার ইতর প্রকৃতির পরিচয় দিতেন, এখন সেই তিনি—সতত সেই পরশ্রীকাতরা পঙ্কজিনীর সুখ সাধনে নিযুক্তা। আর এই সব দেখিয়া শুনিয়া মনে হয়, যে, বিধাতা তাঁহার নির্ম্মল ও পবিত্র চরিত্রে এতটুকু হিংসা, দ্বেষ ও পরশ্রীকাতরতার লেশ পর্য্যন্ত দেন নাই। বুঝি এতই ভাল করিয়া বিধাতা তাঁহাকে সংসারে পাঠাইয়াছিলেন, যে, পাঠাইবার কালে তাঁহার চরিত্রের উৎকর্ষ সাধন করিতে যাইয়া, তাঁহার অদৃষ্টে দুঃখ বৈ ক্ষুদ্র এক কণিকা সুখ পর্য্যন্ত লিখিতে ভুলিয়া গিয়াছিলেন। তাঁহাকে দেখিলে আমার মনে হয়, বুঝি এ সংসারে ঈশ্বর বলিয়া কেহ নাই—বুঝি ঈশ্বর মনুষ্যের অদ্ভুত কল্পনা। নহিলে ঈশ্বর থাকিলে—পাপ পুণ্যের একজন ন্যায়নিষ্ঠ বিচারক থাকিলে, তাঁহার মতন অমন সাক্ষাৎ স্বর্গের দেবীর অদৃষ্টে এমন স্নেহশূন্য নীরব অভিসম্পাত কখনই বর্ষিত হইত না।" এই বলিয়া আবার নীরব হইলেন।

ক্ষণকাল নীরব থাকিবার পর পুনরায় রজনীরঞ্জন কহিতে লাগিলেন,—"অমর, ইহসংসারে এখন আমার মনের কথা বলিতে একমাত্র তুমি ভিন্ন, আমার আর দ্বিতীয় কেহই নাই। দুঃখী লোকে, আপনার স্ত্রীর নিকট আপ-

নার মর্ম্মকাতরতা প্রকাশ করিয়া হৃদয়বেদনা দূর করে; কিন্তু হতভাগ্য আমি—যদিও আমার পঙ্কজিনী সংসারের অনেক ঘাতপ্রতিঘাত পাইয়া, এখন আপনার পূর্ব্ব চরিত্র অনেকটা সংশোধন করিয়াছেন,—যদিও আগেকার সেই হিংসা, দ্বেষ প্রভৃতি নিকৃষ্টবৃত্তিগুলির কতকটা উচ্ছেদ সাধন করিতে পারিয়াছেন; তথাপি এখনও তিনি এমন চরিত্র লাভ করিতে পারেন নাই যে, আমার প্রতি কার্য্যে তাঁহার সহানুভূতি আকৃষ্ট হইবে,—জীবনে কোন দিন পারিবে কিনা, জানি না। তাই বলিতেছিলাম, এ সংসারে একমাত্র তুমি ভিন্ন আমার মনের বোঝা নামাইবার আর দ্বিতীয় লোক নাই, যে, তাঁহার কাছে নিজের বেদনা ব্যঞ্জক হৃদয়ের বোঝা নামাইয়া দুই দণ্ড শান্তি উপভোগ করি। তোমার বিচ্ছেদে এই দীর্ঘকাল যে অসহ্য হৃদয়বেদনা ভোগ করিতেছিলাম—তোমাকে পাইয়া আমার সে যাতনা অনেকটা লাঘব হইয়াছিল। কিন্তু আবার সেই যন্ত্রণা ভোগ করিতে চলিলাম। যাহা হউক, আমি যাইতেছি, তুমিও ঐ দুই স্থানের এক স্থানে বদলি হইতে যত্ন করিও, তাহা হইলে আবার আমরা দুইজনে একত্রিত হইব। আর যে কথা তুমি শুনিতে চাহিতেছ—যে রহস্য ভেদ করিবার জন্য তোমার প্রাণাধিকা পত্নী উদগ্রীবা হইয়াছেন, আমার বুক ফাটিলেও একদিন সে কথা অবশ্য তোমাকে বলিব,—আজ নহে। কদিন পরে কটক যাইয়া, আমার সোণায় অরুচি কেন, তাহা বিস্তারিত করিয়া লিখিয়া পাঠাইব। দেখ আমার যে দুঃখ, মুখে বলিতে গেলে সকলটা বলিতে পারিব না, পরন্তু হৃদয়ে বিষম বেদনা পাইব। তাই শেষ স্থির করিলাম, যে, কটক যাইবার পর সমস্ত বিষয় পরিষ্কার করিয়া লিখিয়া পাঠাইব। আশা করি, আমার এ অনুরোধ তুমি রাখিবে এবং আমার হইয়া তোমার পত্নীকেও এ অনুরোধ রক্ষা করিতে বলিবে।"

আমি। "কেন এত অনুরোধ করিতেছ,—রজনী। সংসারে যাঁহাকে দেখিলে হৃদয়ে স্বর্গসুখ অনুভব করি, যাঁহার সহবাসে স্বর্গবাস সুখ মনে হয়, যাঁহার স্নেহপূর্ণ মধুর কথা শুনিলে হাতে স্বর্গ পাই, সেই তুমি—তোমার এ অনুরোধ রক্ষা না করিব কেন? যখন তোমার বলিতে ইচ্ছা হয় বলিও—আমরা শুনিব।"

এমনই ভাবে আরও কতক্ষণ সুখ দুঃখের কথা হইল। শেষ রজনীরঞ্জন

বিদায় লইয়া গেলেন।

* * * *

সেই রাত্রিতে আমার স্ত্রী অনঙ্গমুঞ্জরী আসিলে তাঁহাকে কহিলাম,—"'সোণায় অরুচি কেন' রজনীকে ইহার কারণ জিজ্ঞাসা কর্ত্তে বলেছিলে, আজ রজনীকে তাহার কারণ জিজ্ঞাসা করেছিলেম। কিন্তু আগামী সোমবারে রজনী পাটনা হতে কটক কালেজে বদলি হয়ে যাইতেছেন। কটক গিয়ে, তিনি আমার প্রশ্নের উত্তর দিবেন,—তখন শুনিও।"

অনঙ্গ। কটক যেয়ে উত্তর দিবেন,—কেমন?

আমি। পত্র লিখে—পত্রের দ্বারায় তাঁহার সোণায় অরুচি কেন লিখিয়া জানাইবেন।

অনঙ্গ। উত্তম।

* * * *

কদিন কাটিয়া গেল। নির্দ্দিষ্ট সোমবারে অপরাহ্নের ট্রেনে রজনীরঞ্জন সপরিবারে পাটনা হইতে চলিয়া গেলেন। পাটনা ছাড়িবার ঠিক একমাস পরে, রজনীর একখানি পত্র, আর সেই সঙ্গে Registered একটা Packet পাইলাম। পত্র ও Packet পাইয়া, প্রথমেই প্যাকেটটা খুলিয়া ফেলিলাম। প্যাকেট খুলিয়া প্রথমেই দেখিতে পাইলাম,—প্যাকেটের উপর পরিষ্কার অক্ষরে স্পষ্ট করিয়া লেখা আছে :—

"সোণায় অরুচি।"

আমি। "সোণায় অরুচি"—ইতিশীর্ষক গল্পের প্যাকেটটা রাখিয়া, রজনীর পত্র খুলিলাম। রজনী লিখিয়াছেন :—

কটক কালেজ।

অমর!

যথাসময়ে কটক আসিয়াছি। কটকে আসিয়াই মেজদিদি ও বউ-ঠাকুরাণীর অনুরোধ উপেক্ষা করিতে না পারিয়া ৺জগন্নাথধামে পুরুষোত্তম দর্শনে গিয়াছিলাম,—আজ দশ দিন হলো সেখান হতে আসিয়াছি। তারপর নূতন স্থান—নূতন স্থানে নূতন বন্দোবস্ত করিয়া সংসার পাতাইতে কদিন গেল বলিয়া, তোমাকে পত্র লিখিতে বিলম্ব হইল। যাহা হউক, অদ্য Registered

packet এ তোমার ও তোমার প্রাণাধিকা পত্নী শ্রীমতী অনঙ্গমুঞ্জরীর পাঠের জন্য—"সোণায় অরুচি"—ইতিশীর্ষক, আমার শোক দুঃখ পরিপূর্ণ জীবনের ক্ষুদ্র একাংশের একটা বিষাদ কাহিনী লিখিয়া পাঠাইলাম,—প্রাপ্তি সংবাদ লিখিবে। আমার অসার জীবনের এই আমার ক্ষুদ্র কাহিনী পাঠ করিলেই পরিষ্কার বুঝিতে পারিবে, যে, কেন কি দুঃখে সোণায় আমার ঘোর বিতৃষ্ণা জন্মিয়াছে। তবে একটা কথা বলিয়া রাখি, বড় অল্প সময়ে তাড়াতাড়ি লিখিলাম, তাই দুই এক স্থানে অসংলগ্ন থাকিলেও থাকিতে পারে। আমার অনুরোধ, তুমি নিজেই তাহা সংশোধন করিয়া লইও। তারপর এই "সোণায় অরুচি" পাঠ করিয়া, যদি ইহার দ্বারায় দেশের বা সমাজের কোন উপকারের প্রত্যাশা কর, তবে কোন একটা মাসিকপত্রে প্রকাশ করিতে চেষ্টা করিও। আর একটা কথা, আমার জীবনের এই ক্ষুদ্র কাহিনীটা পাঠ করিলেই, তোমরা স্বামী স্ত্রীতে বেশ বুঝিতে পারিবে যে, জীবনের এই দীর্ঘকাল আমি প্রতিদণ্ডে, প্রতি পলে কি অসহ্য হৃদয়-বেদনা ভোগ করিতেছি,—বুঝিতে পারিবে যে, যতদিন আমার জীবনের শেষ না হইতেছে, ততদিন এই অসহ্য হৃদয় যাতনা অহরহ আমাকে ভোগ করিতেই হইবে,—কতদিনে যে এ যাতনার সমাপ্তি হইবে বিধাতাই জানেন।

কটকে আসিয়া আমার একেবারেই মন টিকিতেছে না। আমি এখান হইতে ঢাকা বা রাজশাহী বদলি হইবার চেষ্টায় আছি, যদি শীঘ্র বদলি হইতে না পারি তবে, দুই মাস দেখিয়া কিছুদিনের বিদায় লইয়া—এখান হইতে উঠিব। অধিক আর কি লিখিব সতত স্নেহপূর্ণ—শান্তিপূর্ণ পত্র লিখিয়া আমার চিত্ত বিনোদন করিতে অন্যথা করিও না। তোমার স্ত্রীকে আমার প্রীতি-সম্ভাষণ দেবে। ইতি

তোমার হতভাগ্য—শ্রীরজনীরঞ্জন শর্ম্মা।

রজনীর পত্র পাঠ সমাপন করিবার পর, আমি অতীব আগ্রহভরে, তখনই রজনীরঞ্জনের লিখিত, তাঁহারই শোক দুঃখ পরিপূর্ণ জীবনেতিহাসের এক পৃষ্ঠার বিষাদপূর্ণ আখ্যায়িকা :—"সোণায় অরুচি" পাঠ করিতে বসিলাম। ইতি

শ্রীঅমরেন্দ্র লাল চৌধুরী।

ক্রমশঃ

শ্রীউমেশচন্দ্র মৈত্রেয়

ব্যাকুলতা। *

"কিমাগ আস যৎ জিঘাংসসি স্তোতারং।" হে পরমাত্মন্! হে হৃদয়েশ! এমন কি গুরুতর পাপ করিয়াছি যে তুমি তোমার স্তোতা তোমার বন্ধু আমাকে দেখা দিতেছ না? তুমি কেন দেখা দিতেছ না, তাহা আমাকে বল। তুমি কি আমাকে বিনাশ করিবার ইচ্ছা করিতেছ যে আমাকে দেখা দিতেছ না? আমি এত কি গুরুতর অপরাধ করিয়াছি যে তুমি আমার নিকট হইতে অন্তর্হিত হইতেছ? না জানিয়া, মোহে পড়িয়া, অনেক পাপ করিয়াছি—অন্তর্যামিন্ অনেক পাপ করিয়াছি; হে করুণাময়! তোমার অপার করুণা, অনন্ত সলিল দ্বারা আমার হৃদয়ের মলিন পূতিগন্ধ বিশিষ্ট পাপ সকল ধৌত করিয়া দাও। আমার আত্মাদর্পণ যেন এরূপ নির্ম্মল পবিত্র হয় যে তাহাতে তোমার—পরম পবিত্রস্বরূপ তোমার প্রতিবিম্ব পড়িতে পারে; আমি তোমার সেই অপরূপ প্রতিবিম্ব দেখিয়া পরিতৃপ্ত হইতে পারি।

আমরা অতি ক্ষুদ্র প্রাণী; শতবার তোমার আদেশ ভুলিয়া কণ্টকাকীর্ণ পাপপথে চলি এবং দণ্ডভোগ করিয়া পুনরায় কাঁদিতে কাঁদিতে তোমার ক্রোড়ের দিকে ফিরিয়া আসি; তুমি প্রেমের বাহু বিস্তারিত করিয়া আমাদিগকে গ্রহণ কর। দেবদেব! রাজরাজ! আজ তোমাকে দেখিতে পাইতেছি না; আমি জানি যে আমার পাপবশতঃই তোমার সাক্ষাৎ লাভ পাইতেছি না; কিন্তু তোমার নিকট আমি অন্তর হইতে হৃদয়ের ক্রন্দনের সহিত এই প্রার্থনা করিতেছি যে, আমার সেই পাপ সকল তোমার বজ্রদণ্ড দ্বারা ভস্মীভূত করিয়া, শান্তিপ্রদানে আত্মাকে শুদ্ধ পাপমুক্ত করিয়া তোমার ক্রোড়ের দিকে অগ্রসর করিয়া লও। হে শান্তস্বরূপ পরব্রহ্ম! আমার হৃদয় হইতে অশান্তি দূর করিয়া দাও, যাহাতে সেথায় শান্তিকে প্রতিষ্ঠিত করিতে পারি; এবং সেই শান্তি হৃদয়ে বদ্ধ করিয়া এই সংসারের ঘোর কোলাহল দারুণ অশান্তির

* ১৭ বৎসরে রচনা।

মাঝে তোমারি মঙ্গলস্বরূপ এবং অনন্ত মহিমা অবিশ্রান্ত ধ্যান করিতে পারি।

অবসানে তোমার নিকট এই রোদন করিতেছি যে আমি অতি ক্ষুদ্র; কখন যে মোহে পড়িয়া নানা জনের প্রলোভনে ভুলিয়া বিপথে চলি তাহা বুঝিতে পারি না; তুমি সেই সময় তোমার বজ্রদণ্ডের দ্বারা আমাকে সাবধান করিয়া দিও এবং এতদূর প্রলোভনে আমাকে ফেলিও না যাহাতে আমি একেবারে আত্মহারা হইয়া যাই এবং কর্ণধারবিহীন তরীর ন্যায় অকূল পাথারে ভাসিয়া চলি।

শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

জীবন।

(ফরাসী কবিতার অনুবাদ।)

জীবন অনৃত কেবল
একটু প্রেমলেশ
একটু ঈর্ষাদ্বেষ
তারপর——হরিবোল্।

জীবন অতি যে তরল
একটু আশ শুধু
একটু স্বপ্নমধু
তারপর——হরিবোল্।

আনারসের লক্ষ্ণৌ মোরব্বা।

(খাদ্যপাক।)

উপকরণ।—আনারস তিনটী, চিনি দেড় সের, জাঁফ্রাণ তিনমাসা, কাগজি নেবু একটা, কেওড়া বা গোলাপ জল দুই ছটাক।

প্রণালী।—আনারসগুলির খোলা ছাড়াইয়া বেশ করিয়া চোখগুলা কাটিয়া ফেল; পরে চাকা চাকা করিয়া কাট।

এখন দেড়সেরটাক জলে আনারসগুলা সিদ্ধ করিতে চড়াও। আর ঐ জল উহাতেই মারিয়া ফেল। আনারস সিদ্ধ হইলে একটি পাত্রে ঐগুলা ছড়াইয়া রাখ। একদিন ঐভাবেই ছড়ান থাকুক। পরদিনে আড়াইপোয়া জলে দেড়সের চিনি দিয়া রস কর। রসের গাদ উঠিলে উহা ফেলিয়া দিবে। দু তিন ফোঁটা নেবুর রস দিয়া রসটাকে বেশ পরিষ্কার করিয়া ফেল। রসটা যখন বেশ চট্‌চট্ করিবে, তখন ঐ আনারসগুলার এক এক চাকা লইয়া, বেশ মোটা ঝাড়নে মুছিয়া শুকাইয়া, ঐ রসে ছাড়িয়া দাও। তারপরে জাফ্রাণ-টুকুও গোলাপ জল বা কেওড়া দিয়া বাঁটিয়া ঐ আনারসের হাঁড়িতে ছাড়িয়া দাও; হাতা দিয়া সবটা বেশ করিয়া মিশাইয়া দাও। যখন রসটা মাঝামাঝি রকমের ঘন হইবে তখন নামাইয়া ঠাণ্ডা করিয়া, বোতলে পুরিয়া রাখ। রসটাকে বেশী কড়া করিও না, তাহা হইলে শুকাইয়া চিনি উপরে আসিয়া যায়। এরূপে মোরব্বা করিয়া এক বৎসর দেড় বৎসর রাখিলেও খারাপ হয় না।

ভোজন বিধি।—বিলাতী জ্যামের পরিবর্ত্তে ইহা মাখন পাঁউরুটি দিয়া খাও—জ্যামের চেয়েও ভাল লাগিবে। দেশীয় লুচি রুটির সঙ্গে খাইলেও বেশ লাগে। পুডিংয়ে বা কেকে ইহার পুর দিলে খাইতে বেশ হয়।

শ্রীসুদক্ষিণা দেবী।

বিশ্বভুবন রঞ্জন।

(সাংখ্যস্বরলিপি।)

মেঘমল্লার—সুরফাঁকতাল।

বিশ্বভুবন রঞ্জন, ব্রহ্ম পরম-জ্যোতি,
অনাদি দেব জগপতি, প্রাণের প্রাণ।
কতই কৃপা বরষিছ,
প্রাণ জুড়ায় সুমধুর প্রেম-সমীরে,
দুঃখতাপ সকলি হয় অবসান।
সবাকার তুমি হে পিতা বন্ধু মাতা,
অনন্ত লোক করে তব প্রেমামৃত পান।
অনাথ শরণ এমন আর কেবা তোমা হেন,
ডাকি তোমারে,
ত্রাণ দাও প্রভু হে কৃপা নিধান।

তালি। ১ঃ (স্থা, ন্ত ভো)। ২ । ৩ ॥
মাত্রা। ৪ । ২ । ৪ ॥

স্থাঃ·—II মা২ মা মা । পা পা । পাঃ মাঃ পা পা পা ।
স্থাঃ·—II বি শ্ব ভু । ব ন । র — — ঞ্জ ন ।

২
ধা সা ধা ধা । পা পা । পাঃ মাঃ পা মাঃ গাঁঃ
ব্র — হ্ম প । র ম । জ্যো — — তি —

গাঁ । গাঁ মা রে রে । + রে রে । সা সা সা সা ।
অ । না — দি দে ' — ব । জ গ প তি ।

রে মা মা মা । মা পা । মাঃ পাঃ ধা পাঃ II ॥
প্রা — ণে র । প্রা — । — — — ণ II ॥

২........................
(স্ত)ঃ— মা পা পা পা । নিঃ । সা সা সা সা ।
(স্ত)ঃ— ক ত ই ক্ল । পা । ব র ষি ছ ।

২..
সাঃ নিঃ সা রে রে । ম্গাঁঃ । গাঁ মা রে রে ।
প্রা — — ণ জু । ড়া । সু ম ধু র ।

সাঃ ধ্নি পা । পা + পাঃ মাঃ । ম্পা মাঃ
প্রে ম স । মী — — । রে —

গাঁঃ গাঁ গাঁ । গাঁ মা রে রে । রে রে ।
— তুঃ খ । তা — প স । ক লি ।

সা সা সা সা । সা মা মা মা । মা পা । মাঃ
হ য় অ ব । সা — — — । — — । —

পাঃ ধা পাঃ ॥ (স্থা পু)ঃ— মাঃ মা মা ।
— — ন ॥ (স্থা-পু)ঃ— বি শ্ব ভু ।

পা পা । পাঃ মাঃ পা পা পা ॥ (ভো)ঃ— রে
ব ন । র — — ঞ্জ ন ॥ (ভোঃ— স

মা রে মা । পা পা । পা পা পা পা ।
বা — কা । — র । তু মি হে পি ।

২
প্সাও ধ্নিঃ ধাঃ । নিঁ পা । মা পা ম্গা গা ।
তা ব — । — ন্ধু । মা — তা অ ।

গাঁ মা রে রে । রে + রে । সা সা সা সা ।
ন — ন্ত লো । — ক । ক রে ত ব ।

রে মা মাঃ । মা মা । মা পা "মাঃ ধাঃ" বা
প্রে — মা । মৃ ত । পা — — —

"মাঃ পাঃ ধাঃ পা । মা পা পা নি । নি
— — — ন । অ না থ শ । র

২.................. ২ ২..........................
নি । সা২ সা সা । ন্‌সা½ নি½ সা রে রে ।
ণ । এ ম ন । আ — — র কে ।

....
মৃগাঁ২ । গাঁ গঁমা রে রে । সা সা ধৃনিঁ
বা । তো মা হে ন । ডা — কি

পা । পা মা । মৃপা মা½ গাঁ½
তো । মা — । য়ে — —

গাঁ গাঁ । গাঁ মা২ রে । রে রে ।
স্তা থা । দা ও প্র । ভু হে ।

সা সা২ সা । রে মা৩ । মা পা ।
স্তু পা নি । ধা — । — — ।

মা½ পা½ ধা পা২ । মা: ॥ ॥
— — — ন । বি ॥ ॥

স্বরলিপির চিহ্ন ব্যাখ্যা।

II = দুইবার আবৃত্তির চিহ্ন; 'আই'য়ের দ্বারা বেষ্টিত থাকিলে বুঝিতে হইবে যে আবৃত্তি করিতে হইবে। একবার আবৃত্তির বেলায় 'আই'য়ের দ্বারা আবৃত্তির অংশটী বেষ্টিত করিলেও চলে না করিলেও চলে। যতবার আবৃত্তি করিতে হইবে ততগুলি 'আই' একত্রিত ভাবে লিখিয়া আবৃত্তির অংশের দুই-ধারে লিখিতে হইবে।

মা২ = মা একটানে দুইমাত্রাকাল গাহিতে হইবে।

পা½ মা½ = অর্দ্ধমাত্রিক কাল পা সুর ও মা সুর গাহিতে হইবে। অর্থাৎ একমাত্রার মধ্যে অর্দ্ধমাত্রা করিয়া পা ও মা গাহিতে হইবে। দুইটী সুরের মধ্যে + বক্রচিহ্ন বা যোগচিহ্ন থাকিলে বুঝিতে হইবে যে দুইটী সুর একযোগে গাহিতে হইবে।

ঃ = সমের চিহ্ন। ॥ = সমাপ্তির চিহ্ন।

স্থা = অস্থায়ী। অ = অন্তরা। ভো = আভোগ।

স্থা-পু = অস্থায়ী পুনরায়।

শ্রীহিতেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

তির্ব্বতে তানসেন।

যখন তানসেন বাদশাহ আকবর সাহর মজলিসে দীপক গাহিবার জন্য অনুরুদ্ধ হয়েন তখন তিনি সম্রাটকে স্পষ্টই বলিয়াছিলেন যে "যদি আমাকে চান তো আমাকে দীপক রাগ গাহিতে বলিবেন না, আমাকে না চাহেন তো দীপক রাগ গাহিতে আদেশ করিবেন।" সম্রাট আকবর তানেসনকে যথার্থই ভালবাসিতেন, শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিতেন, তানসেন যে নষ্ট হয়েন এ তাঁহার ইচ্ছা নয়, অথচ দীপক রাগ শুনিবার জন্য বড়ই আগ্রহ, বড়ই

ব্যাকুলতা, না শুনিলেই নয়, অন্যান্য গায়কেরা বাদশাহকে উন্মত্ত করিয়া তুলিয়াছে, বলিয়াছে যে তানসেন ব্যতীত দীপক রাগ ঠিক কেহ গাহিতে পারিবেন না, গাহিতে জানেন না,—সুতরাং তানসেনকে আপনি সভায় দীপকরাগ গাহিতে আদেশ করুন।

দীপকের উদ্দীপনীশক্তি—দাহিকাশক্তি প্রবলা, তানসেন জানিতেন যদি তিনি যথার্থ দীপক রাগ প্রকাশ করিতে আরম্ভ করেন তো তিনি দগ্ধ হইবেন, অন্যান্য গায়কদিগের বড়ই ঈর্ষা হইয়াছে যে তানসেন দিল্লীর সভায় শ্রেষ্ঠ আসন অধিকার করিয়া বসিয়াছেন, তাহাদের ইচ্ছা যে তানসেন আর না থাকেন, দিল্লীসভা আর উজ্জ্বল না করেন। একেবারে জন্মের মত পৃথিবী হইতে যদি তানসেন বিদায় গ্রহণ করেন তবে ঐ সকল গায়কসয়তানদের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হয়। তানসেন তাহাদের মনোগত অভিপ্রায় বুঝিয়াছিলেন। বুঝিয়া কিন্তু কিছু আর বলিলেন না, তাহাদের পাকচক্রে পড়িয়া সম্রাট যখন দীপক শুনিবার জন্য অমন ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছেন, তখন আর নয়, ঠিক করিলেন, জীবন থাকে বা যায়, আকবর সাহকে দীপক শুনাবেনই। কিন্তু এই সঙ্গে তাঁহার একটী উপায়ও মনে আসিল, যে দীপক রাগ তাঁহাকে যাহাতে দহন করিতে না পারে এইজন্য ব্যবস্থা করিলেন, যে বাদসাহর সভায় দীপক গাহিবার সময়, দহনভাব নিবারণের জন্য তানসেন তাঁহার কন্যাকে মেঘমল্লার গাহিতে বলিয়া রাখিলেন।

সভায় যেদিন তাঁহার দীপক গাহিবার জন্য নির্দ্দিষ্ট হইল, সেইদিনে তিনি তাঁহার কন্যাকে মেঘমল্লার গাহিবার জন্য প্রস্তুত করাইয়া রাখিলেন। নির্দ্দিষ্ট দিনে সভায় সম্রাট আসীন, নানা বিখ্যাত গায়কবৃন্দ উপবিষ্ট—তানসেন দীপক গাহিবেন।—দেখিতে দেখিতে সকলকে চমৎকৃত করিয়া এমনি জ্বলন্তভাবে দীপকরাগকে মূর্ত্তিমান করিয়া তুলিলেন, তাহার প্রভাবে তানসেনের শরীর দগ্ধ হইবার উপক্রম হইল, বাদসাহর সভার আলোকবর্ত্তিকাসমূহ জ্বলিয়া উঠিল, প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল, সভার সমস্ত লোক আশ্চর্য্যান্বিত ও ব্যাকুল হইল, তানসেন বুঝি বা দগ্ধ হয়!—তাঁহার দহন দূর করিবার জন্য, দীপকানল প্রশমনার্থে সত্বর তাঁহার কন্যা তানসেনের আদেশ মত মেঘমল্লার গাহিতে আরম্ভ করিলেন, কিন্তু তাঁহার কন্যার মেঘমল্লার খাঁটি হইল না, ভয়ে তাঁহার

কণ্ঠ হইতে ঈষৎ পরিবর্ত্তিতরূপে আবির্ভূত হইল—এই বিকৃত মল্লারের নাম 'মিয়া মল্লার' হইল। এই বিকৃত মল্লার তানসেনের দহনভাবকে সম্পূর্ণরূপে দূর করিতে সমর্থ হইল না, আংশিকভাবে তাঁহার দহনযাতনা যেন কিঞ্চিৎ প্রশমিত হইল; কিন্তু তাহার পর হইতে তানসেন অসুস্থ হইলেন, কেহ কেহ বলেন, সে এই দহনজনিত অসুস্থতা বর্দ্ধিত হইয়া তিনি মৃত্যুমুখে পতিত হয়েন, আবার কেহ কেহ বলেন তানসেন মরেন নাই, একজন বিখ্যাত গায়িকার শরণাপন্ন হয়েন, তিনি দিল্লী হইতে পলাইয়া গিয়া আরও উত্তরে হিমাদ্রির সন্নিকটে মধুমাধ (প্রকৃত নাম মধুমাধ্বী) নামক কোন গায়িকার শরণাগত হয়েন ও সকল কথা তাঁহাকে জানান। সেই ক্ষমতা-শালিনী গায়িকা মধুমাধ্বী আশ্চর্য্যরূপে রাগরাগিণী সকল মূর্ত্তিমান করিয়া তুলিতে পারিতেন। তিনি তানসেনের দুরবস্থা শুনিয়া করুণার্দ্রচিত্তে যথার্থ-রূপে বিশুদ্ধ মেঘমল্লার প্রকাশ করতঃ সেই রাগের সাহায্যে তানসেনের দীপক-দহন সম্পূর্ণরূপে আরাম করিয়া দেন। আরোগ্য লাভ করিয়া তান-সেন যেন মহাশক্তি লাভ করিলেন।

মধুমাধ্বী তানসেনের তুল্যগায়িকা ছিলেন—সঙ্গীতের রাগ রাগিণীর মধ্যে যে শক্তি বিদ্যমান তাহা তাঁহার আয়ত্তীভূত হইয়াছিল। তাই মধুমাধ্বী তানসেনের দহনজ্বালা আরোগ্য করিতে সক্ষম হয়েন। কথিত আছে যে, তানসেন অর্দ্ধমৃত অবস্থায় দিল্লীসহর হইতে একেবারে চিরদিনের জন্য পলাইয়া গিয়াছিলেন—ইচ্ছা আর কৃতঘ্ন দিল্লীসহরের মুখ দেখিবেন না।—পলাইয়া গিয়া পূর্ব্বোক্ত মধুমাধ্বীর গ্রামে গিয়া শান্তি লাভ করেন। মধুমাধ্বীর গ্রাম দিল্লীসহর হইতে বহুদূরে অবস্থিত ছিল। মধুমাধ্বীর শান্তিময় গ্রাম ছাড়িয়া আর তানসেনের চক্রান্তময় দিল্লীসহরে যাইতে বাসনা হইল না। কি করিয়াই বা হইবে? স্বরকবি যোগীগায়ক তানসেন প্রথম হইতেই প্রকৃতির কোলে পরিভ্রমণ করিয়া বেড়াইতেন,—নদনদী বন উপবনের সৌন্দর্য্য, পর্ব্বতের গাম্ভীর্য্য, স্তব্ধতার মাধুরী তাঁহার হৃদয়কে আয়ত্ত করিয়া আছে, পাকে পড়িয়া সহসা বাদ্‌সাহর কন্যারূপ অচ্ছেদ্য প্রলোভনের বশবর্ত্তী হইয়া দিল্লীসহরে গিয়াছিলেন—বাদসাহর অধীনে আসিয়াছিলেন, কিন্তু কতক্ষণ তাঁহার মুক্তহৃদয় দিল্লীতে বদ্ধ হইয়া থাকিবে? তাহাতে আবার সম্রাটের

সভা-গায়কদিগের কুটিলতাপূর্ণ চক্রান্তের জ্বালা।—তাঁহার বিনাশের চেষ্টা! সম্রাটের সভার ওস্তাদেরা চক্রান্ত করতঃ তাঁহার ওরূপ দুর্দ্দশা পর্য্যন্ত করিতে লজ্জিতও হইল না। কোথায় যে পলাইয়া গেলেন দিল্লীসহরের অন্যান্য গায়কেরা কেহই তাহা জানিতে পারিল না। অজ্ঞাতসারে তানসেন মধুমাধ্বীর গ্রামে বাস করিতে লাগিলেন।

মধুমাধ্বী কর্ত্তৃক তানসেন যথার্থ উপকৃত হইয়াছিলেন বলিয়া মধুমাধের গ্রামে তিনি আকৃষ্ট হইয়া পড়েন। মধুমাধ্বী তানসেনের দীপকদহনজনিত বিকৃতাবস্থা একেবারে রীতিমত আরাম করিয়া দেন। কি প্রকারে আরাম করিয়া দেন তাহা নিম্নে কথিত হইতেছে ঃ—

মধুমাধ্বী তাঁহার গৃহের ছাদের উপর একটা চৌবাচ্ছা গাঁথিয়া তানসেনকে বলিলেন "তুমি এই চৌবাচ্ছাতে বোসো"; তানসেন মধুমাধের কথামত চৌবাচ্ছায় বসিলেন। তখন মধুমাধ শুধু মেঘরাগ গাহিতে লাগিলেন।—কিছুক্ষণ পরেই ঝর ঝর ধারায় বৃষ্টি পড়িতে লাগিল। বৃষ্টিতে চৌবাচ্ছাটী পূর্ণ হইয়া গেল। তখন সেই বৃষ্টির জলে স্নান করিয়া তানসেন পুনরায় নবজীবন প্রাপ্ত হইলেন। বিজ্ঞানশাস্ত্রেও তো বলে যে বৃষ্টিবারির অশেষ গুণ; ইহাতে চর্ম্মরোগ দহনজ্বালা অতি সত্বর উপশম হয়। শাস্ত্রে আছে ঃ—

"গগনাম্বু ত্রিদোষঘ্নং গৃহীতং ষৎসুজনে।
বল্যং রসায়নং মেধ্যং পাত্রাপেক্ষিচ তদ্গুণং॥"

"সুপাত্রে গৃহীত বৃষ্টি জল ত্রিদোষঘ্ন, বলকারক, রসায়ন, মেধ্য; অর্থাৎ জরাব্যাধিহর পুষ্টিকর হয় এবং যে প্রকার পাত্রে গৃহীত হয় তদ্গুণবিশিষ্ট হয়।"

এইরূপে তানসেন মধুমাধ্বীর গানের ফলে চৌবাচ্ছায় বৃষ্টিবারিতে স্নান করিয়া আরোগ্য লাভ করিলে পুনরায় তিনি তথা হইতে আরও উত্তরে চলিয়া গেলেন; তাঁহার আর কেহ সন্ধান পাইল না। কথিত আছে হিমাদ্রি অঞ্চলে উত্তর হইতে উত্তরে গিয়া তির্ব্বতপ্রদেশস্থ কৈলাসে গিয়াছিলেন। তানসেন একজন মহাযোগীগায়ক ছিলেন—তাই একেবারে তির্ব্বতে যোগীশ্রেষ্ঠ শিবের প্রিয় স্থান কৈলাস অঞ্চলে গমন করেন। তানসেন জগদ্বিখ্যাত ছিলেন; তাঁহার সময়ে তাঁহাকে য়ুরোপীয় সঙ্গীতের অন্যতম

জন্মভূমি ইটালী প্রভৃতি দেশে এবং আরব পারস্য প্রভৃতি দেশে তাঁহার নাম প্রচারিত হইয়া পড়ে। ভারতের ব্রাহ্মণবংশীয় যোগীগায়ক তানসেন যে তাঁহার আত্মা ও দেহ মনের শান্তির জন্য শেষে যে যোগধাম শান্তিধাম শিবের আলয় কৈলাস অঞ্চলে প্রস্থান করিবেন তাহা আর বিচিত্র নহে। শুধু তানসেন কেন পূর্ব্বে হিন্দুমাত্রেই যোগরত সন্ন্যাসীর ভাবাপন্ন হইলেই শেষ হিমাদ্রিপারে কৈলাসে যাইবার চেষ্টা করিত, ইহার ভূরি ভূরি প্রমাণ আছে; ভারত হইতে কেহ তির্ব্বতায় লামাদের মঠে আসিলে তির্ব্বতের লামারা বড়ই আনন্দিত হইত। বর্ণিয়র প্রভৃতি ইউরোপীয় পর্য্যটকদিগের মতে,—ভারত হইতে এবং বিশেষতঃ এই বাঙ্গলা হইতে শত শত গোঁসাই লাসাসহরে লামামঠে যাইয়া মঠের শোভা বর্দ্ধন করিত। কোন ফরাসী পর্য্যটক লিখিয়া গিয়াছেন যে, বান্দচান রেমবুজি নামক কোন ভারতের লোক নানা ঘটনার পরে জীবনের শেষাংশ ভারত হইতে অধিকতর দূরে অবস্থিত তিব্বতের কোন স্থানে যাইয়া অতিবাহিত করেন;—জন্মজন্মান্তরের রূপকচ্ছলে তাহার গল্পটী এইরূপ কথিত আছে ঃ—"The present Bandchan—Remboutchi is sixty years of age; he is, they say, of a fine and majestic frame, and astonishingly vigorous for his advanced age. This singular personage states himself to be *of Indian origin*, and that it is already some thousand of years since his first incarnation took place in the celebrated country of the Azaras. The physiognomists who, at our first coming to Lhassa, took us for white Azaras, failed not to urge us to go and offer our devotions to the Djachi-Loumbo, assuring us, that in our quality of countrymen of the Bandchan-Remboutchi, we seould have a very good reception. The learned Lamas, who occupy themselves with Budhic genealogies, explain how the Bandchan, after numerous and marvellors incarnations in Hindostan, ended by appearing in further Thibet, and fixing his residence at

Djachi-Loumbo."

ভারতবর্ষীয়েরা যে পূর্ব্বে শেষ জীবনে যোগক্ষেত্র কৈলাস অঞ্চলে যাইবার অভিলাষ করিত তাহা মহাযোগী শিবের অনুসরণ মাত্র। যোগী তানসেনও তাহাই করিয়াছিলেন— পূর্ব্বে তির্ব্বতে অনেকেই যাইত—কথায় কথায় ভারতের অধিবাসীরা লাসায়—শিবের কৈলাসে যাইত। যোগী শিবভক্ত তানসেনও শেষজীবন যোগধাম শিবধাম তির্ব্বতে গিয়াছিলেন।

যোগী তানসেন যে দিল্লীর প্রতি বিমুখ হইয়া যোগভূমি তির্ব্বতে গিয়াছিলেন ইহা যে অমূলক জনশ্রুতিমাত্র তাহা মনে হয় না, কারণ বর্ত্তমান তির্ব্বত ইতিহাসে তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাওয়া যায়। এই তির্ব্বতের একস্থানে 'তানসেন' বা 'তানসান' নামক মঠ এখনও বিদ্যমান; ইহাতে ২০০ শত লামাসন্ন্যাসীর স্থান আছে; ইহার প্রতিষ্ঠানভূমি অত্যন্ত মনোমুগ্ধকর; চতুর্দ্দিকে শৈলপর্ব্বতরাজি; দীর্ঘ দেবদারু পাদপসমূহলতাসমাচ্ছন্ন হইয়া বিরাজ করিতেছে; মধ্যে লামাদের বাসস্থান; একটী স্রোতস্বিনী—ধারে ধারে রাশি রাশি পার্ব্বত্য জলবল্লীতে শোভমান—নিঃশব্দে মঠের চারিদিক বেষ্টিত করিয়া, এক শৈলপ্রপাতের উপর সবেগে পতিত হইতেছে, এবং মরুভূমির মধ্যদিয়া প্রবাহিত হইয়া চলিয়া গিয়াছে। 'তানসান' নামক বৌদ্ধমঠটী, সকলে বলে অত্যন্ত ঐশ্বর্য্যপূর্ণ; কুকুনূরের মোগল রাজপুত্রেরা ইহাতে বাৎসরিক দান করিয়া থাকেন। "From Tchogortan to the Konkon-Noor was four days' march. We passed on our way a small Lamasery, called Tansan, containing at most two hundred Lamas; its site is perfectly enchanting; rocky mountains, covered with shrubs and tall firs, form for it a circular enclosure, in the centre of which rise the habitations of the Lamas. A stream bordered with willows and fine long wort, after tranquilly encircling the Lamasery, dashes over a rocky fall, and continues its course in the desert. The Buddhist manastery of Tansan is, they say, very rich, being largely endowed by the Mongal princes of Konkon-Noor with annual contributions."

তানসেনের সহিত মোগল রাজপরিবারের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ; তাই দেখি মোগলরাজপুত্রেরা তানসেনকে সাহায্য করিতে কখনও কুণ্ঠিত হন নাই। তানসেন যখন দিল্লীতে ছিলেন সেখানে তিনি মোগলরাজের প্রচুর সাহায্য লাভ করিয়াছিলেন, আবার যখন তিনি তির্ব্বতে গেলেন সেখানেও সে দেশের মোগলরাজপরিবারের কাছে বিশেষ সমাদর ও সাহায্য লাভ না করিয়া যান নাই। তাই এখনও দেখি, তানসেন যে স্থানে যোগসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন সেই তির্ব্বত প্রদেশের মোগলরাজবংশধরেরা "তানসেন" মঠের সাহায্যার্থে বর্ত্তমানকালেও প্রচুর অর্থ দান করিয়া থাকেন। এই "তানসেন" মঠ খুব সম্ভবতঃ যোগী তানসেন কর্ত্তৃকই প্রতিষ্ঠিত হইয়া "তানসেন" নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছে। হিমাদ্রিপারে তির্ব্বতেও যে তানসেন নাম ধ্বনিত ইহা কিছু আশ্চর্য্য নহে; কারণ, জাপানীদের মুখে শুনিয়াছি যে ভারত হইতে যে সকল গায়ক জাপানে, ব্রহ্মে, চীনে বা তির্ব্বত যাইত তাহাদিগকে সে দেশীয় লোকেরা আপন দেশীয় গায়কদের অপেক্ষা অধিকতর সম্মান ও যত্ন প্রদর্শন করিত—ভারতীয় গায়কদিগের প্রতিষ্ঠার জন্য চীন, জাপান, তির্ব্বত বর্ম্মা, প্রভৃতি দেশের অধিবাসীগণের কি যে আন্তরিক নিষ্ঠা ছিল তাহা এক মুখে বলা যায় না।—মোগলবাদশাহদের প্রভুত্বের সময় তানসেনের নাম শুদ্ধ ভারতে বা তির্ব্বতে কেন প্রকৃতপক্ষে জগদ্বিখ্যাত হইয়া পড়ে।—তির্ব্বতে কিন্তু তানসেন যোগসমাধিলাভ করেন—শিবের প্রিয়স্থান কৈলাসরাজ্যে গিয়া 'যোগেনান্তে' তনুত্যাগ করেন।

শ্রীহিতেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

পুণ্য পঞ্জিকা।

জ্যৈষ্ঠ।—১৩১২, ইং ১৯০৫।

দিন	আষাঢ়	জুন	তিথি	শুক্লপক্ষ	দিন	আষাঢ়	জুলাই	তিথি	কৃষ্ণপক্ষ
বু	১	১৫	ত্র		শ	১৭	১	চ	
বৃ	২	১৬	চ		র	১৮	২	অ	
শু	৩	১৭	পূ	স্নানযাত্রা	সো	১৯	৩	প্র	শুক্লপক্ষ
শ	৪	১৮	প্র	কৃষ্ণপক্ষ	ম	২০	৪	দ্বি	রথযাত্রা
র	৫	১৯	দ্বি		বু	২১	৫	তৃ	
সো	৬	২০	তৃ		বৃ	২২	৬	চ	
ম	৭	২১	চ		শু	২৩	৭	প	
বু	৮	২২	প		শ	২৪	৮	ষ	
বৃ	৯	২৩	ষ		র	২৫	৯	স	
শু	১০	২৪	স		সো	২৬	১০	অ	
শ	১১	২৫	অ		ম	২৭	১১	ন	
র	১২	২৬	ন		বু	২৮	১২	দওও	পুনর্যাত্রা
সো	১৩	২৭	দ		বৃ	২৯	১৩	দ্বা	
ম	১৪	২৮	এ		শু	৩০	১৪	ত্র	
বু	১৫	২৯	দ্বা		শ	৩১	১৫	চ	
বৃ	১৬	৩০	ত্র		র	৩২	১৬	পূ	

১লা সূর্য্যোদয়—ঘ ৫।১৭ মি ; সূর্য্যাস্ত—ঘ ৬।৪১ মি।

৩২শে সূর্য্যোদয়—ঘ ৫।২৭ মি ; সূর্য্যাস্ত—ঘ ৬।৪৪ মি।

বিবাহ—আষাঢ় ৩।১০।১২।১৫।১৬।২৩।

চন্দ্রকান্ত তৈল।

উচ্চশ্রেণীর মহাসুগন্ধি ! কেশতৈল

গৃহলক্ষ্মী কামিনীগণের আদরের সামগ্রী।

ডাক্তার, বারিষ্টার, মহারাজা, রাজা প্রভৃতিদিগের অতি প্রিয় বস্তু।

এ সুযোগ বেশী দিনের জন্য নহে।

অভাবনীয় ব্যাপার ! বিরাট উপহার !!

যাঁহারা নিম্নলিখিত ঠিকানা হইতে **চন্দ্রকান্ত** তৈল লইবেন তাঁহাদিগকে প্রত্যেক শিশির সহিত একখানি করিয়া সুন্দর **রেশমী রুমাল,** একটী সুন্দর শিশিতে বিলাতী সুগন্ধি **এসেন্স** ও একটী সুন্দর **সাবান** এই তিন প্রকার উপহার বিনামূল্যে দেওয়া যাইবে। যত প্রকার সুগন্ধি মস্তিষ্কস্নিগ্ধকর তৈল আছে আমরা সাহসপূর্ব্বক বলিতে পারি **চন্দ্রকান্ত** তৈল সকলের অপেক্ষা উৎকৃষ্ট। ইহা যেমন গুণে সর্ব্বোৎকৃষ্ট তেমনি পরিমাণে ও সুগন্ধে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। সুগন্ধে ইহা নন্দনের পারিজাত তুল্য। যাঁহারা এক ডজন **চন্দ্রকান্ত** তৈল লইবেন তাঁহারা একটী নিকেল সিলভারের মজবুত কিলেস ঘড়ি বিনামূল্যে পাইবেন। যাঁহারা চারি ডজন একত্র লইবেন তাঁহারা একটী বহুমূল্য **রৌপ্য ঘড়ি ও ঘড়ির চেন** উপহার বিনামূল্যে পাইবেন।

উপহার সহ তৈল আমাদের আফিসে আসিয়া লইতে পারেন অথবা পত্র লিখিলে উপহার সহ তৈল ভিঃ পিতে পাঠান যায়।

এজেণ্টগণ উচ্চহারে কমিশন পাইয়া থাকেন।

দেখুন ! দেখুন ! !

বর্ত্তমান শতাব্দীর অত্যাশ্চর্য্য কেশতৈল ! ! !

চন্দ্রকান্ত

উচ্চশ্রেণীর অনুপম সুবাসিত কেশতৈল।

চন্দ্রকান্ত

কলিকাতার উচ্চসমাজের একটী আদরের সামগ্রী।

চন্দ্রকান্ত

আধুনিক সুগন্ধি কেশতৈলের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ।

চন্দ্রকান্ত

সর্ব্বপ্রকার মস্তিষ্ক রোগের একমাত্র মহৌষধ।

চন্দ্রকান্ত

অকালপক্কতা ও টাক রোগে অব্যর্থ।

চন্দ্রকান্ত

শরীরের কান্তি ও সৌন্দর্য্য বর্দ্ধন করিতে অদ্বিতীয়।

চন্দ্রকান্ত

ডাক্তার, ব্যারিষ্টার, মহারাজা, রাজা প্রভৃতি সম্ভ্রান্ত ও ধণাঢ্য ব্যক্তিরা ব্যবহার করিয়া থাকেন।

সুন্দর বড় শিশি মূল্য ১৲ টাকা। ডাকমাশুল স্বতন্ত্র।

প্রাপ্তিস্থান—ম্যানেজার পুণ্য ব্রহ্মর্ষি ঔষধালয়।

৩৭৪ নং অপারচিৎপুর রোড অথবা ৬ নং দ্বারকানাথ ঠাকুরের গলি, যোড়াসাঁকো কলিকাতা।

"মহারাজা" চা

অতিশয় সুস্বাদু ও সুবাসিত। ইহাপেক্ষা উচ্চশ্রেণীর চা আর নাই। দারজিলিং, আসাম প্রভৃতি ভারতবর্ষের কতিপয় উৎকৃষ্ট উদ্যানসমূহে ইহা বিশেষ যত্নের সহিত উৎপন্ন করা হয়। যাঁহারা চা পান করিয়া থাকেন তাঁহারা যদি অনুগ্রহ করিয়া একবার "মহারাজা" চা পরীক্ষা করেন তাহা হইলে আমরা সাহস করিয়া বলিতে পারি আমাদের কথার যথার্থতা নিশ্চয়ই প্রমাণিত হইবে।

উৎকৃষ্ট চা আয়ুর্ব্বেদের অঙ্গীভূত। **চা পানের** অনেক গুণ আছে। আয়ুর্ব্বেদে লিখিত আছে—চা পানে শরীরের অবসন্নতা দূর হয়, কফ নাশ করে, কোষ্ঠ শুদ্ধি হয়। চা পানে নিদ্রা ও আলস্য ভাব দূর করে, মুখের অরুচি যায় এবং পিপাসা নিবারণ করে। ম্যালেরিয়া জ্বরাক্রান্ত দেশে চা একটী আবশ্যকীয় আহার্য্য সামগ্রী। উপযুক্ত পরিমাণে দুগ্ধ ও চিনি মিশ্রিত করিয়া চা পান করিলে ইহা পুষ্টিকারক ও বলবর্দ্ধক হয়।

সংস্কৃতে চায়ের গুণ লিখিত আছে—

ব্রহ্মদেশোদ্ভবা কৃষ্ণা চাহাখ্যা হরিতচ্ছদা।
শ্রমহা বলদা রেকা নিদ্রাজিজ্জ্বরশীতহা ॥
পীনসারুচিবাতঘ্নী শ্লেষ্মহৃদ্দরাময়া ॥
হিক্কাকাস পিপাসানুৎ * *

চা যতই ভাল হউক না কেন উহার প্রস্তুত প্রণালীর উপর আবার উহার সুস্বাদ অনেকটা নির্ভর করে। চা পান করিয়া তৃপ্তি লাভের নিমিত্ত সাধারণের উপকারার্থে প্রত্যেক টিনের উপর উপযুক্ত প্রস্তুত প্রণালী মুদ্রিত আছে।

"মহারাজা" চা নিম্নলিখিত দরে বিক্রয় হয়। প্রত্যেক টিনে এক পাউণ্ড করিয়া চা আছে।

সর্ব্বোৎকৃষ্ট—"দি ডিভাইন" মার্কা—১।০
AAA :—"ম্যাজেসটিক" মার্কা—১৲
AA :—"রয়্যাল" মার্কা———৸০
সুন্দর কাগজের ব্যাগে———/০

মহারাজা চা

মহামূল্য উপহার ! বিরাট উপহার ! !

বিশেষ দ্রষ্টব্য ! ! !

এই মাহেন্দ্র সুযোগ বেশী দিনের জন্য নহে।

মহারাজা চা যে সকল প্রকার চা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ তাহা সাধারণের দ্বারা প্রমাণ করাইবার নিমিত্ত আমরা তাঁহাদিগকে নিবেদন করিতেছি তাঁহারা ইহা একবার পরীক্ষা করিয়া দেখুন। আমাদে মহারাজা চা এর প্রতি তাঁহাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিবার নিমিত্ত আমরা কিছু কালের জন্য প্রত্যেক ক্রেতাকে নিম্নিলিখিত দ্রব্যাদি উপহার দিতেছি :—'রয়্যাল' মার্কা টিনের সহিত একটী খাঁটী ব্রেজিলিয়ান রৌপ্যের চা চামচ, ও "ডিভাইন" ও "ম্যাজেসটিক" মার্কা টিনের সহিত একটী সুন্দর চাএর পিরিচ ও পেয়ালা। এই শেষোক্ত পিরিচ ও পেয়ালা এনামেল কিম্বা পোসিলেনের (ক্রেতার ইচ্ছানুযায়ী) দেওয়া হয়।

পাইবার ঠিকানা—

পুণ্য ভাণ্ডার।

৩৭৪ নং অপারচিৎপুর রোড,

বা ৬ নং দ্বারকানাথ ঠাকুরের গলি,

জোড়াসাকো কলিকাতা।

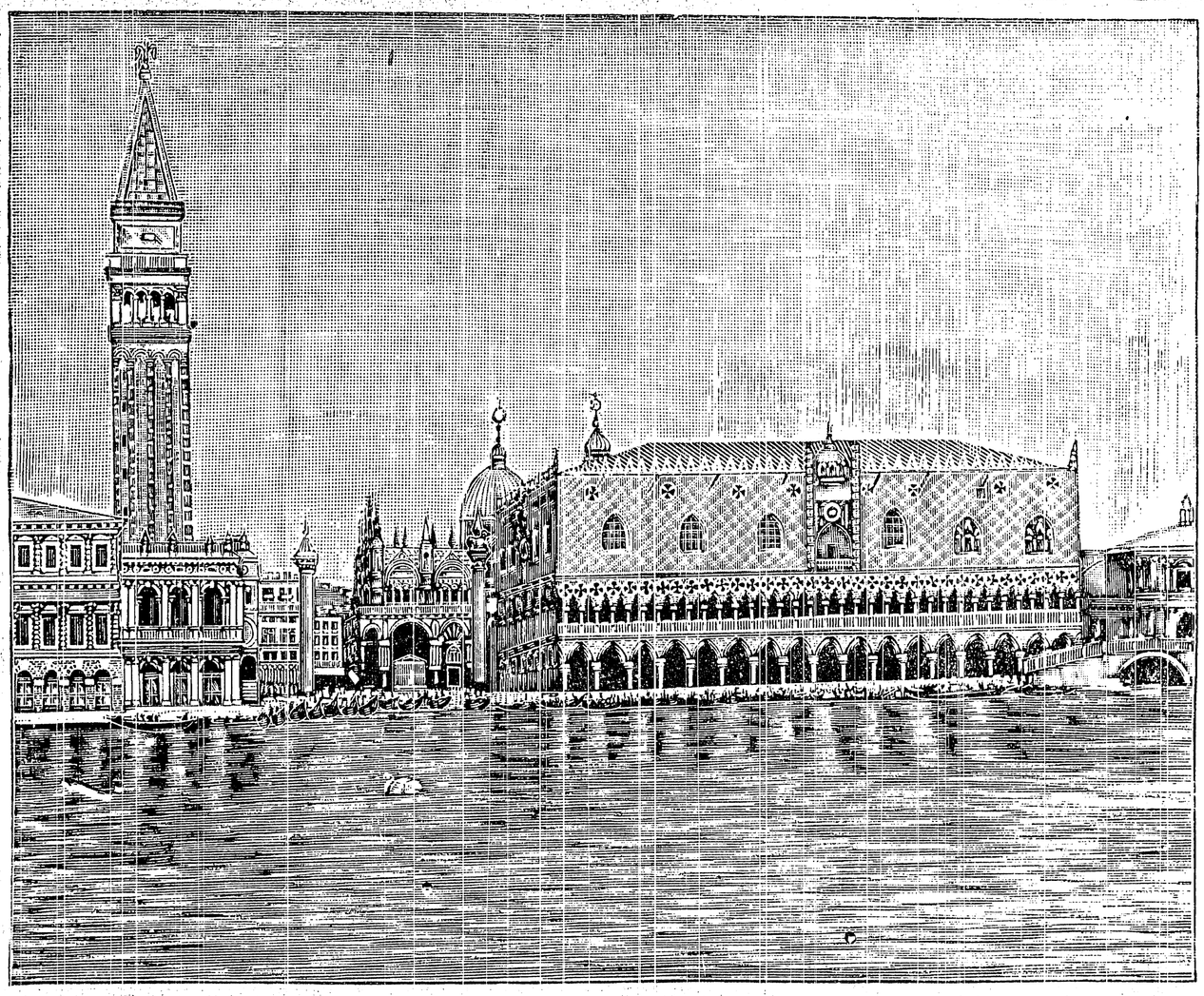

ভিনিসের রাজপ্রাসাদ।

JOTINDRO NATH DUTTA

ওঁ

পুনঃ পুনঃ প্রণাম ধারয়তি পুনঃ প্রাণদা সুরেভ্যঃ

গীতিকবি আমীরখস্রু ও সুলতান নেজামুদ্দিন।

সঙ্গীতের দরবারে প্রসিদ্ধ গীতিকবি আমীর খস্রুর কথা কে না জানে? এই আমীর খস্রুকে জানে বলিয়া গায়ক ওস্তাদেরা সুলতান নেজামদ্দিনকে জানে। তাহার কারণ আমীরখস্রু তাঁহার প্রায় অনেক গানে সুলতান নেজামদ্দিনের নামোল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। সুলতান নেজামদ্দিনের নাম গানে দেখিলেই গায়কেরা বুঝেন যে গানটী গীতিকবি আমীরখস্রুর রচনা; খস্রু তাঁহার গান নেজামদ্দিনের নামেই প্রসিদ্ধ করিয়াছেন। যেমন সদারং তাঁহার অনেক গানে শুধু 'মোমদসা' কথাটী স্পর্শ করিয়া গিয়াছেন, বাদশা মোমদসার নাম দেখিয়াই যেমন বোঝা যায় যে গানটী সদারঙ্গের গান, সেইরূপ গানে শুধু সুলতান নেজামদ্দিনের উল্লেখ দেখিলেই বুঝিতে হইবে গীতটী আমীরখস্রুর রচিত।—কিন্তু খস্রুর গানে তাঁহার নিজ নামোল্লেখ না থাকাতে অনেক সময়ে ওস্তাদেরা গোলমাল করিয়া ফেলেন; এই গোলোযোগে পড়িয়া কেহ কেহ বলেন যে আমীরখস্রু ও সুলতান নেজামদ্দিন একই লোক; আমীরখস্রুর অন্যতম নাম হইতেছে সুলতান নেজামদ্দিন।

আমীরখস্রু ও সুলতান নেজামদ্দিন ইহাঁরা দুইজনে যে পৃথক ব্যক্তি তাহা ঐতিহাসিক অনুসন্ধানের দ্বারা জানিতে পারা যায়।—গায়কসমাজে যে তাঁহা-

দের দুইজনকে অনেক সময়ে একই লোক বলিয়া গোল করিয়া ফেলে তাহার অন্যতম কারণ হইতেছে যে তাঁহারা দুইজনে একই সময়ের লোক। এই সমসাময়িক লোক বলিয়া আর নেজামদ্দিন নাম যুক্ত গান খস্রুর গান বলিয়া প্রসিদ্ধ থাকাতে, গায়কেরা অনেকে উভয়কে একই ব্যক্তি স্থির করিয়া ভ্রমে পতিত হয়েন।—মনে করেন আমীরখস্রুও যে ব্যক্তি সুলতান নেজামদ্দিনও সেই ব্যক্তি।—আমীরখস্রুই গানে নিজের সুলতান নেজামদ্দিন নাম চালাইয়াছেন।

দুইজনে যে পৃথক ব্যক্তি তাহার একটী প্রধান প্রমাণ এই যে, আমীরখস্রু, নেজামদ্দিন ও তাঁহার প্রভু কাইকোবাদ ও তৎপিতা বগরা খাঁর সাক্ষাৎ সম্বন্ধীয় একটী গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। এই দিল্লির বাদসা কায়কোবাদের নেজামদ্দিনই সম্ভবতঃ সুলতান নেজামদ্দিন। কারণ টোগলাক রাজত্বের সময় আমীরখস্রু বর্ত্তমান ছিলেন। যে সুপ্রসিদ্ধ গায়ক নায়ক গোপালের কল্যাণ রাগের প্রাণ লইয়া আমীরখস্রু চতুরতাসহকারে ইমনকল্যাণের সৃষ্টি করিয়াছিলেন সেই নায়ক গোপালও আমীরখস্রুর সমসাময়িক ও টোগলক রাজত্ব কালেই * ছিলেন। টোগলকদিগের রাজত্বের সময় কায়কোবাদের উক্ত নেজামদ্দিন ব্যতীত নেজামদ্দিন নামে অন্য কোন পারিষদ মন্ত্রী ছিল না; এবং ইতিহাসে ইহাও পাঠ করা যায় যে কায়কোবাদের দরবারে উক্ত নেজামদ্দিন দ্বারা অনেক নর্ত্তকী, গায়ক ও ওস্তাদমণ্ডলী সুরক্ষিত ও পুষ্ট হইত।—সম্রাটসভায় গানবাজনার মহা মজলিস বসিত।—আমোদ প্রমোদ লইয়া নেজামদ্দিন মগ্ন হইয়া থাকিতেন। গায়কবৃন্দ অল্পবয়স্ক বিলাসী সম্রাটকে পাইয়া ভারি স্ফূর্ত্তিলাভ করিতেছিল; কায়কোবাদের পিতা বগরাখাঁ তাঁহার পুত্র কায়কোবাদের বিলাসমোহ বুঝিয়া বাঙ্গলা দেশ হইতে দিল্লীর অভিমুখে তাঁহার পুত্রের সহিত সাক্ষাৎ করিতে চলিলেন—হিতোপদেশ দান করিবেন।—পারিষদমন্ত্রী নেজামদ্দিন প্রমুখ গায়কবৃন্দের তাহা সহ্য হইল না, ভাবিল যে বগরাখাঁর সদুপদেশে কায়কোবাদের মন ফিরিলে আর দিল্লীর দরবারে তাহাদের প্রভুত্ব থাকিবে না।—তাহারা নানারূপে পিতা পুত্রের মধ্যে বিবাদ লাগাইবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন—মন্ত্রী ও গায়ক পারিষদেরা কায়কোবাদকে বলিলেন যে, বগরাখাঁ

* সমীরণ নামক মাসিকপত্রিকায় এবিষয়ে পূর্ব্বে আমি বিস্তৃতরূপে বলিয়া আসিয়াছি।

আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিলে, যেমন সম্রাটকে সুবাদারের সম্মান প্রদর্শন করা উচিত সেইরূপ সম্মান দেখাইয়া তাঁহাকে আসিতে হইবে, নচেৎ দিল্লীর সিংহাসনের মান যাইবে। মূর্খ কায়কোবাদ তাহাতে সায় দিলেন—বগরা খাঁ আসিলে আদেশ দিয়া রাখিলেন যে সুবাদার যে প্রকারে আদবকায়দার সহিত সম্মান প্রদর্শন করতঃ বাদসার কাছে যান, সেইরূপ আদবকায়েদার সহিত যেন আমার সঙ্গে দেখা করিতে আসেন।

কায়কোবাদের উপর তাঁহার মন্ত্রী নেজামদ্দিন ও গায়কবৃন্দের এইরূপ প্রভাব ছিল। মন্ত্রীই একরূপ সম্রাটসভার সুলতান হইয়া দাঁড়াইয়াছিলেন। এরূপ হওয়া ইতিহাসে কিছু বিচিত্র নহে; মহারাট্টা ব্রাহ্মণ মন্ত্রী পেশোয়ারা কি ছিলেন? নেপালের মন্ত্রীরাইবা কি ছিলেন? তাহারা মন্ত্রী হইয়াও রাজার ন্যায় ছিলেন;—কায়কোবাদের সভায় মন্ত্রী নেজামদ্দিনের প্রভাব ও প্রতাপ অত্যধিক ছিল, যেন তিনিই সর্ব্বেসর্ব্বা ছিলেন। তিনি গায়কসমাজকে পুষ্ট করিতে অনেক যত্ন করিয়াছিলেন এইজন্য আমীরখস্রুরও তিনি গুরুতুল্য ছিলেন, তাই আমীরখস্রু তাহার গানে নেজামদ্দিনের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন!—

দিলীয়া নগরমে জস গাঁউ
জেতে হরপা দেছনা সোই মেয় পাঁউ
সুলতান নেজামদ্দিন তোম্ পরবিন হোয় অধীন কেয়সেকে রেঝাঁউ।

দিল্লীসহরে সুলতান নেজামদ্দিনের নাম খুব। খস্রুই তাঁহার নাম অধিক প্রসিদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। তিনি সুলতান নেজামদ্দিনের একরূপ শিষ্যসম হইয়াছিলেন, নেজামদ্দিনকে খস্রু প্রধান গুরুর মত সম্মান প্রদর্শন করিতেন ও তাঁহার একান্ত অধীন থাকিয়া সর্ব্বদা তাঁহাকে সন্তুষ্ট করিতেন। পুরাতন দিল্লীসহরে আমীরখস্রু ও সুলতান নেজামদ্দিনের সমাধিদ্বয় পাশাপাশি রহিয়াছে। অনেক যাত্রী সেখানে গিয়া ফুলের মালা দিয়া আসে। আমি যখন দিল্লীতে যাই তখন এই দুই গায়ক কবির সমাধিদ্বয় দেখিয়া আমারও কেমন গাম্ভীর্য্য ও শ্রদ্ধার ভাব মনে উদয় হইয়াছিল। আমিও ভারতের অতীতের গুণীর কাছে মস্তক অবনত করিয়া ছিলাম।

সুলতান নেজামদ্দিন প্রভাবে ও প্রতাপে যদিচ সুলতানবৎ হইয়া দিল্লীতে

বিরাজ করিতেছিলেন, কিন্তু তিনি বেশ ধরিতেন ফকিরের বেশ—আউলিয়ার বেশ। তাঁহার অন্যতম উপাধি ছিল আউলিয়া। তিনি আপনাকে সর্ব্ব-প্রথমে লোকের কাছে **নেজামদ্দিন আউলিয়া** নামে পরিচয় দেন। দিল্লীর লোকে, তাঁহাকে একজন ফকির বলিয়া সাধারণতঃ সম্মান ও ভক্তি করিত—খস্রুও করিতেন। তারপরে ক্রমে তাঁহার সম্রাটসভায় প্রবেশ দেখিয়া সাধারণ লোকে আরও মান্য করিতে লাগিল।—দেখিল নেজামদ্দিন একেতো আউলিয়া তার উপর দিল্লীর রাজসভার উপর তাঁহার প্রভাব বিলক্ষণ; তখন হইতে তাঁহাকে লোকে **সুলতান নেজমদ্দিন আউলিয়া** আউলিয়া বলিতে লাগিল।—তিনি একজন মহা প্রসিদ্ধ ব্যক্তি হইয়া উঠিলেন।—আমীরখস্রু তাঁহার নেজামদ্দিন নাম তাঁহার গানে চালাইয়া তাহার অমরতাসাধন করিলেন। খস্রু নেজামদ্দিনকে অত্যন্ত ভক্তি ও শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিতেন; আমীরখস্রু তাঁহার কোন কোন গানে **'সুলতান নেজামদ্দিন আউলিয়া পীর মহাবুব'** বলিয়া নেজামদ্দিনের নাম ধ্বনিত করিয়া গিয়াছেন:—

খস্রুর অনুকরণে অন্যান্য গায়কেরা ও নেজামদ্দিনকে ভক্তি ও শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিতে লাগিলেন। বিখ্যাত ভারতীয় সঙ্গীতজ্ঞগুণী সদারঙ্গ তাঁহার একটী গানে তাঁহার প্রিয় প্রভু মোমদসাকে দরবারে শোভমান করিতে গিয়া নেজামদ্দিনের সহিত তাঁহার তুলনা করিয়াছেন—**'তুম্মা দরবারে নেজামদ্দিন'** বলিয়া তাঁহাকে উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন।

দিল্লীতে যে একটী উদ্যানের মধ্যে আমীরখস্রু ও সুলতান নেজামদ্দিন আউলিয়ার সমাধিদ্বয় পাশাপাশি স্থাপিত হইয়াছে, তাহা সঙ্গতই হইয়াছে।—খস্রু ও নেজামদ্দিন পৃথক ব্যক্তি হইলেও গানে যেন একাত্মা হইয়া সমাধিস্থ হইয়া আছেন।

শ্রীহিতেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

ব্রাহ্মসমাজের প্রয়োজন।

ঈশ্বরের এমনি আশ্চর্য্য নিয়ম যে কোন কিছুই তীব্র প্রয়োজন পড়িলেই তাহার সৃষ্টিও হয়, বিনা প্রয়োজনে কিছুই সৃষ্টি হয় না—অনেক সময়ে আমরা প্রয়োজন উপলব্ধি নাও করিতে পারি। ব্রাহ্মসমাজের প্রয়োজন পড়িয়াছিল, ব্রাহ্মসমাজের উৎপত্তিও হইল। যে সময়ে ব্রাহ্মসমাজের উৎপত্তি, সে সময়ে ভারতের প্রশান্ত গগন মসীলিপ্ত অন্ধকার আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিতেছিল এবং সত্বরেই নানা ঝঞ্ঝাবাতের সম্ভাবনা ছিল। একদিকে প্রাচীন পন্থার ব্যক্তিগণ প্রাচীন প্রথা সকল ভাল হউক বা মন্দ হউক আঁকড়াইয়া ধরিয়াছিলেন, বিন্দুমাত্র পরিবর্ত্তন করিতে দিবেন না। অপরদিকে পলাশি যুদ্ধের পর অবধি নবীন আশায় উৎফুল্ল, নূতন রাজকার্য্যের ভারপ্রাপ্ত ইংরাজজাতির সংস্পর্শে আসিয়া অনেক নবীন যুবকের হৃদয় নূতন নূতন ভাবে আলোড়িত হইতেছিল, তাহারা বিকৃত প্রাচীন প্রথার দুর্গন্ধরাশির মধ্যে বাস করা বড়ই কষ্টকর বোধ করিতেছিল। কিন্তু তখনও তাহারা সামাজিকতার বাঁধ ভাঙ্গিতে পারে নাই। সেই এক কাল গিয়াছে, যখন বহুবিবাহ ও সতীদাহ, এই উভয়ের মধ্যে কে দেশের অধিকতর সর্ব্বনাশ সাধন করিতে বলা কঠিন হইয়া উঠিয়াছিল। কোথায় এক কুলীন পাষণ্ড বিভিন্নগ্রামে শতাধিক বিবাহ করিয়া প্রাণত্যাগ করিল, আর শতাধিক গ্রামে সতীদাহের আসুরিক আয়োজন হইল এবং শতাধিক গ্রামে সতীগণের মর্ম্মভেদী অভিশাপ তপ্ত অশ্রুজলের আকারে স্বদেশের উপরে নিপতিত হইল। অথচ ইহা বহুকাল অবধি চলিয়া আসিতেছিল বলিয়া প্রাচীনপন্থীগণ প্রাণপণে রক্ষা করিবার যত্ন করিলেন, অপরদিকে ধর্ম্মপ্রাণ ইংরাজজাতির সংস্পর্শ প্রাপ্ত অনেক নবীন যুবকের হৃদয় এই নিষ্ঠুরতা দেখিয়া প্রাচীন প্রথাসমূহ ভাঙ্গিয়া ঘোরতর সামাজিক বিপ্লব আনয়ন করিতে উৎসুক হইয়াছিল। এইরূপ নানা বিষয়ে তখন প্রাচীন ও নবীনের মধ্যে এক তুমুল সংঘর্ষ উপস্থিত হইয়াছিল। বিপ্লববন্যা আসিয়া ঋষিসেবিত এই ভারতবর্ষের কতকগুলি অনিষ্টকর প্রাচীন প্রথার সঙ্গে

মঙ্গলজনক প্রাচীনতর প্রথাসমূহও ভাসাইয়া লইয়া যাইবার উপক্রম করিয়াছিল। এই বিপ্লবের পরিবর্ত্তে প্রাচীন ও নবীনের মধ্যে সামঞ্জস্য আনয়ন করিয়া ভারতগগনে শান্তি পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করা প্রয়োজন হইয়া পড়িল এবং সঙ্গে সঙ্গে মঙ্গলময় পরমেশ্বর ব্রাহ্মসমাজকে সেই সামঞ্জস্য সাধনের উপায় করিয়া পাঠাইলেন। বাধা না পাইলে কোন প্রকার স্রোতেরই বল অনুভূত হয় না। ঈশ্বরপ্রেরিত ব্রাহ্মসমাজ যে কি ঐশ্বরিক বল লইয়া আসিয়াছিলেন, তাহা ব্রাহ্মসমাজপ্রতিষ্ঠাতাগণ প্রতিপদে বাধা পাওয়াতেই প্রকাশ পাইয়াছিল। মহাত্মা ব্যক্তিগণ বিলাসিতায় মগ্ন থাকিয়া সহসা রাতারাতি বড় লোক হয়েন না; তাঁহাদিগকে যথেষ্ট পরিশ্রম করিতে হয়, কঠোর তপস্যা অবলম্বন করিতে হয়। তাঁহাদিগকে অলস রক্ষণশীলদিগের নিকট হইতে যথেষ্ট বিদ্রূপ অত্যাচার প্রভৃতি সহ্য করিতে হয়, কিন্তু তাহাতেও তাঁহারা ভ্রূক্ষেপ না করিয়া অবিচলিতচিত্তে স্বীয় কর্ত্তব্যপথে অগ্রসর হয়েন।

প্রধানতঃ ব্রাহ্মসমাজেরই কল্যাণে এবং ইংরাজ শাসন ও শিক্ষাবিস্তারের ফলে কোন প্রচলিত প্রথার বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়া উন্নতি সাধন করিতে গেলে সেকালে যে কি ভয়ানক অত্যাচার লাভ করিবার সম্ভাবনা ছিল, তাহা বর্ত্তমানে কল্পনায়ও আনিতে পারি না; ব্রাহ্মসমাজ-প্রতিষ্ঠাতাগণের উপর সেকালের অত্যাচারসমূহ উপন্যাসের মত বোধ হয়। এইরূপ অত্যাচার নির্য্যাতন প্রভৃতি দূরীকরণও ব্রাহ্মসমাজের অভ্যুদয়ের একটা প্রয়োজন। ব্রাহ্মসমাজের প্রতিষ্ঠায় প্রতিষ্ঠাতাগণের নির্য্যাতন প্রাপ্তি কিছু আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। তখনও ইংরাজদিগের রাজত্ব ভারতে সুদৃঢ়রূপে প্রতিষ্ঠিত হয় নাই; ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট তখনও অনেক বিষয়ে সসঙ্কোচে চলিতেছিলেন, দেশীয়দিগের উপর অনেক সাহায্যের প্রত্যাশা রাখিতেন। * তখন চারিদিকেই কুসংস্কারের রাজত্ব; কেবল দলাদলি ও গালাগালি।

সেই সময়ে এখানকার কিরূপ অবস্থা ছিল, তাহা তাঁহারই এক অনুগত শিষ্য সুন্দররূপে বর্ণনা করিয়াছেন। "রামমোহন রায় যে সময়ে কলিকাতায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন, তখন সমুদয় বঙ্গভূমি অজ্ঞানান্ধকারে আচ্ছন্ন ছিল;

* Human sacrifices in India by John Poynder Esq. London, J. Hatchard and son. 1827.

পৌত্তলিকতার বাহ্যাড়ম্বর তাহার সীমা হইতে সীমান্তর পর্য্যন্ত পরিব্যাপ্ত ছিল; বেদের যে সকল কর্ম্মকাণ্ড, উপনিষদে যে ব্রহ্মজ্ঞান, তাহার আদর এখানে কিছুই ছিল না; কিন্তু দুর্গোৎসবের বলিদান, নন্দোৎসবের কীর্ত্তন, দোলযাত্রার আবীর ও রথযাত্রার গোল, এই সকল লইয়াই লোকেরা মহা আমোদে, মনের আনন্দে কালহরণ করিত। গঙ্গাস্নান, ব্রাহ্মণ বৈষ্ণবে দান, তীর্থভ্রমণ, অনশনাদি দ্বারা তীব্র পাপ হইতে পরিত্রাণ পাওয়া যায়, পবিত্রতা লাভ করা যায়, পুণ্য অর্জন করা যায়, ইহা সকলের মনে একেবারে স্থির বিশ্বাস ছিল, ইহার বিপক্ষে কেহ একটীও কথা বলিতে পারিতেন না। অন্নের বিচারই ধর্ম্মের কাষ্ঠাভাব ছিল, অন্নশুদ্ধির উপরেই বিশেষরূপে চিত্তশুদ্ধি নির্ভর করিত। স্বপাক হবিষ্যভোজন অপেক্ষা আর অধিক পবিত্রকর কর্ম্ম কিছুই ছিল না। কলিকাতার বিষয়ী ব্রাহ্মণেরা ইংরাজদিগের অধীনে বিষয়কর্ম্ম করিয়াও স্বদেশীয়দিগের নিকটে ব্রাহ্মণজাতির গৌরব ও আধিপত্য রক্ষা করিবার জন্য বিশেষ যত্ন করিতেন। তাঁহারা কার্য্যালয় হইতে অপরাহ্ণে ফিরিয়া আসিয়া অবগাহন স্নান করিয়া ম্লেচ্ছসংস্পর্শজনিত দোষ হইতে মুক্ত হইতেন এবং সন্ধ্যাপূজাঙ্গ শেষ করিয়া দিবসের অষ্টমভাগে আহার করিতেন। ইহাতে তাঁহারা সর্ব্বত্র পূজ্য হইতেন এবং ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেরা তাঁহাদের যশ সর্ব্বত্র ঘোষণা করিতেন। যাঁহারা এত কষ্ট স্বীকার করিতে না পারিতেন, তাঁহারা কার্য্যালয়ে যাইবার পূর্ব্বেই সন্ধ্যাপূজা হোম সকলই সম্পন্ন করিতেন এবং নৈবেদ্য ও টাকা ব্রাহ্মণদিগের উদ্দেশে উৎসর্গ করিতেন; তাহাতেই তাঁহাদের সকল দোষের প্রায়শ্চিত্ত হইত। ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেরা তখন সংবাদপত্রের অভাব অনেক পূরণ করিতেন। তাঁহারা প্রাতঃকালে গঙ্গাস্নান করিয়া পূজার চিহ্ন কোশাকুশী হস্তে লইয়া সকলেরই দ্বারে দ্বারে ভ্রমণ করিতেন এবং দেশবিদেশের ভালমন্দ সকল প্রকারই সংবাদ প্রচার করিতেন। বিশেষতঃ কে কেমন দাতা, শ্রাদ্ধ দুর্গোৎসবে কে কত দান করিলেন, ইহারই সুখ্যাতি ও অখ্যাতি সর্ব্বত্র কীর্ত্তন করিতেন এবং ধনীদাতাদিগের যশ ও মহিমা সংস্কৃত শ্লোকের দ্বারা বর্ণন করিতেন। ইহাতে কেহ বা অখ্যাতির ভয়ে, কেহ বা প্রশংসালাভের আশ্বাসে, বিদ্যাশূন্য ভট্টাচার্য্যদিগকেও যথেষ্ট দান করিতেন। শূদ্র ধনীদের উপরে তাঁহাদের আধিপত্যের সীমা ছিল না। তাঁহারা শিষ্যবিত্ত-

পহারক মন্ত্রদাতা গুরুর ন্যায় কাহাকেও পাদোদক দিয়া, কাহাকেও পদধূলি দিয়া, যথেষ্ট অর্থ উপার্জ্জন করিতেন। ইহার নিদর্শন অদ্যাপি গ্রামে নগরে সর্ব্বত্র বিদ্যমান রহিয়াছে। তখনকার ব্রাহ্মণপণ্ডিতেরা ন্যায়শাস্ত্রে ও স্মৃতিশাস্ত্রে অধিক মনোযোগ দিতেন এবং তাহাতে যাঁহার যত জ্ঞান ও অনুশীলনা থাকিত, তিনি তত মান্য ও প্রতিষ্ঠাভাজন হইতেন; কিন্তু তাঁহাদের আদিশাস্ত্র বেদে এত অবহেলা ও অনভিজ্ঞতা ছিল যে প্রতিদিন তিনবার করিয়া যে সকল সন্ধ্যার মন্ত্র পাঠ করিতেন, তাহার অর্থ অনেকে জানিতেন কিনা সন্দেহ। বিষয়ী ধনীদের মধ্যে তো কোন প্রকারই বিদ্যার চর্চ্চা ছিল না। চলিত বাঙ্গালা ভাষারও ব্যাকরণ জানা দূরে থাকুক কাহারো তাহার বর্ণশুদ্ধি জ্ঞান ছিল না। বিষয়কর্ম্মের উপযোগী পত্রলেখা ও অঙ্ককষা জানা থাকিলেই তাঁহাদের পক্ষে যথেষ্ট হইত। তাঁহাদের মধ্যে যাঁহারা পারসী পড়িতে ও ইংরাজী অক্ষর ভাল করিয়া লিখিতে পারিতেন, তাঁহারা বিদ্যার গরিমা আর মনে ধারণ করিতে পারিতন না। তখনকার বাঙ্গালা পুস্তকের মধ্যে কেবল চৈতন্যচরিতামৃত; কবিকঙ্কনের চণ্ডী, আর ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গল ও বিদ্যাসুন্দর প্রসিদ্ধ—এসকলই পদ্যের, গদ্যের গ্রন্থ তখন একখানিও ছিল না। বুলবুলি ও কুড়ির খেলা, কৃষ্ণযাত্রা ও কবির লড়াই, বীণ সেতার ও তবলাতেই তখনকার কলিকাতার যুবকদিগের আমোদ ছিল এবং তাঁহারা দোলের আবীর খেলার ন্যায় নন্দোৎসবে গোলা হরিদ্রা লইয়া পথে ঘাটে দলে দলে মাতামাতি করিয়া ফিরিতেন ও দেবকী-প্রসূতির প্রসাদ ঝালের লাড়ু ভক্তিপূর্ব্বক খাইতেন। তথাপি অনেক রক্ষা এই ছিল যে তখন পানদোষ তাহার মধ্যে প্রবেশ করে নাই এবং ইউরোপ দেশের বিজাতীয় সভ্যতার কলঙ্ক তাহাতে লিপ্ত হয় নাই। তখন তাঁহারা বড় বড় পূজাতে ইংরাজদিগকে বাটীতে নিমন্ত্রণ করিয়া খাওয়াইতেন বটে, কিন্তু আপনারা সেই আহারে তাঁহাদের সঙ্গে যোগ দিতে পারিতেন না। *

গীতা বলিয়াছেন—

যুক্তাহারবিহারস্য যুক্ত চেষ্টস্য কর্ম্মসু।
যুক্তস্বপ্নাববোধস্য যোগো ভবতি দুঃখহা॥

* তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা ১৭৮৭ শক, শ্রাবণ।

সামঞ্জস্যই যোগ। উপরে সে কালের যেরূপ অবস্থা বর্ণিত দেখিলাম, তাহাতে বোধ হয় যেন তখন আলস্য ও কপটতার রাজ্য ছিল। লোকের মনে যাহাই কেন থাকুক, বাহিরে ধর্ম্মের বেশ ধারণ করিলেই তাহার সমস্ত অপরাধের মার্জ্জনা হইত। আশ্চর্য্য এই যে জনসাধারণ এইরূপ কপটতার রাজ্যে কিরূপে সন্তোষের সহিত জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিত। তবে বোধ হয় যে ভাবুক ও চিন্তাশীল লোকের একেবারে অভাব হয় নাই এবং তাঁহাদের প্রাণ, কপটতা ও আলস্যের বাঁধ ভাঙ্গিয়া মস্তক উত্তোলন পূর্ব্বক প্রকৃত ধর্ম্মের মর্য্যাদা ঘোষণা করিবার জন্য অত্যন্ত অস্থির হইয়া উঠিয়াছিল। তাঁহাদের প্রাণের তীব্র আকাঙ্ক্ষার তরঙ্গ সকল বঙ্গদেশের আকাশ ব্যাপ্ত করিয়া ফেলিয়াছিল। সেই মর্ম্মবাহী আন্দোলনের ফলে বিশ্রাম ও কর্ম্মের, প্রাচীন প্রথা ও নবীন সংঘর্ষের, এবং ধর্ম্মের বহিরঙ্গ ও অন্তরঙ্গের মধ্যে সামঞ্জস্য স্থাপনের জন্য ব্রাহ্মসমাজের অভ্যুদয় হইল। ব্রাহ্মসমাজের মূল প্রতিষ্ঠাতা বীরচতুষ্টয়—রাজা রামমোহন রায়, স্বনামপ্রসিদ্ধ দ্বারকানাথ ঠাকুর, সুবিখ্যাত স্মার্ত্তচূড়ামণি রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ এবং আদিব্রাহ্মসমাজের সুপ্রসিদ্ধ গায়ক বিষ্ণুচন্দ্র চক্রবর্ত্তী।

শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

ব্রহ্মে শূলীনাথ।

ব্রহ্মদেশে এক্ষণে বুদ্ধদেবের সাম্যভাবের রাজত্ব—সকলই একাকার। কিন্তু এই ধর্ম্ম বিস্তার হইবার অনেক পূর্ব্বে হইতে এ দেশীয়দের "নট" উপাসনায় বিশেষ রতি ছিল। "নট" উপাসনা শুদ্ধ ব্রহ্মদেশে কেন, আদিম কালে নানা দেশেই প্রচলিত ছিল; বর্ত্তমান কালেও স্থানে স্থানে তাহার চিহ্ন পরিলক্ষিত হয়। ব্রহ্মদেশে "নট" পূজা অনেক পুরাতন; ব্রহ্মদেশবাসী জনসাধারণের মধ্যে এবং এমন কি চারিপার্শ্বস্থ সান কাচিন কারেন প্রভৃতি অসভ্য বর্ব্বর জাতিদের মধ্যে উহাই সর্ব্বেসর্ব্বা ধর্ম্ম ও কর্ম্ম।

"নট" কথা পালী ও সংস্কৃত 'নাথ' কথার অপভ্রংশ; অতএব "নট" পূজা শব্দে নাথ বা দেবতা পূজা বুঝা যায়, কেননা উচ্চতর দেবশক্তিগণকে লোকপাল বা লোকনাথ শব্দে অভিহিত করা হয়। ব্রহ্মদেশবাসীরা সক্রমিন অর্থাৎ শক্র বা ইন্দ্ররাজাকেই ইহাদের রাজা বলিয়া থাকেন। বৌদ্ধধর্ম্ম এ বিশ্বাসের প্রতিকূল নহে, সেই জন্য এ বিশ্বাসের সহিত এখানে ধর্ম্মেরও কোন বিরোধ ঘটে না। প্রয়াগে, অনেকেই জানেন যে কামবাপী কূপ বলিয়া এক কূপ ছিল তাহাতে যাহা কামনা করিয়া লোকে প্রাণত্যাগ করিত পরজন্মে তাহাই লাভ করিত; কথিত আছে আকবর বাদশাহ পূর্ব্বজন্মে রাজচক্রবর্ত্তী হইবার কামনা করিয়া এই কূপে প্রাণত্যাগ করেন, তাই পরজন্মে ভারতবর্ষের সম্রাট হইয়াছিলেন। শুনা যায় ইংরাজরা সেই কূপ বুজাইয়া দিয়াছেন যাহাতে লোকে আর সেখানে প্রাণবিসর্জ্জন করিতে না পারে। তবে সেস্থান এখনো আছে ও দেখান হয়। ব্রহ্মদেশেও ঐ প্রকার কূপ না হইয়া এক প্রস্তরখণ্ড আছে, তাহাকে কামরূপী উপলখণ্ড বলা যাইতে পারে। কথিত আছে "মুলে নট" বা শূলীনাথ রেঙ্গুনে একস্থানে অঙ্গুলি দ্বারা নির্দ্দেশ করিয়া দেন, তৎপরে সেই স্থানেই ঐ শ্বেদিগোনফয়া অর্থাৎ সুবর্ণ কলস বা ছত্রযুক্ত মন্দির প্রতিষ্ঠিত হইয়া অনেক ধর্ম্মপিপাসু লোকের উপাসনা-স্থান হইয়া উঠিয়াছে। ইহা ব্রহ্মদেশের রাজধানী রেঙ্গুনসহরে এক অতি বৃহৎ বুদ্ধদেবের মন্দির বলিয়া

প্রসিদ্ধ! কিন্তু যে স্থানে উক্ত "শূলীনাথ" দণ্ডায়মান ছিলেন সেই স্থানে আধুনিক "শূলী" মন্দির প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল ও তাঁহার নিজ স্থিতি স্থানে তাঁহারই মূর্ত্তি বিরাজমান আছে। এই "শূলীনাথ" ত্রিশূলধারী শিবের নামান্তর বলিয়া মনে হয়। অনেক লোকেরা মন্দিরে উপাসনা করিতে আসিলে এই স্থানে ফুল মালা চন্দন ধূপ ধূনা অগুরু ও দীপ উপহার দিয়া সর্ব্বপ্রকারে শূলীনাথের পূজা করিয়া থাকে। এই দেবমূর্ত্তির সম্মুখে সদাসর্ব্বদা উত্তম বস্ত্র ও মহামূল্য বসনভূষণ পূজা দেওয়া হইয়া থাকে। এই স্থান সদাসর্ব্বদা নূতন নূতন বস্ত্র ও ভূষণে এবং ফুল ও মালাতে আবৃত থাকে। দীপমালাশ্রেণীতে এই স্থান সর্ব্বদা মনোরম করিয়া রাখা হয়। শূলীনাথ দণ্ডায়মান হইয়া শ্বেদিগোন মন্দিরের দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া দেখাইতেছেন। এই দেবমূর্ত্তির সম্মুখে এক বৃহৎ প্রস্তরখণ্ড ভূমিতলে পড়িয়া আছে; লোকের বিশ্বাস যে এই দেবতাই লোকের মনস্কামনা জ্ঞাত হইয়া তদনুরূপ সঙ্কেত বা উত্তর প্রদান করিয়া থাকেন। জনসাধারণের এই বিষয় বিশ্বাস অতিশয় বদ্ধমূল। দেবতার নিকট হইতে উত্তর চাহিলে নিম্নলিখিত প্রণালীতে তাহাকে কার্য্য করিতে হইবে।—উক্ত প্রস্তর দুই খণ্ডে বিভক্ত; একটি বৃহৎ ও একটি ক্ষুদ্র। বৃহৎ খণ্ডের উপরিভাগে এক খণ্ড চৌকোণা কাগচ চেপ্‌কান আছে তাহাতে জ্যোতিষের চক্রাদির মত কি সব লেখা আছে; এবং ইহারই উপর ক্ষুদ্র প্রস্তরখানি রাখা থাকে এবং ঐ কাগচকে সম্পূর্ণরূপে আবৃত করিয়া রাখে। ক্ষুদ্র প্রস্তর অপেক্ষাকৃত লঘু, ওজনে ৩।৪ সের হইবে; জিজ্ঞাসু উপাসক জয় পরাজয় জানিতে ইচ্ছা করিলে নতজানু হইয়া দেবমূর্ত্তিকে মনে মনে পূজা করিয়া নিজের ভাব নিবেদন করে এবং তাহার নিকট উত্তর প্রার্থনা করে। উপাসকের মনোবাসনা পূর্ণ হইবার হইলে সে অনায়াসে ক্ষুদ্র প্রস্তরখণ্ড উঠাইয়া লইতে পারিবে। কিন্তু যদি বিফল মনোরথ হইবার হয় ত শত চেষ্টায় ঐ প্রস্তর সরাইতে পারিবে না। যদি মনস্কামনা পূর্ণ হইতে বিঘ্ন বাধা থাকে ত তদনুযায়ী ভার বোধ হইয়া থাকে। এই কারণে ইহাতে লোকের বিশ্বাস খুবই দৃঢ় হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

শ্রীসুনৃতা দেবী।

জানিনা।

জানিনা, কি সুখ-আশে,
কি সুখ-প্রবাহে ভেসে,
ধাই উভরায় ;
কি সুখ-আশায়, সাধে,
সিকত-রেণুর বাঁধে,
বুক বাঁধি' হায় ?
ত্যজি' শান্তি-বনস্থল,
জুড়াইতে হৃদিতল,
আকুল হিয়ায়,
ধাই কেন এক প্রাণে,
তপন-তাপিত স্থানে
শুধু মরু-প্রায় ?
পবিত্র নীহার-স্নাত,
ললিত সুষমা-জাত,
ত্যজি' লতিকায়,
জানিনা, কেন যে মন,
ভুজগিনী আলিঙ্গন
করিবারে চায় ?

৺কালিদাস চক্রবর্ত্তী।

সোণায় অরুচি।

(গল্প।)

প্রথম পরিচ্ছেদ।

"সোণায় অরুচি"—কথাটা শুনিয়া অনেকেই আমাকে পাগল মনে করিবেন,—করুন, কোন আপত্তি করিব না। প্রকৃতই আজ একাদশ বর্ষ অতীত হইতে চলিয়াছে, এই সুদীর্ঘ একাদশ বর্ষ মধ্যে একদিন—এক মুহূর্ত্তের জন্যও স্বর্ণ স্পর্শ করি নাই,—করিতে পারি নাই। এখন চোখের সামনে সোণা দেখিলে, হৃদয়ের নিভৃততম প্রদেশ হইতে এমন একটা ভীষণ অতীত দুঃখের স্মৃতি আসিয়া জাগরিত হয় যে, তাহাতে আপনার চিত্তবেগ আপনিই রোধ করিতে পারি না। এখন আমি লেখা পড়া শিখিয়াছি,—বিশ্ববিদ্যালয়ের এম, এ, উপাধিলাভ করিয়াছি,— বড় চাকুরী করিতেছি; এখন এই সভ্যতার কালে কালেজের অত বড় একটী অধ্যাপকের কাজ করিলেও, আমার স্ত্রী পুত্রের গায়ে একখানিমাত্রও সোণার গহনা নাই,—আমার নিজের বুকে একটা সোণার ঘড়ি বা অঙ্গুলীতে একটা হীরেকাটা অঙ্গুরীয় নাই দেখিয়া লোকে হাসে,—আমাকে পাগল বলিয়া উড়াইয়া দেয়। স্বর্ণে আমার এমনই ঘোর বিতৃষ্ণা দেখিয়া, আমারই একজন বি, এল্, উপাধিধারী উকিল বন্ধু একদিন আমাকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছিলেন যে,—"অতিরিক্ত কাব্য ও দর্শনাদি শাস্ত্র আলোচনা করিতে করিতে, লোকটা এই অল্প বয়সে একপ্রকার ঘোর উন্মাদগ্রস্ত হইয়া গিয়াছে। আর স্বয়ং, আমার তীক্ষ্ণদর্শী সদরআলা শ্বশুর একদিন স্বীয় কন্যার দুর্ভাগ্য ভাবিয়া আমারই মুখের উপর আমাকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছিলেন যে—"আমি আমার একদিনকার বুঝিবার ভুলে, আমার এ হেন অমূল্য রত্ন একটা বানরের গলায় পরাইয়া দিয়াছি।" কিন্তু আমার কিছুতেই আপত্তি নাই। লোকের হাসি তামাসা, ঠাট্টা বিদ্রূপ,—উপহাস ও সতত বিষমিশ্রিত বিষম বাক্য যন্ত্রণা, এ সব তো অনেক দিনই

আপনার কণ্ঠরত্ন করিয়া লইয়াছি। প্রথম যেদিন সংসার ক্ষেত্রে আমার প্রথম ও প্রধান স্নেহবন্ধন ছিন্ন হইয়াছিল, প্রথম যেদিন আপনার জনকে মধুমতীর সৈকতভূমে শ্মশান শয্যায় শোয়াইয়া জন্মের মত পাষাণ হৃদয়ে বিদায় দিয়াছিলাম, সেই দিন—সেই কাল মুহূর্ত্ত হইতে লোকের তীব্র তিরস্কার—অজস্র ঘৃণা, বিষম বাক্য যন্ত্রণা, সবই তো আমার অঙ্গের আভরণ করিয়া লইয়াছি; তখন কিছুতেই আর আমার শোক নাই, দুঃখ নাই—পরিতাপ নাই। এখন ভালয় ভালয় লোকের ঘৃণা ও তিরস্কার—অবহেলা ও অনাদর মস্তকে ধরিয়া জীবনের অবশিষ্ট দিন কয়েকটা কাটিয়া গেলেই আমি আমার পরম সৌভাগ্য জ্ঞান করিব।

হাঁ, "সোণায় অরুচি"। শৈশবে সোণায় আমার অরুচি ছিল না,—এখন হইয়াছে। আজ ঠিক একাদশ বর্ষ পূর্ব্বে সোণায় অরুচি জন্মিয়াছে। কোন একটা মর্ম্মান্তিক কারণ বশতঃ আমার এই অরুচি জন্মিয়াছে। সেই কারণটী জানিতে হইলে, আমার জীবনের সেই অংশের একটুখানি ইতিহাস শুনিতে হইবে। সেই অংশের ইতিহাস পাঠ করিলেই সহৃদয় পাঠক আর সহৃদয়া পাঠিকারা বুঝিতে পারিবেন যে, বড় দুঃখে—বড় আত্মগ্লানিতেই আমার সোণায় এই ঘোর অরুচি জন্মিয়াছে। এখন আমার এই ব্যবহার দেখিয়া, লোকে আমাকে ঘোর উন্মাদগ্রস্ত পাগল বলিয়া উপহাস করিয়া আসিতেছেন; আর আমার বিজ্ঞ ও প্রাজ্ঞ সদরআলা শ্বশুর মহাশয় আমাকে বানরের সহিত উপমা দিয়া আসিতেছেন। এখন আমার জীবনের সেই অংশের ইতিহাস আলোচনা করিয়া, আমি পাগল কি বানর—সে বিচার দেশের দশজনে করিবেন—অবিবেচকের কথায় আমার কোনই ক্ষতিবৃদ্ধি হইবে না। তবে মনে হয়, আজি এই দীর্ঘ একাদশ বর্ষ হৃদয়ে যে অসহ্য দাবানল সহ্য করিয়া আসিতেছি, মনে হয় এ দারুণ হৃদয়বেদনার অপেক্ষায় ঘোর উন্মাদগ্রস্ত হইলে আমি আমার অদৃষ্টকে শতবার ধন্যবাদ দিতাম,—ভক্তিপ্লাবিত হৃদয়ে জগদীশ্বরের চরণে কোটি কোটি প্রণাম করিতাম। কিন্তু মনে করিলে কি হইবে? বিধাতা আমার সুখের—আমার শান্তির সকল পথই চির জীবনের জন্য একেবারে রুদ্ধ করিয়া দিয়াছেন। আশৈশব আমি দরিদ্র; কিন্তু জীবনের প্রথম বিংশবর্ষকাল পর্য্যন্ত সহস্র দারিদ্র্যতার নিষ্পেষণে অহরহ নিষ্পেষিত হইলেও, একবার এক মুহূর্ত্তের জন্যও দুঃখকে দুঃখ বলিয়া মনে করি নাই—ঈশ্বরের ঘোর অভিসম্পাতকে অভিসম্পাত বলিয়া ভাবি নাই; বরং পিতা, মাতা, জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ও ভ্রাতৃজায়া প্রভৃতির সমুদ্রতুল্য অপরিমেয় স্নেহে ও ভালবাসায় সেই শত দারিদ্র্যতাকেও অনন্ত সুখ সম্পদ এবং বিধাতার অভিসম্পাতকে অভিসম্পাত মনে না করিয়া, অনন্ত আশীর্ব্বাদই মনে করিয়া আসিতেছিলাম। আর এখন—এখন আমার শৈশবের সে কঠোর দারিদ্র্যতা নাই—ভীষণ অন্নচিন্তা নাই; নিজে মাসে মাসে বিপুল (আমার পক্ষে) অর্থোপার্জ্জন করিতেছি, কিন্তু হৃদয়ে সে বল নাই,—চিত্তে সে সুখ নাই—মনে সে শান্তি নাই, এক কথায় বলিলে বলিতে হয়, বুঝি আমি সে রজনীরঞ্জন—আর পিতা মাতা ভ্রাতার স্নেহপুষ্ট সে রজনীরঞ্জনই নহি। জীবন না গেলে উপায় নাই, তাই জীবন রাখিতে হইয়াছে—রাখিতে হইয়াছে বড় দুঃখে ও বড় কষ্টে। হায়! কতদিন—কতদিন কত কালই যে এই অসহ্য নরক যন্ত্রণা ভোগ করিতে হইবে, কতকাল এ অনন্ত নরক যন্ত্রণা ভোগের পর এ জীবনের শেষ হইবে—বলিতে পারি না। তবে এই মাত্র জানিতেছি—এইমাত্র বুঝিতেছি যে, যতদিন এ পাপ জীবনের শেষ না হইতেছে ততদিন রাবণের চিতার ন্যায় হৃদয়ে এই হৃদয়াগ্নি আমাকে বুকে করিয়া বহিয়া মরিতেই হইবে। এ হৃদয়াগ্নি বহিতে সম্পূর্ণ অশক্ত হইয়া আপত্তি করিলেও বিধাতার কঠোর নিয়মের বিন্দুমাত্র ব্যতিক্রম হইবে না—হইবার নহে। তাই এখন বাজে কথা রাখিয়া আমার প্রেমাস্পদ শৈশব সুহৃৎ অমরেন্দ্র নাথ ও তাঁহারই প্রিয়তমা পত্নী শ্রীমতী অনঙ্গমঞ্জরীর ইচ্ছানুসারে—"সোণায় অরুচি"—এই আখ্যায়িকা লিখিতে প্রবৃত্ত হইলাম।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

যে বৎসর আমি ঢাকা কালেজ হইতে প্রবেশিকা পরীক্ষা দিই, সেই বৎসরেই পরীক্ষার ঠিক দুই মাস পরে আমার বিবাহ হয়। প্রথমে মনে করিয়াছিলাম যে, বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ সমাপ্ত না হইলে বিবাহ করিব না। কিন্তু ঘটনাচক্রে পড়িয়া অগত্যা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ করিতে না করিতেই বিবাহ করিতে হইল। যে মাসে আমি প্রবেশিকা পরীক্ষা দিই ঠিক তাহার

ছয় মাস পূর্ব্বে আমার অগ্রজ মোহিনী রঞ্জনের প্রথমা পত্নী শোভাময়ী দেবীর মৃত্যু হয়। দাদার স্ত্রী বিয়োগ হইলে, আমরা সংসারে অন্ধকার দেখিলাম। কেন না, এই ঘটনার প্রায় দ্বাদশ কি ত্রয়োদশ বর্ষ পূর্ব্বে আমার শৈশব কালে আমাদের মাতৃবিয়োগ হয়। পুত্র বর্ত্তমানে বিবাহ করা সম্পূর্ণ অনুচিত এবং শাস্ত্রানুমোদিত নহে,—ইহাই আমাদের পরমারাধ্য পিতৃদেবের মত এবং তিনি অন্যকে যাহাই উপদেশ দিতেন, আত্মদেবচরিত্রে সতত তাহাই পালন করিতে ভালবাসিতেন এবং তাঁহার জীবনে প্রথম হইতেই তিনি তাহা পালন করিয়া আসিতেছিলেন, এবং বলিতে কি ইহার পর পুনরায় বিবাহ করিতে বিরত হইয়া আত্মজীবনের শেষ ভাগ ধর্ম্মানুষ্ঠানে নিয়োজিত করিয়াছিলেন। এদিকে মাতৃবিয়োগের পরেই আমাদের সংসারে একটা বিশেষ গোলযোগ ঘটিবার বিশেষ সম্ভাবনা ছিল, কিন্তু মার মৃত্যুর পর আমার দাদার বালিকা পত্নী শোভাময়ী দেবী আপনার বালিকা বয়স সত্বেও আমাদের মা মরা সেই ভাঙ্গা সংসারে মার আসনে বসিয়া আমাদের আঁধার সংসার আবার আলোকিত করিয়া আসিতেছিলেন। কিন্তু অদৃষ্টচক্রের আবর্ত্তে পড়িয়া কয় বৎসর যাইতে না যাইতেই শোভাময়ী দেবী আমাদের সাজান বাগান অন্ধকার করিয়া অকালে চলিয়া গেলেন। শোভার মৃত্যুর পর, পিতৃদেবঠাকুর দাদার পুনরায় বিবাহ দিতে চেষ্টা করিলেন, এবং সেই সঙ্গে আমাকেও বিবাহ করিতে আদেশ করিলেন। এখন শোভার মৃত্যুর পর, সংসারে আর দ্বিতীয়া সধবা স্ত্রীলোক নাই, যিনি দাদার নবপরিণীতা ভার্য্যার সহিত একত্রে মিলিয়া মিশিয়া সংসার চালাইতে পারেন; তাই পিতৃদেবঠাকুর দেখিলেন যে, আমাদের দুই ভাইকে একত্রে বিবাহ দিলে, আমাদের দুই ভ্রাতার দুইটি স্ত্রী একত্রে থাকিয়া সংসারের কাজ কর্ম্ম করিতে পারিবেন, এই ভাবিয়া আমার পরীক্ষার ফল বাহির হইবার পূর্ব্বেই আমাদিগকে বিবাহিত করিলেন।

যথাসময়ে আমাদের বিবাহ হইয়া গেল। বিবাহের কয় মাস পর দাদা ও আমার স্ত্রী—উভয়েই সংসারের কাজকর্ম্ম করিতে লাগিলেন। কাজকর্ম্ম করিতে লাগিলেন সত্য; কিন্তু যে আশায় পিতৃদেবঠাকুর অসময়ে আমার বিবাহ দিয়াছিলেন, তাঁহার সে আশা পূর্ণ হইল না। প্রবেশিকা পরীক্ষা দিবার পরই হঠাৎ আমাদের উচ্চবংশ ও কুলশীল এবং আমার স্বভাব চরিত্র—

শিক্ষাদীক্ষার সম্যক পরিচয় পাইয়া, ফরিদপুরের সদরআলা চব্বিশ পরগনা নিবাসী রাধা চরণ বন্দোপাধ্যায় মহাশয় স্বতঃ প্রবৃত্ত হইয়া, তাঁহারই কনিষ্ঠা কন্যা শ্রীমতী পঙ্কজিনী দেবীকে আমার করে দান করিলেন। বন্দোপাধ্যায় মহাশয় আমার সহিত স্বীয় কন্যার বিবাহ দিবার সময় আমার স্বভাব চরিত্র বিদ্যা বুদ্ধির পরিচয় পাইয়া, আমাদের আর চিরদিনকার ভীষণ দারিদ্র্যতার প্রতি একবারও দৃক্‌পাত করিলেন না,—দৃক্‌পাত করা আবশ্যকও জ্ঞান করিলেন না। অন্যদিকে, আমার দাদা অল্প বেতনভুক্ বিদ্যালয়ের শিক্ষক—দোয়াজবর, তাই কোন বড় ঘর হইতে তাঁহার কোন বিবাহ সম্বন্ধ আসিল না। অগত্যা তিনি কোন মধ্যবিত্ত স্বজাতীয় ব্রাহ্মণের কন্যা শ্রীমতী অপরাজিতা দেবীর পাণিগ্রহণ করিলেন।

যথাসময়ে, যখন আমরা দুই ভাই বিবাহ করিয়া আপন আপন নবপরিণীতা ভার্য্যা লইয়া গৃহে আসিলাম; তখন কি জানি কেন, আমাদের সূক্ষ্মদর্শী পিতা, আমাদের নবপরিণীতা ভার্য্যাদের চাল চলন ও প্রকৃতি দেখিয়া আপনার ভবিষ্যৎ দূরদৃষ্টির সাহায্যে কহিয়াছিলেন যে,—"বড় বউমা সাক্ষাৎ লক্ষ্মীস্বরূপা, আর ছোট বউমাকে দেখিয়া মনে হয়, বুঝি পাছে এই ছোট বউমা কর্ত্তৃকই রজনীর ভবিষ্যৎ জীবন বিষময় হয়।" তখন সে সময় অগ্রজ মহাশয়, পাছে বাবার কথায় আমি মনঃকষ্ট পাই—আমার সংসারজ্ঞানশূন্যা বালিকা পত্নী হৃদয়ে ব্যথা পান, এই মনে করিয়া পিতৃদেবঠাকুরের কথায় অগ্রজ মহাশয় বাধা দিয়া কহিয়াছিলেন,—"বাবা বুঝেন না। হাজার হউক ছোট বউমা, এখন বালিকা; তারপর বড় লোকের মেয়ে—চিরসুখের ক্রোড়ে প্রতিপালিতা, তাই একটু চঞ্চল প্রকৃতির; কিন্তু বয়োবৃদ্ধি সহকারে সে দোষ শোধরাইয়া যাইবে।" আমার প্রথম জীবনে আমার পরমারাধ্য পিতৃদেবঠাকুরের কথাই সম্পূর্ণরূপে খাটিয়াছিল। তবে দাদাও যাহা অনুমান করিয়াছিলেন, তাহাও একেবারে নিরর্থক হয় নাই। কেন না, প্রথম জীবনেই পঙ্কজিনী যতটা অশান্তির কারণ স্বরূপা হইয়াছিলেন, শেষ জীবনে বিস্তর ঘাত প্রতিঘাত সহ্য করিয়া, দাদার মৃত্যুর পর হইতে, তাঁহারই পিতা মাতা হইতে প্রাপ্ত, শৈশবের সেই হিংসা দ্বেষ প্রভৃতি ইতর মনোবৃত্তিগুলি পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। এখানে একে একে তাহাই বলিয়া যাইতেছি।

এদিকে আমাদের বিবাহের ঠিক এক সপ্তাহ পরেই হঠাৎ আমার পিতৃ-বিয়োগ ঘটিল। পিতৃবিয়োগের অল্পদিন পরেই প্রবেশিকা পরীক্ষার ফল বাহির হইল,—আমি প্রথম বিবাহে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার সংবাদ পাইলাম। পরীক্ষা দিবার সময়ে মনে করিয়াছিলাম যে, যদি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া মাসিক বিংশ মুদ্রা বৃত্তি পাই, তবে কষ্টে স্বষ্টে কলিকাতা যাইয়া প্রেসি-ডেন্সী কালেজে এফ, এ, পড়িব। কিন্তু সহসা পিতৃবিয়োগের পর আমাকে আমার সে সঙ্কল্প পরিত্যাগ করিতে হইল। আশৈশব আমরা দরিদ্র,—এতদিন পিতা ও জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা যাহা উপার্জ্জন করিতেন, তাহাতেই বড় কষ্টে আমাদের এই বৃহৎ পরিবার প্রতিপালিত হইত; কিন্তু এখন পিতৃদেবের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই তাঁহার উপার্জ্জিত আয় বন্ধ হইল; সুতরাং একা অগ্রজ মহাশয়ের উপার্জ্জিত অর্থে আমাদের সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ হওয়া সমূহ কঠিন, তাই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবার পর, যখন বৃত্তির তালিকায় কুড়ি টাকা বৃত্তির ঘরেই আমার স্থান দেখিলাম, তখন সেই সামান্য মাসিক কুড়ি টাকার উপর নির্ভর করিয়া প্রেসিডেন্সী কালেজে অধ্যয়ন করিতে যাওয়া আমি সমীচীন বোধ করিলাম না। বরং এ অবস্থায় কলিকাতা যাইয়া প্রেসিডেন্সী কালেজে না পড়িয়া ঢাকা কালেজে অধ্যয়ন করিলে, এ বৃত্তির টাকা কয়েকটীর দ্বারায় সংসারের অনেকটা সাহায্য হইতে পারিবে,—এই সব চারিদিক ভাবিয়া চিন্তিয়া আমি ঢাকা কালেজেই এফ, এ, পড়িতে প্রবৃত্ত হইলাম।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

এমনই ভাবে আষাঢ় মাস কাটিয়া গেল। শ্রাবণের মাঝে, পিতৃগৃহ হইতে আমাদের উভয় ভ্রাতার স্ত্রীরাই আসিলেন। আমার জীবনে সেই প্রথম পত্নীসম্ভাষণ হইল। রাত্রিতে আহারাদি করিয়া শয়ন গৃহে আসিলাম। শয়ন গৃহে আসিয়া শয্যোপরি শুইয়া শুইয়া আপনার মনে আপনি অধ্যয়ন করিতে-ছিলাম। এমন সময়ে দ্বাদশ বর্ষের বালিকা পত্নী পঙ্কজিনী আসিয়া আমার শয্যায় বসিলেন। আমার নূতন বয়স—নূতন আকাঙ্ক্ষা একদিকে, অন্যদিকে শরতের নিষ্কলঙ্ক জ্যোৎস্নাস্বরূপিনী কিশোরী পত্নী,—এই সবে আমি মুগ্ধ হইয়া

হাতের পুথি দূরে নিক্ষেপ করিয়া, মৃৎপ্রদীপটী উজ্জ্বল করিয়া দিয়া, উদ্বেলিত হৃদয়ে প্রেমভারে আপনার বাহুযুগলে পঙ্কজিনীকে বেষ্টন করিয়া বুকের উপর টানিয়া আনিয়া বার বার প্রেমভরে পত্নীর মুখচুম্বন করিলাম; তারপর আবার প্রদীপটী উজ্জ্বল করিয়া দিয়া সেই প্রদীপের উজ্জ্বলালোকে পঙ্কজিনীর সেই পঙ্কজকোরকনিভ চাঁদমুখখানি আপনার হাতে তুলিয়া ধরিয়া একবার অনিমিষ লোচনে পঙ্কজিনীর সেই দেবেন্দ্রবাঞ্ছিত অতুল্য সৌন্দর্য্যরাশি নয়ন ভরিয়া দেখিলাম,—দেখিয়া দেখিয়া আত্মহারার ন্যায় হইলাম। কতক্ষণ এভাবে ছিলাম,—জানি না, তখন সময়ের প্রতি আমার বড় একটা লক্ষ্য ছিল না। সহসা আমার প্রথম মোহ কাটিলে পর আমি পুনরায় পঙ্কজিনীর মুখচুম্বন করিয়া তাঁহারই সহিত প্রেমসম্ভাষণ করিতে প্রবৃত্ত হইলাম। বালিকা পত্নীর সহিত জীবনে এই প্রথম প্রেমসম্ভাষণে প্রবৃত্ত হইলাম সত্য; কিন্তু দুর্ভাগ্য আমার,—আমি জীবনে এই প্রথম প্রেমসম্ভাষণ করিতে প্রবৃত্ত হইয়া জীবনে একটু সুখ—একটু শান্তি—বালিকাপত্নীর নিকট হইতে সামান্য একটু সহানু-ভূতি মাত্রও পাইলাম না। পঙ্কজিনীও জীবনে এই প্রথম আমার সহিত স্বামীসম্ভাষণে প্রবৃত্ত হইয়া প্রথমেই আমাদিগের ঘোর দারিদ্র্যতা, পিতার বিপুল ধনগৌরব—উচ্চ রাজপদ, এই সব লইয়া আমার সহিত একটু ব্যঙ্গ বিদ্রূপ করিলেন,—একটু ঘৃণা প্রকাশ করিতেও ছাড়িলেন না। তারপর আমায় কহিলেন,—"এখন এখানে না পড়িয়া হুগলী কালেজে পড়াইতো ভাল, বাবারও সেই মত।"

আমি। হুগলী কালেজে পড়লে আর বেশী কি হবে? হাঁ, যদি কলি-কাতায় পড়তে পেতাম তা হলে হ'তো।

পঙ্কজিনী। হুগলী কালেজে পড়লে, বেশ ত বাবার কাছে বড় আদরে—বড় যত্নে থাকিতে পারিবেন; আর আমিও বড় সুখে থাকিব। এখানে এই তো কষ্ট,—চারিদিকেই কষ্ট; এত কষ্ট করে এখানে থাকবার কি প্রয়োজন।

আমি আমার নব পরিণীতা বালিকা পত্নীর প্রত্যেক কথাগুলির গূঢ় অর্থ ছত্রে ছত্রে বুঝিতে পারিলেও আমার মনের কথা প্রকাশ না করিয়া কহিলাম,—"কি কষ্ট—পঙ্কজিনী।"

এবার পঙ্কজিনী আমার প্রশ্নের উত্তর না করিয়া পুনরায় আমাকেই জিজ্ঞাসা করিলেন,—"এখানে সুখই বা কি—বলুন।"

আমি। দুঃখই বা কি—বল।

পঙ্কজিনী। আগে আমার কথায় উত্তর দিন? এখানে কোন সুখে বাস কর্ত্তে চান।

আমি। নিজের বাড়ীতে বাস করিব,—ইহাতে সুখ দুঃখ আবার কি?

পঙ্কজিনী। নিজের বাড়ী সত্য; কিন্তু জীবনে যদি একটু সুখ ভোগ করিতে না পারিলেন তবে এ জীবনেই বা প্রয়োজন কি?

পঙ্কজিনীর এবারকার কথাগুলিন আশৈশব বিলাসিতার ক্রোড়ে প্রতিপালিতা সদরআলা-নন্দিনীরই মত।

এমনই ভাবে আবার ক্ষণকাল নীরবে থাকিবার পর পঙ্কজিনী কহিলেন,—"সংসারে সুখ তো এই দেখছি—দু চারটে ঝি বা একটা রাঁধুনি রাখবার পর্য্যন্ত গতি নাই। আর খাবার দাবার সুখ, সেও তো ঢের দেখছি।"

আমি। তা যখন আমাদের ন্যায় দরিদ্রের ঘরে এসেছ, তখন চিরদিন এমনই সুখভোগ করিতে হইবে,—একথা তো আগে ভাবা উচিত ছিল। আমাদের অবস্থা তোমার বিয়ের পূর্ব্বেও যেমন ছিল, এখনও তেমনি আছে।

পঙ্কজিনী এবার সমধিক আশ্চর্য্যান্বিতা হইয়া কহিলেন,—"আগেও এম্নি ছিল?"

আমি। হাঁ, আগেও এম্নি ছিল। কালও আমরা রাজা ছিলাম না,—আজও আমরা পথের ভিখারী হই নাই।

পঙ্কজিনী। তা না হও, এখন এক কাজ কর না কেন?

আমি। কি কাজ করিব—বল।

এবার পঙ্কজিনী একটু ইতস্ততঃ করিয়া কহিলেন, "মা ও বাবার আন্তরিক ইচ্ছা যতদিন আপনি উপার্জ্জন করিতে না শিখিতেছেন,—যতদিন আপনার কালেজে পড়ার শেষ না হয়; ততদিন হুগলী কালেজে পড়িবেন,—সেখানে বড় সুখে—বড় আদরে থাকিবেন। বৃথা এখানে কেন কষ্টভোগ করিবেন।"

পঙ্কজিনীর এবারকার কথায় আমার হাসি আসিল, আমি হাসিয়া কহিলাম —"কেমন, ঘর জামাই হয়ে থাকিব না কি?"

পঙ্কজিনী। ঘর জামাই হয়ে থাকিবেন কেন? বাবা বলেছেন,—ঢাকা কালেজ চাহিতে হুগলী কালেজের নাম বড়। আর যদি তা না হয়, হুগলী থেকে কলিকাতায় পড়িবেন। তবুও তো বড় সুখে—বড় শান্তিতে থাকিবেন।

আমি। পরের অধীন হয়ে, পরের মুখের পানে চাহিয়া আমার কি সুখ হইবে—পঙ্কজিনী!

পঙ্কজিনী। পরের অধীন!—তা এখানেই বা কোন স্বাধীন হয়ে আছেন, যে, সেখানে অধীন হয়ে দুঃখী হবেন। বরং শ্বশুরগৃহে জামাইবাবুর আদরে বড় সুখে থাকিবেন।

আমি। এখানে পরাধীনতা কি দেখিলে?

পঙ্কজিনী। কেন, ভাইয়ের, আর ভাইয়ের অধীনতা কি আর অধীনতা নয়? ভাই ও জায়ের অধীন হওয়ার অপেক্ষায় কি শ্বশুরের অধীন হওয়া অধিক কষ্টকর?

আমি। কি জানি, কেমন করে বলবো,—বল। জীবনে কখন তো শ্বশুরের অধীন হই নাই।

পঙ্কজিনী। আমার বড় দিদির স্বামীও যতদিন চাকুরী না করিতেছিলেন, যতদিন কালেজে পড়িতেছিলেন, ততদিন তিনি বাবার কাছে থেকে বহরমপুর ও রাজসাহী কালেজে পড়িতেন,—দিদিও বাবার কাছে থাকিতেন। কৈ তিনি তো একটী দিন এক মুহূর্ত্তের জন্য কোন দুঃখ বা পরাধীনতার কোন যাতনা সহ্য করেন নাই; বরং নিজের বাড়ী অপেক্ষায় অধিক সুখই বোধ করিতেন এবং সতত সেই কথা আপনার মুখে বলিতেন।

বালিকাপত্নীর কথা শুনিয়া এবার আর আমার মুখের হাসি চাপিয়া রাখিতে পারিলাম না, তাই হাসিয়া কহিলাম,—"তোমার জামাই বাবু বিদ্বান ও বুদ্ধিমান, কাজেই ইহাতে সমধিক সুখ বোধ করিয়াছিলেন; আর তাই অর্থোপার্জ্জন করিতে প্রবৃত্ত হইবার পরই তোমার দিদির প্রেমমন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া, অভাগিনী বিধবা মা, আর অনাথ শিশু ভ্রাতাদিগকে পৃথক করিয়া দিয়া মাসিক পাঁচ টাকা মাসহারার অধীন করিয়াছেন। আমি আজিও ততদূর বিদ্বান হতে পারি নাই,—আর বুদ্ধিটাও অপেক্ষাকৃত মোটা; তারপর এখনও

তুমি আমার কর্ণে প্রেমমন্ত্র দান কর নাই যে, ইচ্ছা করিয়া নিজের গৃহ ছাড়িয়া —দাদার স্নেহপাশ ছিন্ন করিয়া, তোমার আঁচল ধরিয়া শ্বশুর গৃহে প্রবেশ করিব।" এই বলিয়া ক্ষণকাল নীরব হইবার পর, আবার একবার মৃৎপ্রদীপটী উজ্জ্বল করিয়া দিয়া, পূর্ব্বের ন্যায় হাসিয়া কহিলাম,—"তবে যদি কখন তোমার জামাই বাবুর ন্যায় বিদ্বান ও বুদ্ধিমান হতে পারি—যদি কখন উকিল হই; আর তুমিও যদি ততদিন আমার কর্ণে প্রেমমন্ত্র দিতে পার, তবে না হয় তখন তোমার আঁচল ধরিয়া তোমারই জামাইবাবুর ন্যায় তোমারই পিতৃগৃহে প্রবেশ করিব।" এই বলিয়া নীরব হইলাম।

এবার আমার কথাগুলি শুনিয়া পঙ্কজিনী আপনার সেই অর্দ্ধবিকসিত কমলকোরকনিভ সুন্দর মুখখানি মলিন করিয়া কহিলেন,—"আপনার ভালর জন্যই বলিতেছিলাম। তবে আমার হিতকথা যদি আপনার ভাল না লাগে, আমাদের উপদেশ মত না চলিবেন,—অত ব্যঙ্গ বিদ্রূপে কাজ কি?" এই বলিয়া ঘোর অভিমান ভরে দ্বাদশ বর্ষের বালিকাপত্নী পঙ্কজিনী পাশ ফিরিয়া শুইলেন।

অভিমান ভরে পঙ্কজিনীকে পাশ কাটাইয়া শুইতে দেখিয়া আমার মনটা একটু নরম হইল, আর সেই সঙ্গে ঈষৎ হাসির রেখাও দেখা দিল। পূর্ব্বেই বলিয়াছি আমার নূতন বয়স,—হৃদয়ে নূতন উদ্বেলিত আকাঙ্ক্ষা একদিকে, অন্যদিকে প্রবল ভ্রাতৃভক্তি। সুতরাং একই সঙ্গে একবার অভিমানিনীর অভিমান দেখিয়া মনটা একটু নরম হইল, আবার পরক্ষণেই আমার সেই দেব-প্রতিম অগ্রজের অপরিমেয় স্নেহ—আমার প্রতি অত্যধিক স্নেহ ভাবিয়া মনটা একটু বিষাদভারাক্রান্ত হইল। এবং পঙ্কজিনীর বালিকা হৃদয়ে হিংসা দ্বেষ প্রভৃতি নিকৃষ্ট প্রবৃত্তির সম্যক্ পরিচয় পাইয়া আমার হৃদয়ের স্তরে স্তরে ঘৃণায় পরিপূর্ণ হইল। আবার পরক্ষণেই স্বার্থপরায়ণা বর্ত্তমান বাঙ্গালীর মেয়ের ভবিষ্যৎ জীবনের ছায়াপাত দেখিয়া এবং এই ছায়াপাতের একমাত্র প্রধানতম কারণ, সংসার জ্ঞানশূন্যা বালিকার স্বার্থপর পিতামাতা,—এই কথা ভাবিয়া হৃদয়ে হাসির রেখাও দেখা দিল। এমনই ভাবে দীর্ঘকাল ধরিয়া হরিষে আর বিষাদে হৃদয় মধ্যে প্রবল দ্বন্দ্ব হইল, শেষ অভিমানিনী পঙ্কজিনীরই জয় হইল। তাই আমি তখন ধীরে ধীরে পঙ্কজিনীকে আপনার বুকের উপর টানিয়া লইয়া

প্রেমভরে তাহার মুখচুম্বন করিয়া কহিলাম,—"পঙ্কজ (পঙ্কজিনীর আদরের ডাক নাম) আমার কথায় রাগ করিলে কি?"

একটী দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া ছোট গলায় পঙ্কজিনী কহিলেন,—"রাগ করিয়া কি করিব।" এই বলিয়া আবার নীরব হইলেন।

আমি। না, নিশ্চয় রাগ করিয়াছ, নহিলে পাশ কাটাইয়া শুইতে না।

পঙ্কজিনী ইতস্ততঃ করিয়া পূর্ব্বমত ছোট গলায় কহিলেন,—"ঘুম পাইতেছে।"

এমনই ভাবে পঙ্কজিনীর ঘোর অনিচ্ছা সত্ত্বেও স্বামীস্ত্রীতে আরও কতক্ষণ গল্প হইল; কিন্তু পঙ্কজিনী এবার আর ভাল করিয়া আমার সহিত কথা কহিলেন না। তবে যে দুই চারিটা কথা বলিলেন, তাহাতেই বেশ বুঝিতে পারিলাম যে, আমার কথায় সত্যই পঙ্কজিনী রাগ করিয়াছেন। আমি মানিনীর মান ভাঙ্গিতে চেষ্টা করিলাম; কিন্তু হৃদয়ের নিভৃততম প্রদেশে ভ্রাতৃভক্তির অঙ্কুর একটুকু ছিল বলিয়াই প্রিয়তমার মানভঙ্গ কার্য্যে কৃতকার্য্যতা লাভ করিতে পারিলাম না।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

দেখিতে দেখিতে এমনই ভাবে দিন কাটিতেছিল। দিনের পর দিন যাইতেছিল, আর আমার সেই বালিকা পত্নী পঙ্কজিনী আপনার পিতা মাতার উপদেশানুসারে দিন দিন দাদার উপর হইতে—দাদার স্ত্রীর উপর হইতে আমার দৃঢ় বিশ্বাস ও অচলা ভক্তি দূর করিবার আশায় প্রতি রাত্রিতে আমার কর্ণকুহরে কত অমৃত বর্ষণ করিতেছিল,—তাহার সংখ্যা করা যায় না। তবে এই পর্য্যন্ত বলিয়া রাখি যে, নির্গুণ আমি,—দীর্ঘ দুই মাস অনবরত প্রতি রাত্রিতে আমার কর্ণকুহরে অমৃত বর্ষণেও আমার চিত্ত বিকার জন্মাইতে সমর্থ হইলেন না,—শ্বশুরগৃহে থাকিয়া হুগলী কালেজে অথবা প্রেসিডেন্সী কালেজে পড়াইতে পারিলেন না।

এমনই ভাবে আরও কয়দিন কাটিলে পর পূজা আসিল। নূতন জামাতা আমি,—আমি পূজোপলক্ষ্যে সস্ত্রীক শ্বশুরালয়ে যাইবার জন্য নিমন্ত্রিত হইলাম।

দাদাও স্বতঃ প্রবৃত্ত হইয়া আমাকে শ্বশুরগৃহে পাঠাইলেন। অনেক দিনের কথা, কিন্তু জীবনে সেই যে প্রথম শ্বশুরগৃহে যাই, শ্বশুরগৃহে যাইয়া যে আদর ও অভ্যর্থনা, যে শিক্ষা ও দীক্ষা পাই, অতীতের সেই সব ঘটনাগুলি এখনও তেমনি উজ্জ্বলভাবে আমার চিত্তপটে অঙ্কিত আছে,—কখন এ চিত্র মুছিবে কি না, জানি না। শ্বশুরগৃহে যাইয়া উপদেশচ্ছলে সদরআলা শ্বশুর মহাশয় ও আমার শ্বাশুড়ী, নবজামাতা আমাকে প্রথম সাক্ষাতে আমার ভবিষ্যৎ মঙ্গলের জন্য যে সব অমূল্য উপদেশ (!) দিয়াছিলেন, দীর্ঘকাল অতীত হইলেও—জীবনে অনেক ঝঞ্ঝা বায়ু ভোগ করিলেও সেই উপদেশগুলি এখনও আমার কর্ণে ঠিক তেমনই ভাবে বজ্রনির্ঘোষে ধ্বনিত হইতেছে—যতদিন বাঁচিব ততদিন এমনই ভাবে ধ্বনিত হইবে। বর্ত্তমান সভ্যতার কালে বঙ্গের গৃহে গৃহে ভ্রাতৃবিচ্ছেদের বড় ধুম পড়িয়া গিয়াছে, এখন—"ভাই ভাই, ঠাঁই ঠাঁই,"—এই মহামন্ত্রে বঙ্গবাসী দীক্ষিত, কালে আরও কত না হইবে,—কে বলিতে পারে? আর এই ভ্রাতৃবিচ্ছেদ ঘটাইবার একমাত্র প্রধান ও প্রথম উদ্যোগী নব্যবঙ্গযুবকেরা ও তাঁহাদেরই পত্নী,—এই বলিয়া তাঁহাদেরই ঘাড়ে সম্পূর্ণ দোষটা প্রদান করিয়া বঙ্গবাসী নিশ্চিন্ত। কিন্তু আমি আমার জীবনে যতটা দেখিয়াছি,—দেখিয়া যতটা বুঝিতে পারিয়াছি, তাহাতে আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে, বর্ত্তমান সময়ে ভ্রাতৃবিচ্ছেদ ঘটাইবার প্রধান ও মূল কারণ সংসারে ভাল মন্দ বিচারাক্ষম নব্যযুবকেরা, অথবা তাঁহাদের পরিণীতা যুবতী পত্নীরা ততটা দোষী নহেন, যতটা দোষী সেই অপরিণামদর্শী হতভাগ্য যুবকদের শ্বশুর ও শ্বাশুড়ী। তাঁহারাই (শ্বশুর ও শ্বাশুড়ী) আপনার কন্যার ভবিষ্যৎ সুখের আশায় (সে সুখ প্রকৃত সুখ কি দুঃখ—একমাত্র বিধাতাই বলিতে পারেন; অক্ষম আমি,—আমি তাহা কেমন করিয়া বলিব!) সেই বিবাহের পর হইতেই নবজামাতার কর্ণকুহরে ভ্রাতৃবিচ্ছেদের যে সব অমৃতময় উপদেশ বর্ষণ করিতে থাকেন, সেই অমৃত বর্ষণ, আর অধিকাংশস্থলে শ্বশুরগৃহের নিত্য নূতন আদর ও স্নেহ, গরবিণী শ্যালিকাকুলের সরস হাস্য পরিহাস,—এই সবে মিলিয়া মিশিয়া ভবিষ্যৎ ভাল মন্দ বিচারাক্ষম যুবকদের মস্তিষ্ক ঠিক থাকে না,—থাকিবার আশা করাও বৃথা। তারপর স্বার্থপর পিতামাতার শিক্ষানুযায়ী গৃহবিচ্ছেদ বাক্যে বালিকাপত্নী শৈশবে যে দীক্ষিত হন, সেই শিক্ষানুসারে সময় বুঝিয়া,

একবার কুটিলতা-পরিপূর্ণ নয়নে কুটিল কটাক্ষপাত করিয়া, স্বামীর কর্ণে অহরহ যে সুধা বর্ষিত হইতে থাকে, সংসার জ্ঞানশূন্য নব্যযুবকেরা অমৃতভ্রমে অহরহ সেই বিষ পান করিয়া সংসারে ভ্রাতৃবিচ্ছেদ ঘটাইয়া শান্তির পরিবর্ত্তে ঘোর অশান্তি—সুখের পরিবর্ত্তে ঘোর দুঃখ আনিয়া আপনার দেবদুর্লভ পবিত্র মনুষ্য জীবনকে চিরদিনের জন্য কলঙ্কিত করিয়া থাকেন।

আমি যেদিন প্রথম শ্বশুরগৃহে প্রবেশ করিলাম, সেদিন ষষ্ঠী—বোধনষষ্ঠী। পূজার কয়দিন ধুমধামে কাটিল। দিবারাত্রি,—"দিয়তাং ভূজ্যতাং" প্রভৃতি শব্দের সহিত পাপবিলাসিতার সুন্দর অভিনয় হইয়া গেল। পূজার পর বিজয়ার রাত্রিতে অন্দরমহলে আমার শয়নের ব্যবস্থা হইল। রাত্রিতে যথা-সময়ে আহারাদি সমাপনান্তে শ্যালিকাকুল ও সালাজ বউ প্রভৃতি পরিবেষ্টিত হইয়া, আমি আমার নির্দ্দিষ্ট শয়নগৃহে প্রবেশ করিলাম। আমাকে শয়ন মন্দিরে আসিতে দেখিয়া, আমার পত্নী পঙ্কজিনী বোধ হয়, যেন দরিদ্র আমি—আমাকে আপনার ধনশালী পিতার অতুল বৈভবের পরিচয় দিবার মানসেই বুঝি আপনার আপাদমস্তক বহুমূল্যের রত্নালঙ্কারে ভূষিত করিয়া, রক্তপদবিক্ষেপে আপনার অনুপম সৌন্দর্য্যরাশি প্রদীপালোকে চারিদিকে বিকীর্ণ করিতে করিতে জ্ঞাতিভ্রাতৃবধূ মনমোহিনীর সহিত আসিয়া শয়ন-মন্দিরে প্রবেশ করিলেন। নূতন শ্বশুরগৃহে আসিলে, নূতন জামাইয়ের প্রতি মহিমাময়ী শ্যালিকাকুল ও শালাজ বউঠাকুরাণীরা যে, হাসিতামাসা প্রভৃতি সরস রসিকতা করিয়া এবং মধ্যে মধ্যে ব্যঙ্গ ও বিদ্রূপপূর্ণ বাক্যবাণ প্রয়োগ করিয়া লজ্জাহীনার মত রঙ্গরসের চরিতার্থতা করিয়া থাকেন, শ্যালিকাকুলের সেই রঙ্গরসের পূর্ণ বিবরণ এখানে লিপিবদ্ধ না করিলে হয়ত আমার চিররসবতী বঙ্গের সুন্দরী পাঠিকারা আমাকে শতবার শত প্রকারে ধিক্কার দিবেন,—দেন, তাহাতে কোন আপত্তি করিব না। বহু-দিনের কথা,—বহুদিন গত হইয়াছে, কিন্তু প্রথম শ্বশুরগৃহে আসিয়া, প্রথম যে নিশা শ্যালিকা ও শালাজ বউদের সহিত কাটাইতে হইয়াছিল, এখন প্রৌঢ় বয়সেও সে কথা মনে হইলে, আপনার লজ্জায় আপনাকে মরিয়া যাইতে হয় এবং সেই বীভৎস দৃশ্য বহু পূর্ব্বে অভিনীত হইয়া গেলেও, এখনও সে দৃশ্য তেমনি ভাবে চোখের উপর সতত অভিনীত হইতেছে। তবে একমাত্র

শালীনতার অনুরোধে এখানে সেই অতি বড় বীভৎস কাহিনী বর্ণনা করিয়া পবিত্র লেখনীর কলঙ্ক সাধন করিতে আমার প্রবৃত্তি নাই,—ইচ্ছাও নাই। তবে এইমাত্র বলিয়া রাখি যে, শ্যালিকাদের হাসিতামাসা, ব্যঙ্গবিদ্রূপ, রঙ্গ-রসের রসগ্রহণে সম্যক্ অসমর্থ হইয়া, শেষে তাঁহাদের নিকট পরাজয় স্বীকার করিয়া,—"বাঙ্গাল"—এই উপাধি গ্রহণ করিতে হইল। তবে সহরবাসিনী তাঁহারা—তাঁহারা যে কি দেখিয়া আমাকে 'বাঙ্গাল' নির্দ্দেশ করিলেন, দীর্ঘ-কাল চিন্তার পরও তাহার মীমাংসা করিতে পারি নাই। তবে মনে হয়, বুঝি তাঁহাদের মতানুসারে চলিতে সম্পূর্ণ অসম্মত হইয়াছিলাম, বুঝি অগ্রজের স্নেহপাশ ছিন্ন করিয়া শ্বশুরের গলগ্রহ হইতে রাজি হইয়াছিলাম না,—তাঁহাদের অতুল বৈভবে মুগ্ধ হইয়া, চিরদিনের জন্য কর্ম্মনাশার জলে আপনার মনুষ্যত্বকে যে বিসর্জ্জন দিয়া পশুত্বে পরিণত হইতে অস্বীকৃত হইয়াছিলাম, তাই তাঁহারা—সহরবাসিনী প্রেমময়ী শ্যালিকাকুল আমাকে নির্ব্বোধ বাঙ্গাল নির্দ্দেশ করিয়া-ছিলেন।

যাহা হউক, অগত্যা উপায় না পাইয়া, যখন আমি করজোড়ে "বাঙ্গাল"—ইহাই স্বীকার করিয়া লইলাম, তখন সেদিনকার মত শ্যালিকাকুল আমাকে অব্যাহতি দান করিয়া প্রস্থান করিলেন। শ্যালিকাকুলের হাত হইতে অব্যা-হতি লাভ করিয়া, আবার এক নূতন বিপদে পড়িলাম,—সে বিপদ আমারই স্ত্রী পঙ্কজিনী। সকলে বিদায় হইয়া চলিয়া গেলে পর পঙ্কজিনী আপনার মুখের ঘোম্‌টা খুলিয়া হাসি মুখে পানের ডিবা হইতে আমার হাতে একটী পানের খিলি দিয়া হাসিয়া কহিলেন,—"কেমন পূজো দেখিলে,—পূজোর মত পূজো কিনা?" কথাটা একটু অহঙ্কার পরিপূর্ণ।

পানের খিলিটা মুখে দিয়া হাসিয়া কহিলাম,—"হাঁ, পূ'জোর মতনই বটে।"

এবার আমার উত্তরটা বুঝি পঙ্কজিনীর শ্রুতিসুখকর হইল না,—বুঝি আমি তাহাকে ব্যঙ্গ করিতেছিলাম, তাই তিনি আপনার বিশালায়ত আননে বিশাল ভ্রুকুটি ভঙ্গ করিয়া কহিলেন,—"কেন, অত ঠাট্টা কেন?"

আমি। ঠাট্টা করিলাম কৈ? তুমি যেমন জিজ্ঞাসা করিলে ঠিক তেম্নি উত্তর দিলাম।

পঙ্কজিনী। সাধে কি দিদি ও বউদিদিরা তোমাকে বাঙ্গাল বলে গেলেন।

এবার আমি হাসিয়া কহিলাম,—"বাঙ্গাল বৈ কি? আমি বাঙ্গালই বটে। তবে কথা কি জান, তোমাদের বাড়ীর সকলের ভাব চরিত্র দেখে আমার মনে হয়, বুঝি আমার সহিত তোমার বিবাহ দিয়া তোমার পিতা মাতা ভাল কাজ করেন নাই; আর আমিও যতটা বুঝিতেছি, তাহাতে আমারও বিশ্বাস দরিদ্র ও মূর্খ বাঙ্গাল আমি,—আমিও তোমার ন্যায় আশৈশব সুখ-প্রতিপালিতাকে বিবাহ করিয়া বুঝি ভাল কাজ করি নাই, বরং তোমার ও আমার—উভয়েরই জীবনে সুখের পথে কাঁটা দিয়াছি।" এই বলিয়া নীরব হইলাম।

আমার কথায় এবার পঙ্কজিনী হাসিয়া কহিলেন,—"বারে রসিক! এখন তো মুখ ফুটিল! এতক্ষণ বউদিদিরা মুখ ফুটাইবার জন্য এত যত্ন ও চেষ্টা করিলেন, কিন্তু মুখ ফুটাইতে পারিলেন না, এখন দেখিতেছি আপনা আপনি মুখ ফুটিয়া উঠিল।"

আমিও হাসিয়া কহিলাম,—"আমরা বাঙ্গাল,—তোমাদের মত ভুবন-মনোমোহিনী রত্নের পাল দেখিলেই আমাদের ভয় হয়,—ভীরু কবির কবিতা-রাজির ন্যায় মুখ ফুটি ফুটি করিয়াও ফুটে না,—উপায় কি?"

এমনই ভাবে দীর্ঘকাল ধরিয়া কত কথা হইল—কত গল্প হইল; আর সেই সঙ্গে পঙ্কজিনী প্রত্যেক কথায়, আমাদের দরিদ্রাবস্থা—আপনার পিতার অতুল বৈভব, চক্‌মিলানো প্রাসাদতুল্য অট্টালিকা, দাস দাসী, রাশি রাশি রত্নালঙ্কারের পরিচয় দিতে, আর সেই সঙ্গে আমাদের মেটে ঘর—দাস দাসী ও রত্নালঙ্কারের সম্পূর্ণ অভাব,—এই সব উল্লেখ করিতে কিছুমাত্র ত্রুটি করিলেন না। এমনই ভাবে হাসি তামাসায়, তীব্র ব্যঙ্গ বিদ্রূপে,—মান অভিমানে পঙ্কজিনী ও আমার—উভয়ের কালিমাময়ী সেই রাত্রি কাটিয়া গেল। রজনী প্রভাতে, শয্যা হইতে উঠিয়া প্রাতঃকৃত্যাদি সমাপনান্তে কর্ত্তার বৈঠকখানাভিমুখে চলিলাম।

ক্রমশঃ

শ্রীউমেশচন্দ্র মৈত্রেয়।

ভিনিস ভ্রমণ।

ইউরোপের নানা দেশ ভ্রমণ করিয়া ১৮৯৯ স্যালের ১লা ফেব্রুয়ারী তারিখে মিলান (Milan) হইতে ভিনিস (Venice) যাত্রা করি। সেই দিবসই সন্ধ্যাকালে সাগর-বেষ্টিত ভিনিস সহরে আসিয়া উপস্থিত হই। ইটালির রেলগাড়ীগুলি বেশ আরামদায়ক—পুরু গদিবিশিষ্ট বসিবার স্থান আছে— জানালা দরজার ঘড়ঘড়ানি শব্দ নাই—সুন্দর সুন্দর পার্ব্বত্যদৃশ্যের ছবি টাঙ্গান—স্নানের ঘরে (bath room) সাবান তোয়ালে ও গরম জল প্রস্তুত। গাড়ীর আবার বারাণ্ডা আছে—এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত যাতায়াত করিতে পারা যায়। আমি যখন যাই সেই সময় অত্যন্ত শীত—সমস্ত রাস্তাটা কেবল বরফাবৃত—দুধারে পর্ব্বতমালা শ্বেতাবরণ পরিয়া যেন আমাদের দিকে তীক্ষ্ণদৃষ্টি নিক্ষেপ করিতেছে। কিন্তু গাড়ীর মধ্যে একটুও ঠাণ্ডা ছিল না—বরং গরম বোধ হইতেছিল। বাষ্পের (steam) দ্বারা গরম করিবার বন্দোবস্ত ছিল। আমার Thomas Cook দের নিকট হইতে একেবারে বোম্বাই সহর পর্য্যন্ত ভ্রমণের জন্য টিকিট ক্রয় করা ছিল, অতএব কোনখানে আর টিকিট লইবার গোলযোগের মধ্যে পড়িতে হয় নাই। টিকিট না কেনা থাকিলে সময়ে সময়ে বিশেষ অসুবিধায় পড়িতে হয়—কোথায় টিকিট ঘর, আবার আমাদের ভাঙ্গা ভাঙ্গা বেসুরি ফরাসী ভাষা—তাহার উপর আমাদের বিশুদ্ধ ভাষা শ্রবণে অনভ্যস্ত কর্ণ—এক বলিতে আর এক বলি, ও এক শুনিতে আর এক শুনি। শুধু তাহাই হইলে ত বাঁচা যাইত—নূতন নূতন স্থানে নূতন নূতন মুদ্রা—কয়টা মুদ্রা হইলে কত হইবে আর কতই বা ফিরিয়া পাওয়া যাইবে তাহা বুঝিতে গেলে দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া দুই তিনখানা ট্রেন্ মিস্ করিতে হয়। সেটা তেমন সুবিধাজনক বলিয়া মনে হয় না। Thomas Cook দের শত শত ধন্যবাদ! আধ ঘণ্টার মধ্যে একেবারে লণ্ডনে বসিয়া সমগ্র পৃথিবী ভ্রমণের টিকিট ক্রয় করিতে পারা যায়—কোন গোলযোগ নাই—সমস্ত মুদ্রা পাউণ্ড সিলিং পেন্স এ বুঝিয়া দিলাম। তাহাদের নিকট হইতে টিকিট ক্রয়

করিলে আরও একটী সুবিধা আছে। সকল বড় বড় রেলের ষ্টেষনে এক ধরণের (Uniform) পরিচ্ছদধারী Cook কোম্পানীর একটী করিয়া কর্ম্মচারী ট্রেনের আগমনকালে উপস্থিত থাকে। Cook দের টিকিট সঙ্গে থাকিলে তাহারা রেলযাত্রীকে সকল প্রকারে সাহায্য করিতে বাধ্য। থাকিবার স্থান অন্বেষণ করা, লগেজের আর লওয়া, গাড়ী ডাকিয়া দেওয়া ও অন্যান্য বিষয়ে সকল প্রকারে তাহাদের সাহায্য পাওয়া যায়। ইহাতে পর্য্যটকের কত সুবিধা তাহা যাঁহারা ইউরোপে ভ্রমণ করিয়াছেন তাঁহারাই জ্ঞাত আছেন। একটী উদাহরণ দিতে পারি। আমি যখন Paris রাজধানীতে গমন করি ট্রেন হইতে নামিয়াই পকেট হইতে টিকিটের বইখানা লইয়া Ticket collector এর হাতে দিলাম তাহার মধ্যে অনেকগুলি টিকিট ছিল। Ticket Collector বাছিয়া তাহার দরকার মত টিকিট্‌টি লইল। তাহার তিন দিন পরে টিকিটগুলি পাঠ করিয়া দেখি Ticket Collector ভুলক্রমে অপর একটী টিকিট লইয়াছে। ভাবিলাম আবার বুঝি টিকিট ক্রয় করিতে হইবে। যাহা হউক সন্দিগ্ধচিত্ত হইয়া পারিস সহরস্থিত Cook দের আফিসে গিয়া সকল কথা বলিলাম। তাহার পরদিন তাহাদের লোক একেবারে সেই টিকিটটী লইয়া উপস্থিত। যে টিকিট্‌টী Ticket Collector ভুলক্রমে লইয়াছিল সেইটীই ফের ফিরিয়া পাইলাম। বাস্তবিকই Cook এরা পর্য্যটকদিগের প্রকৃত বন্ধু।

ভিনিসে আসিবার আগেই কোন্ হোটেলে থাকিব তাহা Cook দেরই Guide পুস্তক দেখিয়া ঠিক করিয়া রাখিয়াছিলাম। ষ্টেষনের গায়েই ভিনিসের সদররাস্তা—রাস্তাটী খুবই বিস্তৃত। ষ্টেষনের সম্মুখেই অশ্ববিহীন কৃষ্ণকায় যানসকল শ্রেণীবদ্ধ হইয়া আগত যাত্রীদিগের প্রতীক্ষায় দণ্ডায়মান আছে। সে রাস্তায় লোকেরা পদচারণা করিয়া চলে না—চলা একেবারেই অসম্ভব—এমন কি একটীমাত্র পশুরও পদশব্দ শুনিতে পাওয়া যায় না। অথচ ভিনিসিয়ান যানসকল সেখান দিয়া নিঃশব্দে দ্রুতগতিতে গমনাগমন করে। রাস্তা ও গাড়ীর আকৃতি সম্বন্ধে পাঠকের মনে সন্দেহ উদ্রেক হইতে পারে—মনে করিতে পারেন এমন কি রাস্তা যাহার উপর দিয়া হাঁটিয়া চলা অসম্ভব! ভিনিসের যে ছবি দেওয়া গেল উহা দেখিলেই বুঝিতে পারিবেন ঐ উচ্চশৃঙ্গ সৌধমালার সম্মুখেই ভিনিসের প্রধান রাস্তা। আমাদের দেশে ও সমগ্র

জগতে প্রস্তর প্রভৃতি কঠিন বস্তুর দ্বারা রাস্তা নির্ম্মিত হয়—কিন্তু ভিনিসদেশে সমুদ্রের জলই রাস্তার উপকরণ সামগ্রী। সমুদ্র স্বয়ং তাহার বাহুবিস্তার করিয়া ভিনিসসহরকে বেষ্টন করিয়া আছে, এমন কি তাহার বক্ষস্থল বিদীর্ণ করিয়া শতধারা হইয়া প্রবাহিত হইতেছে। এক একটী ধারা সহরের এক একটী শিরা, এবং এই শিরার মধ্য দিয়াই ভিনিসবাসীদিগের ভাসমান নৌ-শকট সকল মনুষ্য ও বাণিজ্যভার বহন করিতেছে। আমি ষ্টেষন ত্যাগ করিয়াই সম্মুখস্থিত একটী নৌ-শকট ভাড়া করিয়া গন্তব্যস্থানে যাইতে মানস করিলাম, কিন্তু যখন নিকটবর্ত্তী হইলাম, দেখি একে ত অন্ধকার রাত্রি তাহার উপর আবার ভাসমান জলযানগুলি কৃষ্ণাবরণে মণ্ডিত। সে দৃশ্য তখন সুখ-জনক মনে হইল না। ভাবিলাম যদি আর কোন উপায়ে যাওয়া যায় তাহা হইলে সেই অন্ধকার রাত্রে জল রাজ্যের দোদুল্যমান শবাধারে (coffin) আত্মসমর্পণ করিব না। মাঝি ত লইয়া যাইবার জন্য প্রস্তুত, এবং ভাড়াও কিছু কম নহে। শুনিলাম হোটেলটী এক মাইলের চেয়েও কিছু বেশী দূরে। যাই হোক, অল্পক্ষণ ইতস্ততঃ করিয়া স্থির করা গেল যে যদি হাঁটিয়া যাইবার সুবিধা থাকে তাহা হইলে তাহাই শ্রেয়। সৌভাগ্যবশতঃ একটী কুলী পাওয়া গেল, সে জানাইল যে সে হাঁটিয়া লইয়া আমাকে হোটেলে পৌছাইতে পারে। অতএব তাহারই সাহায্যে ফুটপাথের ন্যায় সংকীর্ণ রাস্তা দিয়া আমি চলিলাম। যাইতে যাইতে অনেকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পুল পার হইতে হইল। রাস্তার উভয় পার্শ্বে গ্যাসালোক জ্বলিতেছে—মাঝে মাঝে সুন্দর সুন্দর পণ্যদ্রব্যসুশোভিত পণ্যবীথিকা জনাকীর্ণ হইয়া রহিয়াছে দেখিতে পাওয়া গেল, কিন্তু কোন স্থানেই অশ্বের পদশব্দ নাই—গাড়ীর ঘড়-ঘড়ানি নাই। সেই নিস্তব্ধ নিশীথে আমরাও নিঃশব্দে চলিলাম এবং অল্পক্ষণ মধ্যেই সহরের অপরাংশে, যেদিকে রাজপ্রাসাদ অবস্থিত, সেইদিকে আসিয়া পৌছিলাম। হোটেলের সম্মুখে আসিবামাত্র হোটেলের কর্ত্রী আমার সহিত ইংরাজীতে আলাপাদি করিতে লাগিলেন এবং অনেকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিবার পর একটু কথা কহিবার অবকাশ পাইয়া আমি হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিলাম। তিনি একজন ইংরাজ রমণী এবং ইংলণ্ড হইতে আমি আসিতেছি শুনিয়া একটু বিশেষ যত্নের সহিত আমার থাকিবার সব বন্দোবস্ত করিয়া দিলেন। কুলিকে একটী মুদ্রা দিয়া বিদায় দিলাম এবং হাতমুখ ধুইয়া ডাইনিং হলে খাইতে গেলাম। সেই হোটেলে আরও অনেকগুলি লোক ছিল, এবং আমরা সকলেই একই টেবেলে ডিনার খাইলাম। আহারাদি সমাপ্ত হইলে সমুদ্র উপকূলে একটুখানি বেড়াইয়া লইলাম। যেস্থানে হোটেল আছে সেইস্থানটী একেবারেই সমুদ্রের উপকূলে—এড্রিয়াটিক সাগর সম্মুখে বহুদূর বিস্তৃত হইয়া বিরাজমান। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে ভিনিস সহর একটী দ্বীপমাত্র—আমাদের বোম্বাই সহরের ন্যায় সাগর-বেষ্টিত ও মহাদেশের সহিত রেলরাস্তার দ্বারা সংলগ্ন। যদিও অন্ধকারাত্রে ভিনিস্ সহরে আসিয়াছিলাম, কিন্তু মনে হইল এইবার আমার চিরাভিলাষ সার্থক হইল। কতকাল হইতে ভিনিসের বিষয় শুনিয়া আসিতেছি—এরূপ অপূর্ব্ব সহর পৃথিবীতে আর নাই—বাড়ীর সদর দরজার সামনেই কঠিন রাস্তার পরিবর্ত্তে একটী তরল রাস্তা—বাজার হাট, চলা ফেরা করিতে হইলেই নৌকার সাহায্য লইতে হয়—এই সব কতকাল হইতে স্বপ্ন দেখিয়া আসিতে-ছিলাম, আজ সেই স্বপ্ন সত্যে পরিণত হইল। আমি সেই সুদূরবর্ত্তী সৌন্দর্য্য-বিভূষিতা এড্রিয়াটিক মহিষীর বক্ষের উপর আজ সত্যসত্যই স্থান পাইয়াছি। আজ আমার হৃদয় আনন্দে পরিপূর্ণ। আমি প্রাতঃকালের প্রতীক্ষা করিয়া সেদিনকার মতন শয়ন করিলাম।

বস্তুতঃ ভিনিস সহর কতকগুলি দ্বীপের উপর প্রতিষ্ঠিত। ইটালির অ্যাল্পস্ নামক পর্ব্বতমালা হইতে ছয়টী নদীর এড্রিয়াটিক সমুদ্রের সহিত সম্মিলন হওয়ায় ক্রমাগত বালী ও কর্দ্দম সেইস্থানে জমিতে জমিতে ঐ দ্বীপ-গুলির সৃষ্টি হয়। ভাটার সময় দেখা যাইত যে এই দ্বীপগুলির চতুর্দ্দিকেই বালুকারাশি, এবং এই বালুকারাশি প্রায় দশ ক্রোশ পর্য্যন্ত সমুদ্রাভিমুখে ব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছে। জলের অনতিগভীরতাবশতঃ শত্রুর অর্ণবপোতসকল বারং-বার ভিনিস আক্রমণ করিতে আসিয়াও কিছুতেই ভিনিসের নিকটবর্ত্তী হইতে পারে নাই। এমন কি স্থলের দিক হইতেও শত্রুরা দ্বীপগুলি আক্রমণ করিতে আসিয়াও সহস্র চেষ্টা করিয়াও সম্পূর্ণ বিফলপ্রয়াস হইয়াছিল। বহুকাল পূর্ব্বে ভেনেসি নামক এক জাতীয় লোক কোন ক্ষমতাশালী শত্রু কর্ত্তৃক নিজ নিজ দেশ হইতে বিতাড়িত হইয়া নিরাপদ মনে করিয়া ঐ দ্বীপ-গুলি প্রথমে অধিকার করে। এখানে তাহাদের শত্রুহস্তে নিপীড়িত হইবার

আর কোন ভয় ছিল না। সেই অনবচ্ছিন্ন শান্তিসুখ ভোগকরতঃ তাহারা কালে একটী সুবৃহৎ রাজ্য সৃষ্টি করিতে সক্ষম হইল যাহার প্রাধান্য সমস্ত পৃথিবীকে স্বীকার করিতে বাধ্য হইতে হইয়াছিল। ভেনেষিয়া এইস্থানে পর্ণকুটীর নির্ম্মাণ করিয়া বসবাস করিতে আরম্ভ করিল। বাস্তবিকই ইহাপেক্ষা রমণীয় স্থান তাহারা আর কোথায় পাইত কিনা সন্দেহ। যদিও সময়ে সময়ে কিছু দূরে যুদ্ধের ভেরীনিনাদ শুনিতে পাওয়া যাইত তথাপি তাহা তাহাদের সেই পর্ণকুটীরের শান্তি ও নির্ব্বিঘ্নতা কখন নষ্ট করিতে পারিত না। আর চতুর্দ্দিকেই নীল জলরাশি, একবার দ্বীপগুলি বেষ্টন করিয়া উঠিতেছে, একবার নামিতেছে—ঊর্ম্মিমালা ফেনোদ্গীরণ করিয়া সৈকতপুলিনে অবিরত নৃত্য করিতেছে। উপরে অনন্ত নীলিমার দৃশ্য—সূর্য্যের উজ্জ্বল আলোককে প্রায় মেঘাবরণ ভেদ করিয়া আসিতে হয় না। তাহার উপর গ্রীষ্মকালীন মলয়ানিল যে কি সুন্দর তাহা ভিনিষিয়ানরাই জ্ঞাত আছে। সেই পর্ণকুটীরপূর্ণ ভিনিস সহরে আজ উন্নতমস্তক অট্টালিকা ব্যতীত আর কিছুই দৃষ্ট হয় না। যেদিকেই দৃষ্টি নিক্ষেপ করি সেইদিকেই বৃহৎ বৃহৎ হর্ম্ম্যরাজী সমুদ্রবক্ষ ভেদ করিয়া গগন স্পর্শ করিতে উদ্যত। এরূপ রমণীয় সৌন্দর্য্যপূর্ণ সহর বাস্তবিকই আর দেখিতে পাওয়া যায় না। পরদিন ষ্টীমারে করিয়া যখন প্রধান খালের (Grand Canal) উপর দিয়া সহরের অপর প্রান্তে যাই, দুধারে যে কি দৃশ্য দেখিলাম তাহা বর্ণনা করা দুঃসাধ্য মনে হয়। সে দৃশ্যের নমুনার স্বরূপ একটী ছবি দেওয়া গেল, এবং ক্রমে আরও অন্যান্য চিত্র দেওয়া যাইবে। ভিনিস কিরূপে এত উন্নতি লাভ করিল তাহা ভিনিসের ইতিহাস পাঠে অবগত হওয়া যায়। পঞ্চদশ শতাব্দীতে ভিনিস উন্নতি সোপানের সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকার করিয়াছিল। ইহার ইতিহাসের প্রারম্ভকাল হইতে ইহা অল্পে অল্পে ক্রমশঃই সর্ব্ববিষয়ে উন্নতি লাভ করিতে লাগিল এবং ঐ শতাব্দীর শেষ ভাগে সেই উন্নতির চরমসীমায় পদার্পণ করিলে সমগ্র বাণিজ্যজগতের ইহাই কেন্দ্রস্থল বলিয়া পরিগণিত হইল। ইহার পণ্যদ্রব্যাদি পরিপূর্ণ বাণিজ্যপোত সকল পৃথিবীতে এমন স্থান ছিল না যেখানে যাইত না। সকল দেশের সহিতই ইহা বাণিজ্যসূত্রে দৃঢ়বদ্ধ ছিল। "বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মী" এই প্রবচনের জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত ভিনিসই প্রথম দেখাইয়াছে। অত্যল্পকাল মধ্যেই যে ইহা বিপুল অর্থ সঞ্চয় করিতে পারিয়াছিল তাহার প্রমাণ আজিও ভিনিসের প্রাচীন ঐতিহাসিক প্রাসাদসকলের বহুমূল্য রমণীয় কারুকার্য্য মধ্যে রক্ষিত আছে।

রাজনীতি ও রমণীপ্রতিভা।

বিখ্যাত মহিলা মাদাম দা ষ্টেলের নাম কে না শুনিয়াছে? অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে এই মহিলা সমগ্র ইউরোপকে আপনার উজ্জ্বল প্রতিভা দ্বারা স্তম্ভিত করিয়াছিলেন। ইঁহার ন্যায় অতুলনীয় বিদ্যাবুদ্ধি স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে প্রায় দেখিতে পাওয়া যায় না।

এই আদর্শ ফরাসী রমণী মাদাম দা ষ্টেল (কুমারী অ্যান লুই জার্ম্মেন নেকার) ১৭৬৬ খৃষ্টাব্দে প্যারিস নগরে জন্মগ্রহণ করেন।

নেপোলিয়ন, ওয়াশিংটন, মহারাণী ভিক্টোরিয়া প্রভৃতি খ্যাতনামা পুরুষ ও রমণীদিগের জীবনী পাঠ করিলে দেখা যায়, যে ইঁহাদিগের পিতামাতারা বিখ্যাত না হউন, কিন্তু অতিশয় উচ্চমনা এবং বহু গুণে বিভূষিত ছিলেন। এই আদর্শ রমণী মাদাম দা ষ্টেলের পিতামাতারাও ঐ শ্রেণীর লোক ছিলেন।

ইঁহার পিতা জেম্‌স্ নেকার অতিশয় দরিদ্রাবস্থাপন্ন হইয়াও এক সময় ফরাসী রাজনৈতিক গগনে অল্প ক্ষমতা বিস্তার করেন নাই। পঞ্চদশ বৎসর বয়সে জেম্‌স্ নেকার স্বীয় জন্মভূমি জেনীভা পরিত্যাগ করিয়া কোন ব্যাঙ্কের কর্ম্মচারী নিযুক্ত হইয়া প্যারিসে আইসেন। কিয়ৎকাল পরে এই কর্ম্ম ছাড়িয়া দিয়া অপর একটি ব্যাঙ্কে কর্ম্ম করিতে আরম্ভ করেন। পরিশেষে ইহারই অংশিদার হইয়া, যেকালে ইংরাজদিগের সহিত ফরাসীগণের সাত বৎসর কাল মহা যুদ্ধ হয়, সেই সময় ইনি প্রভূত ধনোপার্জ্জন করেন। ১৭৭৬ খৃষ্টাব্দে ফরাসী রাজস্ব সম্বন্ধে কোনরূপ সুবন্দোবস্তের অভাব হেতু তাঁহাকে ফরাসী গবর্ণমেণ্ট রাজস্বসচিবের পদে নিযুক্ত করেন। নেকারের অগ্রে এ পর্য্যন্ত কোনও

প্রোটেষ্টান্ট্‌ ধর্ম্মমতাবলম্বী ফরাসী এরূপ উচ্চপদ প্রাপ্ত হয়েন নাই। রাজস্ব-সচিব হইয়া ইনি নিঃস্বার্থভাবে স্বদেশের অনেক হিতসাধন করিয়া গিয়াছিলেন। তাহার জন্য ফরাসী রাজ হইতে তিনি কোনই পুরস্কার প্রাপ্ত হন নাই, বরঞ্চ তাঁহার প্রতি অত্যন্ত অন্যায় আচরণই করা হইয়াছিল।

ফরাসী বিপ্লবের প্রথম সূচনায় জেমস নেকার, ফরাসীরাজ যোড়শ লুইকে প্রজাবিরোধী কতকগুলি কর্ম্ম হইতে নিরস্ত করিতে গিয়া কর্ম্মচ্যুত হইয়া প্যারিস হইতে তাড়িত হইলেন। রাজাদেশানুযায়ী প্যারিস পরিত্যাগ করিয়া নেকার মাতৃভূমি জেনীভায় চলিয়া গেলেন। সেখানে উচ্চবংশের বহুবিধ পদস্থ সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণ তাঁহার প্রতি সহানুভূতি প্রকাশের নিমিত্ত তাঁহার সহিত দেখা সাক্ষাৎ করিতে আসিতেন। ইনি প্যারিস হইতে প্রস্থান করিলে নগর মধ্যে প্রজাসাধারণের মধ্যে এক মহা হাহাকার পড়িয়া যায়। এই কোলাহল থামাইবার জন্য মহারাজ লুই পুনরায় নেকারকে প্যারিসে ডাকাইয়া পূর্ব্বপদে প্রতিষ্ঠিত করিতে বাধ্য হইলেন। নেকারের প্রত্যাগমনে ফরাসীরা অতিশয় আনন্দিত হইল, কেননা নেকারের প্রতি তাহাদিগের অত্যন্ত শ্রদ্ধা ভক্তি ছিল। অবশেষে ১৭৮৮ খৃষ্টাব্দে ফরাসী বিপ্লবের প্রথম জাতীয় অধিবেশনে, তাঁহাকে পুনরায় কর্ম্মচ্যুত করিয়া প্যারিস হইতে নির্ব্বাসিত করা হইল। তিনি তখন জেনীভার নিকট কপেট নামক প্রদেশে তাঁহার যে নিজের ভূসম্পত্তি ছিল সেইখানে গিয়া বাস করিতে লাগিলেন। এই সময় হইতে জীবনের অবশিষ্ট কয়েক দিবস তিনি সাহিত্য সেবায় মনোনিবেশ করিলেন। তিনি রাজনীতি ও ধর্ম্ম সম্বন্ধে অনেক গ্রন্থ লিখিয়াছিলেন। ইহা ব্যতীত ফরাসীবিপ্লব সম্বন্ধে এক প্রকাণ্ড ইতিহাস প্রণয়ন করিয়াছেন। এইরূপে স্বদেশের কত মহৎ কার্য্য সাধন করিয়া কত লোকের অনুরাগ ও বিরাগভাজন হইয়া কত উৎকৃষ্ট গ্রন্থ রচনার দ্বারা জগতে অক্ষয় কীর্ত্তি স্থাপন করিয়া ১৮০৪ খ্রীষ্টাব্দে ৭২ বৎসর বয়সে ইহলোক ত্যাগ করিয়া যান।

মাদাম দা ষ্টেলের মাতা মাদাম সুজ্যান নেকার একজন পাদরীর দুহিতা। এই সুজ্যান নেকার এক অসাধারণ বিদুষী রমণী ছিলেন। ইহারই যত্নে ও সুশিক্ষার গুণে, ইঁহাদের একমাত্র কন্যা ভবিষ্যতে লোকসমাজে এত

...হইতে পারিয়াছিলেন। মাদাম নেকার যেমন পরমাসুন্দরী ছিলেন ...নি বিদ্যা, বুদ্ধি, সুমিষ্ট বাক্যালাপ ব্যবহারাদিতেও অন্যান্য রমণীগণের ...ক্ষা এত শ্রেষ্ঠ ছিলেন যে বিখ্যাত রোম ইতিহাসবেত্তা গিবান সাহেবও ...র রূপ ও গুণে মোহিত হইয়া তাঁহার হস্তপ্রার্থী হন। কিন্তু পরে, ইঁহার ...র দরিদ্রাবস্থা দেখিয়া বিবাহ করেন নাই। সুজ্যান, পিতার মৃত্যুর পর, সাং...রিক কষ্টের জন্য দিন কতক শিক্ষয়িত্রীর কার্য্য করিয়া নিজের ও মাতার ভর...পোষণ নির্ব্বাহ করেন। এইরূপে তিনি যখন এক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির পুত্রকে লা... শিক্ষা দিতেছিলেন সেই সময় নেকারের সহিত তাঁহার পরিচয় হয়। তি... সুজ্যানের আন্তরিক ও বাহ্যিক উভয় সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে ...করেন। ইঁহাদের পরস্পরের প্রতি প্রগাঢ় ভালবাসা ছিল। নেকার ...সম্বন্ধীয় বিষয় হইতে আরম্ভ করিয়া কোনও সামান্য বিষয়ও স্ত্রীর পরামর্শ ... চলিতেন না, তেমনি মাদাম নেকারও স্বামীর অতিশয় বাধ্য ছিলেন, ... বিনা অনুমতিতে কোনও কর্ম্ম করিতেন না। তিনি রূপের জন্য যত না ...ক, গুণের দ্বারা স্বামীর এত অনুরাগ ভাজন হইতে সক্ষম হইয়াছিলেন।

জেম্‌স্‌ নেকারের রাজস্বসচিবের পদ মাদাম নেকারকে দরিদ্র প্রজাদিগের কষ্ট ও দুঃখ লাঘবের পক্ষে খুব সহায়তা করিয়াছিল। পাঁচ বৎসর কাল তিনি নিরন্তর প্রগাঢ় যত্ন ও অধ্যবসায়ের সহিত প্যারিসের যাবতীয় কারাগৃহ এবং হাস্পাতালের অধিবাসীগণের দুঃখমোচনে এবং উহাদের ব্যবস্থাপ্রণালী সংস্কারে একান্ত ব্রতী ছিলেন। নেকার তাঁহার রচিত পুস্তকাদির মধ্যে এক স্থানে উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন, যে "একজন রাজস্বসচিবের পক্ষে সহধর্ম্মিণীকে এইরূপ যাবতীয় কার্য্যে সহকারিণী স্বরূপে লাভ করা, ইহা কম সৌভাগ্যের বিষয় নয়; ইহা কি সুখের বিষয় যে এরূপ একজন সুশিক্ষিতা মহিলাকে আপনার সমস্ত সুখ দুঃখের ভাগী করিতে পারিয়াছি।"

এমন সর্ব্বগুণে বিভূষিতা বিদুষী রমণী—যিনি অন্যান্য লোকের উপকারে এত ব্যস্ত, তিনি যে একমাত্র কন্যার শিক্ষার জন্য সতত চেষ্টিত ছিলেন, তাহা বলা বাহুল্য মাত্র।

কুমারী নেকার অর্থাৎ মাদাম দা ষ্টেল স্বীয় মাতার নিকট শিক্ষা লাভ ব্যতীত তাঁহার পিতৃগৃহে সমবেত খ্যাতনামা জ্ঞানী ব্যক্তিদিগের গবেষণাপূর্ণ

বহু প্রকারের তর্কবিতর্ক ও আলোচনা হইতেও জ্ঞান লাভ করিতেন। বয়সে অন্যান্য বালিকারা পুতুল খেলায় প্রবৃত্ত থাকে কুমারী নেকার বয়সে ঐ সব প্রধান প্রধান ব্যক্তিগণের মধ্যে বসিয়া সাহিত্য, রাজনী ধর্ম্মের কথা কহিতে শিখিয়াছিলেন।

বালিকাবস্থা হইতেই ইনি কূট বিষয় সকল এরূপ সূক্ষ্মভাবে আলে করিতে পারিতেন, যে তৎকালে অতি প্রবীণ বহুদর্শী শাস্ত্রবেত্তারা ইহার বাক্যালাপ করিয়া অতিশয় আনন্দ উপভোগ করিতেন। পঞ্চদশ বয়সে তিনি একখানি দুরূহ ফরাসী গ্রন্থের উপর আপনার মন্তব্য লিখি সুন্দর ভাবে তাহার সমালোচনা করেন। তাহা দেখিয়া প্রসিদ্ধ দার্শনিক, অ্যাবে রেন্যাল, কুমারী নেকারকে তাঁহার তৎকাল রচি খানি দুরূহ গ্রন্থের সমালোচনা করিতে অনুরোধ করিয়াছিলেন।

মাদাম দা ষ্টেলে একদিকে যেমন পুরুষোচিত গুণ যথা—অধ্যবসা বুদ্ধি, তেজস্বিতা, বহুদর্শিতা প্রভৃতি বিদ্যমান ছিল, অন্যদিকে রমণীর কোমলভাবও তাঁহাতে পূর্ণমাত্রায় ছিল। পিতামাতার প্রতি তাঁহার শ্রদ্ধা ভক্তি ছিল। কুমারী নেকার নিজেই বলিয়া গিয়াছেন যে "আমার পূ পিতার নিকট হইতে আমি এরূপ চিন্তা করিতে অভ্যাস করা শিক্ষা ক যাহাতে সকলে পরিষ্কার ভাবে আমার হৃদয় পড়িতে পারে।" জেম্‌স্ নেকার "কাউণ্ট রাঁদু" নামে এক গ্রন্থ লিখিয়া প্রকাশ করিলে কুমারী নেকার তাঁহার পিতাকে, এই গ্রন্থের সুন্দররূপে সমালোচনা করিয়া একটি বেনামী পত্র লিখেন। ঐ পত্রের লেখার ধরণে নেকার বুঝিতে পারিয়াছিলেন, উহার লেখিকা কে, এবং সেই অবধি তিনি স্বীয় দুহিতার পরামর্শানুযায়ী কার্য্য করিতেন এবং তাঁহার বিচার বিবেচনাতে অত্যন্ত শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিতেন।

কুড়ি বৎসর বয়স হইতে কুমারী নেকার রীতিমত সাহিত্যসেবী হইয়াছিলেন। ইহার আগে তিনি তাঁহার পিতার কার্য্যের সহায়তা করিতেন মাত্র।

তাঁহার প্রথম রচনা "সোফী" বা "গুপ্ত অনুরাগ" নামে একখানি উপন্যাস। তাহার পর বৎসরে লেডি জেন্‌গ্রের জীবনী অবলম্বন করিয়া আর একখানি গ্রন্থ প্রকাশিত করেন। এই সময় সুইডেন প্রদেশের রাজপ্রতিনিধি,

হারাণী মরি অ্যানটোয়নেটের অতিশয় প্রিয়পাত্র, ষোড়শ লুইর সভাসদ ারণ ডাষ্টির সহিত কুমারী নেকারের বিবাহ হয়। এই ব্যারণ ডাষ্টিল এক ন অতিশয় সুপুরুষ ছিলেন। তিনি সুইডেন প্রদেশের রাজমহিষীর প্রধান র্ম্মচারীর পদ প্রাপ্ত হন এবং পরে অনেক উচ্চ উপাধি-ভূষিত হইয়াছিলেন।

দুর্ভাগ্যবশতঃ ইঁহাদের মিলন কিন্তু সুখের হয় নাই। মাদাম ষ্টেলের ক্ষ্য তাঁহার স্বামীর জীবনের লক্ষ্য হইতে একেবারে ভিন্ন ও উচ্চদরের কাতে তাঁহারা পরস্পরের সংসর্গে সুখী হইতে পারেন নাই। দুইটি পুত্র ং একটি কন্যা জন্ম হইবার পর, ইঁহারা পরস্পর পৃথক হইয়া যান।

ফরাসী বিপ্লবের সহিত প্রথমে ইঁহার সম্পূর্ণ সহানুভূতি ছিল, কিন্তু পরে সূত্রে অনেক লোমহর্ষক বীভৎস ব্যাপার সংঘটিত হইতে আরম্ভ হইলে, া ইহার একজন মহাবিপক্ষ হইয়া উঠেন। রাজপরিবারের প্যারিস হইতে পনে পলায়নের জন্য তিনি অনেক চেষ্টা করিয়াও ব্যর্থমনোরথ হইয়া যে পিতার সহিত সুইজারল্যাণ্ড প্রদেশে চলিয়া যান।

মহারাজ লুইয়ের হত্যার সংবাদ শুনিয়া তিনি অত্যন্ত ব্যাকুল হইলেন। এবং মহারাণী মেরি অ্যানটোয়নেটকে বাঁচাইবার জন্য অনেক চেষ্টা করেন। বিখ্যাত ফরাসী সচিব রোবস্ পিয়েরের রাজত্বকালে নিজের আসন্ন বিপদ তুচ্ছ করিয়া রাণীর পক্ষ সমর্থন করতঃ এই বিপ্লবকারীদিগের বিরুদ্ধে এক গ্রন্থ লিখিলেন, কিন্তু তাহা তখন কে পড়িবে! সকলেই তখন রাজার শিরশ্ছেদন দর্শনার্থ লালায়িত। প্রজা সাধারণের প্রতি রাজা যে অন্যায় ব্যবহার করিয়াছেন, সেই অন্যায় তাহারা রাজরক্তে ধৌত করিতে চায়। অতএব কে এখন মাদাম দা ষ্টেলের কথা শুনিবে? সুতরাং তাহাদিগের সেই রাজমুণ্ডের জন্য গগনভেদী উচ্চনাদে, মহারাণীকে রক্ষা করিবার নিমিত্ত তাঁহার সমুদয় প্রয়াস বিফল হইল।

প্রাতঃকালে মেরি অ্যানটয়নেট রাজপ্রাসাদের সম্মুখে "গিলোটিন্" নামক শিরশ্ছেদন যন্ত্রে প্রাণত্যাগ করিলেন। এই প্রাসাদেই কয়েক মাস গত হইল অতিশয় জাঁকজমকের সহিত ইঁহার বিবাহ কার্য্য সম্পন্ন হইয়াছিল, সেই আনন্দসূচক ঘটনা আজ কি হৃদয়ভেদী ঘটনায় পরিণত হইল!

মহারাণী আস্তে আস্তে গিলোটিনাভিমুখে অগ্রসর হইতে লাগিলেন, তাঁহার

মস্তকে একটি কালো টুপি এবং পরিধানে শ্বেত বস্ত্র, তাঁহার চারিধারে অমা
ষিক ঘৃণা ও বিদ্বেষভাবপূর্ণ মনুষ্যমূর্ত্তির যেন তরঙ্গ খেলিতেছিল। ধর্ম্ম ব
বলী হইয়া মেরী সেই ভয়ঙ্কর গিলোটিনের সম্মুখীন হইলেন। মুহূর্ত্তের জ
ঊর্দ্ধদিকে দৃষ্টিপাত করিয়া সন্তানগণও মহারাজের নিকট দু একটি মাত্র কথা
বিদায় গ্রহণ করিলেন, আর তৎক্ষণাৎ সেই ভয়ঙ্কর খড়্গ তাঁহার মস্তক ছেদ
করিল। হায়! এইরূপ নৃসংশভাবে একজন নির্দ্দোষী ও নিঃসহায় রমণী
নিহত হইতে দেখিয়া সেই প্রতিহিংসাপরায়ণ পশুতুল্য মনুষ্যগুলির মধ্যে
কাহারও চক্ষে একবিন্দুও অশ্রু দেখা দেয় নাই! ক্রমে কত ভাল ভাল লে
এই নরপিশাচগুলার হস্তে নিহত হইল। প্যারিস সহরে নররক্তের ে
বহিতে লাগিল। যে কেহ এই ক্ষিপ্তপ্রায় মানবপাষণ্ডদিগের সহিত সম
"জয় সাধারণতন্ত্রের জয়" না বলিবে তাহারও জন্য ঐ গিলোটিন্ প্রস্তুত আ
এই সকল ভয়ানক দৃশ্য হইতে অব্যাহতি লাভ করিবার জন্য মাদাম দা
প্যারিস পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যান। বোধ হয় আর দিনকতক এই স্থ
থাকিলে এই পশুদিগের হস্তে ইহাকেও প্রাণ হারাইতে হইত। কারণ প্যারিস হইতে পলায়ন কালে তিনি রাস্তায় বিদ্রোহীদিগের দ্বারা ধৃত হইয়া হোটেল্ দা ভিল্য়ে নীত হন। পরিশেষে অনেক কষ্টে অন্যান্য বন্ধুদিগের সাহায্যে ঐ স্থান হইতে পরিত্রাণ লাভ করিয়া কপেট নগরে তাঁহার পিতার নিকট আসিয়া বাস করিতে লাগিলেন।

কপেট হইতে তিনি ইংলণ্ডে গমন করেন। এই স্থানে তিনি "শান্তির চিন্তা" নামক একখানি অতি উৎকৃষ্ট গ্রন্থ প্রকাশ করিয়া প্রভূত যশোলাভ করিয়াছিলেন।

মন্ত্রীসভার (কনভেনশনের) অধিবেশনে মাদাম দা ষ্টেল প্যারিসে পুনরাগমন করিয়া ফরাসীবিপ্লবের দ্বারা দেশে যে সকল কুফল ফলিয়াছিল, তাহা দেখাইতে আরম্ভ করিলেন, কিন্তু ইহার জন্য তাঁহাকে মন্ত্রীসমাজে তিরস্কৃত হইতে হইয়াছিল।

শৈশব কাল অবধি রাজনৈতিক বিষয় আলোচনাদির দ্বারা ইনি এরূপ বহুদর্শিতা লাভ করিয়াছিলেন এবং ঐ সকল বিষয় এমন গভীর ও সূক্ষ্মভাবে বিচার করিতে পারিতেন যে তৎকালীন ফরাসীবিপ্লবের বিপক্ষ স্বপক্ষ উভয়

জস্ব-
য়া-
হন
কে
ইয়া
ত্যাগ
ংশের
নিমিত্ত
হইতে
পড়িয়া
ফারকে
কারের

হকীম কাবুল হইতে আসিয়া পঞ্জাব
ের সহিত একটী বিপুলবাহিনী সেনা
ঞ্জাব যাত্রা করিলেন। হকীম বিনা-
ওঁ
, আকবরের রাজ্যে অনবরত উপদ্রব
স করিত এবং সময়ে সময়ে নিম্নদেশ-
পূর্ণং প্রানানাধারয়তি পূর্ণং আকবর তাঁহার প্রিয়সখা বীরবলকে
ন প্রতারণা পূর্ব্বক একটী গিরিসঙ্কটে

জয় জয় বি

চল্লিশ সহস্র অশ্বারোহী ও পদাতি-
ংরেজদিগেরও একবার এইরূপ দুর্দ্দশা
ভূপালী—রূত দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইলেন। তিনি মান-
জয় জয় বিশ্বরান কিন্তু ধর্ম্মভীরু মানসিংহ "আটক"
তব গুণগান গাহি, তো করিলেন। উদার-চেতা আকবর
এই ত্রিভুবন মচনা করিয়া প্রেরণ করিলেন—
নকী,
ক কহা।
সূর্য্যচন্দ্র গ্রহতারা আটক হৈ,
সভাপা আটক রহা॥"
বসে আছ সিংহা পালজীর,
গাহিছে ম ত বলো।
আছে,
সৃষ্টিস্থিতি মহালয়, তোমলা॥"
সবাকার তুমি য়া কাবুল যাত্রা করিতে কিছুমাত্র
সর্ব্বলোক অনুক্ষণ করি তীর্থ যাত্রার ন্যায় নিঃশঙ্কচিত্তে কাবুল
একমাত্র অধিগর সহিত পঞ্জাবে তাঁহার প্রত্যাগমন
সাধারণ বীরত্ব বলে বিজয়ী হইলেন।
তুমি মহা লোকপাল, ত।
অনন্ত সে নাহি॥"

মস্তকে একটি কালো টুপি এবং ’রে, প্রসারিত বাহুপরে
ষিক ঘৃণা ও বিদ্বেষভাবপূর্ণ মনুষ্যমূ াগুভার।
বলী হইয়া মেরী সেই ভয়ঙ্কর f
উর্দ্ধদিকে দৃষ্টিপাত করিয়া সন্তানগান, ক্ষুদ্র অতি হীনপ্রাণ
বিদায় গ্রহণ করিলেন, আর তৎস্থব তব কাজ ;
করিল। হায়! এইরূপ নৃসংশভাসম, তুমি দেব অনুপম
নিহত হইতে দেখিয়া সেই প্রভূবন মাঝ।
কাহারও চক্ষে একবিন্দুও অশ্রু বিশ্বরাজ।
এই নরপিশাচগুলার হস্তে নিহ শ্রীঋতেন্দ্রনাথ ঠাকুর।
বহিতে লাগিল। যে কেহ এই
“জয় সাধারণতন্ত্রের জয়” না বলি
এই সকল ভয়ানক দৃশ্য হইতে
প্যারিস পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া সিংহ।
থাকিলে এই পশুদিগের হস্তে ল জয়।)
প্যারিস হইতে পলায়ন কালে
হোটেল্ দা ভিল্‌য়ে নীত হন। পা
সাহায্যে ঐ স্থান হইতে পরিত্রাণ লাভ নন সহধ্রুবম্।
নিকট আসিয়া বাস করিতে লাগিলেন। মেবচ॥”
কপেট হইতে তিনি ইংলণ্ডে গমন রিকা।
চিন্তা” নামক একখানি অতি উৎকৃ -রাজ ভারমল্লজী পরলোক গমন
করিয়াছিলেন। রের রাজা হইলেন। বাদসাহ আকবর
মন্ত্রীসভার (কনভেনশনের) অধি প্রেরণ করিলেন। তৎকালে কাশ্মীরে
করিয়া ফরাসীবিপ্লবের দ্বারা দেশে লেন। ভগবদ্ দাস তদ্দেশ জয় করিয়া
আরম্ভ করিলেন, কিন্তু ইহার জন্য র আকবরের আমীর-ওমরাদিগের শ্রেণী-
ছিল। ল্লীশ্বর বাদশাহ্‌দিগের গ্রীষ্মবাসস্থানরূপে
শৈশব কাল অবধি রাজনৈতি দুইবার কাশ্মীরে বাস করিয়াছিলেন।
বহুদর্শিতা লাভ করিয়াছিলেন এবং লে সেখানে অবস্থিতি করিতেন। ভগবদ্
বিচার করিতে পারিতেন যে ত পঞ্জাবের সুবাদার পদ প্রাপ্ত হইলেন।

১৬৩৮ সম্বতে আকবরের ভ্রাতা মির্জা হকীম কাবুল হইতে আসিয়া পঞ্জাব আক্রমণ করিলেন। অকবর মানসিংহের সহিত একটী বিপুলবাহিনী সেনা লইয়া ভগবদ্ দাসের সহায়তা করিতে পঞ্জাব যাত্রা করিলেন। হকীম বিনা-যুদ্ধেই কাবুলে প্রত্যাগমন করিলেন।

পেশওরের চতুর্পাশ্বস্থ পার্ব্বত্য জাতিরা, আকবরের রাজ্যে অনবরত উপদ্রব করিত। তাহারা দুরারূহ গিরিনিচয়ে বাস করিত এবং সময়ে সময়ে নিম্নদেশ-বাসীদিগকে লুটপাট করিত। অতএব আকবর তাঁহার প্রিয়সখা বীরবলকে কাবুলে পাঠাইয়া দিলেন। তত্রত্যবাসীগণ প্রতারণা পূর্ব্বক একটী গিরিসঙ্কটে লইয়া গিয়া সসৈন্যে তাঁহাকে নিধন করে। চল্লিশ সহস্র অশ্বারোহী ও পদাতি-কের মধ্যে একটীও জীবিত ছিল না। ইংরেজদিগেরও একবার এইরূপ দুর্দ্দশা হইয়াছিল। আকবর কাবুল জয় করিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইলেন। তিনি মান-সিংহকে এই কার্য্যের জন্য মনোনীত করিলেন কিন্তু ধর্ম্মভীরু মানসিংহ “আটক” নদী পার হওয়া শাস্ত্রনিষিদ্ধ বলিয়া আপত্তি করিলেন। উদার-চেতা আকবর তাঁহাকে নিম্নলিখিত “দোঁহা” বা শ্লোক রচনা করিয়া প্রেরণ করিলেন—

“সবহী ভূমি গোপালকী,
যাঁমে অটক কহা।
যাকে মন মেঁ অটক হৈ,
সোহী অটক রহা॥”

“সব দেশ গোপালজীর,
আটক যাতে বলো।
যার মনেতে আটক আছে,
আটক সে র’লো॥”

অতঃপর মানসিংহ অত্যন্ত লজ্জিত হইয়া কাবুল যাত্রা করিতে কিছুমাত্র সঙ্কুচিত হইলেন না। তিনি কাশী কাঞ্চী তীর্থ যাত্রার ন্যায় নিঃশঙ্কচিত্তে কাবুল যাত্রা করিলেন। আকবর ভগবদ্ দাসের সহিত পঞ্জাবে তাঁহার প্রত্যাগমন অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। মানসিংহ অসাধারণ বীরত্ব বলে বিজয়ী হইলেন।

“রাজা মানসিংহ জিতে।
খোতেন ফৌজ ডুবাহী॥”

এই রঘুবংশধর বীর তাঁহার পূর্ব্বপুরুষের ন্যায় অসংখ্য মুসলমান সৈন্য ধরাশায়ী করিলেন—

"শত শত শ্মশ্রুযুক্ত যবনের শির
ভল্লে কেটে মানসিংহ * পাড়িলা ধরায় ;
নীল অলি পরিবৃত মধুচক্রপ্রায়,
শোভে তাহা রণস্থলে দেখিতে রুচির।
অবশেষে ম্লেচ্ছগণ তাঁহার চরণে
নামাইয়া শিরস্ত্রাণ লইল শরণ ;
বিনা প্রণিপাতে কিম্বা নম্রতাচরণে
মহৎজনের কোপ না হয় বারণ।
বিছায়ে অজিনাসন দ্রাক্ষালতাবনে
বিশ্রাম লভিল এবে মানসৈন্যগণ,
দূর করি রণশ্রম মধুরস পানে
বিজয় উল্লাসে মত্ত আনন্দে মগন।"

যুবরাজ মানসিংহের পুত্র কুমার জগৎ সিংহ কাবুলের সুবাদার নিযুক্ত হইয়াছিলেন। কথিত আছে অদ্যাপিও কাবুলী রমণীরা "মান্নু আতা" এই বলিয়া সন্তানদিগকে ভয় প্রদর্শন করে।

শ্রীনগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়।

---

* রঘুবংশ ৪। ৬৩—৬৫ 'রঘু'র স্থলে 'মানসিংহ' সন্নিবেশিত হইল।

গুরুনানকের ব্যবসায়বুদ্ধি।

গুরুনানক যখন প্রথম যৌবনে পদার্পণ করিলেন, তখন তাঁহার লোকের সঙ্গে
মেশামেশি বড় ভাল লাগিত না—কাহারও সঙ্গে কথালাপ করিতেন না, হয়ত বা
চুপ করিয়া একাকী এক গৃহকোণে বসিয় আপনার ভাবে আপনি মগ্ন থাকি-
তেন। আত্মীয়স্বজনেরা তাঁহাকে বু াইয়া কিছুতেই পারে নাই—হার
মানিয়াছিল। লোকে বলিতে লাগিল "ন ানক পাগল হইয়া গেছে।" নানকের
মাতা আসিয়া তাঁহাকে বলিতে লাগিলেন "দেখ তোমার এরূপ একলা একলা
বসিয়া থাকা উচিত নয়। এখন যৌবন বয়স, তোমার উপার্জ্জনের চেষ্টা করা
দরকার; নিজে উপার্জ্জন করিতে পারিলে তোমার সুখ্যাত বাড়িবে। তোমার
এরকম ভাব ছাড়। লোকে আমাকে বলে 'কালুর পুত্র নানক নিষ্কর্ম্মা।'
জ্ঞাতিকুটুম্বের এই সব কথা শুনিতে ত ামার বড় খারাপ লাগে"। নানকের
মাতার এই সকল মর্ম্মস্পর্শী কথা শুনি লও নানকের মনে তাহা বিশেষ কিছু
আঘাত করিল না। তিনি সেই রক ম ভাবেই একাকী পড়িয়া থাকেন।
লোকেরা তাঁহাকে কত বুঝাইতে লাগিল কিন্তু সকলেই নিরস্ত হইল। তাঁহার
খাওয়া দাওয়া নাই—কি যে ভাবেন, ি যে চিন্তা করেন, কেহ বলিতে পারে
না। নানকের এইরূপ অবস্থা দর্শনে মর্ম্ াহত হইয়া তাঁহার মাতা কালুর কাছে
গিয়া বলিলেন "দেখ তোমার ছেলে এ কভাবে কতদিন পড়িয়া আছে, খাওয়া
দাওয়া নাই।" তখন নানকের পিতা ক ালু আসিয়া নানককে বুঝাইয়া বলিতে
লাগিলেন—"নানক তুমি কেন রাত দিন এমন ভাবে পড়িয়া থাক? তোমার
কিসের ভাবনা? খাও দাও পর, আ র বেশ খুশীতে থাক। আর তোমার
জমীর কেমন চাষবাস হচ্ছে দেখ ে ান, নিজে রোজগার কর। দেখ,
তোমাকে এই রকম দেখে আত্মীয়স্ব জনেরা আমাকে কত কথাই না বলে।
বলে যে, 'নানকটা আল্‌সে নিষ্কর্ম্মা হয়ে ছে।' আচ্ছা তোমার যদি কোন কিছু
করিতে ভাল না লাগে, করো না, তাহ াই ভাল। কিন্তু তুমি সদাই কি যেন
ভাবনায় ডুবে আছ, রাতদিন কি যেন ভাবছ। কিছু নিজে রোজগার করা

ভাল কথা। যে সকল ক্ষত্রিয়ের পয়সা আছে, যাহারা ধনী, তাহারা কি রোজগার ছেড়ে দিয়ে নিষ্কর্ম্মা বসে থাকে? দেখ কীর্ত্তি বিনা জীবন নিষ্ফল, কিছু নয়। আমাদের ক্ষেত্র পরিপক্ক ফসলে ছেয়ে গেছে, তুমি যদি জমী দেখিতে আরম্ভ কর, তাহলে ক্ষেত্র নষ্ট হয় না, রক্ষা পায় আর তাহ'লে জ্ঞাতগোষ্ঠীর সকলে বলবে, যে, 'বাঃ বাঃ কালুর পুত্র বেশ কাজের।' দেখ কথাইত আছে "ক্ষেতী খৎমা ক্ষেতী"—যে ক্ষেতে ক্ষেত্রপতি নিজে গিয়া দেখে সেই ক্ষেতেই ভাল ফসল হয়।" নানক তাঁহার পিতা কালুর এই সকল কথা শুনিয়া বলিলেন, "পিতা আমি আলাদা নিজে ক্ষেত করেছি, তাতেই লাঙ্গল দিয়েছি, আর আমার জমী বেশ হয়েছে। আর ঐ জমীতে প্রচুর ফসল হয়েছে। আমি ঐ জমী বেশ ভাল করেই দেখছি। তবে অন্য ক্ষেতের খবর আমি রাখিনে।" নানকের এই কথা শুনিয়া কালু কিছুক্ষণ স্তব্ধ হইয়া রহিলেন, লোকদের দেখাইয়া বলিতে লাগিলেন, "দেখ এ কি পাগলের মত বলে।" নানককে বলিলেন "তুমি আলাদা ক্ষেত আবার কবে থেকে করলে? আচ্ছা এবারে এখন আমাদের জমীর ফসল সব পেকে গেছে; তোমার যদি তাই ইচ্ছে হয়, ত, আসছে বার থেকে আমি তোমার আলাদা ক্ষেতই করে দেব, দেখব তুমি কেমন সে জমী ভাল করে কর!" গুরুনানক পিতাকে ফের বলিলেন, "পিতা! আমি এখনই নূতন ক্ষেত করেছি; আমার ক্ষেত ফসলে ভরে গেছে।" কালু তাঁহার কথার গভীর অর্থ না বুঝিয়া বলিলেন, "কৈ আমি ত তোমার এ ক্ষেত দেখি নাই।" তাহাতে নানক বলিলেন "আমি যে ক্ষেত করেছি তাহা তুমি দেখতেই পাবে।" এই বলিয়া তিনি এক পদ উচ্চারণ করিলেন—

মন্ হালী কিরসাণী করণী
সরম্ পাণী তন্‌ক্ষেৎ।
নামবীজ সন্তোখ্ সোহাগা
রখ্ গরীবী বেস্।
ভাও করম কর্ জম্মসী
সে ঘর ভাগঠ দেখ্।
বাবা মায়া সাথ্ ন হোয়্

ইন্ মায়া জগ মোহেয়া বির্‌লা বুঝে কোয়॥

কালু ইহার অর্থ জিজ্ঞাসা করিলে, গুরুনানক তাঁহার পিতাকে ঐ পদের অর্থ বুঝাইয়া বলিলেন "এই যে আমার মনকে সৎসঙ্গে নিযুক্ত করিয়াছি, ইহাই আমার ক্ষেত্রে লাঙ্গল দেওয়া হইয়াছে। শরীররূপ ক্ষেত্রে শুভকর্ম্মরূপ চাষ করিয়াছি। শ্রমসাধন আমার ক্ষেত্রে জলসেক এবং পরমেশ্বরের নামজপ আমার ক্ষেত্রে বীজবপন। সন্তোষ অবলম্বনই ক্ষেত্রে সোহাগা * হইয়াছে। ঈশ্বরে ও তাঁহার প্রিয় কর্ম্মে যে প্রীতি তাহাই বীজের অঙ্কুরস্বরূপ। সেই ভাগ্যবান যে এমন ক্ষেত্রের শস্য গৃহে আনিতে পারিয়াছে। আর অন্য যে সকল ক্ষেত্ররচনা ও সকল নশ্বর, সঙ্গে যাইবে না, উহা পরমেশ্বরের কাছ হইতে ভুলাইয়া আমাদিগকে দূরে লইয়া যায়।" গুরুনানকোচ্চারিত পৌড়ীর সুগভীর অর্থের প্রতি কালু মনোযোগ দিলেন না। তিনি এ সকল বালকের প্রলাপ ভাবিয়া নানকের চিত্তকে অন্য বিষয়ে আকৃষ্ট করিবার চেষ্টা করিলেন। কালু বলিলেন—"বৎস! তুমি যদি ক্ষেত না করিতে চাও ত ব্যাপার কর, দোকান কর। আমাদের ক্ষত্রিয়েরা না হয় ক্ষেত করে, না হয় বাণিজ্য ব্যবসায় করে।" যে নানক পরমেশ্বরের নামজপরূপ বীজবপনের জন্য ক্ষেত্র কর্ষণ করিয়াছেন, তিনি যে সহজ ব্যাপারী তাহা কালু বুঝিতে পারেন নাই। নানক যে মহা-ব্যবসায় কার্য্যে মনপ্রাণ নিয়োগ করিয়াছেন গুরুনানক তাঁহার পিতাকে তাহাও বলিলেন—

হাণ হট্ট কর্ আর্‌জা
সচ্ নাম কর্ বথ্।
সুরৎ সোচ্ কর্ ভাণ্ডসাল্
তিস্ বিচ্ তিসনো রখ্।
বণজারিয়া সেও বণজ্ কর্
লেয় লাহা মন্ হস্॥

"হে পিতা আমি দোকানও খুলিয়াছি। মনুষ্যের দেহের যে আয়ু তাহারি

* ক্ষেত্র কর্ষণের পর যে উঁছনীচু মাটী সমান করিয়া দেওয়া হয় তাহাকেই 'সোহাগা' বলে।

দোকান খুলিয়া ব্যবসায় চালাইতেছি। বুদ্ধিবৃত্তিকে পাপ হইতে শুদ্ধ করিয়া উহারই ভাণ্ডসমূহ দোকানে রাখিয়াছি। আর পরমেশ্বরের নামরূপ দ্রব্য-সামগ্রী সেই সকল ভাণ্ডে স্থাপন করিয়াছি। সাধু সজ্জনরূপ ব্যবসায়ীদিগের সঙ্গে কারবার করিয়া আনন্দচিত্তে অনেক জ্ঞান উপার্জ্জন করিয়াছি।"

ইহার পরে কালু বুঝিলেন যে তাঁহার পুত্রের না ক্ষেত্রকর্ষণে মন আছে না বাণিজ্য ব্যবসায়ে মন আছে। তিনি মনে করিলেন যে, হয়ত একস্থানে থাকিয়া কার্য্য করা নানকের মনের ইচ্ছা নয়। তাহাই ভাবিয়া কালু বলিলেন —"যদি তোমার দোকান করিতেও না ভাল লাগে, আর দেশবিদেশ ঘুরিয়া ফিরিয়া বেড়াইতে ভাল লাগে, তাহা হইলে ঘোঁড়ার ব্যবসায় কর।" গুরুনানক তাহাতেও পশ্চাৎপদ নহেন; নানক তাঁহার পিতাকে বলিলেন—"আমি ঘোড়ার ব্যবসায়ও আরম্ভ করিয়াছি"—

সুণ সাস্তর সওদাগরী
সৎ ঘোড়ে লে চল্
খর্স্ বন্ চংগআইয়াঁ
মৎ মন জাণহ্ কল্।
নিরংকারকে দেস জায়
তাঁ সুখ লহয়্ মহল্॥

"সৎশাস্ত্র শ্রবণ ও তাহার ধারণাপূর্ব্বক সত্যরূপ ঘোটকেরই আমি ব্যবসায় করিতেছি। অসৎ কর্ম্ম ত্যাগ ও সৎকর্ম্ম গ্রহণের যে শুভবুদ্ধি তাহাই খরচের জন্য লইয়াছি। মন নিশ্চয়রূপে পরমাত্মাকে জানিয়াছে। এই ব্যবসায় উপলক্ষে নিরংকারের দেশে গিয়া প্রচুর আনন্দ লাভ করিয়া আসিয়াছি।" এই আত্মাপরমাত্মার মহা-কারবারের কথা বিষয়ী কালু কিন্তু বুঝিলেন না। তিনি মনে স্থির ভাবিলেন যে নানক মহা আলস্যপরবশ—কাজকর্ম্মের উৎসাহ তাঁহার প্রাণে বিন্দুমাত্র নাই। তখন তিনি বলিলেন "আচ্ছা তাই ভাল, তোমার কাজকর্ম্ম কিছু করিতে হবে না, এখন ঘরে চল, খাও দাও। তুমি যে উপার্জ্জন করিবে সে আশা আমি ছাড়িয়া দিয়াছি। তোমাকে এমন উদাসী দেখে জ্ঞাতিকুটুম্বেরা সকলেই বলিতেছে 'কালুর পুত্র অকর্ম্মা'। আর যদি তুমি উদাসী হয়ে চলে যাও, ত, সকলেই বলিবে যে, কালুর ছেলেটা নিষ্কর্ম্মা ছিল

ফকির হয়ে বেরিয়ে গেছে— একথা শুনতে আমার বড় খারাপ লাগবে—এতে আমার নাম খারাপ হবে। নেহাৎ তুমি যদি কোন কাজকর্ম্ম নিজে নাই করিতে পার ত কোন কাহারও চাকরীই না হয় কর।" ইহারই পরে এই চাকরীর উপলক্ষ করিয়াই নানক এক সুন্দর পদ উচ্চারণ করিলেন—

"লায় চিত্ত কর্ চাকরী
অন্ন নাম্ কর্ কম্।
বন্ন বদীয়াঁ কর্ ধাবণী
তাকো আখে ধন্ন।
নানক বেখে নদর্ কর্
চড়ে চওগুণ বন্ন।

"পিতা! আমি চাকরীও করিতেছি। পরমেশ্বরে যে আত্মসমর্পণ আমি সেই চাকরীই করিতেছি। পরমেশ্বরের নাম মনন ইহাই আমার কার্য্য। অসৎ বিষয় হইতে মনকে সংযত করা ইহাতেই আমাকে সর্ব্বদা চলাফেরা করিতে হয়। আমার এই কার্য্যে নিপুণতা দেখিয়া সকলে ধন্য ধন্য করে। যদি প্রভু ঈশ্বর প্রীতিপূর্ব্বক আমার প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন ত আমার প্রেমানন্দ চতুর্গুণ বাড়িয়া যায়।" কালু এইবার নিরস্ত হইলেন। প্রত্যেকবারে তাহার ঐ সকল কথার এমন সুস্পষ্ট উত্তর শুনিয়া কালু আর কথাটী না বলিয়া চলিয়া গেলেন। গুরুনানক পরমেশ্বরে মগ্ন হইয়া পূর্ব্বের মত সেই সমাধি অবস্থায় পড়িয়া রহিলেন।

শ্রীঋতেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

ভিনিস ভ্রমণ।

২

প্রত্যুষে উঠিয়াই হাত মুখ ধুইয়া লইলাম এবং প্রাতরাশের অপেক্ষায় রহিলাম। আমাদের দেশে ইচ্ছামত সময়ে ভোজনাদি করা যাইতে পারে, কিন্তু পাশ্চাত্যদেশে সব বিষয়ই একটী বাঁধাবাঁধি নিয়মের দ্বারা আবদ্ধ। খাইবার, বেড়াইবার, বিশ্রাম করিবার, খেলিবার প্রভৃতি যাবতীয় দৈনন্দিন কার্য্যসমূহের নির্দ্ধারিত সময় আছে, আর সেই সেই কার্য্যগুলি ঠিক সেই সেই সময়ের মধ্যে করিতেই হইবে। না বলিবার যো নাই। একেবারে একেলা থাকিতে পারিলে অনেকটা স্বেচ্ছামত নিয়ম বা অনিয়মের বশবর্ত্তী হইয়া চলিতে পারা যায় কিন্তু যেখানে পাঁচজনের সহিত বসবাস করিতে হইবে সেখানে নিয়ম ভঙ্গ করা বড়ই সুকঠিন। দেখিতে পাইতেছি ভোর হইয়াছে, সূর্য্যের স্নিগ্ধ উজ্জ্বল রশ্মি বাতায়ন ভেদ করিয়া শয়নকুটীর আলাকিত করিতেছে, ক্ষণে ক্ষণে মনুষ্যপদশব্দ শ্রুতিগোচর হইতেছে, আর আমিও শয্যার উপর এপাশ ওপাশ ফিরিয়া মুহুর্মুহু আমার ঘড়ীর কাঁটা নিরীক্ষণ করিতেছি—কখন্ ৮টা বাজে, কেননা ৮টা না বাজিলে ভদ্রলোকের উঠিবার নিয়ম নাই। উঠিয়াই শীঘ্র শীঘ্র প্রাতঃকৃত্য সমাপন করিলাম ও যথাসময়ে প্রাতরাশ (ব্রেক্‌ফাষ্ট) করিয়াই আনন্দোল্লাসে সমীপবর্ত্তী সমুদ্রোপকূলে ছুটিলাম। গতমাসের 'পুণ্যে' ভিনিসের যে ছবি দেওয়া গিয়াছিল সে দৃশ্যটী একেবারে সমুদ্রকূলস্থিত ভিনিসের প্রধান হর্ম্ম্যাবলীর। সম্মুখের কারুকার্য্যসমন্বিত বৃহৎ প্রাসাদটী ভিনিসের প্রাচীন রাজপ্রাসাদ। এইস্থানেই ভিনিসরাজগণ, ডোজেরা (Doges) বাস করিতেন, এই নিমিত্ত ইহার নাম ডোজের প্রাসাদ। বামে ভিনিসের প্রধান Square বা মুক্তপ্রাঙ্গন। ইহার ইটালিয়েন নাম—"পিয়াজ্জা সান্ মার্কো", অর্থাৎ সেণ্ট মার্কোর স্কয়ার। এই স্থানটী এত মনোহর যে ইহার মত এমন সুন্দর দৃশ্য সমগ্র ইউরোপের মধ্যে আছে কিনা সন্দেহ। আমি প্রথমদিবস সমগ্র ভিনিস দেখিবার নিমিত্ত কুতূহলী হইয়া বিশেষ বিশেষ স্থান সূক্ষ্মভাবে না দেখিয়া

পদযুগলকে একেবারে ছাড়িয়া দিলাম। যেখানে যত ক্ষুদ্র গলি হউক না কেন সেইখান দিয়াই চলিতে লাগিলাম। কত পুল কত খাল পার হইলাম, কিন্তু কোথায় যে যাইতেছি তাহার ঠিকানা নাই। আমি জানি যে সমুদ্র পরিবেষ্টিত ক্ষুদ্র সহর মধ্যে আমার হারাইবার ভয় নাই, যাইতে যাইতে নিশ্চয়ই সমুদ্রকূলে আসিয়া পড়িতেই হইবে। এবং সমুদ্রকূলে আসিলেই সহজেই গন্তব্যস্থানে যাইতে পারিব? মাঝে মাঝে দেখিতে পাই ভিনিসিয়ান জলশকট —যাহা 'গণ্ডোলা' (Gondola) নামে অভিহিত, ইতস্ততঃ দ্রুতগতিতে চলিতেছে। আমি অনায়াসেই এই গণ্ডোলার সাহায্যে যথাইচ্ছা তথা যাইতে পারিতাম, কিন্তু এই গণ্ডোলাগুলি অতি ক্ষুদ্র খালের মধ্যে প্রায়ই যায় না। তাহা ছাড়া আমার ইচ্ছা জগদ্বিখ্যাত ভিনিস সহরের ভিতর বাহির দুইই দেখিব। বাহ্যিক দৃশ্যের ত কথাই নাই, ভিনিসে প্রবেশমাত্র তাহার যথেষ্টই নয়নগোচর হয়। ভিনিসের বাহ্যিক দৃশ্যটী বাস্তবিকই এত সুন্দর যে ইহাকে একটী অমরাপুরী বলিলেও অত্যুক্তি হয় না—যেন কোন সুনিপুণ চিত্রকরের একটী আদর্শ চিত্র পৃথিবীর আমোদ ও তৃপ্তির জন্য কোন প্রদর্শনী মধ্যে প্রদর্শিত হইতেছে। যতই দেখা যাউক না কেন যেন আমাদের কৌতূহল চরিতার্থ কিছুতেই হয় না। যাহা হৌক ভিনিসে পদার্পণ করিয়াই ত ইহার সৌন্দর্য্যে কিছু মুগ্ধ হইতে হইয়াছিল, কিন্তু যখন প্রাতঃকালীন নীল নভোমণ্ডলে প্রদীপ্ত সূর্য্যের হৃদয়গ্রাহী কিরণজাল ছাইয়া ফেলিল তখন এড্রিয়াটিক মহিষীর (The Queen of the Adriatic) রূপলাবণ্যের এক অপূর্ব্ব বিকাশ দৃষ্ট হইল—সেই সৌন্দর্য্যের সেই মাধুর্য্যের এমন অনির্ব্বচনীয় মুগ্ধকর শক্তি যে একেবারেই মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত নিস্পন্দভাবে আত্মহারা হইয়া রহিলাম, এবং আত্মহারা হইয়াই তাহার বক্ষের মধ্যে বিচরণ করিতে লাগিলাম। যতটা পারিলাম ঘুরিলাম। যদিও ভিনিসের প্রধান রাস্তাগুলি খালবিশেষ, তথাপি পদব্রজে যাইবার নিমিত্ত সরু সরু বিস্তর রাস্তা আছে। যেখান দিয়া যাই, দেখি স্থানগুলি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, এক একটী স্থান অতিশয় নির্জ্জন। মধ্যে মধ্যে অনেক ছোট বড় স্কয়ার (square) অর্থাৎ মুক্ত প্রাঙ্গন দেখিতে পাইলাম। কিন্তু সহরের মধ্যে দোকান বাজার বিশেষ কিছু নাই। সব প্রধান প্রধান স্থানে আছে। ক্ষুদ্র সহর, অনায়াসেই বাজার হাট করা যায়। আমার ঘুরিয়া আসিতে তিন চারি

ঘণ্টা লাগিল। তথাপি আমি ভিনিসের একদিকেই ঘুরিয়াছিলাম, আমার সহিত সহরের একটী ম্যাপ ও Guide Book ছিল কিন্তু বিচরণ কালে তাহা দেখিবার আবশ্যক হয় নাই। কেননা আমার উদ্দেশ্য ছিল না কোন নির্দ্দিষ্ট স্থানে যাইব। যাহা দেখিলাম তাহাতে মনে হইল ভিনিসবাসীরা নির্জ্জনতা খুব ভালবাসে। সহরের অভ্যন্তরে যত ঘর বাড়ী আছে তাহার মধ্যে যেন এক চিরশান্তি বিরাজ করিতেছে। অশ্বের পদশব্দ নাই, গাড়ীর ঘড় ঘড় শব্দ নাই, গাভীর হাম্বারব নাই, ছাগের করুণ উচ্চনিনাদ নাই, এমন কি খেচরদের মৃদুকণ্ঠেরও চিহ্নমাত্র নাই। জগৎ যেন সুষুপ্ত অবস্থায় নিমগ্ন আছে! কিন্তু বাস্তবিক ভিনিস যে কোন কালে সুষুপ্ত ছিল না তাহার ভূরি ভূরি পরিচয় ভিনিসইতিহাস পাঠে জানা যায়। বরং অন্যান্য জাতিরা সহস্রাধিককালাবধি ভিনিসবাসীদের তুলনায় নির্জীব ও সুষুপ্ত ছিল বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। একা এই দ্বীপবাসীরাই এতাবৎকাল সমগ্র জগতকে বাণিজ্যসূত্রে বন্ধন করিয়া তাহার উপর গৌরবের সহিত আধিপত্য করিয়া আসিয়াছে। এক্ষণে বোধ হয় প্রভূত যশ ও অর্থোপার্জ্জন করিয়া তাহাদিগের সেই কার্য্য-জীবনের অবসর কাল যেন নির্জ্জনে উপভোগ করিতেছে। তখন তাহারা স্বাধীন ছিল, এখন তাহারা পরাধীন। স্বাধীনতার মধ্যে যেমন কার্য্য আছে, তেমনি অধীনতার মধ্যে অবসর আছে। স্বাধীন মনুষ্য যেমন নিজোন্নতির জন্য কায়মনোবাক্যে চেষ্টা করে, পরাধীন মনুষ্যের সে বিষয়ে ততটা আগ্রহ থাকে না, কেননা পরের ইচ্ছায় কার্য্য করিতে গেলে, পদে পদে সেই ইচ্ছানুরূপ কার্য্য না হইলে তিরস্কৃত, অপমানিত ও লাঞ্ছিত হইতে হইবে। সুতরাং কার্য্যজগতে স্বাধীন মনুষ্যের যেমন একটি উদ্দাম কার্য্যতৎপরতা দেখিতে পাওয়া যায়, প্রত্যেক কার্য্যে সমস্ত বিদ্যা, বুদ্ধি ও কায়িক ও মানসিক বল অকুণ্ঠিতভাবে ঢালিয়া দিতে পারে, তেমনি যাহারা পরাধীনতার শৃঙ্খলে বদ্ধ তাহারা তাহার গুরুভারে ক্লান্ত—তাহাদের বিদ্যা বুদ্ধির পরিচালনার দ্বার অপ্রশস্ত এবং তাহাদের মনে যেন সর্ব্বদাই একটা অনিশ্চিত বিপদাশঙ্কা ও অবমাননার ভাব জাগ্রত রহিয়াছে। নির্জ্জনবাসই তাহাদের ভাল লাগে এবং গৃহের স্বাধীনতাসুখই তাহাদের জীবনের একমাত্র সুখ। সহস্রাধিক বৎসরের স্বাধীনতারত্ন হইতে বঞ্চিত হইয়া ভিনিসবাসীরা আজ যেন রাজ্যভার

চিন্তা হইতে অবসর গ্রহণ করতঃ পারিবারিক ও নির্জ্জনতার শান্তির মধ্যে সুখে নিদ্রা যাইতেছে।

ভিনিস সহরের পরিধি সাত মাইল হইবে। ইহার বক্ষ ভেদ করিয়া সহরের প্রধান খাল—Grand Canal—ইহাকে দ্বিখণ্ডিত করিয়াছে। সহরটী তিনটী প্রধান দ্বীপ ও একশত চৌদ্দটী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দ্বীপের উপর প্রতিষ্ঠিত। ইহার মধ্যে প্রায় দেড়শত খাল আছে এবং প্রায় চারিশত পুল এই খালগুলির উপর দিয়া চলিয়াছে। ইহাতেই বুঝিতে পারা যাইতেছে সহরের মধ্যে গমনাগমনের জন্য কিছুমাত্র অসুবিধা নাই। ভিনিসের চারিপার্শ্বের সমুদ্রজল সামান্য গভীর। এই নিমিত্ত ভিনিসের বন্দরে জাহাজের বড় একটা সমাগম নাই। জাহাজ যে একেবারে আসিতে পারে না তাহা নয়, জাহাজ আসিবার কেবল দুইটী অপ্রশস্ত রাস্তা আছে, তাহার মধ্য দিয়া অতি সাবধানে জাহাজ চালাইতে হয়, কেবল সেইখানকার জলই কিছু বেশী গভীর। বস্তুতঃ পি এণ্ড ও কোম্পানীর জাহাজ সেখান হইতে নিয়মিত ভাবে যাওয়া আসা করিয়া থাকে।

ভিনিস সহর যেরূপ ভাবে স্থিত তাহা বাস্তবিকই বিপজ্জনক, অন্ততঃ এক কালে ভিনিসবাসীরা আশঙ্কা করিয়াছিল যে ইহা অচিরে সমুদ্রের জলরাশির ঘাতপ্রতিঘাতে চূর্ণবিচূর্ণ হইয়া যাইবে এবং ইহার কোন চিহ্নমাত্রও থাকিবে না। কিন্তু বিজ্ঞানের বলে সমুদ্রকে পরাস্ত হইতে হইয়াছে। ভিনিসবাসীরা বিপুল উদ্যম ও অপর্য্যাপ্ত অধ্যবসায়ের সহিত এড্রিয়াটিক মহিষীকে সমুদ্রের উপর্য্যুপরি আক্রমণ হইতে রক্ষা করিতে চেষ্টা করিতে লাগিল এবং অবশেষে প্রস্তর নির্ম্মিত সুবৃহৎ প্রাচীর নির্ম্মাণ করিয়া মহিষীকে চিরকালের নিমিত্ত এড্রিয়াটিক সাগরের উন্মত্ত আলিঙ্গন হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া লইল। এই মহৎ কার্য্যটীতে এত বুদ্ধি কৌশল, এত পরিশ্রম ও এত অর্থ ব্যয় হইয়াছে যে ইহা ভিনিসবাসীদিগের একটী বিশেষ জাতীয় গৌরবের বিষয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

এককালে পৃথিবীর বিদ্যাবুদ্ধির আলোচনার ইহাই একটী কেন্দ্রস্থল ছিল। বহুবিধ প্রতিভাশালী ব্যক্তির ইহাই প্রধান লীলাভূমি ছিল। এই দ্বীপপুঞ্জেই স্বভাবের কত নিগূঢ় তত্ত্বের প্রথম আবিষ্কার হয়। এইখানেই তিনশত বৎসর পূর্ব্বে বিখ্যাত বিজ্ঞানবিদ্ পণ্ডিত, গ্যালিলিও, প্রথম দূরবীক্ষণ যন্ত্র আবিষ্কার করেন। সেই যন্ত্রের সাহায্যে ভিনিসের সেণ্টমার্ক নামক টাওয়ারের অত্যুচ্চ

শৃঙ্গের উপর হইতে আকাশের গ্রহনক্ষত্র সকলকে বিশেষরূপে পর্য্যবেক্ষণ করিয়া যন্ত্রটী ভিনিসরাজকে প্রদান করেন। এইখানেই ধর্ম্ম-প্রবীণ লয়োলা (Loyola) Order of Jesus নামক একটী ধর্ম্মসম্প্রদায়ের প্রথম স্থাপনা করেন। এই-খানেই ভিট্টোরিয়া, কানোভা, সানসোভিনো, পাল্লাদিও, টাসো, মার্কো পোলো প্রভৃতি স্বনামখ্যাত মনীষীগণের জন্মভূমি। এইখানেই সমগ্র ইটালীর প্রথম পুস্তক মুদ্রাযন্ত্রে মুদ্রিত হয়। খৃষ্টধর্ম্মের প্রধান গ্রন্থ বাইবেল ও লাটিন ও গ্রিক্ ভাষায় লিখিত প্রাচীন গ্রন্থাবলীর প্রথম সংস্করণ এই ভিনিস সহরেই মুদ্রিত হয়। এইখানেই সপ্তদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে সংবাদপত্রের প্রথম সৃষ্টি হয়। ইহার মূল্য এক গাজেট্টা হওয়াতে গেজেটের নামকরণ হইল। ইহা কম আশ্চর্য্যের বিষয় নয় যে, যে দেশের নৃপতি অসীম ক্ষমতাশালী ছিলেন ও রাজ্যে একাধিপত্য করিতেন সেই দেশই স্বাধীনতার জন্মভূমি। সেই সময়ে আর কোন দেশে সংবাদপত্র প্রচার করা একেবারে অসম্ভব ছিল। শুধু তাহাই নয়, সাধারণের টাকাকড়ি একস্থানে গচ্ছিত রাখিবার ও ধার দিবার বন্দোবস্ত ভিনিসেই প্রথম আরম্ভ হয়। কথিত আছে কামানের সৃষ্টি এইখানেই প্রথম হয়।

বোধ হয় সমগ্র পৃথিবী মধ্যে এমন কোন স্থান নাই যেখানে ভিনিসের ন্যায় এত অধিক প্রাচীন ঐতিহাসিক স্মরণচিহ্নের সমাবেশ আছে। ইহার ইতিহাস, ইহার কবরস্থান, ইহার ধর্ম্মমন্দির, ইহার মিউজিওম, ইহার নাট্য-শালা, ইহার সাধারণ হর্ম্ম্যাবলী ও বিখ্যাত প্রাসাদসমূহে জ্বলন্ত অক্ষরে লিখিত আছে। বাস্তবিকই ভিনিস সহরে যাইলে এগুলি না দেখিয়া চলিয়া যাওয়া অসম্ভব। আমি ত যতটা পারিলাম দেখিলাম, এবং যাহা দেখিলাম তাহাতেই ভিনিসের মহত্ত্বের যথেষ্ট পরিচয় পাইলাম। দুর্ভাগ্যবশতঃ বেশীদিন সেখানে থাকিতে পারিলাম না, কেননা যে জাহাজে যাইব তাহার যাত্রার নির্দ্ধারিত দিন আসিল, সুতরাং অনেকগুলি দেখিবার উপযুক্ত জিনিষ ছাড়িয়া দিতে হইল। যাহা দেখিলাম তাহা নিম্নে বিবৃত হইল। এখানকার চিত্রশিল্পাগারে বহু প্রকারের বিখ্যাত ও মূল্যবান অয়েলপেণ্টিং আছে—সেগুলি প্রায় চারি পাঁচ শতাব্দী কাল গত হইল বিখ্যাত বিখ্যাত ভিনিসিয়ান চিত্রকর কর্ত্তৃক অঙ্কিত হয়। ইহা দেখিবার নিমিত্ত একটী ফ্রাঙ্ক খরচ করিতে হইল, কিন্তু যাহা

দেখিলাম তাহা বাস্তবিকই অমূল্যরত্ন। ঘরগুলিও চিত্রবিচিত্র ও নানারূপ কারুকার্য্যে সুশোভিত।

ভিনিসের সেণ্টমার্ক নামক স্কয়ারটী সহরের মধ্যে সর্ব্বপ্রধান মুক্তপ্রাঙ্গন। ইহার দৃশ্যটী এমন সুন্দর যে সমগ্র ইউরোপ মধ্যে ইহার সমতুল্য আর কোন স্থান আছে কিনা সন্দেহ। পার্শ্বেই এড্রিয়াটিক্ সমুদ্রের নীল সলিল সুদূর নভো-মণ্ডলে বিলীন হইয়া গিয়াছে এবং সম্মুখেই পি এণ্ড কোম্পানীর বৃহৎ জাহাজ তাহার বক্ষ সুশোভিত করিতেছে। প্রত্যেক দিবস সান্ধ্যসমীরণে ভিনিসের উচ্চ ও নিম্নপদস্থ যাবতীয় নগরবাসীদিগের ইহাই একমাত্র ক্রীড়াভূমি; এই খানেই তাহাদের ধর্ম্ম, সমাজ বা রাজ্যতন্ত্র প্রভৃতি সকলবিষয়েরই সাধারণ সমক্ষে আলোচনা হয়; পৃথিবীতে এমন কোন দ্বিতীয় স্থান আছে কিনা সন্দেহ যেখানে প্রত্যেক দিবস সমগ্র নগরবাসীদিগের একত্র সমাবেশ হইয়া থাকে। গ্রীষ্মঋতুতে দেখিতে পাওয়া যায় শত সহস্র ব্যক্তি উত্তমরূপে বেশ ভূষা করিয়া এই স্কয়ারের বিস্তৃত প্রাঙ্গনে রাত্রে আট ঘটিকার সময় ছোট ছোট টেবিলের পার্শ্বে বসিয়া কফি ও মদ্য পান করিতেছে, কিন্তু শীতকালে দেখি উচ্চ সমাজস্থ ব্যক্তিগণ বেলা দুইটার পরই এই মনোরম প্রাঙ্গনে তাঁহাদের সুখাবেশ আরম্ভ করিয়াছেন।

ক্রমশঃ

তানসেন ও স্বরসাধন।

সঙ্গীত শিক্ষা করিতে গেলেই স্বরসাধনের দিকে বিশেষরূপে মনোযোগ দেওয়া কর্ত্তব্য। যেমন বর্ণমালার পরিচয় ও অভ্যাস না হইলে ভাষা আয়ত্ত করা যায় না, সেইরূপ সুরগুলির পরিচয় ও অভ্যাসাদি না হইলে সঙ্গীত আয়ত্ত হওয়া বড়ই দুষ্কর। সর্ব্বাগ্রে সা রে গা মা পা ধা নি এই সপ্তস্বর ও তাহার তীব্র মৃদু সহায়গুলির সাধন না করিলে ভাল সঙ্গীতজ্ঞ হইতে চেষ্টা করা বৃথা। এইগুলির সাধনে যে যত মনোযোগী, সে তত সঙ্গীতযোগে যোগী হইতে পারেন। এ সাধনের মর্য্যাদা ভারতে প্রাচীন কালের লোকেরা রীতিমত বুঝিত; ইদানিন্তন কালের গাহয়েরাও জানেন; ইউরোপও এই স্বরসাধনের অত্যন্ত আদর; সেখানেও সঙ্গীত-অধ্যাপকেরা ছাত্রবর্গকে কি গানে, কি বাদ্যে scale অর্থাৎ সুরগুলির অভ্যাস কার্য্যে বিশেষরূপে প্রবৃত্ত করায়; ইংরাজী বাজনা যাঁহারা পিয়ানো প্রভৃতিতে অভ্যাস করিতে গিয়াছেন, তাঁহারাই জানেন, যে, ইউরোপীয় সঙ্গীতবিৎ পণ্ডিতেরা scale practice অর্থাৎ সুরশ্রেণীর আলোচনা ও অভ্যাসে কিরূপ যত্ন প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন। আমিও দেশীয় ও বিদেশীয় বাদ্য গানাদি অভ্যাস করিবার সময়, নিজে পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছি, যে দেশীয় ও বিদেশীয় গান বাজনার যত scale practise করা যায়, তখন গানবাজনায় সুন্দর সক্ষমতা বৃদ্ধি পায়।

সঙ্গীতবিদ্যার এই স্বরসাধনের আবশ্যকতা গীতিকবি তানসেন এপ্রকার অনুভব করিয়াছিলেন যে তজ্জন্য তিনি কোন কষ্টকেই কষ্ট মনে করিতেন না। অকাতরে বনে, জঙ্গলে একেলা নানারূপে সুরসাধনায় ব্রতী থাকিতেন; এই কারণেই তানসেন অতবড় বিখ্যাত গায়কযোগী হইতে সমর্থ হইয়াছিলেন!

তানসেন নানা কৌশলে স্বরসাধন করিতেন। কখনো ভুন্ডুরির পাশে বসিয়া হতাশনের অন্তরের হুহু ধ্বনি—যেন চিরদাবানলের ধ্বনিকে আদর্শ করিয়া সঙ্গীত সাধিতেন, কখনো অরণ্যে শ্বাপদসঙ্কুলের অনুকরণে সুর সাধিতেন,—হরবোলার ন্যায় বিবিধরূপ সুর করিতে অভ্যাস করিতেন, নানারূপে

স্বরসাধন করিতেন। তাই তাঁহার সুরে যেমন বল ছিল, তেমনি তাহাতে বিচিত্রতা ছিল।

স্বরসাধনার দ্বারা তানসেনের আওয়াজের খুব জোর হয়। প্রসিদ্ধ আছে যে তিনি যখন গাহিতেন, তখন তাঁহার এত বলাধিক্য জাগিত, যেন মনে হইত,—তাঁহার তিন দিক হইতে স্বর বহির্গত হইতেছে, বোধ হইত যেন, তিনজনে একসঙ্গে গাহিতে লাগিয়াছে—এপ্রকার তাঁহার সুরে ভীম বল ও বিক্রম ও বিচিত্র মাধুরী ছিল!

নদীতে জলাধিক্য হইলে সেই অতিরিক্ত জল যেমন চারিধার প্লাবিত করিয়া দেয় ও চতুর্দ্দিককার ভূমিসকল আর্দ্র করে, সেইরূপ তিনি গান গাহিতে আরম্ভ করিলে, তাঁহার সুরে এত সুরাধিক্য হইত যে, সেই অতিরিক্ত সুর চারিধারে শ্রোতৃমণ্ডলীকে প্লাবিত করিয়া দিত, শ্রোতৃবর্গ ও চারিদিকের জীবজন্তুগণ যেন গানের বন্যায় মগ্ন হইয়া যাইত এবং কিছুকাল পরে তাহাদেরও মন সঙ্গীতরসে সিঞ্চিত ও আর্দ্র হইয়া উর্ব্বরতা ও সফলতা লাভ করিত।

বাস্তবিক সঙ্গীত আয়ত্ত করিতে চাহিলে, স্বরসাধনে বিশেষরূপে মনোযোগী ও ব্রতী হইতে হইবে। সুর সাধিতে সাধিতে তবে সুর পরিষ্কার হয়—বিমলতা লাভ করে। ভাল গাইয়ে হইতে গেলে সুরের স্বাভাবিক বিশুদ্ধতা আবশ্যক।—ইউরোপীয় সঙ্গীতাধ্যাপক 'জে জুস' সুরসাধন সম্বন্ধে বলেন—"The chief object of the student and his master must be to obtain the natural tone of the voice in its purest state."

"ছাত্র ও অধ্যাপকের উভয়েরই স্বরের স্বাভাবিকভাব ও বিশুদ্ধতার প্রতি মুখ্য লক্ষ্য করা উচিত।"

সুর স্বাভাবিক ও শুদ্ধ হইলে লোকের মনোরঞ্জনকারী হয়; সেই সুর স্বয়ং আপনার মহিমায় বিরাজ করিতে পারে। তখন সেই স্বাভাবিক স্বয়ং বিরাজিত স্বাধীন স্বরের দ্বারা গানও স্বাভাবিক, শুদ্ধ ও নিজমহিমায় বিরাজ করিতে সমর্থ হয়।—অনেক ধ্বনি আমরা শুনিতে পাই বটে, কিন্তু যেগুলি তাহার মধ্যে বিশেষভাবে গানে প্রয়োগ করিয়া লোকের মনোরঞ্জন করি, লোকের মনপ্রাণ স্নিগ্ধ করি, তাহাকে সুর বলি, এই সুরকে সাধিয়া সাধিয়া শুদ্ধ ও মধুর করা চাই।—সঙ্গীতশাস্ত্রে স্বরলক্ষণ উক্ত হইয়াছে:—

"শ্রুত্যনন্তরভাবিত্বং
যস্যানুরণনাত্মকঃ।
স্নিগ্ধশ্চ রঞ্জকশ্চাসৌ
স্বর ইত্যভিধীয়তে॥"

পদান্তরঃ

"শ্রুত্যন্তর ভাষী যঃ
শব্দোনুরণনাত্মকঃ।
মনোরঞ্জয়তি শ্রোতুঃ
শ্চিত্তং স স্বর উচ্যতে॥"

"শ্রুত্যন্তরভাষী—যে শব্দ অনুরণনাত্মক—শ্রোতৃবর্গের চিত্তের রঞ্জনসাধন করে—যাহা স্নিগ্ধ ও রঞ্জক তাহাই স্বর। অথবা

"স্বয়ং যো রাজতে নাদঃ স স্বরঃ পরিকীর্ত্তিতঃ" স্বয়ং যে নাদ বিরাজ করে সেই স্বর বলিয়া পরিকীর্ত্তিত হয়।"

এই স্বর স্বতন্ত্রভাবে স্বাধীনভাবে সাধন করা চাই, তবে সঙ্গীত সহজে আয়ত্ত হয়। তানসেন তাঁহার গানে—গ্রন্থে শত শতবার সুরের বিশুদ্ধতা সম্পাদনের দিকে দৃষ্টি রাখিতে উপদেশ দিয়া গিয়াছেন। তানসেন যোগী-গায়ক ছিলেন তাহাতে তাঁহার তো স্বরসৌষ্ঠবের দিকে বিশেষরূপ যত্ন থাকিবেই। উপনিষদে প্রথম যোগপ্রবৃত্তিতে যে যে বিষয় আবশ্যক হয় তন্মধ্যে স্বরসৌষ্ঠবকেও ধরা হইয়াছে।—

"লঘুত্বমারোগ্য মলোলুপত্বং
বর্ণপ্রসাদাঃ স্বরসৌষ্ঠবঞ্চ।
গন্ধঃ শুভো মূত্রপুরীষমল্পং
যোগপ্রবৃত্তিং প্রথমাং বদন্তি॥"

স্বরসৌষ্ঠবকে যখন যোগপ্রবৃত্তির মধ্যে আর্য্য পণ্ডিতেরা ধরিয়াছেন, তখন ত সঙ্গীতযোগের বেলায় কোন কথাই নাই। এই স্বরসৌষ্ঠব লাভ করিবার জন্য তানসেন কি না শ্রমসাধন করিয়াছিলেন। আমরাও যদি তানসেনের মত সঙ্গীতযোগী হইবার ইচ্ছা করি, তাহা হইলে আমাদেরও স্বরসাধনে ব্রতী হইয়া স্বরসৌষ্ঠব লাভ করা উচিত।

শ্রীহিতেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

স্বর্গীয় মাইকেল মধুসূদন দত্তের অপ্রকাশিত পত্র।*

(২)

৬ নং লোয়ার চিৎপুর রোড,
২৪শে এপ্রিল ৬০।

প্রিয় রাজনারায়ণ,—

আমাদের সুহৃদ রাজেন্দ্রকে তুমি যে দুইখানি পত্র লিখিয়াছ তাহা দেখিয়া আমি নীরব থাকিতে পারিতেছি না। আমাকে প্রোৎসাহিত করায় তুমি আমার আন্তরিক ধন্যবাদের পাত্র। তুমি নিশ্চয়ই ইদানীন্তন স্বদেশের অগ্রণীগণের মধ্যে অন্যতম এবং তোমার অভিমতকে ভবিষ্যতের মতামতের পরিচায়ক বলিয়া ধরা যাইতে পারে। আমি স্পর্দ্ধার সহিত বলিতে পারি তোমার এবং তোমার ন্যায় এই সহরের আরও জনছয় কৃতবিদ্য ব্যক্তির অভিমত যে আমার কবিতার ভবিষ্যৎ ভাগ্য স্থির করিয়া দিবে তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।

তিলোত্তমা শীঘ্রই পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইবে। বোধ হয় তুমি জান না 'তিলোত্তমা চারি অধ্যায়ে সমাপ্ত হইবে। বাবু যতীন্দ্র মোহন ঠাকুর বোধ হয় শেষ অধ্যায়টীকে সর্ব্বোৎকৃষ্ট বলিয়া বিবেচনা করিতেছেন। তিলোত্তমা তাঁহারই ব্যয়ে মুদ্রিত হইতেছে কেননা আমিও চিরপ্রসিদ্ধ সুকবি-গণের ন্যায় কপর্দ্দকহীন। সে যাহা হউক তুমিও শীঘ্রই এবিষয়ে বিচার করিবার সুযোগ পাইবে। পুস্তকখানি শীঘ্রই বাহির হইবে, কিন্তু কথা হই-তেছে কয়জন লোক তাহা পড়িবে। দুঃখের বিষয় তুমি এখন কলিকাতায় নাই। তুমি কলিকাতায় থাকিলে আমি এই পুস্তক সম্বন্ধে বক্তৃতা দিবার জন্য তোমাকে বিরক্ত করিতাম। তাহাতে নিঃসন্দেহ কএকটী পাঠক পাওয়া

* ইংরাজী পত্রের অনুবাদ।

যাইত। আমার ভয় হইতেছে পাছে তুমি আমার লিখিবার ধরণটী অতিশয় জমকাল রকমের মনে কর——যেন আমিও ঐ সকল বহুসংখ্যক গণ্ডমূর্খদিগের মধ্যে একজন যাহাদের পেটে কিছুমাত্র বিদ্যা নাই অথচ আজকালকার সাহিত্যিক উদ্দীপনাবলে পুস্তক লিখিয়া থাকে। আমি যাহা কিছু লিখি তাহা আপনা হইতেই উত্থিত হয়, যেন (বোধ হয় বলিতে পারি) দৈববাণীরূপে ভাবের স্রোতে ভাসিয়া আসে। উচ্চদরের অমিত্রাক্ষর ছন্দ শ্রুতিমধুর হওয়া আবশ্যক। ইংলণ্ডে যে সকল কবি অমিত্রাক্ষর ছন্দে পুস্তক রচনা করিয়াছেন তাঁহাদের মধ্যে প্রাচীন জন্ মিল্টন্‌ই অগ্রগণ্য। তাঁহার রচনা অতিশয় দুরূহ। ভার্জিল ও হোমারও নিতান্ত সহজপাঠ্য নহে। সে যাহা হউক, নূতন কবির প্রথম কবিতার দোষসকল তুমি যে মার্জ্জনা করিবে তাহাতে আমার কোন সন্দেহ নাই। আমি উপহাসচ্ছলে কবিতাটী লিখিতে আরম্ভ করি, কিন্তু এখন দেখিতেছি যে আমি এমন একটী কার্য্য সাধন করিয়াছি যদ্দ্বারা আমাদের জাতীয় পদ্যের বিশেষ উন্নতি লাভ হইতে পারে। অন্ততঃ আমাদের বাঙ্গলা দেশের ভবিষ্যৎ কবিগণ তাহা আদর্শ করিয়া, কৃষ্ণনগরনিবাসী সেই লোকটী যে ভাবে কবিতা লিখিয়াছেন তাহার ঠিক বিপরীত ভাবে লিখিতে শিখিবেন। তিনি একটী অত্যন্ত ঘৃণ্য কবিদলের অগ্রণী, যদিও তিনি নিজে একজন দিব্য প্রতিভাপন্ন ব্যক্তি সন্দেহ নাই।

যদিও আমি একজন সামান্য লেখক, তুমি যে আমার প্রহসনগুলি পাঠ করিয়া আনন্দ লাভ করিয়াছ তাহা মনে করিয়া আমি আপনাকে অতিশয় গৌরবান্বিত মনে করিতেছি। কিন্তু ঠিক সত্য বলিতে গেলে ঐ দুইটী জিনিষ প্রকাশ করিয়াছি বলিয়া আমি দুঃখিত আছি। তুমি জান আমরা অদ্যাবধি একটী জাতীয় রঙ্গালয় স্থাপন করিতে সক্ষম হই নাই, অর্থাৎ আমাদের মধ্যে অদ্যাবধি উৎকৃষ্ট গাম্ভীর্য্যপূর্ণ উচ্চশ্রেণীর নাটক বেশী নাই যাহাতে করিয়া আমাদের জাতীয় রুচি উচ্চমার্গে থাকিতে পারে। সেই জন্য আমি বলিতেছি যে, প্রহসন আমাদের মধ্যে না থাকাই ভাল। আমি জানি না "শর্ম্মিষ্ঠা" দেখিয়াছ কি না। যদি দেখিয়া থাক ত তোমার কেমন লাগিয়াছে বলিতে পারি না। আমার আর একটী নাটক আছে যাহা শীঘ্র এক সখের দলে অভিনয় করিবেন। ইহা উচ্চশ্রেণীর নাট্যকারদিগের গুরুগম্ভীর নাটকের

অনুকরণে রচিত। ইহার ছাপা শেষ হইলেই তোমায় একখানি পুস্তক পাঠাইয়া দিব। ইহার সম্বন্ধে তোমার মতামত নিশ্চয় করিয়া লিখিবে। যদি বাঁচিয়া থাকি তিন চারিটা আরও ঐরূপ নাটক লিখিতে চেষ্টা করিব, কেননা তাহা হইলে আমাদের দেশীয় লোকদের মধ্যে ঐরূপ ধরণের নাটকে একটা রুচি জন্মাইতে পারে। পরে ইতিহাসমূলক ও অন্যান্য বিষয়ের উপরও নাটক লিখিব। আমাদের জাতীয় মহাকাব্য সম্বন্ধে তুমি যে প্রস্তাব করিয়াছ তাহা বাস্তবিকই অতি উত্তম। কিন্তু আমার মনে হয় না যে আমি এখন পর্য্যন্ত পদ্যরচনায় এত অধিক পারদর্শিতা লাভ করিয়াছি যে ঐরূপ রচনায় এখনই হস্তক্ষেপ করিতে পারিব। অতএব তোমাকে এখন কিছুকাল অপেক্ষা করিয়া থাকিতে হইবে। ইত্যবসরে আমি অতি সমারোহে আমার প্রিয় ইন্দ্রজিতের মৃত্যু স্মরণীয় করিতে প্রবৃত্ত হইতেছি। সুহৃদ্বর, ভয় পাইও না। বানরদিগের বিষয় লিখিয়া পাঠকগণকে কষ্ট দেওয়া আমার উদ্দেশ্য নহে। আমি কতিপয় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মহাকাব্য রচনা করিয়া ইহাতে একটু নিপুণতা লাভ করিতে ইচ্ছা করি।

বোধ হয় তোমার জানা নাই আমি এখানে কিরূপ ভাবে আছি। তবে শুন, আমার মনের মধ্যে যদি ধর্ম্মের উচ্চ ভাব জাগরূক না হইত তাহা হইলে আমি কবিতার সহিত কোন সংস্রবই রাখিতাম না। আমি সদর আদালতের জন্য আইন পাঠ করিতেছি, এবং কবিতা লিখি। ইংরাজ কবি পোপের শিক্ষানবিশের কথা তোমার মনে থাকিতে পারে;—

"না শোনে পিতার কথা মত্ত কবিতাতে,
স্বকার্য্যে সে মন নাহি দেয় দিন রাতে।"

আমিও তাইই, একে পিতৃহীন, তাহা ছাড়া, আমার পৈত্রিক সম্পত্তি লইয়া প্রায় জনকুড়ি লোকের সহিত আমার আদালতে বিবাদ চলিতেছে। কিন্তু আমার বুকে এখনও যথেষ্ট বল আছে এবং সাহসের সহিত লড়াই করিতে প্রস্তুত আছি। সমগ্র রুষের সম্রাট হওয়া অপেক্ষা আমি অগ্রে দেশের কাব্যজগতের উন্নতি সাধন করিতে ইচ্ছা করি।

আমি জানিনা কোন্ ইউরোপীয়ান তোমায় বলিয়াছে যে আমি বাঙ্গলা-ভাষা ঘৃণা করিতাম, কিন্তু সত্যই আমি ঘৃণা করিতাম। কিন্তু এক্ষণে আমি একথা বলিতে কুণ্ঠিত নহি যে আমাদিগের অমিত্রাক্ষর ছন্দ এত উৎকৃষ্ট যে

ইংরাজীতে এমন কিছু নাই যাহা ইহার সমকক্ষ হইতে পারে। বাস্তবিকই ইহা অন্য কোনও দেশের ছন্দ অপেক্ষা কোনও অংশেই নিকৃষ্ট নহে।

আমার "মেঘনাদ" হইতে গোড়ার কতক পংক্তি লিখিয়া তোমায় পাঠাইতেছি, তুমি অবশ্য লিখিবে তোমার ইহা কেমন লাগিল। একজন বন্ধু যিনি পদ্য রচনা সম্বন্ধে ভাল বিচার করিতে পারেন বলিয়াছেন যে ইহা খুব ভাল হইয়াছে।

ভাল কথা, আমি গীতিপূর্ণ একটী পুস্তক রচনা করিয়া ছাপাইতে দিয়াছি। ইহাতে কেবল সেই বেচারী রাধার বিরহের কথা আছে। ছাপা হইলেই তোমাকে একখানি বই পাঠাইয়া দিব।

আমাকে এইখানেই শেষ করিতে হইবে। আমাকে লিখিতে যেন কিছুই ভুলিও না।

তোমার স্নেহের
মাইকেল মধুসূদন দত্ত।

রাজা রামমোহন রায়ের বাল্যকাল।

ব্রাহ্মসমাজের প্রতিষ্ঠাতা বলিয়া আমরা যে বীরচতুষ্টয়ের নাম উল্লেখ করিয়াছি, তন্মধ্যে কাহাকেও পরিত্যাগ করিবার উপায় নাই; একথা বলা যাইতে পারে না যে ইঁহাকে ছাড়িয়া দিলে ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠিত হইতে পারিত। তবে সকলকেই ইহা স্বীকার করিতে হইবে যে উক্ত মহাপুরুষদিগের মধ্যে ব্রাহ্মসমাজের প্রতিষ্ঠা বিষয়ে রামমোহন রায়ই অগ্রণী ছিলেন। অপর তিনজন নানাপ্রকারে সাহায্য করিয়াছেন বটে, কিন্তু ব্রাহ্মসমাজস্থাপনের জন্য পাঁচজন লোকের কাছে যাওয়া আসা, অর্থসংগ্রহ করা, পুস্তকাদি লিখিয়া অন্যমত খণ্ডন পূর্ব্বক নিজমত স্থাপন করা এই সকলই রামমোহন রায় স্বয়ং করিয়াছিলেন, এই কারণে ব্রাহ্মসমাজের উল্লেখ করিলেই সর্ব্বপ্রথমে তাঁহারই নাম স্মরণপথে উদিত হয়।

রামমোহন রায় যে কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছিলেন, তাহার মূল্য বুঝিবার লোক তখন অতি অল্পই ছিলেন। তাই তিনি বেদান্তসারের ইংরাজী অনুবাদের ভূমিকায় দুঃখপ্রকাশ করিয়া বলিয়া গিয়াছেন যে "তিনি সত্য ও সরলতার পথ অবলম্বন করাতে সকলের, এমন কি আত্মীয়স্বজনেরও বিরাগভাজন হইয়াছেন, কিন্তু সর্ব্বদর্শী ঈশ্বরের কাছে তিনি নির্দ্দোষ।" ব্রহ্মজ্ঞান প্রচারের জন্য তিনি কতনা কষ্ট ও ক্ষতি স্বীকার করিয়াছিলেন। তাঁহাকে উপনিষদ্ প্রভৃতি গ্রন্থসকল আপন ব্যয়ে মুদ্রিত করিয়া অকাতরে বিতরণ করিতে হইয়াছিল। একবার তিনি বেদান্তসূত্র ছাপাইতে সঙ্কল্প করিয়া এই কলিকাতাতে তাহা অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। তিনি এবং তাঁহার সহোদ্যোগী রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ মহাশয় সমস্ত কলিকাতা খুঁজিয়া বহু অন্বেষণের পর একটী ব্রাহ্মণের গৃহে একখানি বেদান্তদর্শনের পুঁথি দেখিতে পাইলেন। ব্রাহ্মণ পুঁথিটীকে নিত্য পূজা করিতেন, সুতরাং তিনি তাহা তাঁহাদের হস্তে কিছুদিনের জন্য রাখিতে পারিলেন না। অবশেষে রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ সেই স্থানে বসিয়াই সেই চন্দনচর্চ্চিত পুঁথিখানির অনুলিপি করিয়া আনিলেন এবং রামমোহন রায় তাহা হইতে বেদান্তসূত্র আকর্ষণ করিয়া মুদ্রিত করিলেন। তাঁহাদের সেই প্রথম উদ্যোগের ফলে আজ আমরা এতদূর উপনিষদ্, বেদান্তদর্শন প্রভৃতি আলোচনা করিতে সক্ষম হইতেছি। শ্রীমদ্দেবেন্দ্রনাথ রামমোহন রায় সম্বন্ধে বলিয়াছেন, "প্রথমত ব্রাহ্মসমাজের কথা মনে হইলেই এই দেশের প্রথম বন্ধু রাজা রামমোহন রায়কেই স্মরণ হয়। তাঁহার শরীর যেমন বলিষ্ঠ ছিল, বুদ্ধিও তেমনি সারবান ছিল; শ্রদ্ধাভক্তি হৃদয়ের ধনও তাঁহার সেই প্রকার ছিল। এখন প্রথমেই তাঁহার মুখশ্রী আমার চক্ষের সমক্ষে আবির্ভূত হইতেছে। তাঁর ভক্তিশ্রদ্ধাতে উজ্জ্বল মুখ; তাঁর সেই উদার ভাব, সমুদয় যেন প্রত্যক্ষ করিতেছি। তাঁর শরীরের বল, মনের বীর্য্য, হৃদয়ের ভাব সকলি অনুরূপ। ধর্ম্মের উন্নতির জন্যই তিনি এখানে উদিত হন।" * ১৭৭২ খৃষ্টাব্দের ২২শে মে (বাঙ্গালা ১১৭৯ সাল জ্যৈষ্ঠ মাসে) হুগলী জিলার অন্তর্গত খানাকুল কৃষ্ণনগর গ্রামে রামমোহন জন্মগ্রহণ করেন।

---

* পঞ্চবিংশতি বৎসরের পরীক্ষিত বৃত্তান্ত। তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা, ১৭৮০ অগ্রহায়ণ।

রামমোহনের জন্মকালে শাক্ত ও বৈষ্ণব এই উভয় সম্প্রদায়ের পরস্পরের মধ্যে বিবাদ এতদূর দৃঢ়প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল যে "শাক্ত বৈষ্ণবের দ্বন্দ্ব" সকল প্রকার গুরুতর বিবাদ বিসম্বাদের উপমাস্থল হইয়া উঠিয়াছিল। রামমোহনের পিতৃকুল বৈষ্ণব ছিলেন, মাতামহকুল শাক্ত ছিলেন। রামমোহন রায়ের সৌভাগ্যক্রমে শাক্তবৈষ্ণবের দ্বন্দ্বের মধ্যে তাঁহাকে বর্দ্ধিত হইতে হয় নাই। দ্বন্দ্বনির্ব্বাসনের গল্পটী এই—রামমোহন রায়ের পিতামহ ব্রজবিনোদ রায় অন্তিমকালে গঙ্গাতীরস্থ হইলে, শ্রীরামপুরের নিকটবর্ত্তী চাতরা নিবাসী শ্যাম ভট্টাচার্য্য কন্যাদায়গ্রস্ত হইয়া ভিক্ষার্থীস্বরূপে তাঁহার নিকটে উপস্থিত হইলেন। শ্যাম ভট্টাচার্য্য সম্ভ্রান্ত বংশীয়—এতদ্বংশীয়গণ দেশগুরু বলিয়া বিখ্যাত ছিলেন। ব্রজবিনোদ রায় তাঁহার প্রার্থনা পূর্ণ করিতে প্রতিশ্রুত হইলে শ্যাম ভট্টাচার্য্য তাঁহার যে কোন একটী পুত্রকে নিজকন্যা সম্প্রদান করিবার অনুমতি ভিক্ষা করিলেন। ব্রজবিনোদ বড়ই বিপদে পড়িয়া আপনার সাত পুত্রের প্রত্যেককে এবিষয়ে অনুরোধ করিলেন, কিন্তু পঞ্চম পুত্র রামকান্ত ব্যতিরেকে আর কেহই তাঁহার অনুরোধ রক্ষা করিতে স্বীকার করেন নাই। এই রামকান্তের ঔরসে এবং শ্যাম ভট্টাচার্য্যের কন্যা তারিণী দেবীর গর্ভে রামমোহন রায়ের জন্ম। সর্ব্বকাম্যবিধাতা ভগবান যেন রামমোহনের জন্মের পূর্ব্বাবধিই তাঁহার ভবিষ্যৎ জীবনের উপকরণসমূহের ব্যবস্থা করিয়া দিতেছিলেন। রামমোহন রায় উপযুক্ত বয়সে যখন জানিতে পারিলেন যে তাঁহার পিতৃকুল বৈষ্ণব এবং মাতামহকুল শাক্ত, তখন অপর সাধারণ পাঁচজনের ন্যায় নিজের পৈতৃক ধর্ম্ম ব্যতীত অপর ধর্ম্মের নিন্দারত ছিলেন না, কারণ সে নিন্দা করিলে তাঁহারই মাতার বংশে লাগিত। সকল সম্প্রদায়ের নিন্দা হইতে বিরতির হয়তো ইহাই মূল সূত্রপাত হইয়াছিল।

রামমোহন রায়ের পিতা রামকান্ত রায় পিতৃবাক্য রক্ষা করিয়াছিলেন সত্য, কিন্তু তাঁহার নিজের অথবা তাঁহার বংশের ধর্ম্মনিষ্ঠা সম্বন্ধে প্রমাণ পাই নাই। কিন্তু রামমোহনের মাতামহকুলের ধর্ম্মনিষ্ঠার কথা বিশেষরূপে শোনা যায়। রামমোহনের মাতা অত্যন্ত নিষ্ঠাবতী ছিলেন। তিনি স্বামীগৃহে আসিয়া বিষ্ণুমন্ত্রে দীক্ষিত হন। শেষ বয়সে তিনি জগন্নাথদর্শনের জন্য যাত্রা করেন। দেবদর্শনে যাইতে হইলে কষ্ট স্বীকার করিয়া যাইতে হয়, এই

বিশ্বাসবশত সাংসারিক অবস্থা ভাল সত্ত্বেও, তিনি সঙ্গে একজন দাসী পর্য্যন্ত গ্রহণ করেন নাই। এমন কি, পথে তাঁহার সুবিধা ও সুখের জন্য কোন প্রকার উপায় করিতেও দেন নাই; দুঃখিনীর ন্যায় পদব্রজে শ্রীক্ষেত্র যাত্রা করিয়াছিলেন। পরলোকগমনের পূর্ব্বে এক বৎসরকাল দাসীর ন্যায় জগন্নাথদেবের মন্দির সম্মার্জনীর দ্বারা প্রত্যহ পরিষ্কৃত করিতেন। কথিত আছে, মৃত্যুর বৎসরেক পূর্ব্বে রামমোহন রায়কে বলিয়াছিলেন "রামমোহন! তোমার মতই ঠিক। আমি অবলা স্ত্রীলোক, এবং অত্যন্ত বৃদ্ধা হইয়াছি; সুতরাং যে সকল পৌত্তলিক অনুষ্ঠানে আমি সুখ পাইয়া থাকি, তাহা আর পরিত্যাগ করিতে পারি না।" রামমোহনজননী ধর্ম্মে নিষ্ঠাবতী হইলেও বিষয়কর্ম্মে অমনোযোগী ছিলেন না, এবং যতদূর বুঝা যায় তাহাতে বোধ হয় যে তাঁহার প্রকৃতি কিছু উগ্র ছিল। রামমোহনের শৈশবকালে একদিন তাঁহার মাতামহ ইষ্টদেবতার পূজার পর শিশু রামমোহনকে পূজোপকরণ বিল্বদল প্রদান করেন। রামমোহনজননী আসিয়া দেখেন যে তাঁহার পুত্র বিল্বপত্র চর্ব্বণ করিতেছেন। বিষ্ণুমন্ত্রদীক্ষিতা তাঁহার ইহাতে বড়ই ক্রোধ হইল। তিনি সন্তানের মুখ হইতে বিল্বপত্র ফেলিয়া দিয়া মুখপ্রক্ষালন করিয়া দিলেন এবং বিল্বপত্র দিবার কারণে পিতাকে তিরস্কার করিলেন। রামমোহন কলিকাতায় আসিবার পূর্ব্বে নিজগ্রামে যখন প্রকাশ্যে পৌত্তলিকতার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হন, তখন তাঁহার জননী ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহার পত্নীদ্বয় ও নবপুত্রবধূসহিত গৃহ হইতে দূর করিয়া দিবার সংকল্প করিলেন। রামমোহন রায় তাঁহার মাতার সহিত বিবাদে প্রবৃত্ত হইবার পরিবর্ত্তে নিকটবর্ত্তী এক শ্মশানভূমির (হানাজমী?) উপর বাটী নির্ম্মাণ করিয়া সপরিবারে বাস করিতে লাগিলেন। তাঁহার জননী ইহাতেও সন্তুষ্ট না হইয়া তাঁহাকে বিধর্ম্মী বলিয়া তাঁহার পৈতৃক সম্পত্তি হইতে বঞ্চিত করিবার জন্য সুপ্রীমকোর্টে এক মকদ্দমা উপস্থিত করেন, বোধ হয় আশা ছিল যে যদি তাহাতেও তাঁহার মতিগতি ফিরিয়া যায়। আদালতে প্রমাণ হইল না যে তিনি বিধর্ম্মী; সুতরাং পৈতৃকবিষয় হইতে বঞ্চিত হইলেন না। কিন্তু তিনি জননীর হাত হইতে বিষয়ভার কাড়িয়া লইলেন না। তাঁহার জননীও গৃহদেবতা রাধাগোবিন্দ এবং শালগ্রামসমূহ সম্মুখে রাখিয়া জমিদারী কার্য্য সকল পর্য্যবেক্ষণ করিতেন। রামমোহনের জননীর এক বিশেষ তেজ ছিল,

যাহা দ্বারা তিনি সন্তানদিগের মন আকর্ষণ করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন।

রামমোহন রায় স্বলিখিত সংক্ষিপ্ত আত্মবিবরণে লিখিয়াছেন যে পিতার আদেশে বিষয়কর্ম্মের উপযোগী আরব্য ও পারস্য ভাষা শিখিয়াছিলেন এবং মাতামহকুলের অনুরোধে সংস্কৃত ও শাস্ত্রাদি অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। ইহাতেও বুঝা যায় যে তাঁহার পিতৃকুল রীতিমত বিষয়কর্ম্মব্যাপৃত পরিবার ছিলেন এবং তাঁহার মাতামহকুল শাস্ত্রব্যবসায়ী নিষ্ঠাবান পরিবার ছিলেন।

উপরে যাহা কিছু বলিয়া আসিলাম, তাহা হইতে এইটুকু বুঝা যাইবে যে উভয়কুলের মিশ্রণোদ্ভূত চরিত্র সত্ত্বগুণাবৃত রজঃপ্রধান হওয়াই উচিত। আর বাস্তবিকই রজোগুণই তাঁহার প্রকৃতির মূলসূত্র ছিল, তবে সত্ত্বগুণের আবরণ থাকাতে সেই রজোগুণ অনেকটা নির্ম্মল প্রকাশভাবাপন্ন হইয়াছিল এবং তাঁহাকে মন্দপথের পরিবর্ত্তে ভালপথেই চালিত করিয়াছিল।

উপসংহারে পিতৃপুরুষ সম্বন্ধে রাজার নিজের কথা উদ্ধৃত করিয়া শেষ করি। "আমার পূর্ব্বপুরুষেরা উচ্চশ্রেণীর ব্রাহ্মণ ছিলেন। স্মরণাতীত কাল হইতে তাঁহারা কৌলিকধর্ম্মসম্বন্ধীয় কর্ত্তব্যসাধনে নিযুক্ত ছিলেন। পরে আমার ঊর্দ্ধতন পঞ্চমপুরুষ (অতিবৃদ্ধ প্রপিতামহ) ১৪০ বৎসর পূর্ব্বে ধর্ম্মসম্বন্ধীয় কার্য্য পরিত্যাগ করিয়া বৈষয়িক কার্য্য ও উন্নতির অনুসরণ করেন। তাঁহারা বংশধরেরা সেই অবধি তাঁহারই দৃষ্টান্ত অনুসারে চলিয়া আসিয়াছেন। রাজ-সভাসদদিগের ভাগ্যে সচরাচর যেরূপ হইয়া থাকে, তাঁহাদিগেরও সেইরূপ অবস্থার বৈপরীত্য হইয়া আসিয়াছে; কখন সম্মানিত হইয়া উন্নতিলাভ, কখনও বা পতন; কখন ধনী, কখন নির্ধন; কখন সফলতায় উৎফুল্ল, কখন বা নিরাশায় কাতর। কিন্তু আমার মাতামহ বংশীয়েরা কৌলিক ধর্ম্মানুসারে ধর্ম্মযাজকতাই জীবনের অবলম্বন করিয়াছিলেন। ধর্ম্মযাজকদিগের মধ্যে মাতামহবংশ অপেক্ষা উচ্চতর আর কোন পরিবার ছিল না। তাঁহারা বর্ত্তমান কাল পর্য্যন্ত সমভাবে ধর্ম্মানুষ্ঠান ও ধর্ম্মচিন্তায় অনুরত ছিলেন। সাংসারিক আড়ম্বরের প্রলোভন ও উচ্চাকাঙ্ক্ষার উদ্বেজনা অপেক্ষা তাঁহারা মানসিক শান্তি শ্রেয়স্কর জ্ঞান করিয়া আসিয়াছেন।" *

শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

* Last days in England of Raja Rammohan Ray.

সুইডিশ কিন্নরী বা গায়িকা লিণ্ড।

ভারতবর্ষে অতি প্রাচীন কাল হইতে সঙ্গীতের চর্চ্চা হইয়া আসিতেছে। তানসেন প্রভৃতি গায়কগণের বিষয় পড়িয়া জানা যায় যে পূর্ব্বে সঙ্গীতের জন্য অনেকে রীতিমত কঠোর সাধনা করিতেন। এখন এখানে কয়টা লোক গীতবাদ্যের নিমিত্ত সেরূপ কষ্ট স্বীকার করেন? কিন্তু আমাদের পূর্ব্বপুরুষদিগের সেই সাধনা অন্য ভাবে ইউরোপীয় গায়ক গায়িকাদিগের মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায়। সঙ্গীতবিজ্ঞান ভারতবর্ষ হইতেই অন্যান্য দেশে প্রচারিত হইয়াছিল; কিন্তু অন্যান্য বিষয়ের ন্যায় ইউরোপ অপরিসীম অধ্যবসায়ের গুণে গীত বাদ্যাদিতে আজিকাল বড় কম উচ্চ আসন লাভ করে নাই। জেনী লিণ্ড, সারা বার্ণাড, অ্যাডেলিনা পাটি প্রভৃতি পাশ্চাত্য গায়িকাগণ সত্যসত্যই অত্যন্ত কঠোর সাধনা করিয়া সঙ্গীতে সিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন।

এক্ষণে যে খ্যাতনামা মহিলার বিষয় আমরা বলিব তিনি সঙ্গীতের দ্বারা সমগ্র ইউরোপ এবং আমেরিকায় অক্ষয় কীর্ত্তি রাখিয়া গিয়াছেন।

এই মহিলা নাট্যালয়ে গাহিতেন শুনিয়া পাঠকগণ সহসা ইহা না ভাবিয়া বসেন যে একটি থিয়েটরের স্ত্রীলোকের বিষয় লেখা হইতেছে। আমাদের দেশে ভদ্র মহিলাদিগের মধ্যে গান গাওয়া রীতি একেবারে নাই। বাড়ীর মধ্যে কোন স্ত্রীলোক একটু গলার সুর বাহির করিলে আর রক্ষা নাই, অমনি তাহাকে বাড়ীর লোকে, পাড়ার লোকে লজ্জাহীনা প্রভৃতি বাক্যে কত না বিদ্রূপ উপহাস করিবে। অবশ্য ইহার জন্য যে কাহাকেও দোষ দিতে পারা যায় তাহা নয়, কেননা এইরূপ সামাজিক রীতি আমাদের মধ্যে বহুকাল হইতে চলিয়া আসিতেছে। এখন সময়ের পরিবর্ত্তনের সহিত সামাজিক সংস্কারও হওয়া উচিত ও হইয়াও আসিতেছে। কলিকাতার মধ্যে অনেক শিক্ষিত পরিবারে আধুনিক রীতিনীতি অনুযায়ী পুত্র কন্যাদিগকে সমান ভাবে গীত বাদ্য শিক্ষা দেওয়া হয়। মহিলাগণ সঙ্গীত শিক্ষা করিলে, বাড়ীতে অভ্যাগত ব্যক্তি আসিলে তাঁহারা গীত বাদ্য দ্বারা অনায়াসে সকলের অভ্যর্থনা করিয়া তাঁহাদের

পরিতুষ্টি সাধন করিতে পারেন, অন্ততঃ সমস্ত দিবসের পরিশ্রমের পর দিনান্তে পিতামাতা ভ্রাতা ভগ্নী সম্মিলিত হইয়া সঙ্গীতের মোহন শক্তি দ্বারা কিছুক্ষণের জন্য পবিত্র সুখানুভব করিতে পারেন। আমরা যদি আমাদের পুত্রকন্যাদিগকে সঙ্গীতবিদ্যা শিক্ষা দিই তাহা হইলে আমাদের সামাজিক রীতিনীতিরও যে বিশেষ উন্নতি হইবে তাহার আর সন্দেহ নাই। বর্ত্তমানকালে আমাদের শিক্ষিত সমাজ গীতবাদ্য সম্বন্ধে মহিলাদিগকে অনেকটা স্বাধীনতা দিতে প্রস্তুত হইয়াছেন, কিন্তু পশ্চিম হিন্দুস্থানে দেখিতে পাওয়া যায় তাঁহাদের মহিলাগণ বরাবরই সে স্বাধীনতা ভোগ করিয়া আসিতেছেন।

ইউরোপে সঙ্গীতবিদ্যা অতিশয় আদরের বিষয়। কোনও প্রসিদ্ধ গায়ক বা গায়িকা দেশে আসিয়াছেন, আজ অমুক অপেরা হাউসে বা নাট্যালয়ে গাহিবেন শুনিলে সেই নাট্যালয় অত্যল্পকাল মধ্যেই লোকের জনতায় পরিপূর্ণ হইয়া যায়, ও অনেককেই নিরাশহৃদয়ে স্থানাভাব বশতঃ ফিরিয়া যাইতে হয়। এই সব গায়ক গায়িকাগণের গীত শ্রবণের জন্য লোকেরা এত লালায়িত যে নাট্যালয়ের টিকিট সমূহ নিলামে পর্য্যন্ত বিক্রয় হয়।

আমাদের দেশের ন্যায় ইউরোপেও রঙ্গালয়ের গায়িকাদিগের নিন্দা আছে বটে, কিন্তু তাহা এরূপ খ্যাতনামা গায়িকাদিগের পক্ষে নহে। জেনী লিণ্ডের ন্যায় গায়িকাগণকে পাশ্চাত্য জগতের লোকেরা অতি শ্রদ্ধা ও প্রীতির চক্ষে দেখেন। ইঁহারা নাট্যালয় ও গীতবাদ্যের সঙ্গত বা কন্সার্টে গাহিয়া জগতে খ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছেন বলিয়া কেহ ইঁহাদের হীন চক্ষে দেখেন না। সম্রাট, রাজ্ঞী, রাজপরিবারের মহিলাগণ পর্য্যন্ত অন্য কোন ভদ্র মহিলার সহিত যেমন মিশিবেন ইঁহাদের সহিতও সেইরূপ অকুণ্ঠিত চিত্তে মিশিবেন। ইউরোপ বা আমেরিকায়, কোনও বালিকা সঙ্গীতে অসামান্য শক্তিসম্পন্ন হইয়া উঠিলে প্রকাশ্যভাবে জনসাধারণের নিকট গান গাওয়া তাঁহাদের পক্ষে একটা লজ্জাজনক ব্যাপার বলিয়া গণনীয় নয়। এইরূপ স্থলে রঙ্গালয়ে গাহিয়া জগতের নিকট পরিচিত হইলে লোকে তাহা দূষণীয় কার্য্য বলিয়া মনে করে না।

আমরা যাঁহার কথা বলিতেছি এই অসাধারণ গায়িকা যে কেবল সঙ্গীতবিদ্যাতেই প্রসিদ্ধ হইয়াছিলেন তাহা নহে, তাঁহার নিঃস্বার্থ পরোপকারিতা, দানশীলতা, এবং বিদেশী ও স্বদেশীয়ের প্রতি সমভাব তাঁহার চরিত্রের একটি

প্রধান অঙ্গ ছিল। তিনি আমেরিকা, জার্ম্মানী ও ইংলণ্ডে যে লক্ষ লক্ষ মুদ্রা দান করিয়া গিয়াছেন, সর্ব্বাপেক্ষা বোধ হয় এই কারণেই ইংলণ্ডের গৃহে গৃহে এখনও অতি সম্মানের সহিত তাঁহার নাম ধ্বনিত হয়। এই সদাশয়া মহিলা একজন সুইডিশ রমণী। ইনি ১৭২১ খৃষ্টাব্দে সুইডনের রাজধানী ষ্টকহল্‌ম্ নগরে ২১ অক্টোবরে শুভক্ষণে জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পিতা ষ্টকহল্‌ম্ নগরে এক জন্য বিখ্যাত আইনব্যবসায়ী ছিলেন। শিশুকাল হইতেই জেনী অত্যন্ত সঙ্গীতানুরাগী ছিলেন। তিন চারি বৎসর বয়ঃক্রম কালে তিনি যে কোনও সঙ্গীত একবার শুনিতেন তাহা তৎক্ষণাৎ নির্ভুল গাহিয়া দিতে পারিতেন। অনেক সঙ্গীতবিদ্যাবিশারদ পণ্ডিতগণ জেনী লিণ্ডের শৈশবকালের এরূপ সঙ্গীত-প্রতিভা দ্বারা মুগ্ধ হইয়া গিয়াছিলেন। মাদাম লাণ্ডবার্গ নামক ষ্টকহল্মের একজন বিখ্যাত গায়িকা নবম বৎসরের বালিকা জেনীকে এক দিবস গাহিতে শুনিয়া এবং তাহার গানের কৃত্রিমতাশূন্য সুন্দর সহজ ভাবে অত্যন্ত প্রীত হইয়া জেনীর পিতামাতাকে বার বার অনুরোধ করেন যাহাতে উঁহাকে খুব ভাল করিয়া সঙ্গীতবিদ্যা শিক্ষা দেওয়া হয়। এই পরামর্শে জেনীর অত্যন্ত আগ্রহ দেখিয়া ইঁহার পিতা মাতাও স্বীকৃত হন। তৎপরেই জেনী, মাদাম লাণ্ডবার্গের সাহায্যে সঙ্গীতবিদ্যায় সুপণ্ডিত খ্যাতনামা ক্রিয়োলিনের নিকট পরিচিত হন। ক্রিয়োলিন এই বালিকার সঙ্গীত শ্রবণ করিয়া মুগ্ধ হইলেন; বুঝিলেন ইহা ঐশ্বরিক দান, ইহা খাঁটি সোণা, এখনও ইহাতে খনির মাটি কাদা প্রভৃতি কিছু ময়লা আছে বটে, কিন্তু জিনিষটা একেবারে খাঁটি, ইহাতে কোনও কৃত্রিমতা নাই। এখন কেবল ইহা একজন ভাল স্বর্ণকারের হস্তে পড়িলে ইহাতে এখনও যাহা কিছু ময়লা আছে তাহা সম্পূর্ণ সংশোধিত হইয়া যাইবে এবং তখন ইহা নিজপ্রভায় জগৎ আলোকিত করিবে। এখন হইতে তিনি এই বালিকাকে ভবিষ্যতের জন্য বিশেষ যত্নের সহিত প্রস্তুত করিতে লাগিলেন। অতি অল্প সময়ের মধ্যেই জেনী সঙ্গীতে এত উন্নতি লাভ করিলেন যে তাঁহাকে নাট্যালয়ে জনসাধারণ সমক্ষে গাহিতে দেওয়া হইল। এরূপ অবস্থায় অনেক বালিকারা অহঙ্কারে স্ফীত হইয়া উঠে। এই তমোগুণ বশতঃ বিদ্যায় পারদর্শী হইলেও তাহারা সেই বিদ্যার মাধুর্য্যটুকু নষ্ট করিয়া ফেলে, কিন্তু বালিকা

জেণী, সেরূপ প্রকৃতিরই ছিল না। ভবিষ্যতেও যখন তিনি প্যারিসে শিক্ষা লাভ করিয়া স্বীয় মধুর ঝঙ্কারে জগৎ প্রতিধ্বনিত করিতে লাগিলেন তখনও তিনি কদাপি "আমি একজন মস্ত গাইয়ে" বলিয়া গর্ব্ব প্রকাশ করেন নাই। কোন বিখ্যাত সমসাময়িক লোক জেনী লিণ্ডের বিষয় উল্লেখ করিয়া বলিয়া গিয়াছেন "জেনী লিণ্ড সদা সুখী, ইহজগতের লোক তিনি নন। ইঁহার উচ্চ ও মহান্ হৃদয় স্তুতিতে বশীভূত হয় না। সহস্র প্রশংসাবাদে ইনি অটল এবং গম্ভীর থাকেন, আমার জ্ঞাতসারে, একটি বারমাত্র তাঁহাকে, তাঁহার ঐ স্বর্গীয় বিদ্যার জন্য আনন্দ প্রকাশ করিতে শুনিয়াছিলাম।" কোপন হেগ্‌ন্ নগরে শেষবার থাকিবার সময় তিনি প্রত্যহ কোন গীতবাদ্যের সঙ্গতে কিম্বা নাট্যালয়ে গাহিতেন। সেই সময় একটি সভার সহিত তাঁহার পরিচয় হয়; এই সভার একটি মহৎ উদ্দেশ্য ছিল নষ্ট পিতামাতাদিগের হস্ত হইতে হতভাগ্য বালক বালিকাদিগকে উদ্ধার করা ও তাহাদিগকে ভাল করিয়া শিক্ষা দিয়া ভবিষ্যতে ভাল অবস্থায় আনয়ন করা। জেনী এই সভার মহৎ কার্য্যের জন্য একটি বৃহৎ সঙ্গীত সভা আহ্বান করেন ইহাতে তাঁহার গীত শুনিবার জন্য অসম্ভব রকমের জনতা হয়। এত বৃহৎ লোকের সমাবেশ দেখিয়া জেনীলিণ্ডের মুখ সহসা প্রফুল্ল আকার ধারণ করিল, তাঁহার চক্ষু অশ্রুপূর্ণ হইয়া উঠিল; এবং তিনি বলিলেন, "কি চমৎকার, আমি এত ভাল গাহিতে পারি!" তাঁহার স্বাভাবিক সরল সলজ্জ নম্র ভাবের কারণে ষ্টক্‌হল্‌ম্ নগরের সম্ভ্রান্তবংশীয়া মহিলাগণ জেনীর সহিত আলাপ করিয়া অতিশয় প্রীত হইতেন। বার তের বৎসর বয়সে জেনীর একটি অতিশয় দুর্ঘটনা উপস্থিত হয়। তাঁহার স্বরের সর্ব্বোচ্চ সুরটি তিনি গাহিতে অপারগ হইলেন। তাঁহার গান গাহিবার কালে সুরগুলি রেখাব হইতে গান্ধার, গান্ধার হইতে পঞ্চম, পঞ্চম হইতে ধৈবত, ধৈবত হইতে নিখাদ, এইরূপ ধাপের পর ধাপে উঠিত পড়িত; বায়ুর স্রোতে তাঁহার স্বরলহরী ক্রীড়া করিতে করিতে গগনে যেন মিলাইয়া যাইত; তাহা একবার যিনি শুনিতেন তিনি আর উহা ভুলিতে পারিতেন না, তাঁহার কর্ণে সর্ব্বদাই যেন উহা লাগিয়া থাকিত। সেই অতি উচ্চ সুরে এখন হইতে আর তিনি গাহিতে পারিতেন না। সুতরাং তাঁহার বন্ধুগণ এবং জেনী নিজেও ঐ উচ্চ সুরগুলি হইতে বঞ্চিত হওয়াতে অত্যন্ত

চিন্তিত হইলেন। অনেক বৎসর এই ভাবে কাটিল, জেনী উহা পুনঃ প্রাপ্তির নিমিত্ত অনেক সাধনা করিতে লাগিলেন; এইরূপ কত কাল কাটিয়া গেল কিন্তু তাঁহার আশার কোন সুফল হইল না। অবশেষে ভগবান বুঝি তাঁহার সাধনায় তুষ্ট হইলেন।

একবার ষ্টক্‌হল্‌ম্ নগরে একটি বৃহৎ কন্সার্টের আয়োজন হইল। যে নাটকটী অভিনীত হইবার জন্য নির্ব্বাচিত হইল তাহার একটী নায়িকা, অ্যালিস্;—এই নায়িকার অভিনয় করিবার নিমিত্ত অনেক বড় বড় গায়িকা-দিগকে বলা হইল, কিন্তু কেহই উহা একটী অকিঞ্চিৎকর বিষয় বলিয়া স্বীকৃত হইলেন না। অবশেষে কর্ত্তৃপক্ষগণ জেনী লিণ্ডকে ঐ অংশটী লইবার জন্য অনুরোধ করিলেন। জগতে সামান্য বিষয়ও যে তুচ্ছ করিবার নহে এই ঘটনায় তাহার জ্বলন্ত প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে। ভগবানের রাজ্যে, এক একটি সামান্য সামান্য বিষয়ে তাঁহার যে মঙ্গলময় ভাব ফুটিয়া উঠে তাহা দেখিয়া আমরা অবাক্ হইয়া যাই। যে উচ্চ সুরগুলি পুনর্লাভের জন্য এতকাল ধরিয়া জেনী লিণ্ড চেষ্টা করিয়া আসিতেছিলেন তাহা সেইরাত্রে তুচ্ছ অ্যালিশের অভিনয় কালে পুনঃপ্রাপ্ত হইলেন। এই সুর হারাইয়া তিনি নিজে এবং তাঁহার বন্ধুগণ অত্যন্ত নিরাশ হইয়া গিয়াছিলেন; কেননা তাঁহার কণ্ঠ হইতে ঐ সুরগুলি অন্তর্হিত হওয়াতে, তাঁহার প্রথম শ্রেণীর গায়িকা ভুক্ত হইবার পক্ষে একান্ত বাধা পড়িয়াছিল। এক্ষণে সেগুলি পুনঃপ্রাপ্তির পর সকলে মহা সন্তুষ্ট হইলেন। তখন জেনী লিণ্ড বহুদিনের বাঞ্ছিত কোন একটি বিখ্যাত নাটকের অভিনয়ে প্রধান নায়িকার পদে নিযুক্ত হইলেন। এই অভিনয় কার্য্যে তিনি প্রভূত যশোলাভ করিলেন। এইরূপে বৎসরাধিক কাল ষ্টক্‌হল্‌মে অতিশয় দক্ষতার সহিত বড় বড় অভিনয়ে তাঁহার অংশগুলি গাহিয়া সকলকে মুগ্ধ করিতে লাগিলেন। গৃহে গৃহে তাঁহার নাম লইয়া আলোচনা হইতে লাগিল। কিন্তু জেনী সঙ্গীতবিদ্যায় সম্পূর্ণ পারদর্শিতা লাভ করিবার জন্য অত্যন্ত লালায়িত হইলেন। তিনি ঐ সব প্রশংসাবাক্যে একটু মাত্র মনোযোগ দিতেন না। সুতরাং ক্রোইলিন প্রভৃতি কতকগুলি বন্ধুর পরামর্শানুসারে তিনি প্যারিসে গমন করিলেন। প্যারিসে আসিয়া গার্সিয়া নামক ইউরোপের একজন সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ওস্তাদের নিকট সঙ্গীত শিখিবার

জন্য দেখা করিতে আসিলেন। গার্সিয়া তাঁহাকে গাহিতে বলিলেন এবং তাঁহার গান শুনিয়া বলিলেন—"বৎস, তোমার কিছুই সুর নাই; কিম্বা আমি এই বলিতে পারি যে এককালে তোমার গলা ছিল, কিন্তু এখন উহা হারাইতে বসিয়াছ। তোমার গাহিবার যন্ত্রটির এখন বৃদ্ধ কাল উপস্থিত। অতিরিক্ত পরিশ্রমে উহা অক্ষম এবং শিথিল হইয়া পড়িয়াছে। আমার পরামর্শ যদি চাও ত আমি বলি যে তুমি একাক্রমে তিন মাস একটিমাত্র সুরও গাহিবে না। এই কাল গত হইলে আমার নিকট তুমি পুনরায় আসিবে, তখন আমি তোমার গতায়ুপ্রায় সুরের পুনর্জ্জীবনের জন্য সাধ্যমত চেষ্টা করিব। নিরাশ হৃদয়ে তিনি গৃহে ফিরিয়া আসিলেন। গার্সিয়ার পরামর্শানুযায়ী তিনি তিন মাসের মধ্যে একটি বারের জন্য একটি সুর গলা দিয়া বাহির করিলেন না। নৈরাশ্যে দুঃখে দেখিতে দেখিতে এই দীর্ঘ তিন মাস কাটিয়া গেল পুনর্ব্বার তিনি ওস্তাদ গার্সিয়ার সহিত দেখা করিলেন। গার্সিয়া তাঁহাকে গাহিতে বলিলেন এবং গান শুনিয়া আহ্লাদ প্রকাশ পূর্ব্বক বলিলেন "এখন তোমার গলা সঙ্গীত চর্চ্চার যোগ্য হইয়াছে বটে।" প্রায় এক বৎসর কাল গার্সিয়ার নিকট তিনি সঙ্গীত শিক্ষা করিয়া সুপ্রসিদ্ধ composer মিয়ারবিয়ারের নিকট পরিচিত হন। ইতিপূর্ব্বেই মিয়ারবিয়ার জেনীলিণ্ডকে কোন গীতিনাট্য অভিনয় স্থলে গাহিতে শুনিয়াছিলেন, এক্ষণে পুনর্ব্বার তাঁহার গলা পরীক্ষা করিয়া একান্ত প্রীত হইলেন এবং বার্লিণ নগরে লইয়া যাইতে চাহিলেন, কিন্তু জেনী যশের জন্য স্বদেশ প্রেম ভুলিলেন না। তিনি বার্লিণ যাইতে অস্বীকৃত হইলেন। যে সব বন্ধুদিগের পরামর্শে তিনি প্যারিসে আসিয়া সঙ্গীতে ঔৎকর্ষ লাভ করিলেন আজ কি তাহাদিগকে ভুলিতে পারেন! কখনই নয়। তিনি স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। দীর্ঘকালব্যাপী প্যারিসে নির্জ্জন প্রবাসের পর তিনি দেশে আসিয়া যেন হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিলেন। কিন্তু ষ্টক্‌হল্‌মে তিনি বেশী দিন থাকিতে পারিলেন না; বার্লিণ নাট্যালয় খোলা হইলে মিয়াবিয়ারের নিকট হইতে বার্লিনে যাইবার জন্য পুনরায় আমন্ত্রিত হইলেন। এত বড় একজন সঙ্গীত রচয়িতা যিনি একটি কথা কহিলে কত লোক আপনাকে ধন্য মনে করে, তাঁহার নিকট হইতে বার বার নিমন্ত্রিত হইতেছেন। আবার এই খ্যাতনামা পুরুষের বিখ্যাত নাটক "রবার্ট লা দি অবর্" হইতে অ্যালিশের অংশ গাহিবার কালেই

তাঁহার বহুদিনের হৃত উচ্চ সুরগুলি পুনঃপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন। সুতরাং এবার আর জেনী লিণ্ড মিয়ারবিয়ারের কথা ঠেলিতে পারিলেন না। শঙ্কিত হৃদয়ে বার্লিনে উপস্থিত হইলেন। কারণ বার্লিন জগতের মধ্যে যত বড় বড় কূট সমালোচকদিগের অধিষ্ঠানভূমি। ইহাদিগের নিকট কিরূপভাবে তিনি অভ্যর্থনা পাইবেন সেই চিন্তায় ভীত হইলেন। যাহা হউক দুই তিনটা গীতিনাট্যের অভিনয়স্থলে জেনী আবির্ভূত হইবার পর চারিদিক হইতে তাঁহার ডাক পড়িতে লাগিল। প্রুসিয়ারাজ, ইংলণ্ডের মহারাণী ভিক্টোরিয়াকে রাইনে অভ্যর্থনা করিবার কালে কতকগুলি মহাভোজের আয়োজন করেন। তৎকালে জেনী লিণ্ড গীতবাদ্য বিষয়ে তাঁহার প্রধান সহায় হইয়াছিলেন। বার্লিনে তিনি যে সকল বিষয় অভিনয় করেন তাহাতে লোকে বাস্তবিকই মুগ্ধ হইয়া গিয়াছিল এবং তাঁহার নামে চারিদিকে ধন্য ধন্য পড়িয়া গেল। ১৮৪৭ খৃষ্টাব্দে তিনি লণ্ডনে গমন করেন। ইংলণ্ডে এই তাঁহার প্রথম পদার্পণ। লণ্ডনে আসিয়া তাঁহার প্রিয় অ্যালিশের অংশ অভিনয় করিলেন। পরদিন লণ্ডন সহরে কেবল একমাত্র ঐ অপূর্ব্ব গায়িকার বিষয়ই আলোচনা হইতে লাগিল; ছোট বড় সকলের মুখে ঐ এক কথা। টিকিটের অগ্নিমূল্য হইয়া গেল; নাট্যালয় স্বত্বাধিকারীরা এক এক রাত্রে লক্ষপতি হইতে লাগিল। মিয়ারবিয়ার, মোজার্ট, রসিণি, ভার্ডি, মেডল্‌সন্ প্রভৃতি বিখ্যাত বিখ্যাত পাশ্চাত্য গীতবাদ্য রচয়িতাদিগের নাটকসমূহ অভিনয় দ্বারা সমস্ত জগৎ মুগ্ধ করিতে লাগিলেন। লণ্ডন হইতে তিনি স্বদেশ যাত্রা করিলেন। স্বদেশে বহুদিনের পর প্রত্যাগমন করিলে অত্যন্ত সমাদর লাভ করিলেন। নাট্যালয়ের টিকিটসমূহ নীলামে বিক্রয় হইতে লাগিল। ১৮৪৯ খ্রীঃ তিনি পুনরায় লণ্ডনে আসিলেন। লণ্ডনের নাট্যালয়সমূহ এত লোকারণ্য হইতে লাগিল যে এক এক রাত্রে ত্রিশ হাজার চল্লিশ হাজার টাকা উঠিতে লাগিল। রাজপরিবারগণ তাঁহার নিয়মিত শ্রোতা ছিলেন।

যদিও জেনীলিণ্ড অভিনয়ে এবং সঙ্গীতে উভয় গুণে সর্ব্বোচ্চ আসন পাইয়াছিলেন কিন্তু তথাপি তাঁহার সাতাশ আটাশ বৎসর বয়স হইতে অভিনয় কার্য্যে বিতৃষ্ণা জন্মিয়া গিয়াছিল। এক্ষণ হইতে তিনি আর রঙ্গালয়ে গীত গাহিতেন না। কেবলমাত্র বিশেষ বিশেষ বড় বড় কন্সার্টে গাহিতেন। লণ্ডনে তিনি

যাহা উপায় করিলেন তাহার অধিকাংশ টাকা প্রায় ৯০০০০০ নয় লক্ষ টাকা ইংলণ্ডে দান করেন। ইহার পূর্ব্বে জারমানীতে ত্রিশ হাজার ফ্লোরিন্‌স্ দান করেন।

১৮৫০ খৃষ্টাব্দে নিউ ইয়র্কের মিষ্টার পি, টি, বার্ণামের সহিত মিস্ লিণ্ডের মার্কিণ প্রদেশে কন্সার্টে গাহিবার বন্দোবস্ত হয়। মার্কিণ ভ্রমণে জেনীকে সর্ব্বশুদ্ধ দেড় শত কন্সার্টে গাহিতে হইবে ঠিক হইয়াছিল। এবং প্রত্যেক কন্সার্টে ৩০০০৲ হিসাবে তিনি দেড় শত কন্সার্টে ৪৫০০০০৲ চার লক্ষ পঞ্চাশ হাজার টাকা পাইয়াছিলেন। প্রত্যেক কন্সার্টে তাঁহার যশ যেন উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। আমেরিকায় প্রথম দিন যেদিন তিনি গাহিলেন সেদিন প্রায় পাঁচ ছয় হাজার লোকের সমাগম হয়। এবং ৩০০০৲ ডলার নামক মার্কিণ মুদ্রা বার্ণেম প্রাপ্ত হয়। ১৮৫১ খ্রীষ্টাব্দে এইখানে অটো গোল্‌স্মিড্ নামক সুপ্রসিদ্ধ জার্ম্মাণ পিয়ানো বাদ্যকরের সহিত তাঁহার শুভ পরিণয় হয়। সোণায় সোহাগা হইল। পর বৎসরে দম্পতিদ্বয় ইউরোপে চলিয়া আসেন। জেনী লিণ্ড ওরফে মাদাম গোল্‌স্মিড্ অত্যন্ত স্বদেশানুরাগী ছিলেন চারিদিক হইতে প্রচুর খ্যাতিসম্মান পাইলেও স্বদেশের প্রতি কর্ত্তব্য ভুলেন নাই। মার্কিণ হইতে স্বামীর সহিত ষ্টক্‌হল্মে আসিয়া তিনি কতকগুলি স্কুল প্রভৃতি প্রতিষ্ঠার জন্য ৬০০০০০ ছয় লক্ষ টাকা প্রদান করেন। আমেরিকায় অবস্থান কালে তিন লক্ষ দু হাজার ডলার্স পাইয়াছিলেন, ইহার মধ্যে পঞ্চাশ হাজার ডলার্স আমেরিকার নানা স্থানে খয়রাতী কার্য্যে ব্যয় করেন। দানে জেনী লিণ্ডের সমান প্রায় আর দেখা যায় না। ইঁহার স্বভাবও অত্যন্ত দয়ালু ছিল। এই রমণী বদান্যতা, দয়া, পরোপকারিতা এবং সঙ্গীতবিদ্যার দ্বারা যে জগতে অক্ষয় কীর্ত্তি স্থাপন করিয়া গিয়াছেন তাহা যুগযুগান্তেও ম্লান হইবার নহে।

শ্রীসুষমা দেবী।

জয়ন্তী।

(গল্প।)

জয়ন্তী বড় লোকের মেয়ে, বড় লোকের স্ত্রী। বাল্যে পিতৃগৃহে সুখে স্বচ্ছন্দে বর্দ্ধিতা, যৌবনে স্বামীগৃহেও সৌভাগ্যের ক্রোড়ে লালিতা। দৈন্য-দৈত্যের তাড়নাজনিত শারীরিক কিম্বা মানসিক কষ্ট পিত্রালয় কি শ্বশুরালয় কোথাও তাঁহাকে অনুভব করিতে হয় নাই। কিন্তু তাহা বলিয়া আমাদের বঙ্গদেশে সৌভাগ্যশালী বড়লোকের কন্যা কি বধূরা সচরাচর যে প্রকার ননীর পুতুলটী সাজিয়া নিষ্কর্ম্মা হইয়া বেশভূষা, গল্প, আহার নিদ্রাদিতে কালক্ষেপ করেন, আসাম রংপুরের (বর্ত্তমান শিবসাগর) এই সম্ভ্রান্ত ধনী ব্রাহ্মণ কন্যা সেই প্রকার ছিলেন না। পিতৃগৃহেই গুণসম্পন্না মাতার তত্ত্বাবধানে ও সুশিক্ষায় তিনি ভবিষ্যতের গার্হস্থ্য জীবনের প্রায় সমুদয় আবশ্যকীয় কার্য্যে সুশিক্ষিতা হইয়াছিলেন। আসামী ভদ্রঘরের কন্যারা যে সব বিদ্যায় পারদর্শিতা লাভ করা উচিত, জয়ন্তীর তাহা কিছুই বাকী ছিল না।

"টিক্ বলধা ওলাইমাটী
মাক ভাল জীয়েক জাতি।"

আমাদের দেশে খনার বচনের মত আসামে ডাকের বচন প্রচলিত। ডাকের কথিত ভূরি ভূরি বচন আসামী ভাষায় প্রচলিত আছে।

উপরের বচনের তাৎপর্য্য ঃ—

"যে বলদের পশ্চাদ্ভাগে হাত দিলেই লাফাইয়া উঠিবে, সেই বলদ কিনিবে; যে ক্ষেত বাড়ী হইতে বাহির হইয়াই দেখিতে পাওয়া যায় সেই জমি কিনিবে; যে মেয়ের মা সদ্‌গুণসম্পন্না আর সৎস্বভাবা সেই মেয়েকে বিবাহ করিবে।"

জ্ঞানী ডাকের এই বচন জয়ন্তীতে সার্থকতা লাভ করিয়াছিল। জয়ন্তী বিদ্যাবতী, কার্য্যকুশলা, ধার্ম্মিকা জননীর অনুরূপে গঠিতা হইয়া স্বগুণগরিমায় রংপুর নগর আলোকিত করিয়াছিলেন। কেহ যদি জিজ্ঞাসা করে রংপুর নগরের মধ্যে ভাল কাপড় বুনে কে? উত্তর দিতে হইবে জয়ন্তী। অতি উৎকৃষ্ট

ফুলদার পাড়ওয়ালা গায়ের কাপড় * (পারি দিয়া কাপড়) কার তাঁত হইতে বাহির হয়? বলিতে হইবে জয়ন্তীর। বিবাহাদি উৎসবে সুললিত কণ্ঠে সকলের শেরা গীত গাহিতে পারে কে? † জয়ন্তী। দশম, কীর্ত্তন, ঘোষা, রত্নাবলী প্রভৃতি শঙ্করদেব ও মাধবদেব বিরচিত বৈষ্ণব গ্রন্থগুলির কথা রংপুরের মধ্যে কোন্ মহিলার কণ্ঠস্থ? শুনিবে জয়ন্তী দেবীর। স্নানান্তে কেশবিন্যাস করিয়া কপালে সিন্দুরবিন্দু, কর্ণে স্বর্ণকুণ্ডল, গলায় হার, হাতে বলয় ‡ আর শুভ্র আসামী রেশমী বস্ত্র পরিহিত অঙ্গে করজোড় হইয়া বাল-সূর্য্যের সেই বরণীয় কান্তি ধ্যান করিবার সময় বশিষ্ঠজায়া অরুন্ধতীর মত সুন্দরী দেখায় কাহাকে? স্বীকার করিতে হইবে রাধানাথ বড়ুয়ার ষোড়শ বর্ষীয়া সহধর্ম্মিণী শ্রীমতী জয়ন্তী দেবীকে। সত্যই রাধানাথ বড়ুয়ার পত্নী শ্রীমতী জয়ন্তী দেবী প্রাচীন আসামের রাজধানী রংপুর নগরের মধ্যে সাবিত্রীর মত সতী, কমলার মত সুন্দরী, শচীর মত সৌভাগ্যবতী বলিয়া লোকবিদিত ছিলেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

আজ প্রায় এক শতাব্দী হইতে চলিল। আসামদেশ ব্রহ্মদেশীয় সৈন্য দ্বারা তিনবার আক্রান্ত হয়। তৃতীয়বারের আক্রমণ অতি ভীষণ। এইবার আসামদেশ ব্রহ্মরাজসৈন্যদ্বারা অধিকৃত হইয়া স্বাধীনতার পুষ্পমালা কণ্ঠদেশ

---

* ইহা আসামী ভদ্রমহিলাদের বিবাহাদি উৎসবে ব্যবহার্য্য এক প্রকার উচ্চদরের বস্ত্র। কাপড় বুনা অদ্যাপি আসামের ভদ্রমহিলাদের গুণপনার (accomplishment) মধ্যে। স্ত্রীপুরুষের পরিধান করিবার বস্ত্রাদি বাড়ীর মেয়েরা নিজহাতে প্রস্তুত করিত। অবশ্য আজ কাল ম্যাঞ্চেস্টরের প্রসাদে ইহা অনেকটা উঠিয়া গিয়াছে বলিতে হইবে। তবুও শিবসাগর প্রভৃতি স্থানে সম্ভ্রান্ত ঘরের মহিলারা স্বদেশপ্রসূত রেশমীবস্ত্র ছাড়া বিলাতী কাপড় আজও ব্যবহার করেন না।

† আসামী স্ত্রীলোকেরা সকলে মিলিয়া সুর করিয়া বানাইয়া বানাইয়া বিবাহাদিতে গান করে। আসামী ভাষায় তাহাকে "নাম গোয়া" নাম-গাওয়া বলে।

‡ আসামী মেয়েদের কর্ণভূষণের নাম, 'কেরু' বা 'থুরীয়া', হাতের অলঙ্কারের নাম 'খেরু'; আর গলার গহনাকে 'মণি' বা 'গলপতা'। এসিয়াটিক মিউজিয়মে এইগুলি পাঠকেরা দেখিতে পাইবেন।

হইতে অপসারিত করিয়া পরাধীনতার লৌহশৃঙ্খল গলায় ধারণ করে। ব্রহ্ম-সৈন্যের পদভরে স্বাধীন আসামের উচ্চ মস্তক অবনত হয়। ইন্দ্রবংশীয় আহম রাজার গৌরবরবি চিরজন্মের মত অস্তমিত হয়। ছয়শত বৎসর অকণ্টক রাজত্ব ভোগের পর সৌমার (উপর আসাম) বিজেতা আহমরাজ চুকাফার বংশধরগণ পথের ভিখারী হইতে চলিল।

১৭৪২ শকের ২রা চৈত্র হইতে ১৭৪৬ শকের ২১ শে মাঘ পর্য্যন্ত নৃশংস ব্রহ্মবাসীদের অত্যাচার, নিষ্ঠুরতা, হত্যা ও লুণ্ঠনাদি দ্বারা আসাম ক্ষতবিক্ষত ও জর্জ্জরিত হয়। ব্রিটিশ সূর্য্যের আগমনে আসাম হইতে, তিন বৎসর দশ মাস ঊনিশ দিন ব্যাপী এই ঘোর তামসী রাত্রির অবসান হয়। এই সময়ের আসামের অবস্থা লেখনী বর্ণনা করিতে অক্ষম। শিক্ষা, কৃষি, বাণিজ্য, শিল্প, সুখ, শান্তি পাপাত্মাদের দৌরাত্ম্যে দেশ হইতে একেবারে অন্তর্হিত হইয়াছিল। ইহাদের অত্যাচারে প্রায় এক তৃতীয়াংশ প্রজা আসাম হইতে তিরোহিত হইয়াছিল। স্বামী হইতে স্ত্রীকে, পিতা হইতে পুত্রকে, ক্রোড়ের সন্তান হইতে মাতাকে চিরজন্মের মত দুরাত্মারা বিচ্ছিন্ন করিয়াছিল। শত শত গ্রাম দেবালয় প্রভৃতি অগ্নিতে আহুতি প্রদত্ত হইয়াছিল। সহস্র সহস্র সতীসাধ্বীকে দুরাত্মাদের পঙ্কিলময় কবলে, সতীত্ব রত্ন বিসর্জ্জন দিতে হইয়াছিল। প্রকৃতির কাম্যকানন আসাম, মহাতপা বশিষ্ঠ, গালব, গোকর্ণ প্রভৃতি যোগী, তপস্বী, ঋষি, মুনিদের পবিত্র ক্ষেত্র আসাম; লীলাচল, অশ্বক্রান্ত, মণিকর্ণেশ্বর, উমানন্দ, শুক্রেশ্বর, হয়গ্রীবমাধব, বিশ্বনাথ প্রভৃতি হিন্দুদেবতাদের পীঠস্থান, তীর্থস্থান আসাম শ্মশানে পরিণত হইয়াছিল। ঠিক এই সময়কার একদিনের একটী ঘটনা আজ আমার এই গল্পের বিষয়।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

দেশের ঈদৃশাবস্থা। ধন প্রাণের এই প্রকার অস্থিরতা। দেশের রাজা চন্দ্রকান্ত সিংহ ব্রহ্মসৈন্যের ভয়ে কাপুরুষের মত রাজসিংহাসন ও রাজধানী পরিত্যাগ করিয়া পলাতক। ব্রহ্মসেনাপতি মিঙ্গি মাহাতিলুয়া রাজছত্রদণ্ড কুড়াইয়া পাওয়ার মত তুলিয়া লইল। দুর্ব্বৃত্ত ব্রহ্মসৈন্যের অত্যাচার, লুণ্ঠন,

হত্যা, জঘন্য ব্যবহার ও নৃশংসতাতে দুর্ভাগ্য আসাম ওলটপালট হইতে লাগিল। রাধানাথ বড়ুয়া কি করিবেন, কোথায় যাইবেন কিছুই ভাবিয়া স্থির করিতে পারিতেছেন না। বন্ধুবান্ধব ভৃত্যবর্গের অনেকেই প্রাণভয়ে দেশ ছাড়িয়া পলায়ন করিয়াছে, কিম্বা আসামের নিবিড় অটবিতে অপেক্ষাকৃত কম অত্যাচারী হিংস্র বন্যজন্তুর প্রতিবেশিত্ব স্বীকার করিয়াছে।

রাধানাথ দেখিলেন নিরুপায়। প্রাণ, মান, ধন, জন লইয়া আর জন্মভূমিতে বাস করা চলে না। বঙ্গদেশে সস্ত্রীক পলায়ন করা ছাড়া আর কোন উপায় দেখিতে পাইলেন না। সপ্তাহের ভিতরেই তিনি নিজদেশ পরিত্যাগ করিয়া বঙ্গ যাত্রা করিতে সংকল্প করিলেন।

ইতিমধ্যে একদিন ঠিক দুপুর বেলায় রাধানাথ বড়ুয়া আহারাদি করিয়া পালঙ্কের উপর শুইয়া বিশ্রাম করিতেছেন, চক্ষুতে একটু তন্দ্রা আসিতেছে মাত্র, পতিপ্রাণা জয়ন্তী গৃহকার্য্য সমস্ত সমাপন করিয়া কাছে বসিয়া ব্যজন হস্তে স্বামীকে বাতাস করিতেছেন। এমন সময় বাহিরের দরজায় সজোরে আঘাত পড়িতে শুনিতে পাইলেন। নাম ধরিয়া ডাকিয়াও কোন ভৃত্যের উত্তর না পাইয়া জয়ন্তী নিজে উঠিয়া গিয়া দেখিলেন যে তিনজন অস্ত্রধারী ব্রহ্মবাসী লগুড়াঘাতে গৃহদ্বার দ্বিখণ্ডিত করিয়াছে। দর্শনমাত্রেই জয়ন্তীর মুখ বিবর্ণ হইয়া গেল, তিনি ভয়ে কাঁপিতে লাগিলেন। বাড়ীর দাসদাসীরা প্রভুদের পরিত্যাগ করিয়া মুহূর্ত্ত মধ্যে কোথায় প্রাণ লইয়া পলাইয়া গিয়াছে, স্থিরতা নাই। ব্রহ্মদস্যুরা মুহূর্ত্তমাত্রেই ঘরে প্রবেশ করিয়া দম্পতীযুগলকে দৃঢ়রূপে বান্ধিয়া বাড়ী লুণ্ঠন করিতে লাগিল। দেশের ঈদৃশাবস্থা দেখিয়া ইহার পূর্ব্বেই রাধানাথ টাকা, কড়ি, গহনাদি মূল্যবান সামগ্রী সকল বাড়ী হইতে গৌহাটীতে ভ্রাতার কাছে পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। সেইজন্য ব্রহ্মদস্যুরা বিশেষ কিছু মূল্যবান জিনিষ টাকাকড়ি পাইল না। আশা নিষ্ফল হইয়াছে দেখিয়া দস্যুদিগের ক্রোধাগ্নি শতগুণ জ্বলিয়া উঠিল; দন্ত হইতে কড়মড়ধ্বনি ও চক্ষু হইতে যেন অগ্নিস্ফুলিঙ্গ বর্ষণ হইতে লাগিল। প্রথম ব্রহ্মদস্যু দ্বিতীয় দস্যুর প্রতি চাহিয়া বলিল, "ইহারা বড় চালাক লোক। টাকাকড়ি গহনাপত্র সমস্তই পূর্ব্ব হইতে লুকাইয়া রাখিয়াছে।" দ্বিতীয় ব্যক্তি, প্রথম ব্যক্তির

কথায় কোন উত্তর না দিয়াই রাধানাথের পৃষ্ঠে চাবুকাঘাত * করিয়া তর্জ্জন গর্জ্জন করিয়া জিজ্ঞাসা করিল "কোথায় টাকাকড়ি লুকাইয়া রাখিয়াছ এখনি দেখাইয়া দাও, নতুবা তোমাদের দুইজনকে এই ঘরের ভিতর আগুণ দিয়া পুড়াইয়া মারিব।" চাবুকাঘাতে রাধানাথের পৃষ্ঠদেশ হইতে ঝরঝর করিয়া রক্ত পড়িতে লাগিল, তিনি যন্ত্রণায় ছটফট করিতে লাগিলেন। স্বামীর এই প্রকার অবস্থা দর্শন করিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে জয়ন্তী কৃতাঞ্জলিপুটে কাতর কণ্ঠে দস্যুদিগকে বলিল, "তোমরা দয়া কর, আমার স্বামীকে আর প্রহার করিও না। আমাদের হস্তে কিছুই নাই। সত্যসত্যই বলিতেছি টাকাকড়ি, মূল্যবান অলঙ্কারাদি যা কিছু ছিল, দেশের এই প্রকার অরাজকতা দেখিয়া আমরা ইতিপূর্ব্বেই গৌহাটীতে আমাদের আত্মীয়ের বাড়ী পাঠাইয়া দিয়াছি। এখন তোমরা আমাদের দুইজনকে বিনাশ করিলেও তাহা পাইবার উপায় নাই। সেইজন্য আর আমাদের বৃথা নির্যাতন না করিয়া গৃহমধ্যে যাহা রহিয়াছে তাহাই লইয়া ছাড়িয়া দাও। তোমাদের পায়ে পড়ি আমার স্বামীকে আর মের না।" এই কথা শুনিয়া তিনজন দস্যুই অট্টহাস্য সহকারে বলিয়া উঠিল "তোমরা কি আমাদের বালক ঠাওরাইয়াছ যে এই সব কথা বিশ্বাস করিব। কোথায় কি লুকাইয়া রাখিয়াছিস বল্ না হ'লে প্রথমতঃ এই চাবুক প্রহারে তোদের পিঠের চামড়া উঠাইয়া ফেলিব, এবং তারপর আগুণ দিয়া দুইজনকে পোড়াইয়া মারিব।"

জয়ন্তীর অনুনয় বিনয়ে কর্ণপাত না করিয়া দুর্বৃত্তেরা রাধানাথকে প্রহারাদি করিয়া যে প্রকার যাতনা দিতে লাগিল তাহা অবর্ণনীয়। অবশেষে দস্যুরা যখন দেখিল এত যন্ত্রণা দিয়াও কিছুই তাহাদের কাছে পাওয়া গেল না, তখন প্রথম ব্যক্তি সঙ্গীদ্বয়কে সম্বোধন করিয়া বলিল "ইহাদের দুইজনকে লইয়া চল, পুরুষটা বেশ মোটাসোটা সবল আছে, আমাদের জিনিষপত্রাদি পিঠে বোঝাই দিয়া লইয়া যাই, পরে বেটাকে কাটিয়া ফেলিব। আর এই স্ত্রীলোকটা খুব সুন্দরী আছে, আমাদের মুলুকে লইয়া গিয়া রাজাকে দেব। রাজা এমন সুশ্রী রমণী পাইলে আমাদের উপর খুব খুসী হইবে।" দ্বিতীয়

* ইহাকে আসামী ভাষায় "চমতা" বলে। চামড়ার এক প্রকার অতি মজবুত চাবুক।

ব্যক্তি, প্রথম ব্যক্তির প্রস্তাবের প্রতিবাদ করিয়া বলিল, "দেখ্ ভাই তোমার একটা আজকাল রোগ হয়েছে, যা কিছু ভাল জিনিষ পাইলেই বলিয়া ওঠ, যে এইটা মুলুকে গিয়া রাজাকে দেব। কেন রাজাকে দেব, আমি তো বলি এই সুন্দরী স্ত্রী আমার, আমি কাউকেই দেব না। তোমরা টাকাকড়ি যা খুসী লও, কিন্তু আমার ভাগে এ।" শুনিবামাত্রই তৃতীয় ব্যক্তি গর্জ্জন করিয়া বলিয়া উঠিল "কার? তোমার? কখনই না। আমি দেখব, কে আমার হাত থেকে কেড়ে নেয়।" দুইজনের মধ্যে এই প্রকার পৌরাণিক সুন্দ-উপসুন্দী দ্বন্দ্ব চলিতে দেখিয়া, প্রথম ব্যক্তি ইহার মীমাংসা পরে হইবে, বলিয়া দুইজনকে আশ্বাস বচনে সান্ত্বনা করিল। তাহার পর সস্ত্রীক রাধানাথকে লুণ্ঠিত দ্রব্যাদি সহিত বন্ধন করিয়া তাহারা লইয়া চলিল। জয়ন্তী বিপদহারী ভগবানকে কাতর কণ্ঠে ডাকিতে ডাকিতে পতিসহ চলিতে লাগিল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

পথিমধ্যে, আত্মসংযমে অভ্যস্তা জয়ন্তী মনে মনে হঠাৎ একটি উপায় স্থির করিয়া ক্রোধভাব পরিত্যাগ পূর্ব্বক ব্রহ্মদস্যুদিগকে সম্বোধন করিয়া মৃদু মধুর কণ্ঠে বলিল "দেখ ফায়া * তোমরা যখন আমাদের ধরিয়া লইয়া চলিলে, আর আমাদের ধনসম্পত্তি রাখিবার বৃথা চেষ্টা করিয়া ফল কি? আমরাই যখন চলিয়া যাচ্ছি, আর আমাদের ধনসম্পত্তি কে উপভোগ করিবে? আমার অদৃষ্টে ভগবান যাহা লিখিয়াছেন, তাহাই হইবে, কিন্তু যদি তোমরা আমার স্বামীকে প্রাণে না মারিয়া ছাড়িয়া দিতে প্রতিশ্রুত হও, তাহা হইলে আমাদের একবার ফিরৎ লইয়া চল, কোথায় আমাদের বিপুল ধনসম্পত্তি লুকাইয়া রাখিয়াছি দেখাইয়া দিব।"

জয়ন্তীর অলৌকিক রূপলাবণ্য ইতিপূর্ব্বেই দস্যুদিগকে আংশিকরূপে জয় করিয়া রাখিয়াছিল। এখন তাঁহার এই সুমধুর বচন ও বিপুল অর্থ প্রাপ্তির লোভ তাহাদিগকে একেবারেই পরাজিত করিল। তাহারা হর্ষোৎফুল্ল হৃদয়ে পুনর্ব্বার ফিরিয়া রাধানাথের বাটীর নিকটবর্ত্তী হইল। জয়ন্তী বাড়ীর

* "ফায়া" ব্রহ্মদেশীয় সম্মানসূচক সম্বোধন।

সম্মুখস্থ এক কাঞ্চন বৃক্ষের তলা নির্দ্দেশ করিয়া দেখাইয়া বলিল, এইখানেই চারি হাত পরিমিত মাটির নীচেই আমরা আমাদের সমস্ত ধনরত্ন লুকাইয়া রাখিয়াছি; তোমরা খুঁড়িয়া বাহির করিয়া লও।"

শ্রবণমাত্রেই দস্যুরা কাঞ্চনবৃক্ষের সহিত রাধানাথকে দৃঢ়বদ্ধ করিয়া আনন্দ মনে কোদালি লইয়া সেই নির্দ্দিষ্টস্থানে খনন করিতে লাগিল। এইখানে বলা আবশ্যক যে দস্যুরা জয়ন্তীকে স্ত্রীলোক অবলা বলিয়া অধিকক্ষণ বাঁধিয়া রাখা আবশ্যক মনে করে নাই। তাহারা মনে করিল স্ত্রীলোক আর কোথায় পালাইবে, এখনি ধরিয়া ফেলিব।

প্রায় অর্দ্ধঘণ্টা কাল তিন দস্যুই এক জনের পর একজন করিয়া চারিহাত গভীর গর্ত্ত খনন করিল। কিন্তু ধনসম্পত্তির কোন চিহ্ন দেখিতে পাইল না। প্রথম দস্যু জয়ন্তীকে কর্কশস্বরে সম্বোধন করিয়া বলিল "থাথ তুই কি আমাদের সঙ্গে ঠাট্টা করছিস? এই তো এক গলা খুঁড়লুম, টাকা কোথায়?" জয়ন্তী গম্ভীরভাবে উত্তর করিল "আরো একটু খোঁড়, নিশ্চয় পাবে, আর না পাও তো আমরা গলা পাতিয়াই রহিয়াছি, আমাদের দুজনকেই কাটিয়া ফেলো।" গর্ত্তস্থিত দস্যু আশ্বস্ত হইয়া আবার একান্ত মনে খনন করিতে লাগিল। উপরের দুই দস্যু স্বকীয় তরবারি নিজ নিজ পার্শ্বে রাখিয়া একটু অন্যমনস্ক হইয়া পরস্পর গল্প করিতেছে দেখিয়া সুবিধা বুঝিয়া জয়ন্তী বিদ্যুৎবেগে তাহাদের দুইজনকে ধাক্কা দিয়া সেই গভীর একগলা গর্ত্তে ফেলিয়া দিয়া সেই ভূমিস্থিত তরবারি দ্বারা চকিতের মধ্যে তিনজনেরই শিরশ্ছেদন করিয়া স্বামীর বন্ধন মোচন পূর্ব্বক উন্মাদ নৃত্য করিতে লাগিল। রাধানাথের সমস্তই স্বপ্নবৎ প্রতীয়মান হইল। কোথায় সেই ভীমকায় দুর্বৃত্ত দস্যুর কবলে প্রতি মুহূর্ত্তে জীবনাশা জলাঞ্জলি দিতে হইয়াছিল, আর কোথায় তাহাদের মৃতদেহ স্বকৃত দুষ্কার্য্যের প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ স্বকৃত গর্ত্তের মধ্যে মস্তকশূন্য হইয়া পড়িল। কোথায় সেই ভয়বিহ্বলা দুঃখিনী প্রণয়িণী বসিয়া নয়নজলে বস্ত্রাঞ্চল সিক্ত করিতেছিল, কোথায় এই রণোন্মত্তা চামুণ্ডারূপিণী রমণী অসিহস্তে নৃত্য করিতেছে! কোথায় কাঞ্চনবৃক্ষে তিনি বধ্য বন্দীরূপে ছিলেন, আর পলকের মধ্যে কিরূপে তিনি বন্ধনমুক্ত হইলেন। নিমিষের মধ্যে কি অদ্ভুত পট-পরিবর্ত্তন। এই নৃত্যকারী উন্মাদিনী রমণীই কি তাঁহার সেই শান্তা, লজ্জা-

শীলা ও ভীতা জয়ন্তী? এই সব স্বপ্ন, কি মায়া, কি প্রকৃত, কিছুই রাধানাথ ঠাওরাইতে না পারিয়া চক্ষু মুদ্রিত করিয়া বসিয়া পড়িল। ক্ষণকাল পরে নেত্র উন্মীলিত করিয়া দেখিল যে ইহা স্বপ্নও নয়, মায়াও নয়, সত্যসত্যই দুরাত্মাদের কবন্ধদেহ গভীর গর্ত্তে লুণ্ঠিত হইয়া পড়িয়া রহিয়াছে, আর সত্যই তিনি মুক্ত এবং সত্যসত্যই তাঁহার প্রিয়তমা জয়ন্তী মুক্তকেশী চামুণ্ডার ন্যায় রক্তাক্ত কলেবরে অসিহস্তে নৃত্য করিতেছেন। হায়! জয়ন্তী কি সত্যই উন্মাদিনী হইল! রাধানাথ স্পষ্টই দেখিলেন তাঁহার জয়ন্তী বাহ্যজ্ঞানশূন্য উন্মত্তা!

ইহার পর লোকজনের সাহায্যে জয়ন্তীকে লইয়া সেইরাত্রেই রাধানাথ বড়ুয়া নৌকা করিয়া রংপুর ছাড়িয়া গৌহাটী অভিমুখে প্রস্থান করিল। গৌহাটীতে আসিয়া নিজ ভ্রাতা ও বন্ধুজনের সহায়তায় অনেক প্রকার চিকিৎসাদি করাইলেন। কিন্তু জয়ন্তী আর আরোগ্য লাভ করিল না। সেই বিষম উন্মাদ রোগাচ্ছাদিত অবশিষ্ট জীবনের শেষ মূহূর্ত্ত পর্য্যন্ত জয়ন্তীর মুখ হইতে "স্বামীর হাতের বাঁধন খুলেছি," "স্বামীর হাতের বাঁধন খুলেছি" এই বাক্য ছাড়া আর কোনও কথা শোনা গেল না। মৃত্যু স্বক্রোড়ে আশ্রয় দান করিয়া জয়ন্তী কুসুমসদৃশ নিষ্পাপ সতী রমণীকে ইহসংসারের দুঃখযন্ত্রণার হস্ত হইতে উদ্ধার করিল।

শ্রীপ্রজ্ঞাসুন্দরী দেবী।

বঙ্গ-অদর্শন।

চক্রবৎ জগৎ ঘুরিতেছে। দিবার পর রাত্রি, গ্রীষ্মের পর শীত, শুক্লপক্ষের পর কৃষ্ণপক্ষ, উত্তরায়ণের পর দক্ষিণায়ন, যৌবনের পর জরা, জন্মের পর মৃত্যু ইহা নিত্য আবর্ত্তিত হইতেছে। ঈশ্বরের নিয়মে এ সকল সংঘটিত হইতেছে —কে ইহা অতিক্রম করিবে? আমরা সমস্ত পৃথিবীশুদ্ধ লোক সমবেত হইয়া যদি ক্রন্দন করি, যে, হে রাত্রি! তুমি আসিও না—চলিয়া যাও, তাহা হইলে কি ঈশ্বরের নিয়ম লঙ্ঘন হইতে পারে? এই বিধিপ্রবর্ত্তিত নিয়ম যেমন কালে, তেমনি দেশে, তেমনি মনুষ্যসমাজে, তেমনি সকলের প্রতি সমানভাবে কার্য্য করিতেছে। একশত বৎসরের বঙ্গজীবন আলোচনা করিলে আমরা দেখি বঙ্গদেশের প্রতিও এই নিয়ম সম্যকরূপে কার্য্য না করিয়া যায় নাই।

প্রায় শত বৎসর পূর্ব্বে যখন ভারতমাতার ক্রোড়ে নবপ্রসূত বঙ্গ-শিশু রামমোহন ও দ্বারকানাথরূপী দুই চক্ষু উন্মীলিত করিয়া জাগ্রত হইল তখন কি আনন্দের কাল! সেই শৈশবকালে সকলি উৎফুল্ল—চারিদিক উৎসবময়। জগতের চতুর্দ্দিক হইতে লোক আসিয়া সেই নবজাত বঙ্গ-শিশুর সুন্দর মুখনিরীক্ষণে আনন্দ প্রকাশ ও আশীর্ব্বাদ করিতেছে। সে প্রায় এক শতাব্দী কাল অতীত হইল। ক্রমে শৈশব হইতে বঙ্গ-শিশু সরল বাল্যাবস্থায় পদার্পণ করিল। সে সময়ে দেবেন্দ্রনাথ ও বিদ্যাসাগর প্রভৃতি সরল স্বভাব মহাত্মাগণ যে বাল্যলীলা খেলিয়া গেলেন এখনও আমাদিগের অন্তরে তাহার সুখস্মৃতি জাগিয়া উঠে। সেই বাল্যবয়সে বঙ্গে যে সকল লোকের আবির্ভাব হইয়াছিল তাঁহারা বালকের ন্যায় সরলস্বভাব ছিলেন, সরলমতি বালকের ন্যায় তাঁহারা অল্পেতেই কাঁদিয়া ফেলিতেন ও অল্পেতেই আনন্দিত হইতেন। বিদ্যাসাগর ও দেবেন্দ্রনাথ প্রভৃতি সেকালের লোকের চরিত্র যাঁহারা আলোচনা করিবেন, তাঁহারা দেখিবেন সারল্য-কথা বাল্যছবি তাঁহাদিগের মুখে পরিস্ফুট। আহা! সেই মধুরভাষিত বঙ্গবালকের সুকণ্ঠ শ্রবণে তখন লোকের প্রাণে

কতই না আনন্দ সঞ্চার হইত? বঙ্গের সেই বাল্যবয়সে যে সকল মহাজনের আবির্ভাব হইয়াছিল, তাঁহারা একদিকে যেমন বালকের ন্যায় সরলচিত্ত, হাসি-মুখে ছুটাছুটি করিয়া বেড়াইতে রত, তেমনি অন্যদিকে বিদ্যাভ্যাসেও কম আস্থা প্রদর্শন করেন নাই—"বাল্যেভ্যস্তবিদ্যানাং" এই কথার সার্থকতা দেখাইয়া গিয়াছেন। তত্ত্ববোধিনী সভা তাহার নিদর্শন। তত্ত্ববোধিনী সভায় সেকালের বালককণ্ঠ বড় মধুর শুনাইত। সেইকালে বঙ্গের প্রথম হাতে খড়ি হইয়াছিল—বিদ্যাসাগরের বর্ণপরিচয় দেখা দেয়াছিল।

বস্তুতঃ এই বাল্যকালের পর হইতে বঙ্গের চক্ষু উন্মীলিত হইতে লাগিল—বালক-বঙ্গ ক্রমে উদ্দাম যৌবনে পদার্পণ করিতে চলিল। দেশবিদেশের জ্ঞানাহরণের জন্য এক তীব্রপিপাসা তাঁহার অন্তরে জাগিয়া উঠিল। কেশব চন্দ্র প্রমুখ ধর্ম্মবীরগণের ধর্ম্মান্দোলন ও বঙ্কিম প্রমুখ মনীষীগণের সাহিত্য আলোচনার কলরবে নব্যবঙ্গের প্রথম যৌবন বড় অল্প মুখরিত হয় নাই। বস্তুতঃ এই যৌবনে বঙ্গদেশ চক্ষুষ্মান হইয়া উঠিল—তাহার তীক্ষ্ণদৃষ্টি চতুর্দ্দিকে প্রসারিত হইয়া পড়িল। এই সময়ে যৌবনের দিবালোকে বঙ্গের উজ্জ্বল চক্ষু সকল বিষয়ে দীপ্তি পাইতে লাগিল—ইহাকেই বঙ্গ দর্শনের কাল বলা যাইতে পারে। এই কালের বঙ্গদর্শন, আর্য্যদর্শন প্রভৃতি মাসিক-পত্রগুলির নাম হইতেই যুবক-বঙ্গের উজ্জ্বল দৃষ্টি শক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। সেকালের ভারতী কিন্তু প্রবীণ প্রৌঢ় ব্যক্তির ন্যায় বহির্দৃষ্টি অপেক্ষা অন্তর্দৃষ্টি অর্থাৎ দর্শনশাস্ত্রের প্রতি বিশেষ মনোযোগ দিয়াছিল। যুবা বয়সে বঙ্গের অন্তরে এক তীক্ষ্ণ দর্শনস্পৃহা জাগ্রত হইয়াছিল দেখা যায়। সেই সময়ে বঙ্গ-দেশে সর্ব্ববিষয়ে যৌবনের বিকাশ দেখা দিয়াছিল। এই সময়ে বঙ্গে এক যৌবন-উন্মাদনার পরিচয় পাওয়া যায়। লোকে যৌবনে যেমন নবীন তেজে কোন বাধাবিঘ্ন কোন শৃঙ্খলা মানিতে চাহে না, সেইরূপ যৌবনকালে বঙ্গচিত্তও শাস্ত্রের সকল শৃঙ্খলা অতিক্রম করিয়া দেশবিদেশের প্রতি ধাবিত হইয়াছিল। কিন্তু যৌবনের গুণের সঙ্গে সঙ্গে যৌবনের নানা পাপবৃত্তি নানা দোষও আসিয়া আক্রমণ করে; বঙ্গের ভাগ্যেও তাহাই ঘটিল। যৌবনের বিষয়লালসা,

যৌবনের ভোগস্পৃহা ও কামিনীকাঞ্চনে অভিরুচি উহার অল্প অনিষ্ট করে নাই। এককাল এমন গিয়াছে যখন অতিরিক্ত সুরাপান, বঙ্কিম হাবভাব এবং উপন্যাস ও কবিতার বিলাসিতার উপভোগে বঙ্গ-যুবক উন্মত্তপ্রায় হইয়া উঠিয়াছিল—পাপস্রোতে অঙ্গ ঢালিয়া দিয়াছিল। বলিতে গেলে এই কালে বঙ্গহৃদয়ে বিষবৃক্ষ রোপিত হইয়াছিল। তথাপি একথা বলিতে হইবে যে একদিকে বঙ্কিম বিলাসরসে অন্যদিকে রবির বামাকণ্ঠে বঙ্গের যৌবন-মধ্যাহ্ন কলরবে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু সে সময়ের উপন্যাস ও কবিতার বিলাসিতা বঙ্গের রক্তে রক্তে বিষয়োপভোগের তীব্র বিষ সঞ্চার না করিয়া যায় নাই।

যুবক বঙ্গ যৌবনে যে সকল অত্যাচার করিলেন শীঘ্রই তাহার কুফল দেখা না দিয়া যাইতে পারে না। বঙ্গের শরীরে শীঘ্রই জরা আসিয়া আবির্ভাব হইল। আর মুখে সে দীপ্তি নাই, শরীরে আর সে তেজ নাই, চক্ষে চালশে ধরিয়াছে—আর সে যৌবনের দৃষ্টিশক্তি নাই। যৌবনের রক্তকণিকাসমূহ একে একে নিস্তেজ হইতে লাগিল। বঙ্গযুবক প্রৌঢ়ত্বে পদার্পণ করিলে ভারতী-ভারাক্রান্ত দেহে যেন অন্তর্দৃষ্টি বা দর্শনশাস্ত্রে অধিক-তর মনোনিবেশ করিল। ক্রমে জরাভাব ঘনীভূত হইতে লাগিল। বৃদ্ধ-বয়সে বাল্যস্মৃতি বিশেষ জাগিয়া উঠে—বাল্যকথালাপে বৃদ্ধেরা সমধিক আনন্দ উপভোগ করেন, তাই অতীতকথারূপ ইতিহাস বৃদ্ধ বঙ্গের কিছুকাল হইতে প্রিয়বস্তু হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

যৌবন দিবার অবসানে জরানিশীথের যে রাজত্ব আসিয়াছে, সমস্ত বঙ্গদেশে তাহার স্পষ্টচিহ্ন প্রকাশ পাইয়াছে। এই যে স্বদেশীভাবের অতিমাত্রা দেশে জাগিয়াছে, ইহা কি? বঙ্গ জরাজীর্ণ দেহ লইয়া দেশবিদেশে চলাচল করিতে অসমর্থ, তাই স্বদেশরূপ গৃহে প্রবেশ ভিন্ন ইহা আর কিছু নহে। যে বঙ্গদেশ 'কি স্বদেশে কি বিদেশে' গান গাহিয়া নিশান উত্তোলন পূর্ব্বক সার্ব্বভৌমিক ভাবে মাতোয়ারা হইয়া এতদিন দেশবিদেশে ছুটাছুটি করিয়া বেড়াইবার জন্য ব্যগ্র ছিলেন, হায়! আজ সেই বঙ্গ জরাক্রান্ত দেহে উত্থান-

শক্তি রহিত হইয়া স্বদেশরূপ গৃহশয্যায় শয়ান।

সকলেই জানেন জরাজীর্ণ দেহে **ভেদ** (পেটের অসুখ) হইলে শীঘ্র দেহ নাশ করে। অশুভক্ষণে বঙ্গের এই জরাজীর্ণ দেহে **বঙ্গভেদ** (Partition) আক্রমণ করিয়া উহার অঙ্গ অধিকতর শিথিল করিতে চলিয়াছে। ভয় হয় বুঝিবা এক্ষণে বঙ্গ-অদর্শন হইবার মুখে মৃত্যুমুখে পতিত হইতে চলিয়াছে! হা বিধি! এক্ষণে এ রোগীকে **মৃতসঞ্জীবনী ঔষধে** অর্থাৎ বিষবড়ি দিয়া আর কতদিন বাঁচাইয়া রাখা যাইবে। বন্ধুবান্ধবেরা আইস একবার **শেষ বঙ্গ দর্শন** করিয়া লও—একবার শেষ দেখা দেখিয়া লও। গৃহে গৃহে ক্রন্দন-রোল উঠিয়াছে। প্রিয় বঙ্গদেশের এই অন্তিম অবস্থা দেখিয়া কে বা শোক সম্বরণ করিতে পারে? অশ্রুবর্ষণ ভিন্ন আর কাহারও কোন হাত নাই।

মৃতং শরীরমুৎসৃজ্য কাষ্ঠলোষ্ট্রসমং ক্ষিতৌ।
বিমুখা বান্ধবা যান্তি ধর্ম্মস্তমনুগচ্ছতি॥

হয়ত বঙ্গ-অদর্শনের সঙ্গে সঙ্গে উহার শরীর বিসর্জ্জন দিয়া বান্ধবেরা বিমুখ হইবেন, কিন্তু এক **পুণ্যই** উহার শুভকারী হইয়া অমর আত্মার **তর্পণ** করিবে।

শ্রীঋতেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

পদরাগ।

(১) পদরাগ

রামকেলি—কাওয়ালি।

প্রভো! তব পদসেবা করিবহে চিরকাল,
প্রেমের বেতন দিয়া করে রাখো মোরে ভৃত্য,
প্রিয়কার্য্য উপাসনা করিব জীবনে নিত্য;
অন্তিমে দেখিও যেন বঞ্চিত না করে কাল।
বিষয়ের মায়াদাসী প্রলোভনে ভুলাইতে
আসে যায় কতবার বিষমন্ত্র কাণে দিতে—
'করিবে সামান্য কাজ, শুধু লবে পাপভার,
সেথা পাবে ধনজন ঐশ্বর্য্য বেতনসার;'
প্রভু আমি কতকাল তোমার পুরাণো ভৃত্য,
তব পদে লেগে আছে মম প্রাণমন চিত্ত;
দয়া কর মোর প্রতি তুমি অগতির গতি,
মোর চিরজনমের তুমি একমাত্র পতি;
তোমার গৌরবে প্রভো আমার গৌরব জাগে,
হৃদয় রঞ্জিত কর তব চির পদরাগে।

(২) পূর্ণদাতা।

আড়ানা বাহার—তাল মধ্যমান।

শক্তি তাঁর খেলিতেছে অণুতে অণুতে;
তাঁর বলে চলাচল করে পঞ্চভূতে;

বরেণ্য জগৎ পিতা,
মহান ব্রহ্ম সবিতা,
এই সে অনন্ত লোক তিনি অনুক্ষণ
পরম করুণা-হস্তে করেন পালন ;
বিশ্বমাঝে তিনি এক সবাকার পাতা ;
চিরভোগে সবে মত্ত, তিনি পূর্ণ দাতা।

(৩) মনেতেই সব।

বাগেশ্রী—ঢিমাতেতালা।

মনেতেই পাপপুণ্য মনেতেই সব ;
মনেতে চাঞ্চল্য পূর্ণ বাহিরে নীরব—
সাধু সে পরম ভণ্ড,
পাইবে ভীষণ দণ্ড,
গলে মালা জপতপ তার বৃথা সব,
লোকপ্রবঞ্চনা তরে দেবতার স্তব ;
সামান্য প্রার্থনা এক মনের সহিত
সাধিবেরে সকলের সুমহান হিত।

(৪) পাপরবি।

সারঙ্গবাহার—ঝাঁপতাল।

পাপরবি খরতর দগ্ধ করে ভবে,
তৃষাতুর শুষ্ককণ্ঠে চলিয়াছে সবে ;
যাত্রীগণ পরিশ্রান্ত অবসন্ন কায়
আসিয়া বসিল যবে তব পদ ছায়ে,
শুভক্ষণে ছুটিলরে পুণ্য উৎস-জল—
চিরসুধাময় ধারা বহে সুশীতল ;

সেই জল পানে আর নাহি দুঃখ ক্লেশ,
পার হয় অনায়াসে পাপমরু দেশ।

(৫) নিশিদিন জপ।

মালকোষ—পটতাল।

নিশিদিন জপ জপ সেই ইষ্টদেবে
হৃদয়ের নিকেতনে সঙ্গোপনে এবে ;
যাহা বলিবার আছে তাঁরে নিরজনে
ডেকে বল সব কথা, পাবে তৎক্ষণে ;
এমন পরম সখা কোথা পাবে আর ?
তিনি মাতা পিতা স্বামী ধনজনসার।

শ্রীঋতেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

দেশীয় খাদ্যপাক।

চাপাটি।

উপকরণ।—ময়দা আধপোয়া, ঘি আধছটাক, নুন দু চুটকি * (সৈন্ধব নুন দিলেই ভাল), একটুকু জল (ময়দা ঠেশিবার জন্য)।

প্রণালী।—প্রথমে ময়দার সঙ্গে নুনটুকু খুব মিশাইয়া লও। তারপরে ঘৃতটা ময়দার সঙ্গে দলিয়া দলিয়া মিশাও। একটুকু জল দিয়া ময়দাকে বেশ

* চুটকি বা চিমটি অর্থে তিন আঙ্গুলে (বুড়া আঙ্গুল, মাঝের আঙ্গুল ও তর্জনীতে) যতটুকু ধরে।

ঠেশিয়া শক্ত করিয়া মাখ। খানিকক্ষণ ধরিয়া বেশ ঠেশিতে হইবে। এই মাখা ময়দা থেকে পাঁচটী গুটী কাটিয়া লুচির মত পাতলা পাতলা গোলাকার করিয়া বেল।

এইবারে একটি তাওয়ায় একটী টোপাকুলের মত ডেলা ঘি ছাড়িয়া আগুনে চড়াও। ঘিটুকু গলিলে খুন্তি দিয়া সমস্ত তাওয়ার গা-ময় মাখাও। তারপরে বেলা রুটীগুলা এক একখানা করিয়া তাওয়ায় ছাড়। এপিঠ ওপিঠ উল্টাইয়া দাও। একটী রুটী সেঁকা হইয়া গেলে আরেকটী ছাড়িবে। মিনিট পাঁচ ছয়ের মধ্যেই সবগুলা হইয়া যাইবে। রুটী সেঁকিবার কালে উনানের নরম আঁচ করা চাই।

ভোজন বিধি।—গরম গরম রুটী, ডাল বা মাংসের কারির সঙ্গে কিম্বা আচার চাটনি দিয়া খাইতে দাও বেশ লাগিবে। এই রুটী খাইতে বেশ মোলায়েম হয়।

শ্রীঃ দেবী।

কাঁচা আমের আচার।

উপকরণ।—কাঁচা আম পঞ্চাশটা, শুক্লালঙ্কা-গুঁড়া একপোয়া, নূতন সরিষা-গুঁড়া তিন ছটাক, লবণ আধপোয়া, সরিষার তেল দেড়পোয়া, একটি নূতন হাঁড়ি কিম্বা কড়ির বুয়েম।

প্রণালী।—মাঝারী দেখে কাঁচা আম খোলাশুদ্ধ চার ফালি করো, এবং ভিতরকার কসি বাহির করিয়া ফেলো; আর আমগুলিকে রৌদ্রে ফেলিয়া দাও। যখন খুব ভালরূপ আমসির ন্যায় শুকাইয়া আসিবে তখন ঐ আমেতে খুব মিহি সরিষা-গুঁড়া ও লঙ্কা-গুঁড়া এবং নুন ও সরিষার তেল সব এক সঙ্গে মাখাইয়া রৌদ্রে দিবে। দু'চার দিন বাদ একবার করিয়া দেখিতে হইবে। যখন দেখিবে তেল শুকাইয়া গেছে তখন আবার উহার উপর তেল ও নুন মাখাইতে হইবে ও রৌদ্রে দিতে হইবে। এই রকম কিছুদিন করিলে আম-

গুলি যখন নরম হইবে, তখন লুচি, রুটীর সহিত কিম্বা ভাতের সহিত খাইতে পার। দিশী কাঁচা আমড়ারও এই রকম করিয়া করিতে পারা যায়।

শ্রীসুনৃতা দেবা।

পাকা তেঁতুলের আচার।

উপকরণ।—নূতন পাকা তেঁতুল ডেড় পোয়া, বড় বড় কাঁচালঙ্কা গোটা-ত্রিশ, সরিষার তেল আধ পোয়া, নুন এক ছটাক, চার পাঁচটা শুক্লালঙ্কা-গুঁড়া, আধতোলা ভর্ হলুদ-গুঁড়া, বড় মেতি এক তোলা। একটি পাথরের খোরা কিম্বা বড় রকম একটি পাথরের বাটীতে করিতে হইবে।

প্রণালী।—পাকা তেঁতুলের আঁটি বাহির করিয়া ফেলিবে; তারপর রৌদ্রে খুব ভাল করে শুকাইয়া লও। তেঁতুল শুকাইয়া গেলে, কাঁচালঙ্কা চার ফালি করিবে। মেতিগুলি আধ-ভাজা আধ-কাঁচা করিয়া, আধগুঁড়া করিয়া আলাদা রাখিয়া দাও। এইবারে তেঁতুলের সঙ্গে সব মশলা মিশাও; হলুদ-গুঁড়া, লঙ্কা-গুঁড়া, মেতি-গুঁড়া, সরিষার তেল, নুন সব মিশাও এবং ঐ সঙ্গে চারফালি করা কাঁচালঙ্কাগুলিও দাও। তারপর খুব খট্‌খটে রৌদ্রে দিবে; যখন কাঁচালঙ্কাগুলি নরম হইয়া যাইবে তখন জলপানের সহিত খাইতে পারিবে। ইহা বেশী দিন থাকিবে না।

শ্রীসুনৃতা দেবী।

সোণায় অরুচি।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

কর্ত্তার বৈঠকখানায় আসিয়া উপস্থিত হইলে, কর্ত্তা—আমার শ্বশুর মহাশয় কহিলেন,—"এস, বাবা বস।" এই বলিয়া আপনার পার্শ্বেই আমার বসিবার স্থান নির্দ্দেশ করিয়া দিলেন। কর্ত্তার আদেশে আমি বসিলে পর, তিনি কহিলেন,—"কেমন, পড়াশুনা কেমন হইতেছে?"

আমি বিনীতভাবে কহিলাম,—"এক প্রকার ভালই চলিতেছে। তবে ইচ্ছা ছিল, প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া বৃত্তি পাইলে প্রেসিডেন্সী কালেজে এফ, এ, পড়িব; কিন্তু হঠাৎ বাবার মৃত্যুতে এবং সাংসারিক অবস্থা বড় ভাল নয়, তাই অগত্যা বাধ্য হইয়া আমাকে সে সঙ্কল্প পরিত্যাগ করিতে হইয়াছে।"

কর্ত্তা। "তোমার প্রেসিডেন্সী কালেজে পড়িবার ইচ্ছা, আমার কিন্তু অন্যপ্রকার ইচ্ছা।"

এবার পূর্ব্ববৎ বিনীতভাবে কহিলাম,—"আপনার কি ইচ্ছা।"

কর্ত্তা। "আমার টাকার অভাব নেই,—নিজে মাসে মাসে আটশত টাকা বেতন পাইতেছি, কোম্পানির কাগজ আছে—জমিদারী আছে। সুতরাং আমার আন্তরিক ইচ্ছা, কি আমার ছেলেরা—কি জামাতারা, সকলেই পণ্ডিত হয়—পণ্ডিত হ'য়ে আমার মুখ উজ্জ্বল করে। কিন্তু তা ভগবান আমাকে দিলেন কৈ? ছেলে কয়টির স্বাস্থ্য ভাল নয়—চির রোগা। বড় জামাই বরদা দাস—বরদাকে বিলেত পাঠাব মনে করিলাম, হঠাৎ ব্যারাম হ'য়ে পড়ায় বিলেত যাওয়া হ'লো না। এখন তুমি,—আমার বড় ইচ্ছা যে, তুমি বিলেত যাও,—বিলেত হতে সিবিল সার্ব্বিস (civil service) টা দিয়ে এস,—দেশে চাকুরীর তো এই দুরবস্থা অহরহ স্বচক্ষে দেখছ। তারপর আমার টাকার অভাব নেই,—যত টাকা লাগবে, মোট টাকাই আমি দিতে স্বীকৃত আছি।"

এবার স্থিরচিত্তে আমি কর্ত্তার কথাগুলি শুনিলাম। বিলাত যাইতে যে একেবারেই আমার ইচ্ছা না হয় তাহা নহে। তবে আমার যে বংশে জন্ম—আশৈশব যে বংশে আমি প্রতিপালিত, তাহাতে আমার ইচ্ছা হইলেও বিলাত যাইতে কখনই পারিব না। কেননা আমার প্রাণস্বরূপ—আমার ধর্ম্মাত্মা অগ্রজ মহাশয়, কখনই জাতিচ্যুত হইয়া আমাকে বিলাত যাইতে দিবেন না,—ইহা স্থির নিশ্চয়। বরং যদি আমি তাঁহার ইচ্ছার বিরুদ্ধে যাই, তবে তিনি আপনার হৃদয়ে মরণাধিক যন্ত্রণা পাইবেন, ইহাও স্থির নিশ্চয়। সুতরাং আমার অমন দেবপ্রতিম অগ্রজের অন্তঃকরণে ক্লেশ দিয়া বিলাত যাওয়া আমার নিকট সমীচীন বলিয়া বোধ হইল না। তাই কর্ত্তার কথায় অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া কহিলাম,—"বিলাত যেতে যদিও আমার কতকটা ইচ্ছা হয়, কিন্তু আমার দাদা আমার বিলাত যাবার প্রস্তাবে কখনই স্বীকৃত হইবেন না।"

কর্ত্তা। "কেন সম্মত হইবেন না? আর তোমার দাদা সম্মত না হইলেই বা ক্ষতি কি? টাকা দিব আমি—যাবে তুমি, ইহাতে তোমার দাদার মতামতে কি আসিয়া যাইবে।"

কর্ত্তার এবারকার কথা কয়েকটী আমার কর্ণে বাজিল। বিলাত যাইবার কথায় এবার দেখিতেছি যে, কর্ত্তা প্রকারান্তরে ভ্রাতৃবিচ্ছেদের মূল মন্ত্র আমারই কর্ণে ঢালিতেছেন; নহিলে, হয়ত কর্ত্তা বলিতেন যে,—"তোমার দাদাকে বুঝাইয়া পড়াইয়া যাহাতে কার্য্যোদ্ধর হয় তাহারই চেষ্টা করিয়া দেখ।" যাহা হউক, আমি আমার সদরআলা শ্বশুর মহাশয়ের কথাটা অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত আপনার মনে ভাবিতেছিলাম, আর এক একবার হৃদয়ে একটা হাসির তরঙ্গ,—একটু ঘৃণার তরঙ্গ উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিতেছিল; কিন্তু সহসা কোন উত্তর দিতে পারিলাম না। তবে সহৃদয় পাঠক! বলিয়া রাখি যে, আজ এই সংসারক্ষেত্রে আমার কঠোর অগ্নিপরীক্ষার দিন। একদিকে চিরদরিদ্র ভ্রাতৃবৎসল অগ্রজের স্নেহপাশ অন্যদিকে স্বার্থান্ধ শ্বশুরের বিপুল অর্থ—বিলাত যাইবার মোহ, ভবিষ্যতে উচ্চ রাজপদ লাভ,—নিতান্ত পক্ষে হাইকোর্টের Briefless ব্যারিষ্টার, প্রাণাধিকা কিশোরী পত্নীর প্রেম,—সে প্রেমও এই বিপুল অর্থের সহিত একই সূত্রে গাঁথা; এখন ভবিষ্যত সুখ

দুঃখ—ভাল মন্দ বিচারাক্ষম নবীব যুবক আমি—আমি কোন্ পথ অবলম্বন করিব—কোন্ পথ অবলম্বন করা আমার কর্ত্তব্য? কর্ত্তা বলিলেন,—"তোমার দাদার আবার মতামত কি?" আমার বিপুল অর্থশালী শ্বশুর একথা বলিতে পারেন; কিন্তু আমার বড় দুর্ভাগ্য যে, বিধাতা আমাকে জন্মাবচ্ছিন্ন এই অর্থশালী শ্বশুরের জামাই না করিয়া, দরিদ্র অগ্রজের কনিষ্ঠ সহোদর করিয়া এ সংসারে পাঠাইয়াছেন। আমার জীবনের এই দীর্ঘ বিংশ বর্ষ কাল, সেই চির-দরিদ্র পিতা ও অগ্রজের কষ্টার্জ্জিত অন্নে আমার জীবনের প্রত্যেক শোণিত-কণা,—মেদমাংস গঠিত হইয়াছে; সুতরাং অতুল বৈভবশালী শ্বশুরের উপদেশ মত দাদার অমতে অথবা তাঁহার মত না লইয়া বিলাত যাইতে স্বীকৃত হইতে পারিলাম না। আমি জানিতাম যে, বিলাত গেলে একটা কৃষ্ণ বিষ্ণু কিছু হইয়া আসিতাম—দেশের মুখ উজ্জ্বল করিলেও করিতে পারিতাম; কিন্তু যিনি আমার এই উন্নতি দেখিলে হাতে স্বর্গ পাইবেন, সেই দাদাই যখন আমার বিলাত যাওয়ার পক্ষে ঘোর অসম্মত ইহা স্থির নিশ্চয়; তখন তাঁহার হৃদয়ে কষ্ট দিয়া, জাতি ও সমাজ পরিত্যাগ করিয়া বিলাত যাইয়া আমার কি লাভ হইবে,—হৃদয়ে কি সুখভোগ করিব বুঝিতে পারিলাম না। যাঁহার বড় কষ্টার্জ্জিত অন্নে আমার এই জীবন—এই বিপুল বিভবশালী শ্বশুরের জামাই হইতে পারিয়াছি, তিনিই যখন আমার এই উন্নতিতে ঘোর বিতৃষ্ণ, তবে কাহার জন্য আমার সেই দেবতুল্য ভ্রাতৃবৎসল অগ্রজের হৃদয়ে শেলাঘাত করিয়া বিলাত যাইব? সুতরাং অনেকক্ষণ আপনার মনে ভাবিয়া ভাবিয়া, শেষ নীরব হইয়া রহিলাম,—কর্ত্তার কথায় কোন উত্তর দিতে পারিলাম না।

কর্ত্তা আমাকে এতক্ষণ নীরব হইতে দেখিয়া কহিলেন,—"কেন, কি ভাবিতেছ।"

আমি। "সংসারে আমি সব করিতে পারি,—পারিব না শুধু আমার দাদার অন্তরে কোন আঘাত করিতে। তিনি—যিনি এই এতদিন বড় কষ্টে অর্থোপার্জ্জন করিয়া, সেই কষ্টার্জ্জিত অর্থে এতদিন আমাকে মানুষ করিয়া আসিলেন, এখন আমি আমার নিজের সামান্য সুখের জন্য তাঁহার অন্তঃকরণে কষ্ট দিতে কখনই পারিব না।"

কর্ত্তা। "ইহাতে আর তাহার অন্তরে কষ্ট দেওয়াই বা কি হ'লো? বরং

বিলেত হতে এসে না হয় একটা মোটা রকমের মাসিক দেবার বন্দোবস্ত করিও, আর তাহা হইলেই তিনি তোমার উপর প্রসন্ন হইবেন এবং তোমারও যথেষ্ট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ পাইবে,—লোকেও প্রশংসা করিবে।"

কর্ত্তার এবারকার কথায় আমার মনে বড় বিরক্তির সঞ্চার হইল। আমার দাদা আমার উপার্জ্জিত অর্থের কিছুমাত্র প্রত্যাশী নন,—তাহা নিশ্চয়; শুধু আমার বিচ্ছেদই তাঁহার দুঃখের একমাত্র প্রধান কারণ, তাই আমি এবার একটু বিরক্তির সহিত কহিলাম,—"তিনি এমন নীচ বংশে জন্মেন নাই যে, তিনি আমারই উপার্জ্জিত অর্থের প্রত্যাশায় বসিয়া আছেন, শুধু জীবনে আমার স্নেহপাশ ছিন্ন করিতে সম্যক্ অসমর্থ—আমার বিরহ যাতনা ভোগ করিতে কাতর।"

এবার আমার কথাগুলি শুনিয়া কর্ত্তা বিজ্ঞের ন্যায় আপনার মনে আপনি কহিলেন,—"বাঙ্গালীর ছেলেদের মাথা খাইবার একমাত্র প্রধানতম কারণ, তাহাদেরই মূর্খ অভিভাবক।" এই বলিয়া নীরব হইলেন।

বাঙ্গালী অভিভাবকদিগের প্রতি কর্ত্তার এই কঠোর মন্তব্য শুনিয়া আমি আর স্থির থাকিতে পারিলাম না; কেননা, আমি আমার ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে যতদূর বুঝিতাম, তাহাতে আমার অগ্রজ মোহিনীরঞ্জন বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন উপাধীধারী না হইলেও, তিনি যে একজন প্রকৃত পণ্ডিত—একজন আদর্শ মহাপুরুষ, তাহা তাঁহার সেই পরম পবিত্র দেবচরিত্রের প্রতি অঙ্কে স্পষ্টাক্ষরে অঙ্কিত দেখিতাম। সংসারে এই দীর্ঘকাল নানা রকমের অনেক লোক দেখিলাম, অনেক পিতাকে দেখিলাম—অনেক জ্যেষ্ঠভ্রাতাকে দেখিলাম; কিন্তু আমার স্বর্গগত পরমারাধ্য পিতৃদেবঠাকুর অথবা আমার অগ্রজ মহাশয়ের ন্যায় অমন আদর্শ দেবচরিত্রের লোক সংসারে কখন দেখিয়াছি বলিয়া আমার মনে হয় না,—জীবনে আর কখন অমন দেবচরিত্র দেখিব বলিয়া কিছুমাত্র বিশ্বাস হয় না। তাই কর্ত্তার এই তীব্র মন্তব্যে আমার একটু রাগ হইল, সঙ্গে সঙ্গে ঘোর অভিমান আসিয়া দেখা দিল। আমি আর স্থির থাকিতে না পারিয়া কহিলাম,—"বাঙ্গালীর অভিভাবকদের সম্বন্ধে আপনি যে কঠোর মন্তব্য প্রকাশ করিলেন, আপনার এই তীব্র মন্তব্য বাঙ্গালীদের চরিত্রে কতকাংশে খাটিলেও আমার দাদার সম্বন্ধে কিছুমাত্র খাটে না। আপনি তাঁহাকে

কখন দেখেন নাই,—না দেখিয়া তাঁহার প্রতি এই কঠোর মন্তব্য প্রকাশ করিতেছেন ; কিন্তু একবার দেখিলে—একবার তাঁহার সহিত পরিচিত হইলে কখনই তাঁহার সম্বন্ধে এমন রূঢ় ভাষা প্রয়োগ করিতেন না। আপনি কি, বর্ত্তমান কালে আপনি অহরহ যাঁহাদের অনুকরণ করিতে নিযুক্ত আছেন,—যাঁহাদের আদর্শে আপনার জীবন ও চরিত্র গঠন করিতে সতত অভিলাষী, আপনার সেই সব আদর্শ মহাপুরুষেরাই দাদার পবিত্র দেবচরিত্র দেখিয়া সতত মুগ্ধ এবং শতবার শতমুখে তাঁহারই প্রশংসাগীতি গাহিয়া আসিতেছেন। তবে আমার বড় দুর্ভাগ্য যে, আজ এই সর্ব্বপ্রথম আপনার নিকটেই তাঁহার নিন্দা শুনিতে হইল। কি করিব—উপায় নাই। আমি দরিদ্র—আপনি ধনী ; সুতরাং ধনের গৌরবে যাহা বলিবেন, আমাকে এখন তাহাই অম্লান অন্তঃকরণে সহ্য করিতে হইবে। তবে মনে রাখিবেন, দরিদ্র হইলেও—আমি ইতর প্রকৃতির লোক নহি।” এই বলিয়া নীরব হইলাম, আর কথা বলিতে পারিলাম না—ঘোর অভিমান ও আত্ম-গ্লানিতে বুঝি তখন আমার নয়নে জল আসিয়াছিল।

কর্ত্তা আমাকে নীরব হইতে দেখিয়া কহিলেন,—“অত রাগারাগিতে কাজ কি? আমি তোমার ভবিষ্যৎ ভালর জন্যই এত উপদেশ দিলাম। যেদিন তোমার হাতে মেয়ে দিয়েছি, সেইদিন হ’তে মেয়ের ভাল মন্দ দেখিবার অধিকার বোধ হয় আমার হইয়াছে,—তাই এত কথা বলিলাম। নহিলে তোমার নিকট উপদেশ লইবার জন্য এত কথা বলি নাই।” এই বলিয়া কতকটা রাগভরে বৈঠকখানা হইতে উঠিয়া গেলেন।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

রাগভরে কর্ত্তা বৈঠকখানা হইতে উঠিয়া গেলে পর, আমি অনেকক্ষণ ধরিয়া বসিয়া বসিয়া আপনার মনে কত কি ভাবিলাম, কর্ত্তার হিতোপদেশ, আমার প্রতি রাগ, রাগভরে বৈঠকখানা পরিত্যাগ প্রভৃতি কার্য্যের বারবার আলোচনা করিয়া বেশ বুঝিতে পারিলাম যে, এখানে আইসাই আমার অকর্ত্তব্য হইয়াছে। যদি এই পুজোপলক্ষে শ্বশুরগৃহে না আসিতাম, তবে

হয়ত আজি এমন করিয়া আমারই আত্মীয়স্বজনের প্রতি এমন স্নেহশূন্য—সহানুভূতিশূন্য নীরস মন্তব্য শুনিতে হইত না, আর কর্ত্তাও আমার উপর রাগ করিয়া উঠিয়া যাইতেন না। যাহা হউক, যাহা হইবার হইয়াছে, তাহা আর ফিরিবে না—ফিরিবার নয়। এই ভাবিয়া আমিও বৈঠকখানা হইতে উঠিয়া গেলাম।

* * * *

এমনই অবস্থায় বড় মানসিক অশান্তিতে দিন কাটিয়া গেল। রাত্রে আবার আহারাদি শেষ করিয়া পূর্ব্বদিনের মত অন্তঃপুর মধ্যে শয়ন করিতে আসিলাম। শয়নগৃহে প্রবেশ করিয়া দেখিতে পাইলাম যে, পঙ্কজিনী আজ পূর্ব্বাহ্ণেই শয়নগৃহে আসিয়া শয়ন করিয়াছেন। আমি ধীরে ধীরে শয্যায় আসিয়া শয়ন করিলে পর, পঙ্কজিনী আপনার বালিকাসুলভ চপলতার বশে কহিলেন যে,—“কি আজ বাবাকে চটাইয়া দিয়াছেন কেন?”

আমি। কৈ, তোমার বাবাকে আবার কিসে চটাইলাম।

পঙ্কজিনী। বাবা আপনাকে আপনারই ভালোর জন্য বিলেত পাঠাতে চেয়েছিলেন,—বিলেত গিয়ে পড়াশুনা ক’রে আসিলে একটা জজ ম্যাজিষ্ট্রেট হ’তে পাত্তেন,—সেটা আপনার ভাল না বাবার ভাল? তা এজন্য আপনি কোথায় বাবাকে অধিক ভক্তি কর্ব্বেন—ধন্যবাদ দিবেন, না, তাঁহাকেই উল্টা উপদেশ দিতে বসেছিলেন।

আমি। কৈ, আমি তো তাঁহাকে কোন উপদেশ দিই নাই অথবা তাঁহার কোন নিন্দা করি নাই ; বরং তিনি আমার দাদার প্রতি শ্লেষপূর্ণ বাক্যবাণ নিক্ষেপ করিয়াছিলেন। আর তাই দাদার অযথা নিন্দা আমার সামনে করেছিলেন বলেই, সত্যের অনুরোধে—ন্যায়ের অনুরোধে দুই একটা অপ্রিয় কথা আমাকে বলতে হ’য়েছিল। তবে এমন কিছু বলি নাই যাতে ক’রে তাঁর কোন অপমান হ’তে পারে।

পঙ্কজিনী। তা বেশ তো, তিনি তোমার আমার ভালর জন্যেই হাজারে হাজারে টাকা খরচ ক’রে বিলেত পাঠাতে চেয়েছিলেন। আজিকার দিনে কোন্ শ্বশুর জামাইয়ের জন্য এতটা করে থাকে—বল।

আমি। আমি তো তাঁহাকে আমার জন্য হাজারে হাজারে টাকা ব্যয়

কর্ত্তে বলি নাই।

পঙ্কজিনী। এটা তো বরং আরও সুখের বিষয়। তুমি না চাহিতে যখন তিনি নিজ হ'তে বিলাত পাঠাতে চান—বিপুল অর্থ ব্যয় করে তোমাকে দশের একটা কর্ব্বার জন্য বিলেত পাঠাতে ইচ্ছুক তখন তাহাতে তোমার অমত কেন?

আমি। জাতি পরিত্যাগ ক'রে বিলেত যেতে আমি পার্ব্বোনা।

এবার পূর্ব্বের ন্যায় বালিকাবয়সের চপলতায় পঙ্কজিনী হো হো শব্দে হাসিয়া কহিলেন,—"এতেই তো সকলে তোমাকে বাঙ্গাল বলে হাসিয়ে উড়িয়ে দেয়।"

আমি মলিনমুখে মলিন হাসি হাসিয়া কহিলাম,—"বাঙ্গাল বলে এখন হাসিয়ে উড়িয়ে দিলে আর চলিবে না। বরং বাঙ্গাল বলে উড়িয়ে দেবার আগে একবার ভেবে দেখা উচিত ছিল যে, একদিন এই বাঙ্গালের করে কন্যাদান করিবার জন্য কতই না আগ্রহ প্রকাশ করিয়াছিলেন।"

পঙ্কজিনী। করেছিলেন সত্য; কিন্তু তখন আশা ছিল যে, একদিন তোমার মত বাঙ্গালকে হাতে পাইয়া শিক্ষা ও উপদেশ দ্বারায় তোমার স্বভাব সংশোধন করিয়া লইবেন।

এবার আমি হাসিয়া কহিলাম,—"এখন আমাকে সভ্য করিতে পার আর না পার, এখন এই বাঙ্গালের সহবাসে তোমাদিগকে—বিশেষতঃ তোমাকেও একদিন অসভ্য হ'তে হবে।"

এবার আমার কথায় পঙ্কজিনী একটা হৃদয়ভেদী দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া কহিলেন,—"কি করিব, বিধিলিপি—আমার অদৃষ্ট।"

এমনই ভাবে আরও অনেক কথাবার্ত্তা হইল। পঙ্কজিনীর আজিকার কথাবার্ত্তায় পরিস্কার বুঝিতে পারিলাম যে, শ্বশুরগৃহের সকলেই আমার উপর বিষম চটিয়াছেন, এবং তাঁহারা আমার ন্যায় দরিদ্র পথের ককুর বাঙ্গালের করে আপনাদের এই অমূল্যরত্ন কুসুম-সুকুমারী লাবণ্যময়ী পঙ্কজিনীকে দান করিয়া ঘোর অনুশোচনাগ্রস্ত হইয়াছেন। অন্যদিকে, আরও শুনিলাম যে, স্বয়ং পঙ্কজিনী, যদি তাঁহার বিবাহ আমার সহিত না হইয়া, আর কাহারো সহিত—কোন নব্যতন্ত্রের যুবকের সহিত বিবাহ হইত, তাহা হইলে তিনিও

সমধিক সুখী হইতেন। কথাটা শুনিয়া আমার কিছুমাত্র রাগ হইল না; বরং দুঃখ ও ঘোর আত্মগ্লানি আসিয়া উপস্থিত হইল। মনে হইল, হায়! কেন না বুঝিয়া হঠাৎ বাহ্যসম্পদের মোহে মুগ্ধ হইয়া দরিদ্র আমি—আমি বামন হইয়া স্বর্গের চাঁদ পাইবার আশায় মুগ্ধ হইয়া, ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান না ভাবিয়া পঙ্কজিনীকে বিবাহ করিয়া নিজের আর সেই সঙ্গে সংসারজ্ঞানশূন্যা এই বালিকার চিরজীবনের সুখ শান্তি—আশা ভরসায় জলাঞ্জলি দিয়াছি। ধিক্ আমাকে।

আমি নীরবে অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত আপনার মনে আকাশ পাতাল কতকি ছাই ভস্ম ভাবিলাম, তারপর ধীরে ধীরে কহিলাম,—"কি করিবে—উপায় তো আর নাই। যখন আমাকে বিবাহ করিয়াছ—আমার কণ্ঠে একদিন বরমাল্য দান করিয়াছ, তখন আজীবন এমনই ভাবে ছিন্ন কুসুমের ন্যায় গভীর দুঃখ ও গভীর অনুশোচনায় তোমাকে তোমার জীবন কাটাইতে হইবে,—আক্ষেপ করিয়া কি হইবে?"

আমার কথা কয়েকটী বুঝি পঙ্কজিনীর হৃদয়তৃপ্তিকর হইল না, তাই কোন উত্তর না করিয়া নীরব হইয়া রহিলেন। আমিও আর বেশী বাড়াবাড়ি না করিয়া কহিলাম,—"আমি তো কালই বাড়ী যাইব,—তোমাকে আমার সঙ্গে যেতে হবে।"

এবার কতকটা বিরক্তির সহিত পঙ্কজিনী কহিলেন,—"এই তো ক'দিন এসেছি, আবার এখনই যাবার জন্য অত পীড়াপীড়ি কেন? যদি আসিয়াছি, তবে কিছুদিন এখানে থাকিয়া পরে যাইব। আর যেয়ে তো আবার সেই ঘোর কষ্টের মধ্যে পড়তে হবে।"

আমি স্নেহপূর্ণ কাতর কণ্ঠে কহিলাম,—"কি কষ্ট পঙ্কজিনি!"

কতকটা ঘৃণাভরে—কতকটা অবজ্ঞা করিয়া ঘোর বিরক্তির সহিত পঙ্কজিনী কহিলেন,—"কষ্ট আর কি? বড়ই সুখ—বড় সুখেই আমাকে রেখেছেন আর কি?" এই বলিয়া আবার নীরব হইলেন।

আমি। তুমিই শুধু কষ্ট কষ্ট কর; কিন্তু কৈ বালিকা বউঠাকুরাণী (অপরাজিতা) তো কখন ভুলেও একবার কষ্টের কথা মুখেও আনেন না; বরং সদাসর্ব্বদা মধুর হাসিমুখে আপনার প্রত্যেক মুহূর্ত্তটি কাটাইয়া আসিতেছেন।

পঙ্কজিনী। তাঁর ধাতে সব সয়—গরীব দুঃখীর মেয়ে, যা করাবে তিনি সবই কর্ব্বেন; তা বলে আমি শুধু শুধু সে কষ্ট সহ্য কর্ব্বো কেন? আমার কিসের অভাব?

আমি। অভাব আর কিসের, শুধু তোমার অদৃষ্টের—তোমার পিতা-মাতার বুঝিবার দোষের।

পঙ্কজিনী। তাঁহাদের দোষ কি? তাঁহারা তো তোমার এবং আমার দুঃখ ও কষ্ট মোচনের জন্য সতত ইচ্ছুক। কিন্তু তুমিই তো আপনার বুদ্ধির দোষে তাঁহাদের সে হিতকথায় কর্ণপাত করিতেছ না।

আমি। একথা তোমার পিতার পূর্ব্বেই ভেঙ্গে বলা উচিত ছিল, যে আমি ঘরজামাই রাখিব।

পঙ্কজিনী। শ্বশুরগৃহে থাকিলেই বুঝি ঘর জামাই হ'তে হয়? বড় দিদির স্বামী বরদা দাস বাবুও বুঝি এতদিন ঘর জামাই হয়ে ছিলেন—যা।

বৃথা বাক্যব্যয়ে বৃথা কলহের—ঘোর অশান্তির সৃষ্টি, তাই আমি কহিলাম, —"তোমার জামাই বাবু যাহা করিয়াছেন, আমাকেও যে তাহাই করিতে হইবে, এমন কোন কথা নেই। তারপর একটু বিলম্ব করিয়া কহিলাম,— "এখন তুমি আমার সহিত যাবে কিনা তাহাই জিজ্ঞাসা করিতেছি।"

পঙ্কজিনী। "এখন আমি তোমার সহিত যেতে পার্ব্বোনা। যতদিন বাবা ও মা এখানে আছেন, ততদিন এখানে থাকিব; তারপর যাহা হয় লিখিব।" এই বলিয়া নীরব হইলেন।

রাত্রিতে আর কোন কথাবার্ত্তা হইল না। এমনই ভাবে রাত্রি কাটিয়া গেল। রাত্রি কাটিয়া গেলে পরদিন অপরাহ্ণে আমি একাকী, জীবনে এই প্রথম, আর বলিতে কি জীবনে এই শেষ, শ্বশুরগৃহ হইতে আপনার গৃহাভি-মুখে যাত্রা করিলাম। বলা বাহুল্য, পঙ্কজিনী পিত্রালয়েই রহিলেন।

ক্রমশঃ

শ্রীউমেশচন্দ্র মৈত্রেয়।

আমি আমার প্রধান সহায়।

(গানের স্বরলিপি।)

আজকাল আত্মসহায়তা আত্মনির্ভরের এক কথা উঠিয়াছে এবং অনেক বিশিষ্ট ব্যক্তিরা আজকাল এই পথে অগ্রসর হইবার জন্য উত্তেজিত ও উৎ সাহান্বিত হইয়া উঠিয়াছেন, কিন্তু বহু পূর্ব্বে ১৭ বৎসরেরও পূর্ব্বে ১৮১০ শকে পূজনীয় শ্রীযুক্ত হিতেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় রচিত 'ত্রিশূল' নামক পুস্তকে এই আত্মনির্ভর বিষয়ক "আমি আমার প্রধান সহায়" শীর্ষক একটী সুন্দর গীত প্রকাশিত হয়। আমার বোধ হয় এই শ্রেণীর গীতের মধ্যে ইহাই প্রথম কিন্তু সেই সময়ে এই গানটী বড় একটা কাহারও গ্রাহ্যের বিষয় হয় নাই এবং এমন কি তাঁহার আত্মীয়স্বজনদিগের অনেকে এইরূপ আত্মনির্ভরের গান দেখিয়া তাঁহাকে উপহাস করিতেও কুণ্ঠিত হন নাই। আজ দেখিতেছি এই আত্মনির্ভরের ভাব আত্মসহায়তার ভাব সমগ্র বঙ্গে পরিব্যাপ্ত হইবার উপক্রম হইয়াছে। বিদেশ বা পরের প্রতি বিদ্বেষ ভাব বা বিষময় ঘৃণার ভাবের বশবর্ত্তী হইয়া ইহা রচিত হয় নাই তবে সর্ব্বস্থলে পরমুখাপেক্ষী না হইয়া বিশুদ্ধ ভাবে আত্মচেষ্টা ও আত্মনির্ভরের উপর দাঁড়াইতে পারিলে যে সকলের হিত সাধিত হইতে পারে ইহাতে তাহাই ধ্বনিত হইয়াছে। পাঠকবর্গের কৌতূহল চরি-তার্থের জন্য সেই গানটী আমরা স্বরলিপিসহ 'পুণ্যে' প্রকাশ করিলাম।

শ্রীঋ, না, ঠ।

সারঙ্গ—মিশ্র পটতাল।

আমি আমার প্রধান সহায়
তবে কেন গো খুঁজিবারে যাই
পরের কাছে সহায়তায়?

পুণ্য।

নিজের সাহায্যে
সুন্দর হব
মহান হব
নানা কর্ম্ম কার্য্যে
পরসহায়তা
সাধ্য রহিতে কখনো লইব না
আমি আমার শ্রেষ্ঠ সুহৃদ যে তাতো দেখিব না
শুধু পরের দিকে চাহিয়া রব ॥

তালি । ১ (স্থা, স্ত, ভো) । ২ ॥
মাত্রা । ৪ । ৪ ॥

সা৩ পা । রে২ রে২ । মা পা মা রে ।
২
আ মি । আ মার্ । প্র ধা ন স ।

নি২ সা২ রে২ নি২ সা২ । স্সা৩ নি । ধা
২ ২
হা — — — —য়্ । ত বে । কে

ধা পা২ । মা গা মা পা । মা রে
ন গো । খুঁ জি বা রে । যা —

সা২ । সা রে সা ধা । পা২ পা২
—ই । প — রে —র্ । কা ছে

নি সা রে মা । রে মা রে সা ॥
২
স হা — — । — — — তায় ॥

২.....২.....
(স্ত)ঃ— পা৩ মা । ধা৪ । সা২ সা২ । সা৩
(স্ত)ঃ— নি জে । র । সা হা । য্যে

পা । পা৩ পা । পা২ পা২ । গা পা৩ । পা২ পা২ ।
— । সু ন্দর্ । হ ব । ম হান্ । হ ব ।

ধ্নি৩ নি । ধা৩ পা । পা৩ ম্পা । গা৪ ।
না না । ক র্ম্ম । কা — । র্য্যে ।

২
গা ধা পা ম্পা । গা গা৩ । গ্সা৩ ধা ।
প র স হা । য় তা । সা ধ্য ।

পা পা পা২ । গা মা পা২ । মা রে
র হি তে । ক খ নো । ল ই

সা সা ॥
ব না ॥

(ভো)ঃ— মা৩ মা । মা২ মা২ । পা৩ পা ।
(ভো)ঃ— আ মি । আ মার্ । শ্রে ষ্ঠ ।

পা পা পা পা । প্নি ধা নি২ ।
সু হৃ দ যে । তা — তো ।

২.........
ধা ধা পা পা । সা২ সা২ গা২ মা২ ।
দে খি ব না । শু ধু প রের্ ।

পা২ পা । গা গা মা২ । রে২ সা২ ॥
দি কে । চা হি য়া । র ব ॥

শ্রীহিতেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

ওঁ

পুণ্য

পুণ্যং প্রাণান্ ধারয়তি পুণ্যং প্রাণদমুচ্যতে

রাজা রামমোহন রায়ের বিদ্যাশিক্ষা।

যে কোন কার্য্যের সূত্রপাত ভাল হইলে তাহা সহজেই অনেক দূর অগ্রসর হইয়া যায়। রামমোহন রায়ের জীবনের সূত্রপাতে দুইটী বড়ই হিতকারী বন্ধু জুটিয়াছিল দেখিতে পাই। সেই দুইটী বন্ধু—স্মৃতিশক্তি এবং মনোযোগ। এই দুইটি তিনি তাঁহার পিতৃকুল ও মাতৃকুল উভয় হইতেই উত্তরাধিকার সূত্রে লাভ করিয়াছিলেন। ফলে, তাঁহার মেধা ও মনোযোগ অসাধারণ হইয়াছিল। এই মেধাশক্তি উত্তরকালে যে তাঁহার কিরূপ উপকারে আসিয়াছিল, তাহা নিম্নলিখিত গল্পে প্রকাশ পাইবে। একদা এক পণ্ডিত আসিয়া কোন এক তন্ত্রশাস্ত্র সম্বন্ধে তাঁহার সহিত বিচার করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিলেন। রামমোহন রায় দেখিলেন যে তিনি পূর্ব্বে উক্ত গ্রন্থ পাঠ করেন নাই। পণ্ডিতকে তিনি সুতরাং বলিলেন যে "আপনি আগামী কল্য ঠিক এই সময়ে আসিবেন, বিচার হইবে।" পণ্ডিত চলিয়া গেলেন। রামমোহন রায়ের নিকট উক্ত গ্রন্থ ছিল না। পণ্ডিত চলিয়া যাইবার পরেই রামমোহন রায় সভাবাজারের রাজবাটী হইতে পুস্তক লইয়া আসিলেন. এবং মনোযোগ পূর্ব্বক অধ্যয়ন করিলেন। একবার অধ্যয়নমাত্র পুস্তকখানি তাঁহার সম্পূর্ণ আয়ত্ত হইয়া গেল। তৎপরদিবস যথানির্দ্দিষ্টসময়ে বিচারার্থী ব্রাহ্মণ আসিয়া উপস্থিত; ঘোরতর বিচার হইল। পরিশেষে তিনি রামমোহন রায়ের পাণ্ডিত্য ও তর্কশক্তির নিকট পরাজয় স্বীকার করিয়া গৃহে প্রতিগমন করিলেন।

মেধাশক্তি ও মনোযোগে, এই উভয়ের পরস্পরের মধ্যে এক ঘনিষ্ট সম্বন্ধ আছে, ইহা সর্ব্বস্বীকৃত। কোন বিষয় মনোযোগের সহিত আলোচনা না করিলে তাহা সহজে স্মৃতিশক্তির আয়ত্ত হয় না। রামমোহন রায়ের মনোযোগেরও একটী দৃষ্টান্ত দিই। একদিন তিনি প্রাতঃস্নান পূর্ব্বক একটী নির্জন গৃহে বসিয়া সংস্কৃত বাল্মীকি-রামায়ণ অধ্যয়ন করিতে আরম্ভ করিলেন। পূর্ব্বে কখন তিনি উক্ত গ্রন্থ পাঠ করেন নাই; সুতরাং বিশেষ আগ্রহাতিশয়-সহকারেই পাঠ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। ক্রমে বেলা অধিক হইল, দুই প্রহর অতীত হইয়া গেল, অথচ তাঁহার পাঠ সমাপ্ত হইল না। পরিবারবর্গকে তিনি বিশেষ করিয়া নিষেধ করিয়া দিয়াছিলেন যে, কেহ যেন কখন তাঁহার পাঠের ব্যাঘাত উপস্থিত না করে। আহারের সময় উত্তীর্ণ হইয়া যায়, অথচ কাহারও সাহস হইল না যে, রামমোহন রায়ের পাঠের বিঘ্ন করিয়া আহারের বিষয়ে সম্বাদ প্রদান করে। ক্রমে ক্রমে সকলেই আহার করিলেন, রামমোহন অধ্যয়নে নিমগ্ন। বেলা তৃতীয় প্রহর অতিক্রান্ত হইল। পুত্র নিরশন থাকাতে রামমোহনজননীও আহার করেন নাই। তখন রামমোহন রায়ের বিশেষ শ্রদ্ধাভাজন রাধানগরনিবাসী এক ব্যক্তি সাহস পূর্ব্বক তাঁহার গৃহদ্বার ঈষৎ উন্মুক্ত করিলেন। রামমোহন রায় বুঝিতে পারিয়া আর একটু প্রতীক্ষা করিবার জন্য তাঁহাকে ইঙ্গিত করিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরেই পাঠ সমাপ্ত করিয়া আহারাদি করিলেন। কথিত আছে, তিনি এই এক দিনের মধ্যে একাসনে সপ্তকাণ্ড রামায়ণ পাঠ শেষ করিয়াছিলেন।

এই অসাধারণ মেধাশক্তি ও মনোযোগ রামমোহন রায়ের বিদ্যাশিক্ষা বিষয়ে যে বাল্যাবধি বিশেষ সহায়তা করিয়াছিল, তাহা বলা বাহুল্য। রামমোহন রায়ের সময়ে গুরুমহাশয়ের পাঠশালা, ভট্টাচার্য্যের চতুষ্পাঠী, এবং মৌলবীদিগের মাদ্রাসা, এই তিন প্রকার শিক্ষার স্থান ছিল। যতদূর অবগত হওয়া যায়, রামমোহন রায়ের এই তিন স্থানেই যথারীতি শিক্ষালাভ ঘটিয়াছিল। প্রথমে গুরুমহাশয়ের পাঠশালায় তাঁহার বিদ্যারম্ভ হয়। শৈশবকালেও তাঁহার অসাধারণ মেধা ও বুদ্ধিশক্তির পরিচয় পাইয়া গ্রামস্থ লোকেরা আশ্চর্য্য হইয়াছিল। তখন আরবী ও পারসী ভাষাদ্বয় রাজভাষা ছিল। রামমোহন রায়ের পিতা তাঁহার পুত্রের তীক্ষ্ণ মেধা ও বুদ্ধিবৃত্তিকে বিষয়কর্ম্মের পক্ষে

অতীব হিতজনক বোধ করিয়া তাঁহাকে উক্ত ভাষাদ্বয় শিক্ষা দিতে মনস্থ করিলেন। পিতৃগৃহেই তিনি পারস্যভাষা শিক্ষা আরম্ভ করেন। উক্ত ভাষায় বিশেষ উন্নতি ও আরবী শিক্ষার জন্য, নবম বৎসর বয়সে রামকান্ত রায় রামমোহনকে পাটনায় প্রেরণ করেন। তিনি তথায় প্রায় তিন বৎসর অবস্থিতি করিয়া ইউক্লিড এবং অ্যারিষ্টটলের গ্রন্থ পর্য্যন্ত পাঠ করেন। ইহা জানা কথা যে মৌলবীগণ অন্যান্য যে কোন বিষয়ই শিক্ষা দিউন না কেন, ছাত্রগণকে নিত্য কোরাণশিক্ষা দেওয়া তাঁহাদের একটী অবশ্যকর্ত্তব্য কর্ম্ম। রামমোহন রায়ও যে অন্যান্য বিষয়ের সঙ্গে কোরাণশিক্ষাও করিয়াছিলেন, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। দ্বাদশ বর্ষ বয়সে তিনি সম্ভবত মাতৃকুলের ইচ্ছানুসারে শাস্ত্রাদি অধ্যয়ন জন্য কাশীতে প্রেরিত হয়েন। বৎসর তিন চারির ভিতর যতদূর সম্ভব, সেই মত পৌত্তলিকতাসমর্থক তন্ত্রপুরাণাদি সম্ভবত শিক্ষা করিয়াছিলেন। বারাণসী বহুদিন যাবৎ তান্ত্রিকদিগের একটী কেন্দ্রস্থান বলিয়া প্রসিদ্ধ। ষোড়শ বর্ষ বয়সে পিতৃগৃহে প্রত্যাগমন করেন। *

---

* রামমোহন রায়কে আমি দেবতার আসনে স্থান দিতে পারিব না। তিনি ছিলেন একটী মানুষ এবং মানুষের মধ্যে অসাধারণ মহাপুরুষদিগের অন্যতম। আমাদের দেশে জীবনীলেখকগণ প্রাণপণে লেখ্য ব্যক্তিগণকে একেবারে সপ্তম স্বর্গে চড়াইতে পারিলেই আপনাদিগকে কৃতার্থ বোধ করেন। নিরপেক্ষ অত্যুক্তি-হীন জীবনী এদেশে অতীব বিরল। আমরা দেখিতে চাই অমুক মহাপুরুষ সত্যসত্য কিরূপে মহাপুরুষত্ব লাভ করিলেন এবং কি কি কারণেই বা তাঁহার কার্য্য সম্পূর্ণ হইতে পারিল না। বলা বাহুল্য যে শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় লিখিত রাজা রামমোহন রায়ের জীবনচরিত অতি উপাদেয় পুস্তক। প্রয়োজনমত আমিও এই গ্রন্থ হইতে রামমোহন রায়ের জীবন সম্বন্ধীয় অনেকগুলি উপকরণ উদ্ধৃত করিয়াছি। কিন্তু তথাপি আমি একথা বলিতে বাধ্য যে নগেন্দ্র বাবু রামমোহন রায়কে দেবতার স্থান প্রদানে প্রয়াস পাইয়াছেন এবং সেই কারণে বোধ হয় স্থানে স্থানে অত্যুক্তি-দোষ ঘটিয়াছে। একটী দৃষ্টান্ত দিই। তৃতীয় সংস্করণের ১৪ পৃষ্ঠায় তিনি লিখিয়াছেন যে রামমোহন রায় কাশীতে দ্বাদশ বর্ষ বয়সে প্রেরিত হইয়া

কাশীধাম হইতে ফিরিয়া আসিয়া "হিন্দুদিগের পৌত্তলিক ধর্ম্মপ্রণালী" নামক মূর্ত্তিপূজাবিরোধী একখানি গ্রন্থ প্রচার করিলেন। তাহার ফলে পিতা মাতা প্রভৃতি আত্মীয়স্বজন তাঁহার প্রতি বিরক্ত হইলেন। এদিকে তাঁহার নিজেরও ভারতে ইংরাজরাজ্য প্রতিষ্ঠার প্রতি একটা বিকট বিদ্বেষ ছিল। তিনি বোধ হয় ভাবিলেন যে এই সুযোগে বিদেশভ্রমণে বহির্গত হইয়া কিয়ৎকালের জন্য আত্মীয়স্বজনের চক্ষুর অগোচর থাকিলে তাঁহাদের বিরক্তি ও ক্রোধের আবেগ চলিয়া যাইবে এবং পরিব্রজনে বহির্গত হইয়া ক্রমশ তিব্বতে গিয়া উপস্থিত হইলেন। রামকান্ত রায়ের বিরক্তি সময়ে চলিয়া গেল, তখন তিনি পুত্রের অন্বেষণে লোক পাঠাইলেন। বৎসর চারি পরিব্রজনের পর পিতৃ প্রেরিত লোকের সঙ্গে গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন।

রামমোহন রায় আলস্যে কাল কাটাইবার লোক ছিলেন না—তাঁহার

"অল্পকালের মধ্যে বেদাদি শাস্ত্রে আশ্চর্য্যরূপ জ্ঞান উপার্জ্জন করেন।" আবার ১৯ পৃষ্ঠায় লিখিতেছেন যে বিংশতি বৎসর বয়সে তিব্বতভ্রমণ হইতে "প্রত্যাগমনের পর রামমোহন রায় অত্যন্ত পরিশ্রম সহকারে একাগ্রচিত্তে সংস্কৃত শাস্ত্রের চর্চ্চায় প্রবৃত্ত হইলেন। এই সময়ে তিনি বেদ, স্মৃতি, পুরাণ প্রভৃতি শাস্ত্রে, অল্পকালের মধ্যে আশ্চর্য্য ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়াছিলেন।" প্রথমোদ্ধৃত উক্তি নিতান্ত অত্যুক্তি। প্রথমত রামমোহন রায় বেদ তো অধ্যয়ন করেনই নাই। উপনিষদাদি যে এসময় পড়িয়াছিলেন, তাহারও কোন প্রমাণ দেখা যায় না। এইরূপ অত্যুক্তির দোষ এই যে অল্পবুদ্ধি লোকেরা এইরূপ অত্যুক্তি পড়িয়া ভাবিয়া থাকে যে ষোড়শ বর্ষ বয়সের মধ্যে বেদাদি শাস্ত্রে ব্যুৎপত্তি লাভ করা সাধারণের পক্ষে অসম্ভব, সুতরাং সে বিষয়ে চেষ্টা করাই বৃথা। আমি ব্রাহ্মসমাজের ইতিহাসে যতদূর সম্ভব নিরপেক্ষ আলোচনা করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি, যাহাতে আমার ন্যায় ক্ষুদ্রবুদ্ধি ব্যক্তিও দেখিতে পায় যে এরূপ বৃহৎ ঘটনা কিরূপে সংস্থাপিত হইল এবং কেনই বা এখন ইহাতে অবশ্যম্ভাবী পতনের লক্ষণ দেখা দিতেছে এবং সুতরাং কি উপায়ে ইহাকে পুনরুজ্জীবিত করা যাইতে পারে, কোন্ ঔষধের গুণে ইহার মুমূর্ষু প্রাণে নবযৌবনের তেজ দেওয়া যাইতে পারে।

মহাপুরুষত্বের ইহাই একটী সূক্ষ্ম নিদান। বিদেশ হইতে প্রত্যাগমনের পর, রামমোহন রায় অত্যন্ত পরিশ্রম সহকারে, একাগ্রচিত্তে শাস্ত্রাধ্যয়নে প্রবৃত্ত হইলেন। এই সময়ে তিনি স্মৃতি, পুরাণ উপনিষদাদি শাস্ত্রে অল্পকালের মধ্যে আশ্চর্য্য ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়াছিলেন। বলা বাহুল্য যে বিদেশভ্রমণ এবং শাস্ত্রাদি অধ্যয়নের ফলে তিনি বুঝিয়াছিলেন যে ব্রহ্মবিদ্যাই সকল বিদ্যার প্রতিষ্ঠাভূমি এবং "অলখ নিরঞ্জনই" সকল ধর্ম্মের মূলকেন্দ্র। তাঁহার পিতার সহিত মধ্যে মধ্যে ধর্ম্মবিষয়ক তর্কবিতর্ক হইত। রামকান্ত রায় রীতিমত বৈষয়িক লোক ছিলেন, কাজেই এই সকল তর্কবিতর্কে রামমোহন রায়ের প্রচলিত বিরোধী মনোভাব দেখিয়া অত্যন্ত দুঃখিত হইতেন। কিন্তু তিনি তজ্জন্য কখন স্পষ্টভাবে পুত্রকে তিরস্কার করিতেন না। সময়ে সময়ে কথাপ্রসঙ্গে প্রকারান্তরে তাঁহার প্রতি বিরাগ প্রদর্শন করিতেন মাত্র। রামকান্ত রায় ভাবিয়াছিলেন যে তিন চার বৎসর বিদেশে অসহায় অবস্থায় বহু কষ্ট পাওয়াতে রামমোহন রায়ের যথেষ্ট শিক্ষা হইয়াছে; তিনি এখন অবধি শান্তশিষ্ট হইয়া সাংসারিক সুখে মন দিবেন, প্রচলিত পৈতামহ ধর্ম্ম মূর্ত্তিপূজার বিরুদ্ধে আর বাক্‌নিষ্পত্তি করিবে না। কিন্তু তাঁহার সে আশা নির্ম্মূল হইয়াছিল। রামমোহন রায় সাহসের সহিত সকল প্রকার কুসংস্কার ও কুপ্রথার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হওয়াতে রামকান্ত রায় বোধ হয় আত্মীয়স্বজনের পরামর্শে তাঁহাকে পৃথক করিয়া দিতে বাধ্য হইয়াছিলেন, কারণ তাহা না হইলে তাঁহার নিয়মিত অর্থসাহায্য করিবার প্রয়োজন ছিল না।

১৭৭৪ খৃষ্টাব্দে সুপ্রীম কোর্ট সংস্থাপিত হওয়া অবধি দেশীয় লোকের ইংরাজীশিক্ষা আরম্ভ হয় বটে, কিন্তু তাহার পরে বহুকাল যাবৎ মোটের উপর ভারতের সর্ব্বত্র পারস্যভাষারই সমধিক প্রচলন ছিল। রামমোহন রায় দ্বাবিংশ বৎসর বয়ঃক্রম পর্য্যন্ত ইংরাজীভাষা একেবারেই জানিতেন না। বাইশ বৎসর বয়সে প্রথম ইংরাজী শিক্ষা আরম্ভ করেন। আরম্ভ করেন বটে, কিন্তু পাঁচ ছয় বৎসরকাল তাহাতে বিশেষ মনোযোগ প্রদান করেন নাই। সেই সময়ে সংস্কৃত, আরবী ও পারসীভাষায় লিখিত শাস্ত্র অধ্যয়নেই বিশেষ অভিনিবিষ্টচিত্ত ছিলেন। সাতাশ আটাশ বৎসর বয়সেও তিনি ইংরাজী ভাষায় কোন প্রকার রচনা করিতে পারিতেন না।

এই সময়ে রামমোহন রায় ইংরাজের অধীনে কর্ম্মপ্রার্থী হইতে বাধ্য হইয়াছিলেন। রংপুরের কলেক্টর জন ডিগবি সাহেবের অধীনে কেরাণীগিরি লাভ করিয়া স্বীয় অধ্যবসায় ও কার্য্যদক্ষতায় ডিগবি সাহেবের সন্তোষসাধন করিলেন এবং ক্রমে সেরেস্তাদারি (দেওয়াণী) প্রাপ্ত হইলেন। এই ডিগবি সাহেবের সহিত ক্রমে তাঁহার আজীবনস্থায়ী প্রগাঢ় বন্ধুতা হইয়াছিল। সেই বন্ধুতাই রামমোহন রায়ের ইংরাজী ভাষায় উন্নতিলাভের কারণ হইয়াছিল। তাঁহারা উভয়ে মিলিয়া ইংরাজী ও দেশীয় সাহিত্যের চর্চ্চা করিতেন এবং তদ্বিষয়ে পরস্পর পরস্পরকে সাহায্য করিতেন। রামমোহন রায় তাঁহার প্রণীত বেদান্ত সূত্রের ভাষ্য ও কেনোপনিষদের চূর্ণক ইংরাজী ভাষায় অনুবাদ করিয়া ডিগবি সাহেবের সম্পাদকতায় প্রকাশ করেন। সাহেব উক্ত পুস্তকের ভূমিকায় লিখিয়াছেন—"বাইশ বৎসর বয়সে রামমোহন রায় প্রথমে ইংরাজী শিক্ষা আরম্ভ করেন। কিন্তু মনোযোগ পূর্ব্বক শিক্ষা না করাতে, পাঁচ বৎসর পরে, যখন আমার সহিত তাঁহার আলাপ হইল, তখন সামান্য সামান্য বিষয়ে, তিনি ইংরাজীতে কথা বলিলে বোধগম্য হইত মাত্র। কিন্তু উক্ত ভাষা কিছু-মাত্র শুদ্ধরূপে লিখিতে পারিতেন না। যে জেলায় আমি ঈষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির সিবিল সার্বিসে পাঁচ বৎসর কলেক্টর ছিলাম, তথায় তিনি পরি-শেষে দেওয়ান অর্থাৎ করসংগ্রহ বিষয়ে প্রধান দেশীয় কর্ম্মচারীরূপে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। আমার চিঠিপত্র সকল মনোযোগ পূর্ব্বক পাঠ করিয়া এবং ইউরোপীয় ভদ্রলোকদিগের সহিত পত্রাদি লিখিয়া ও আলাপ করিয়া তিনি ইংরাজী ভাষায় এপ্রকার জ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন যে, বেশ শুদ্ধরূপে ইংরাজী বলিতে ও লিখিতে পারিতেন।

সকল বিষয়ের মূলে যাইবার ইচ্ছা তাঁহার বিদ্যাশিক্ষার আর একটী সহায় ছিল। এই ইচ্ছারই ফলে সময়ে তিনি বাইবেল গ্রন্থের মূল গ্রন্থ পড়িবার কারণে গ্রীক ও হিব্রু ভাষা অধ্যয়ন করিয়াছিলেন।

তাঁহার সময়ে এরূপ বিদ্যাচর্চ্চা অন্তত বঙ্গদেশে একটা অসাধারণ ঘটনা নিশ্চয়ই বলিতে হইবে। এরূপ নানা বিষয়ের আলোচনা করা, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য নানা শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া পরিপাক করিয়া সমুদয় অধীতবিদ্যা নিজের লক্ষ্যবিষয়ে যথাযোগ্য প্রয়োগ করিবার সক্ষমতাই সেকালের পক্ষে আশ্চর্য্য

বলিতে হইবে। সেকালে একালের ন্যায় এত মুদ্রিত অভিধান বা কোষ পুস্তক ছিল না যে প্রয়োজন পড়িলেই কোষ খুলিলাম এবং সমুদয় প্রয়োজনীয় বিবরণ সংগ্রহ করিলাম। রামমোহন রায়ের জ্ঞান বহুবিস্তৃত ছিল বটে, কিন্তু জ্ঞানবিস্তৃতির অনুরূপ জ্ঞানগভীরতাও ছিল কি না সন্দেহ করি। তাঁহার বিশেষ গুণ এই ছিল যে তিনি যাহা কিছু অধ্যয়ন করিতেন, সমস্তই কাজে লাগিত, কিছুই নিষ্ফল যাইত না; তিনি অধীত বিদ্যাকে নিজের প্রয়োজন মত কার্য্যসাধন করাইয়া লইতে সক্ষম হইতেন। তাঁহার প্রয়োজন হইয়াছিল ব্রহ্মপূজা প্রতিষ্ঠা করা—সেই লক্ষ্যসাধনে যে সকল শাস্ত্রগ্রন্থ সহজে সহায়তা করিতে পারে, স্মৃতি, পুরাণ, তন্ত্র ও সমধিক প্রচলিত কয়েকখানি উপনিষৎ অধ্যয়ন করিলেন। জার্ম্মাণ পণ্ডিতগণ ইহা অপেক্ষা আরও একটু অগ্রসর হইতেন। তাঁহারা কেবল এই সকল গ্রন্থে ব্রহ্মবিদ্যার উপযোগিতা পর্য্যন্ত আলোচনা করিয়া ক্ষান্ত থাকিতেন না, কিন্তু তাহাদের প্রত্যেক অক্ষরটীর আমূল ইতিহাস আবিষ্কার করিয়া নিশ্চিন্ত হইতেন। রাজা রামমোহন রায় অসাধারণ তর্কশক্তিপ্রভাবে ইংরাজদিগকে নানা বিষয়ে পরাজয় করিয়া তাঁহা-দিগের নিকটে অসাধারণ পণ্ডিত বলিয়া সম্মানিত হইয়াছিলেন, কিন্তু সেই সময়ে একজন জার্ম্মাণ পণ্ডিত ভারতভ্রমণে আসিয়াছিলেন; সেই জার্ম্মাণ পণ্ডিত রামমোহন রায় সম্বন্ধে সুপ্রসিদ্ধ হম্বোল্ড মহোদয়কে পত্র লিখিতে-ছেন:—

"ছাত্রগণের মধ্যে (বঙ্গদেশীয়) কদাচিৎ কেহ বড়লোক হইয়া জীবনক্ষেত্রে প্রবিষ্ট হয়েন। আশঙ্কা হয় যে বঙ্গবাসীদিগের বুদ্ধিবৃত্তি কখনও বিশেষ গভীরতা অথবা কার্য্যক্ষমতা লাভ করিতে পারিবে না। এই বিষয়ের অবশ্য অতি অল্পসংখ্যক ব্যতিরেকস্থল আছে। রামমোহন রায়ও এই ব্যতিরেক-স্থলের মধ্যেই পড়িয়া যান। এই সকল ব্যতিরেকের দৃষ্টান্তস্বরূপ ব্যক্তিগণ হিন্দু (বঙ্গবাসী?) বলিয়াই বিখ্যাত হইয়াছেন, নচেৎ আমাদের নিজের দেশের লোক হইলে কদাপি বড়লোক বলিয়া পরিগণিত হইতেন না।" * ইহা অতি

* "It is evident, that among them (the scholars) brilliant schoolboys seldom enter into life as eminent men, and it is

সত্য কথা। আমাদের বিদেশীয়ের মুখে এই সত্য কথা শুনিয়া শোকপ্রকাশের কোনই কারণ নাই। বরঞ্চ আমাদিগকে রামমোহন রায় অপেক্ষা বহু ঊর্দ্ধে লক্ষ্যস্থাপন করিতে হইবে; তবেই আমরা আমাদের শক্তি ও সামর্থ্য দেখাইতে পারিব।

শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

সাধ।

ধরণীর ধনৈশ্বর্য্য সুখ ও সম্মান
যে যাহা প্রার্থনা করে দাও তারে তাই,
এ সকলে তৃপ্ত মোর নাহি হয় প্রাণ
আমি যে গো আরো কিছু বেশী পেতে চাই!
করুণা-সাগরে তব চলেছি ভাসিয়া
কেমনে হইব তৃপ্ত তা'রি কণিকায়?
তৃষিত হৃদয়ে তাই রহি গো জাগিয়া
এক সাথে সবটুকু পাব বলে হায়!
যার চক্ষে একবার ক্ষণেকেরো তরে
পড়িয়াছে সীমাহীন অনন্ত আকাশ,
সেকি পারে আর কভু বসি রুদ্ধ ঘরে
মিটাইতে আপনার মরম-তিয়াস?
এ তিয়াসা, এই সাধ, আর কিছু নয়—
চিরতরে তুমি মোর হবে দয়াময়!

শ্রীজীবেন্দ্র কুমার দত্ত।

---

to be feared, that the mind of the Bengalese will never acquire any very great depth, or be endowed with much activity. The few exceptions, among whom Rammohan Ray cannot be wholly excluded, are distinguished only as Hindoos, and would never have been considered great men in our own country." Travels in India by Captn. Leopold Von Oslich. Longman, Brown, Green and Longmans—1845, Vol. II. P. 275.

স্বদেশের উন্নতিকল্পে মহিলাদিগের কর্ত্তব্য। *

মহামান্যা নাটোরের মহারাণীর সভাপতিত্বে মহিলাসমিতির ২রা আশ্বিনের অধিবেশনে এই প্রবন্ধ লেখিকাকর্ত্তৃক পঠিত হয়।

মহিলা সমিতি হইতে আমাকে কিছু বলিতে অনুরোধ করা হইয়াছে। কিন্তু পূর্ব্বেই বলিয়া রাখিয়াছি, যে আমার লিখিবার শক্তি তেমন নাই। যদি কেহ কোন দোষ দেখেন তাহা হইলে তাহা সংশোধন করিয়া দিলে ও ত্রুটী মার্জ্জনা করিলে বাধিত হইব।

লিখিতে আরম্ভ করিয়াই আমার স্বর্গীয় পিতৃদেবকে মনে পড়িতেছে। তিনি আমাদের ছেলেবেলা হইতেই সাধ্যমত স্বদেশী ও বিদেশী দুই রকম শিক্ষাই দিতে যত্নবান হইয়াছিলেন। গৃহস্থালী রান্না হইতে, গান, বাজনা, লাঠী ও ঢাল তলোয়ার খেলা, তীর ধনুক ও গুলেল ছোড়া, মুগুর ভাঁজা এবং সংস্কৃত, বাঙ্গলা ও ইংরাজী সব দিকেই তাঁহার দৃষ্টি ছিল। তিনি মাকে ও আমার বড় ভাই বোনদের প্রায় যত রকম দেশী বাজনা করতাল, বাঁয়া, তবলা, বেহালা, সেতার, এসরাজ, সারঙ্গ, বীণ্ প্রভৃতি, এবং আরেক দিকে পিয়ানো বাজনা, ছবি আঁকা, ডাক্তারী শিক্ষা, হার্প ও ইংরাজী স্বরলিপিতে হিন্দি গান স্বরলিপিবদ্ধ করা প্রভৃতি প্রাচ্য ও প্রতীচ্য শিক্ষা বিষয়ে প্রাণপণে যত্ন করিয়াছিলেন। সংস্কৃত গ্রন্থের প্রতি তাঁহার যেরূপ টান্ ছিল ইংরাজী সেক্ষপীয়র, মিলটনের প্রতিও তাঁহার সেইরূপই টান্ ছিল। আমি আমার পিতার কাছে পড়া শিখিতাম—ইহা আমার বেশ মনে আছে। কিন্তু তখন আমি খুব ছোট। মাকে ও বড় ভাই বোনদের যাহা শিক্ষা দিয়া গিয়াছিলেন—তাহারই ছায়াতে আমরা যাহা কিছু অল্প শিখিয়াছি। পিতা আমাদের দেশী ভাব বরাবর বজায় রাখিয়া সঙ্গে সঙ্গে অগ্রসর হইবার জন্য বিদেশী শিক্ষারও দরকার বোধ করিতেন। স্বদেশী ভাব আমাদের গৃহে বরাবরই আছে। স্বদেশ আর কি স্বগৃহ বলিলেই চলে।

কিন্তু আজকাল রাজশক্তি প্রভাবে ও রাজনীতির আন্দোলনে বঙ্গদেশের

---

* মহিলা সমিতির জন্য লিখিত। সন ১৩১২ সাল ২৮শে ভাদ্র।

প্রায় সর্ব্বস্থানেই স্বদেশী স্বদেশী একটা হৈ চৈ পড়িয়াছে। দেশের উন্নতি ও দেশীয় শিল্পের উন্নতি করিতে হইবে। আজ এখানে, কাল সেখানে পুরুষদের মধ্যে আলাপ ও মেলামেশা চলিতেছেই আবার মেয়ে মহলেও সমিতি ও মিটিংয়ের অভাব হইতেছে না। কিন্তু খালি সমিতিতে কতকগুলি মেয়ে কি পুরুষ একত্র হইলেই কি উন্নতি হয়? দেশের কাজ করিতে হইলে সর্ব্বাগ্রে স্বার্থত্যাগ ও ধর্ম্মবল চাই। ভগবানকে সহায় চাই। আমাদের মধ্যে বেশী ভাগ বোধ হয় কেহই একবার ভুলিয়া ভগবানকে ডাকি না—আবার আমরাই দেশের উন্নতি লইয়া ব্যস্ত। আগে হিন্দুদের মধ্যে এই প্রথা ছিল, অগ্রে প্রাতঃস্নান করিয়া শুদ্ধ হইয়া জপ আহ্নিক করিয়া তারপর বৈষয়িক কর্ম্মে লাগা—এখন বেশীভাগ দেখা যায়, বিছানা হইতে উঠিয়াই বিলাতী অনুকরণে আগে চা পান করা চাই নইলে কোন কর্ম্মই সিদ্ধ হয় না। আমাদের দেশে কোন জাতিতে মিল নাই। আগে ছিল ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র—আবার আজকাল এক ব্রাহ্মণের ভিতরেই বোধ হয় পঞ্চাশ রকম শাখা জাতি বাহির হইয়াছে। কেহ কাহারও ভাল দেখিতে পারে না—সকলেই আপনি বড় হইব, এই চেষ্টায় মত্ত। ইহাতে কি দেশের মঙ্গল হয়? একটা কাজ করিতে হইলে একতা চাই, আর কতটা স্বার্থত্যাগ করিতে হয় ইহা কি কেহ মনে ভাবিয়াছেন? এই যে কথা উঠিয়াছে,—"বিলাতী জিনিষ ব্যবহার করিব না, দেশী জিনিষ "কিন্তু সাধ্যমত" করিব।" "কিন্তু সাধ্যমতর" আবশ্যক কি? মহিলা সমিতির ভিতর এমন অনেকেই খুব বড়লোক আছেন যাঁহারা ইচ্ছা করিলেই সমস্ত বিলাতী জিনিষ ত্যাগ করিয়া দেশী জিনিষ ব্যবহার করিতে পারেন। কিন্তু বিলাতী সখের জিনিষ, কাপড়ের ভাল রংটুকু, ফাইন্ মস্‌লিন, কাহারও ত্যাগ করিবার ক্ষমতা নাই। কি দেশী, কি বিলাতী, সব জিনিষই সস্তা, মার্গি আছে। আমাদের কল নাই—কাজেই দেশী কাপড় বিলাতী কাপড় অপেক্ষা সস্তা হইবার যো নাই। বড় বড় বাবুরা ট্যেপ্ ট্যেপ্ করিয়া রবর-টায়র ল্যাণ্ডো গাড়ী চড়িয়া হাওয়া খাইয়া আসিতেছেন, আর ঘরে বলিতেছেন তোমরা বিলাতী জিনিষ ব্যবহার করা ছাড়, দেশী জিনিষ ব্যবহার ধর। ভাবিয়া দেখিলে সেই আস্ত তৈয়ারি গাড়ীখানি এবং তাহার যাহা কিছু মাল-মশলা সবই বিলাতী। প্রকৃত স্বদেশী হইতে হইলে গাড়ী ঘোড়া, ট্রেন,

ট্রাম, গবর্ণমেণ্টের চাকরী, ইংরাজি শিক্ষা, পিয়ানো বা হারমোনিয়ম বাজানা, সাহেবী হোটেলে খাওয়া, বিলাত যাওয়া, বিবি বিয়ে করা এ সকলই ছাড়িতে হয়। যেমন মুসলমানদের আমলে আমরা এক রকম অন্ধ অবস্থায় ছিলাম—এখন আবার সেই ধান্দভাঙ্গা অবস্থায় আসিতে হয়।

ধানটী ভাঙ্গি, ক্ষুদটী খাই,
চালটী রাখি ঘরে
তাও নিয়ে যায় চোরে
আমি যাই সাত পেয়াদার তরে।

কেহ কেহ মতলব করিয়াছেন কেরোসিন আলো পরিত্যাগ করিয়া আগে-কার ন্যায় মাটির প্রদীপ জ্বালা হউক, আচ্ছা, ভগিনীগণ, ভাবিয়া দেখুন এই যে আজ কলিকাতা সহরে প্রায় প্রতি ঘরে ঘরে ইলেকট্রিক আলো ও পাংখা চলিতেছে, ইহা কি আপনারা পরিত্যাগ করিয়া সেই মাটির পিদুম, ও হাতে হাতে সব তালপাতার পাখা ও দিশলাইয়ের পরিবর্ত্তে চকমকি ব্যবহার করিতে পারেন? আর তাহাই করিলে কি ভাল হইবে? আমার মনে হয় তাহা হইলে দেশের উন্নতির গতি রোধ করা হইবে। আধ ঘণ্টা ধরিয়া একটী চকমকি ঘষিয়া যদি আলো জ্বালিতে হয় তাহা হইলে এই বুঝিব যে "সময় যে অমূল্যধন" তাহার ব্যবহার এখনো আমরা শিখি নাই।

এই জন্যই বলিতেছি, বিদেশকে একেবারে এতটা কুৎসিত ঘৃণা করা স্বদেশের মঙ্গলজনক নয়। এই বিলাতী সভ্যতা ও বিজ্ঞানের ফলে আমাদের দেশে কত উপকার হইয়াছে। সকল দেশের শিল্প ও বিজ্ঞানের উন্নতি লইয়া তবে একটা দেশ বড় করিতে হয়। বাণিজ্য, ব্যবসা, দেশবিদেশে চলাচল না হইলে সে দেশের শ্রীবৃদ্ধি হয় না, কথাতেই আছে—"বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মী"। মনে করুন, আজ এই হুজুগে ইংরাজেরা তাহাদের দেশের যাহা কিছু আমাদের এখানে আসা বন্ধ করিয়া দিল, তাহা হইলে আমাদের কি দুর্গতি হয়? স্বদেশকে কে না ভালবাসে? স্বদেশ মানেই হইতেছে, আপনার দেশ। আপনাকে যেমন ভালবাসা কাহাকেও শিখাইতে হয় না সেইরূপ স্বদেশকেও ভালবাসিতে কাহাকেও শিখাইতে হয় না। কিন্তু তাই বলিয়া স্বদেশকে ভালবাসিব আর বিদেশকে ঘৃণার চক্ষে দেখিব, ইহা হইতে পারে

না। বিদেশও যে সকল বিষয়ে আমাদের অপেক্ষা উন্নত তাহা তাহাদের কাছে শিক্ষা করিয়া স্বদেশের করে উপহার দিতে পারিলে তাহাতে দেশের কল্যাণের পথ প্রশস্ত করিয়া দেওয়া হয়। যেমনি তুমি চাও কেহ তোমাকে অথবা তোমার দেশকে ঘৃণা না করে, তেমনি তোমারও বিদেশকে ঘৃণা করা উচিত নয়। আমাদের শাস্ত্রে আছে "অসাধুং সাধুনা জয়েত"। বরং সাধুতা দ্বারা অসাধুকে জয় করিবে। এই মন্ত্র জপিলেই বোধ হয় আমাদের দেশের ও দেশীয়দের মঙ্গল হয়। এ মন্ত্র সব দেশেই আছে—ইংরাজিতেও একটা কথা আছে—"Honesty is the best policy."

দেশকে উন্নত করিতে হইলে আপনাদের আগে উন্নত হইতে হইবে। শুধু বিলাতী জিনিষ ছাড়িয়া দেশী জিনিষ ব্যবহারেই উন্নত হইলে না। এই দেখ, আজ আমাদের দেশ মদ ও চুরট ইত্যাদি নেশায় ছারখার যাইতেছে, কত লোকের সর্ব্বনাশ হইতেছে, কত পয়সা বিদেশে যাইতেছে—ভগিনীগণ, এই পুণ্যব্রতের দিকে লক্ষ্য রাখুন। আজ যদি আমরা ঘরে ঘরে "মদ্যমপেয়ং, মদ্যমদেয়ং, মদ্যমগ্রাহ্যং" এই মন্ত্র ভাই, বন্ধু, পিতা, পুত্র, সকলকে জপাইতে পারি তবে অনেকটা দেশের কাজ হয়।

দেশের লোকের মন কিসে অধঃপাতে যাইতেছে সেই দিকে দৃষ্টি রাখা দরকার। আমাদের মন উন্নত করিতে হইবে। এই নেশাটা ছাড়াইতে পারিলে অনেক উপকার হয়—তাই বলিয়া আমি বিলাতী মদের বদলে দেশী মদ, বা গাঁজা, গুলি, আফিং ইত্যাদি ধরিতে বলিতেছি না—সব রকম নেশাই ছাড়িতে হয়। এই যে আজ ছোকরা মহল 'বিলাতী কাপড় পড়িব না' বলিয়া চীৎকার করিতেছে—এই সঙ্গে বিদেশী সিগারেট ত্যাগ করিয়া যুবকেরা অধিকতর মানসিক বলের পরিচয় দিয়াছে। কিন্তু কোন কোন বিশিষ্ট ব্যক্তি সিগারেট ছাড়িয়া দেশীয় বিঁড়ি ধরিবার পরামর্শ দিয়াছেন—ইহা উচিত হয় নাই। এই সময়ে মহিলাদিগের সামান্য উৎসাহ পাইলে তাহারা এতটা বল পাইতে পারে যে বিঁড়ি বা সিগারেট বা কোনরূপ ধূমপানে তাহাদের অভিরুচিই হইবে না।

বিদেশী দ্রব্য পরিহারের সঙ্গে সঙ্গে বিলাতী কাপড় পরিত্যাগ করিবার কথা বড় প্রবল ভাবে জাগিয়া উঠিয়াছে; কিন্তু দেশী বস্ত্র ব্যবহারেও আমরা

প্রকৃত পক্ষে বিলাতেরই অধীন। যখন আমাদের কাপড়ের সূত্র অনেক পরিমাণে বিদেশে রহিল তখন কি করিয়া বিদেশের সঙ্গে সম্বন্ধসূত্র ছিন্ন হইবেক? বিদেশের সঙ্গে এই সূত্রেই সখ্যতা রাখিতে হইবেক। তবে স্বদেশীয় ভাণ্ডার হোক, একটার বদলে দশটা ভাণ্ডার হোক, বিলাতী কাপড়ের ন্যায় স্বদেশীয় কাপড় সস্তা হোক, গরীব দুঃখী সকলে যাহাতে ব্যবহার করিতে পারে, এমন করা হউক—তাহা হইলে এক্ষণে আমরা দু চারজনে যাহা করিতে সমর্থ তখন তাহা সর্ব্বসাধারণে সুখের সহিত স্বদেশীয় জিনিষ ব্যবহার করিতে সক্ষম হইবে।

সংসারের অন্দরমহল ও বাহিরমহল আছে—ভাবিয়া দেখিলে সকলই মেয়েদের উপর ন্যস্ত। স্বভাবত মেয়েদের ধর্ম্ম কি? যাহা কিছু রক্ষা করা ও পালন করা। মেয়েরা যদি একটু বুদ্ধি পূর্ব্বক কাজ করেন, তাহা হইলে পুরুষরা তাঁহাদের মতেই চালিত হন। দেখিতে গেলে সকল বিষয়ের অন্দর মহল আগেই আছে। শরীর ও মন—মনটা যেন অন্দর, শরীর বাহির। আগে মন কাজ না করিলে শরীরে কাজ হয় না। সেই জন্য মনে হয়, অন্দরের মেয়েরা যদি কোন বিষয়ে লাগিয়া পড়িয়া উঠিতে পারেন, তাহাতে পুরুষদের কোনই আপত্তি থাকিতে পারে না। চেষ্টা করিলে মেয়েদের দ্বারা অনেক কাজ হয়। শিল্প বিষয়ে আমরা দেশের উন্নতিকল্পে অনেকটা সহায়তা করিতে পারি।

এই মহিলা সমিতির সভ্যদের উদ্দেশ্য করা চাই, শুদ্ধ মেয়ে বন্ধুদের না, আপনার ঘরের পুরুষদেরও যাহাতে উন্নতি হয়—সেই চেষ্টায় ব্রতী হওয়া। দেশের উন্নতিতে অনেক স্বার্থত্যাগ চাই। আজ আমাদের বাঙ্গালীতে সেই ত্যাগস্বীকার করিতে চেষ্টা পান। নেশার পয়সা অন্য কাজে লাগান যাউক। কোন যুদ্ধের সময় কতকগুলি ধনী ইংরাজমহিলা চায়ের সঙ্গে চিনি খাওয়া ত্যাগ করিয়াছিলেন, ইহা সকলেই শুনিয়াছেন। ইহা শুনিতে সামান্য কথা, কিন্তু তাঁহাদের পক্ষে ইহা সামান্য স্বার্থত্যাগের কথা নয়। দেশের কার্য্যের জন্য কতলোককে কতরূপে স্বার্থত্যাগ করিতে হয়।

দেশের উন্নতিতে সকলে একমন, একপ্রাণ হওয়া চাই। আমি বড় হব করিতে গেলে চলিবে না—দ্বেষ, হিংসা, নেশা প্রভৃতি যাহা কিছু খারাপ সব

ত্যাগ করিয়া উন্নতমনা হইয়া কাজ করিতে হইবে। দেশ বিদেশের প্রতি হিংসা দ্বেষ পরিহার পূর্ব্বক অন্তরের সঙ্গে সৎকার্য্যে ব্রতী হইতে হইবে। ইহাতে ভগবান আপনিই সহায় হইবেন। প্রথম হইতে যদি আমরা সকল দিক বজায় রাখিয়া—স্বদেশের যাহা ভাল তাহা সংরক্ষণ পূর্ব্বক এবং বিদেশের যাহা ভাল তাহা আহরণ করতঃ সাবধানে চলি এবং ধর্ম্মের কেন্দ্র হইতে পরিবর্ত্ত ভ্রষ্ট না হইয়া পুণ্যপথে অগ্রসর হই, তবেই মঙ্গল।

এস, আজ আমরা সকলে মিলিয়া একসুরে ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করি, যেন তিনি আমাদের এই কল্যাণজনক কাজে উদ্যম ও চেষ্টা সফল করেন ও মহিলাসমিতির সদুদ্দেশ্য সিদ্ধ করেন।

শ্রীমনীষা দেবী।

কুচবেহার।

কুচবেহার বঙ্গের পূর্ব্বোত্তর কোণে অবস্থিত। কুচবেহারের পাদদেশ দিয়া তিস্তা নদী প্রবাহিত হইতেছে। তিস্তা "ত্রি-স্রোতা" নামের অপভ্রংশ। পূর্ব্বে ইহার তিনটী স্রোত ছিল। কথিত আছে, জনৈক অসুর মহাদেবের পরম ভক্ত ছিল। সে পার্ব্বতীকে একেবারে ভক্তি করিত না। পার্ব্বতী তাহাকে শাস্তি দিবার জন্য অস্ত্র গ্রহণ করিলেন। অসুরে ও পার্ব্বতীতে ঘোরতর যুদ্ধ বাধিল। যুদ্ধ করিতে করিতে অসুর অত্যন্ত পিপাসাক্রান্ত হইয়া পড়িল। অসুরের পিপাসা মোচন করা সামান্য জলের কার্য্য নহে। সকাতরে সে তখন তাহার প্রভু মহাদেবকে স্মরণ করিল। তৎক্ষণাৎ পার্ব্বতীর বক্ষস্থল হইতে তিনটী জলস্রোতের ধারা নিঃসৃত হইয়া ত্রি-স্রোতা বা তিস্তা নদীরূপে পরিণত হইল। তিস্তানদী পুণ্যতোয়া।

কুচবেহার নামের উৎপত্তি অধিকতর বিস্ময়কর। 'কুচ' শব্দ 'কোচ' শব্দের অপভ্রংশ। কোচ একটী জাতির নাম। জমদগ্নিসুত পরশুরাম সত্য-

যুগে একুশবার পৃথিবী নিঃক্ষত্রিয় করিয়াছিলেন। প্রবাদ আছে তিনি সাত বার অত্রত্যদেশ সকল অধিকার করেন। তৎকালে বীরজয়ায্য নামক জনৈক রাজা তৎকর্ত্তৃক নিহত হন—অন্যান্য আরো অনেক ক্ষুদ্র বৃহৎ রাজাও ধ্বংস-প্রাপ্ত হন। এই সব রাজবংশীয়দিগের মধ্যে কেহ কেহ পলায়ন করিয়া তাঁহার ভয়ে "সসংকোচে" দিন যাপন করিতে লাগিলেন। তাঁহাদিগকে আত্মপরিচয় জিজ্ঞাসা করিলে তাঁহারা বলিতেন "আমরা "সংকোচ" যুক্ত আছি।"

"পরশুরাম-ভয়াৎ ক্ষত্রী
সংকোচাৎ কোচ উচ্যতে।" (যোগিণীতন্ত্র)

রাজইতিহাসে (Rajchronicles) এ বর্ণিত আছে যে, এই রাজবংশীদিগের ধর্ম্ম মন কালক্রমে "সংকুচিত" হইয়াছিল বলিয়া "সংকোচ" এবং পরে "কোচ" নামে অভিহিত হইতে লাগিল। এক্ষণে ইহারা রাজবংশী বা বঙ্গ-ক্ষত্রিয় বলিয়া পরিচয় দেয়। অতএব কুচবেহারের প্রকৃত নাম "কোচ-বিহার" অর্থাৎ "কোচ-স্থান"। কুচবেহারের নামের আরেকটী অর্থ জনশ্রুতিমূলক "কোচ-(নী)-বিহার" বা কোচনী লীলাক্ষেত্র। প্রবাদ আছে স্বয়ং মহাদেব যোগীবেশ ধারণ পূর্ব্বক অত্রত্য "কোচনী" অর্থাৎ কোচবালাদিগের সহিত বিহার অর্থাৎ লীলা ক্রিয়া করিতেন। এই জন্য এদেশের নাম কোচনীবিহার এবং ক্রমে অপভ্রংশ রূপে কোচ-বিহার বা কুচ-বিহার হইয়া দাঁড়াইয়াছে। পুরাকালে মহাদেব উমা ও তাঁহার সহচরী যোগিনীদিগের সহিত আম্রকুঞ্জে বিহার করিতেন। এই যোগিনীদিগের মধ্যে মাধবী নামে একটী যোগিনী ছিল। তিনি মহাদেবের আংশিক প্রেমে তৃপ্ত না হইয়া তাঁহাকে নিজে একেলা স্বামীরূপে প্রাপ্ত হইবার জন্য কঠোর আরাধনায় প্রবৃত্ত হইলেন। আহার নিদ্রা পরিত্যাগ পূর্ব্বক পর্ব্বতে তন্ময় হইয়া সতত তাঁহার ধ্যানে নিমগ্ন রহিতেন এবং বাহ্যজ্ঞান শূন্য হইয়া পড়িতেন। এতদবস্থায় যখন তিনি অনন্যমনে মহাদেবের ধ্যানে নিমগ্ন ছিলেন সেইকালে একটি ব্রাহ্মণ আসিয়া তাঁহার নিকট ভিক্ষা প্রার্থনা করিলেন। তিনি তখন বাহ্যজ্ঞান একপ্রকার হারাইয়া ফেলিয়াছিলেন সুতরাং তাঁহার কথা তাঁহার কর্ণে প্রবেশ করে নাই। এই অনবধানতার হেতু ক্রুদ্ধ হইয়া সেই ব্রাহ্মণ তাঁহাকে "তুমি কোচনী হও" বলিয়া শাপ-দান করিলেন। এই শাপ বাক্য শ্রবণে মাধবীর চৈতন্য হইল। তিনি ব্রাহ্মণের

পাদধারণ করিয়া বলিলেন—"দেব আমি মূর্খ অবলা বালা। হায় আমি এত কাল কত কষ্ট সহ্য করিয়া দেবাদিদেব মহাদেবের আরাধনা করিয়া আসিতেছি, তার কি এই ফল? প্রভো আমার এই অনবধানতা দোষ ক্ষমা করুন। ব্রাহ্মণের রাগ চলিয়া গেল। তাঁহার মনে দয়ার সঞ্চার হইল। তিনি বলিলেন (এই ব্রাহ্মণ স্বয়ং বশিষ্ঠ ঋষি ছিলেন)—"মাধবী দুঃখ করিও না, তোমার তপস্যা ব্যর্থ হয় নাই —তোমার মনোরথ অচিরে পূর্ণ হইবে। আমি শাপ দিয়াছি তুমি 'কোচনী' হইবে অর্থাৎ 'কোচবংশে' জন্মগ্রহণ করিবে, কিন্তু তুমি স্বয়ং মহাদেবকে স্বামীরূপে প্রাপ্ত হইবে।" আশুতোষ আশু তুষ্ট হন, তিনি কাহাকেও নিরাশ করেন না।

এই মাধবী নাম্নী যোগিনী কামরূপে (বর্ত্তমান আসামে) চিরুগিরিবাসী 'হজো' নামক জনৈক কোচের গৃহে জন্মগ্রহণ করেন। হজোর দুই কন্যা হয়, একটীর নাম জীরা ও একটীর নাম হীরা। হীরা এই মাধবীর রূপান্তর। জীরার যখন চৌদ্দ বৎসর ও হীরার যখন আট বৎসর বয়স তখন তাহাদিগের হার্য্যা মেচ বা হরিদাস নাম একব্যক্তির সহিত বিবাহ হয়। হরিদাসের ঔরসে জীরার গর্ভে দুই পুত্রসন্তান হয়—'চন্দন' ও 'মদন'। হীরা শিশুকাল হইতেই মহাদেবের পাদপদ্ম পূজা করিতেন। বিবাহের পরে তিনি কায়মনোবাক্যে মহাদেবের ধ্যান আরাধনা করিতে লাগিলেন। তিনি প্রাতঃকালে উঠিয়া নদীতে স্নানাদি করতঃ পুষ্পচয়ন করিয়া তত্রত্য "বুড়াবুড়ী" বা হরগৌরীর মন্দিরে মহাদেবের পূজায় রত থাকিতেন।

হীরা যখন চৌদ্দ বৎসর বয়সে পদার্পণ করিলেন ভক্ত বৎসল মহাদেব আর থাকিতে পারিলেন না। তিনি হীরার—তাঁহার পূর্ব্বজন্মের পরিচিত মাধবী যোগিনীর—মনস্কামনা পূর্ণ করিবার জন্য কৈলাস হইতে অবতরণ করিলেন। তাঁহার বাহন একটী শ্বেত বৃষ ছিল। মস্তকের জটারাশি পৃষ্ঠদেশে লম্বমান হইয়া আন্দোলিত হইতেছিল ও ভাগরথীর কলধ্বনি প্রবাহিত করিতেছিল। তাঁহার কটিদেশ ব্যাঘ্র-চর্ম্মে আবৃত ছিল; বাসুকি শতফেরে সেই ব্যাঘ্রচর্ম্ম কটিদেশে আবদ্ধ রাখিয়াছিল ও তাঁহার স্কন্ধদেশের উপর চক্রবিস্তার করিয়া মাঝে মাঝে ফোঁস ফোঁস করিতেছিল। তাঁহার দেবাঙ্গ শ্মশানভস্মে লিপ্ত ছিল; তাঁহার কণ্ঠ নীলকান্তমণির ন্যায় শোভমান ছিল ও তাঁহার গলায়

অস্থিমালা ঝুলিতেছিল। তাঁহার বাম হস্তে শৃঙ্গ ও দক্ষিণ হস্তে মৃদঙ্গ ছিল ও স্কন্ধদেশে ভিক্ষার ঝুলি ঝুলিতেছিল। তাঁহার চক্ষু জবাকুসুম সদৃশ ও কপোলস্থ চক্ষু হইতে অগ্নিশিখা নির্গত হইতেছিল। তিনি শৃঙ্গ বাজাইতে বাজাইতে ও মুখ ফুলাইয়া হস্তদ্বারা চাপিয়া "বোম বোম" রব করিতে করিতে 'কোচনী পাড়ায়' হীরার উদ্দেশ্যে গমন করিলেন। তাঁহার শৃঙ্গের ধ্বনি শুনিয়া আবালবৃদ্ধা 'কোচনীরা' আসিয়া তাঁহাকে ঘিরিল। কেহ তাঁহাকে চাল দান করিল, কেহ বা ধুঁতরা ফুল আনিয়া তাঁহার কর্ণেতে পরাইয়া দিল, কেহ বা কোমল পাতা আনিয়া নন্দীকে খাওয়াইতে লাগিল, কেহ আবার ভাঙপত্র আনিয়া তাঁহাকে দিল, কেহ বলিল—"যোগী, তোমার শিংটী একবার বাজাওনা, আমরা শুনবো। এমন সুন্দর ধ্বনি আমরা কখন শুনি নাই।" ছোট ছোট বালিকারা বলিল—"বাবাজী একবার মুখ ফুলিয়ে বোম বোম করো, আমরা তোমাকে আরো চাল দেবো।"

একটী কোচনী তাঁহার পীড়িত পুত্রকে আনিয়া বলিল—"আমার ছেলেকে একটু ঔষধ দাও।" তিনি তাঁহার প্রতি দৃষ্টিপাত করিবামাত্র ছেলেটি মার কোল হইতে লাফাইয়া পড়িয়া খেলিতে আরম্ভ করিয়া দিল। সমবেতা কোচনীবৃন্দ এই ঘটনাতে আশ্চর্য্যান্বিত ও আহ্লাদিত হইয়া বলিল—"বাবাজী, তুমি এখানে প্রত্যহ এসো, আমরা তোমাকে যথেষ্ট ভিক্ষা দেবো, আর কোথাও তোমাকে যাইতে হইবে না।" তদন্তর মহাদেব প্রত্যহ কামরূপস্থিত চিরুগিরিতে কোচনী পাড়ায় যাতায়াত আরম্ভ করিয়া দিলেন ও কোচবালাদিগের সহিত লীলাক্রিয়া করিতে লাগিলেন। এইরূপে কামরূপ প্রদেশের খণ্ডাংশ কুচবেহার দেশের নামের অর্থ—"কোচবালাদিগের বিহার বা লীলাস্থান হইয়াছে।" যথা—

(হরগৌরী প্রতি)

"কোচাখ্যানে চ দেশেচ * *
মাধবী শক্তিরস্ত্যেকা হীরেতি জনবিশ্রুতা॥
ভিক্ষাচারপ্রসঙ্গেন গচ্ছামি চ দিবানিশং।"

* * যোগিনীতন্ত্র পাতাল ১৪

কুচবেহারের নাম আধুনিক। পূর্ব্বে কুচবেহারের কামরূপ আসামের

পাদধারণ করিয়া বলিলেন—"দেব আমি মূর্খ অবলা বালা। হায় আমি এত কাল কত কষ্ট সহ্য করিয়া দেবাদিদেব মহাদেবের আরাধনা করিয়া আসিতেছি, তার কি এই ফল? প্রভো আমার এই অনবধানতা দোষ ক্ষমা করুন। ব্রাহ্মণের রাগ চলিয়া গেল। তাঁহার মনে দয়ার সঞ্চার হইল। তিনি বলিলেন (এই ব্রাহ্মণ স্বয়ং বশিষ্ঠ ঋষি ছিলেন)—"মাধবী দুঃখ করিও না, তোমার তপস্যা ব্যর্থ হয় নাই —তোমার মনোরথ অচিরে পূর্ণ হইবে। আমি শাপ দিয়াছি তুমি 'কোচনী' হইবে অর্থাৎ 'কোচবংশে' জন্মগ্রহণ করিবে, কিন্তু তুমি স্বয়ং মহাদেবকে স্বামীরূপে প্রাপ্ত হইবে।" আশুতোষ আশু তুষ্ট হন, তিনি কাহাকেও নিরাশ করেন না।

এই মাধবী নাম্নী যোগিনী কামরূপে (বর্ত্তমান আসামে) চিক্রগিরিবাসী 'হজো' নামক জনৈক কোচের গৃহে জন্মগ্রহণ করেন। হজোর দুই কন্যা হয়, একটীর নাম জীরা ও একটীর নাম হীরা। হীরা এই মাধবীর রূপান্তর। জীরার যখন চৌদ্দ বৎসর ও হীরার যখন আট বৎসর বয়স তখন তাহাদিগের হার্য্যা মেচ বা হরিদাস নাম একব্যক্তির সহিত বিবাহ হয়। হরিদাসের ঔরসে জীরার গর্ভে দুই পুত্রসন্তান হয়—'চন্দন' ও 'মদন'। হীরা শিশুকাল হইতেই মহাদেবের পাদপদ্ম পূজা করিতেন। বিবাহের পরে তিনি কায়মনোবাক্যে মহাদেবের ধ্যান আরাধনা করিতে লাগিলেন। তিনি প্রাতঃকালে উঠিয়া নদীতে স্নানাদি করতঃ পুষ্পচয়ন করিয়া তত্রত্য "বুড়াবুড়ী" বা হরগৌরীর মন্দিরে মহাদেবের পূজায় রত থাকিতেন।

হীরা যখন চৌদ্দ বৎসর বয়সে পদার্পণ করিলেন ভক্ত বৎসল মহাদেব আর থাকিতে পারিলেন না। তিনি হীরার—তাঁহার পূর্ব্বজন্মের পরিচিত মাধবী যোগিনীর—মনস্কামনা পূর্ণ করিবার জন্য কৈলাস হইতে অবতরণ করিলেন। তাঁহার বাহন একটী শ্বেত বৃষ ছিল। মস্তকের জটারাশি পৃষ্ঠদেশে লম্বমান হইয়া আন্দোলিত হইতেছিল ও ভাগরথীর কলধ্বনি প্রবাহিত করিতেছিল। তাঁহার কটিদেশ ব্যাঘ্র-চর্ম্মে আবৃত ছিল; বাসুকি শতফেরে সেই ব্যাঘ্রচর্ম্ম কটিদেশে আবদ্ধ রাখিয়াছিল ও তাঁহার স্কন্ধদেশের উপর চক্রবিস্তার করিয়া মাঝে মাঝে ফোঁস ফোঁস করিতেছিল। তাঁহার দেবাঙ্গ শ্মশানভস্মে লিপ্ত ছিল; তাঁহার কণ্ঠ নীলকান্তমণির ন্যায় শোভমান ছিল ও তাঁহার গলায়

অস্থিমালা ঝুলিতেছিল। তাঁহার বাম হস্তে শৃঙ্গ ও দক্ষিণ হস্তে মৃদঙ্গ ছিল ও স্কন্ধদেশে ভিক্ষার ঝুলি ঝুলিতেছিল। তাঁহার চক্ষু জবাকুসুম সদৃশ ও কপোলস্থ চক্ষু হইতে অগ্নিশিখা নির্গত হইতেছিল। তিনি শৃঙ্গ বাজাইতে বাজাইতে ও মুখ ফুলাইয়া হস্তদ্বারা চাপিয়া "বোম বোম" রব করিতে করিতে 'কোচনী পাড়ায়' হীরার উদ্দেশ্যে গমন করিলেন। তাঁহার শৃঙ্গের ধ্বনি শুনিয়া আবালবৃদ্ধা 'কোচনীরা' আসিয়া তাঁহাকে ঘিরিল। কেহ তাঁহাকে চাল দান করিল, কেহ বা ধুঁতরা ফুল আনিয়া তাঁহার কর্ণেতে পরাইয়া দিল, কেহ বা কোমল পাতা আনিয়া নন্দীকে খাওয়াইতে লাগিল, কেহ আবার ভাঙপত্র আনিয়া তাঁহাকে দিল, কেহ বলিল—"যোগী, তোমার শিংটী একবার বাজাওনা, আমরা শুনবো। এমন সুন্দর ধ্বনি আমরা কখন শুনি নাই।" ছোট ছোট বালিকারা বলিল—"বাবাজী একবার মুখ ফুলিয়ে বোম বোম করো, আমরা তোমাকে আরো চাল দেবো।"

একটী কোচনী তাঁহার পীড়িত পুত্রকে আনিয়া বলিল—"আমার ছেলেকে একটু ঔষধ দাও।" তিনি তাঁহার প্রতি দৃষ্টিপাত করিবামাত্র ছেলেটি মার কোল হইতে লাফাইয়া পড়িয়া খেলিতে আরম্ভ করিয়া দিল। সমবেতা কোচনীবৃন্দ এই ঘটনাতে আশ্চর্য্যান্বিত ও আহ্লাদিত হইয়া বলিল—"বাবাজী, তুমি এখানে প্রত্যহ এসো, আমরা তোমাকে যথেষ্ট ভিক্ষা দেবো, আর কোথাও তোমাকে যাইতে হইবে না।" তদন্তর মহাদেব প্রত্যহ কামরূপস্থিত চিক্রগিরিতে কোচনী পাড়ায় যাতায়াত আরম্ভ করিয়া দিলেন ও কোচবালাদিগের সহিত লীলাক্রিয়া করিতে লাগিলেন। এইরূপে কামরূপ প্রদেশের খণ্ডাংশ কুচবেহার দেশের নামের অর্থ—"কোচবালাদিগের বিহার বা লীলাস্থান হইয়াছে।" যথা—

(হরগৌরী প্রতি)

"কোচাখ্যানে চ দেশেচ * *
মাধবী শক্তিরস্ত্যেকা হীরেতি জনবিশ্রুতা॥
ভিক্ষাচারপ্রসঙ্গেন গচ্ছামি চ দিবানিশং।"

* * যোগিনীতন্ত্র পাতাল ১৪

কুচবেহারের নাম আধুনিক। পূর্ব্বে কুচবেহারের কামরূপ আসামের

অন্তর্গত ছিল এবং কামরূপ নামে অভিহিত হইত।

ষোড়শ শতাব্দীর প্রারম্ভে কোচ রাজারা অত্যন্ত পরাক্রান্ত হইয়াছিল, সম্ভবত এই কারণেই বোধ হয় তদানিন্তন কোচরাজারা তাহাদিগের জাতি-নামানুক্রমে অত্রত্য দেশের কোচ বা কুচ-বেহার এই নামকরণ করিয়া থাকিবেন। কুচবেহার নামের দ্বিতীয়াংশ "বেহার" শব্দের কোন বৌদ্ধ মঠের সঙ্গে সম্বন্ধ নাই। বৌদ্ধধর্ম্ম ভারতবর্ষ হইতে বিলুপ্ত হইবার অনেক পরে অর্থাৎ খৃঃ ষোড়শ শতাব্দীতে এতদ্দেশে কোচবংশ প্রবল হয়।

শ্রীনগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়।

মুদীর দোকান।

"অন্নং ন নিন্দ্যাৎ। প্রাণো বা অন্নং। অন্নাদ্বৈ প্রজাঃ প্রজায়ন্তে। অন্নং হি ভূতানাং জ্যেষ্ঠং" "অন্নের নিন্দা করিও না, অন্নই প্রাণরূপ, অন্ন হইতে প্রজা সমূহ উৎপন্ন হয়। অন্ন প্রাণীগণের জ্যেষ্ঠ।" যে বৈদিক কালে এমন উদার ভাবে ভোজ্যদ্রব্যের মাহাত্ম্য কীর্ত্তিত হইয়াছে, সেই কালে যে অন্নের আদর কিরূপ উচ্চ শিখরে উঠিয়াছিল তাহা স্পষ্টই বুঝা যায়। সেই বৈদিককালে অন্ন বা আহার বিষয়ে এত সঙ্কীর্ণতা ছিল না—অমুক ঐ দ্রব্য আহার করিয়াছেন তবে তাহাকে জাতিতে লওয়া হইবে না, জাতিচ্যুত করা হইবে এইরূপ সঙ্কীর্ণ ভাব সেকালে বড় ছিল না। একালে আহার বিষয়ে যে আমাদের মধ্যে কিরূপ সঙ্কীর্ণতা প্রশ্রয় পাইয়াছে আমাদের 'সঁকড়ি' শব্দটী তাহার কতকটা পরিচায়ক। 'সঁকড়ি' শব্দটী 'সঙ্কীর্ণ' শব্দ হইতেই উৎপন্ন বলিয়া মনে হয়। ভাত ডাল প্রভৃতি, আত্মীয়স্বজনরূপ সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে ব্যতীত যাহার তাহার সঙ্গে খাওয়া যায় না—নিষিদ্ধ, তাই উহার বেলায় সঁকড়ির ধুম পড়িয়া যায়, কিন্তু লুচি পিষ্টক প্রভৃতি সামগ্রী যাহা সকলের হাতে সকলের সঙ্গে বসিয়া খাওয়া যায় তাহাতে 'সঁকড়ি দোষ' স্পর্শ করে না। এই সকল

সঙ্কীর্ণ ভাব বৈদিক কালে বড় একটা ছিল না।

অন্ন কাহাকে বলে? বৈদিক ঋষি বলিতেছেন—

"অত্যতে অত্তি চ ভূতানি
তস্মাদন্নং তদুচ্যতে।" *

"যাহা প্রাণিগণ আহার করে তাহারি নাম অন্ন।"

মনু বলিতেছেন—

প্রাণস্যান্নমিদং সর্ব্বং প্রজাপতিরকল্পয়ৎ।
স্থাবরং জঙ্গমঞ্চৈব সর্ব্বং প্রাণস্য ভোজনং॥ †

"প্রজাপতি কি প্রাণী কি উদ্ভিদ এ উভয়ই জীবের অন্ন বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন, অতএব উদ্ভিদাদি স্থাবর এবং মাংসাদি জঙ্গম এই উভয়বিধ পদার্থই প্রাণের ভোজন।" অন্ন বা ভোজ্যবস্তুমাত্রকে প্রাণের আধার এইরূপ এক উদার চক্ষে ঋষিরা দেখিয়া গিয়াছেন।—ভোজ্যবস্তুকে প্রাণের আধার জানিয়া কোনরূপ ভোজ্য পদার্থের নিন্দা বা অনাদর করিতে নিষেধ করিয়াছেন। অন্নকে মহান ভাবে দেখিয়া উহার মহত্ব কীর্ত্তন পূর্ব্বক বলিয়া গিয়াছেন—"অন্নবান্ মহান্ ভবতি। প্রজয়া পশুভি র্ব্রহ্মবর্চ্চসেন মহান্ কীর্ত্ত্যা"। ‡

"অন্নবান প্রজা, পশু, ব্রহ্মতেজ ও মহতী কীর্ত্তির দ্বারা মহান হয়েন।"

'ভিন্নরুচির্হি লোকাঃ' লোকের রুচি ভিন্ন, সেই কারণে আহারও যে রুচি হিসাবে ভিন্ন হইবে তাহার কথাই নাই। প্রাণী মাত্রেরই আহার দুই শ্রেণীতে বিভক্ত—আমিষ ও নিরামিষ। এই দ্বিবিধ আহারের মধ্যে ধর্ম্মের চক্ষে নিকৃষ্ট আসন পায় আমিষাহার। বলকারিতা প্রভৃতি মাংসের অনেক গুণ আছে স্বীকার করি, কিন্তু এক যে হিংসা উহাই মাংসকে ধর্ম্মতঃ নিরামিষাহারের নিম্নে আসন দিয়াছে।

"না কৃত্বা প্রাণিনাং হিংসাং মাংসমুৎপদ্যতে ক্বচিৎ।
নচ প্রাণিবধঃ স্বর্গ্যস্তস্মান্মাংসং বিবর্জয়েৎ॥" ¶

---

* তৈত্তিরীয় আরণ্যক।

† মনু ৫ম অধ্যায়।

‡ তৈত্তিরীয় আরণ্যক।

¶ মনু।

"প্রাণিহিংসা না করিলে কখন মাংস উৎপন্ন হইতে পারে না, প্রাণিবধ স্বর্গের কারণ নহে অতএব মাংস বর্জ্জন করাই শ্রেয়।" কিন্তু তাই বলিয়া ধর্ম্মশাস্ত্রকার মহর্ষি মনু একটুও আত্মার সঙ্কীর্ণতা প্রদর্শন করেন নাই। তিনি বিহিত স্থলে মাংসভক্ষণের ব্যবস্থাও দিয়াছেন; এতদ্ব্যতীত সর্ব্বশেষে উদারতা সহকারে এই মীমাংসা করিয়া দিয়াছেন—

"ন মাংসভক্ষণে দোষো"

"প্রবৃত্তিরেষা ভূতানাং নিবৃত্তিস্তু মহাফলা।"

"মাংস ভক্ষণে দোষ নাই কারণ ইহাতে প্রাণিগণের স্বাভাবিক প্রবৃত্তি হইয়া থাকে তবে নিবৃত্তিই মহাফলজনক।" বস্তুতঃ বৈদিক কালে ভারতে উন্নতির প্রশস্ত যুগে কোন বিষয়ে সঙ্কীর্ণতা ছিল না, আহারে স্বাধীনতা বা উদারতা ছিল, তৃপ্তিপথে কোনরূপ কণ্টক ছিল না। সে স্বাধীনতা সে তৃপ্তি আমাদের একালে এই হীনবল হিন্দুজাতির মধ্যে একান্ত দুর্লভ। দেশকাল-পাত্রভেদে আমিষাহারেও যেমন ঋষিদিগের অরুচি ছিল না, নিরামিষাহারেও সেইরূপ প্রাণের মহান্ পরিতৃপ্তি ছিল। তবে ইহা অবশ্য স্বীকার্য্য যে, আর্য্য-জাতি চিরকাল নিরামিষপ্রধান। দয়াধর্ম্মপ্রাণ আর্য্যজাতি কিছু হিংস্র স্বভাব অসুরগণের ন্যায় আমমাংসভক্ষক নহে। নিরামিষ আহারই তাঁহাদিগের প্রাণ, তাই ঘৃত দধি ও নানা নিরামিষ উপকরণের সাহায্যে সংস্কৃত করিয়া তবে তাহারা আমিষ আহার করিয়া থাকেন। এই দেবপ্রাণ আর্য্য জাতির নিরামিষেই যেন সমধিক রুচি দেখা যায়।

নিরামিষ আহারই যখন আমাদের প্রাণের প্রধান সম্বল, তখন আহার করিবার পূর্ব্বে আমাদিগকে দেখিতে হইবে যে আহার্য্যের উপকরণগুলি কোথা হইতে একত্র সংগ্রহ করা যায়। তাহা আর কোথাও নহে একমাত্র **মুদীর দোকানে**। মুদীর দোকানের নাম করিলেই হয়ত বা এক্ষণে আমাকে অনেকের নিকট হাস্যাস্পদ হইতে হইবে, তথাপি এই দেশীয় ভাবের প্রাবল্যের কালে আমার আশা আছে সুবিবেচক ব্যক্তিরা নাসিকা কুঞ্চন করিতে বিরত হইয়া আমার কথায় মনোযোগ দিতে বিশেষ বিরক্তি বোধ করিবেন না। বিজাতীয় ভাবের প্রবলস্রোতে পড়িয়া মুদীর দোকান এযাবৎ অনাদরে অতি দীনভাবে জীবন অতিবাহিত করিয়া আসিয়াছে—সকলের উপহাসের পাত্র

হইয়া দাঁড়াইয়াছে। কিন্তু ইহাই যে আমাদের প্রাণধারণের একমাত্র নির্ভর-স্থান তাহা কেহ অস্বীকার করিতে পারেন না। এই মুদীর দোকান হইতে গৃহী, খাদ্যোপযোগী চাল, ডাল, ঘি, তৈল প্রভৃতি অধিকাংশ খাদ্যোপকরণ সঞ্চিত করিয়া থাকেন। কিন্তু ইহা সত্ত্বেও ইহার প্রতি প্রাণের আস্থা ও কৃতজ্ঞতা আমাদের একটুও নাই বলিলে হয়। এই মুদীর দোকানের স্থান যেন আজকাল 'Oilman's Stores' অধিকার করিতে বসিয়াছে। মুদীর দোকান না বলিয়া যদি Oilman's Stores বলা যায়, অমনি হয়ত আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিবে, কিন্তু মুদীর দোকান এই নামে আমাদের প্রাণের আনন্দের মূল যেমন সুগভীর প্রোথিত থাকিয়া রসাকর্ষণ করিতে পারে এমনটা কি Oil-man's Stores এ হইতে পারে? Oilman's Stores অর্থে তৈল বিক্রয়ীর ভাণ্ডার বুঝায়—ইহা বিজাতীয় ব্যবহারিক শব্দ মাত্র—অন্তঃসারশূন্য। ইহাতে প্রাণের আকর্ষণ কোথায়? কিন্তু এই লাঞ্ছিত, আমাদিগের নিজস্ব মুদীর দোকান যদিও বাহ্যাড়ম্বরশূন্য, তথাপি ইহা অন্তরে অন্তরে যথার্থ প্রাণের আনন্দদায়ক তাহা একটু ভাবিয়া দেখিলেই বুঝা যায়।

এই মুদীর দোকান বড় আজিকালের সৃষ্টি নহে। সহস্র সহস্র বৎসর পূর্ব্ব হইতে ইহা ভারতে বিরাজ করিতেছে—ভারতবাসীকে অধিকাংশ আহার্য্য দ্রব্য যোগাইয়া আসিতেছে। আজকালকার অবহেলার আস্পদ মুদীর দোকান আমাদিগের পূর্ব্বপূর্ব্ব পিতৃপুরুষগণের প্রাণে কতনা হর্ষ কতনা আনন্দ জাগ্রত করিত।

এই যে "মুদী" শব্দটী ইহা বড় আজকালের কথা নহে। ইহা বৈদিক কাল হইতে ভারতে চলিয়া আসিতেছে। "মুদী" নামটীতে ঋষিদিগের প্রাণের হর্ষ পূর্ণ মাত্রায় বিরাজ করিতেছে। 'মুদী' নামের ধাত্বর্থ হর্ষ; হর্ষ বা প্রাণের আনন্দজ্ঞাপক 'মুদ্' ধাতু হইতে "মুদী" শব্দের উৎপত্তি; "মুৎপ্রীতিঃ প্রমদো হর্ষঃ" (অমর)। যখন শস্যশ্যামল ভারতে পরিপক্ক ধান্য গোধূমাদি অন্নসমূহ ভরিয়া উঠিত—যখন অন্নপূর্ণা গৌরীর ন্যায় তাহার মুখে শোভনা শ্রী বিরাজ করিত তখন ঋষিদিগের প্রাণে এক অপূর্ব্ব আনন্দ জাগরুক না হইয়া যাইতে পারিত না। তাই বৈদিক ঋষিরা এই হর্ষদ্যোতক 'মুদ' শব্দেই ব্রীহ্যাদি অন্নমাত্রকেই বুঝাইতেন। চাল, ডাল, গোধূম প্রভৃতি অন্ন বা ওষধির সাধারণ বৈদিক নাম

'মুদ'। বিবাহকালে বৈদিক রাষ্ট্রভৃদ্ধোমে যে দ্বাদশ মন্ত্র পাঠ করিবার বিধি আছে তাহার মধ্যে দ্বিতীয় মন্ত্রটীতে ওষধি বা ব্রীহ্যাদি অন্ন অর্থে "মুদঃ" শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। "ততো রাষ্ট্রভৃদ্ধোমে পারস্করঃ—বিবাহে রাষ্ট্রভৃদিচ্ছন্নিতি।" তত্র দ্বাদশ মন্ত্রা যথা—এই দ্বাদশমন্ত্রের মধ্যে দ্বিতীয় মন্ত্রটী এই ঃ—

"ঋতাষাড়তধামাগ্নি র্গন্ধর্ব্বস্তস্যৌষধয়োঽপ্সরসো মুদোনাম তাভ্যঃ স্বাহা।"

অস্যার্থ ঃ— যোঽগ্নিঃ গন্ধর্ব্বরূপঃ। কিম্ভূতোঽগ্নিঃ ঋতং সত্যং সহতে ইতি ঋতাসাট্ সত্যসহকৃত ইত্যর্থঃ। পুনঃ কিম্ভূতঃ ঋতধামা ঋতং সত্যং ধাম স্থানং যস্যেতি ঋতধামা। তস্য অগ্নের্গন্ধর্ব্বরূপস্যাপ্সরসঃ ওষধয়ো ব্রীহ্যাদয়ঃ। কিম্ভূতাঃ মুদোনাম মুন্নাম্ন ইত্যর্থঃ। তাভিঃ সর্ব্বে মোদন্তে ইতি মুদঃ তাভ্য ওষধিভ্যঃ স্বাহা স্বহুতমস্ত। অগ্নের্গন্ধর্ব্বস্যাপ্সরোভ্যো মুন্নাম্নীভ্য' ওষধিভ্যঃ অস্মাভি-রিদমাজ্যং প্রদত্তং তা অস্মাকং জ্ঞানং বীর্য্যঞ্চ রক্ষন্ত্বিতি বাক্যার্থঃ।

"ঋতসহকারী ঋতধাম গন্ধর্ব্বরূপ যে অগ্নি, ওষধি বা ব্রীহ্যাদি অন্নগণই তাহার অপ্সরাগণ। সেই মুদো নাম্নী অপ্সরাগণের উদ্দেশে এই হবি আহুতি প্রদত্ত হইল। ইহা আমাদিগের জ্ঞান ও বীর্য্য রক্ষা করুক।"

চাল, ডাল, গোধূম প্রভৃতি ওষধি বা অন্নসমূহকে 'মুদঃ' কেন বলে টীকা-কার তাহা স্পষ্টই ভাঙ্গিয়া বলিয়াছেন—"তাভিঃ সর্ব্বে মোদন্তে ইতি মুদঃ।" অর্থাৎ "এই অন্নের দ্বারা সকলে হর্ষ বা তৃপ্তি লাভ করে তাই 'মুদঃ' নাম।" দক্ষিণায়নের কাল বা হেমন্তঋতু, ধান্যাদি অন্নের প্রশস্ত কাল বলিয়া তৈত্তিরীয় আরণ্যকে দক্ষিণায়ণ কালকে এপর্য্যন্ত "মোদঃ" শব্দে অভিহিত করিয়াছেন,—

"মোদো দক্ষিণঃ পক্ষঃ"

পাঠকগণ এক্ষণে বুঝিলেন যে বৈদিক ঋষিরা ধান্যাদি ওষধির হর্ষে প্রমুদিত হইয়াই ধান্য গোধূমাদি অন্নের নাম দিয়াছেন 'মুদঃ'। এই 'মুদঃ' বা অন্ন যাহার গৃহে বা যাহার পণ্যশালায় আছে সেই "মুদী"। মুদোঽন্নমস্যাস্তীতি মুদী। এইরূপে অন্নবিক্রয়কারীর নাম মুদী হইয়াছে। তাই বলিতেছিলাম 'মুদী' বলিলে আজকাল যেরূপ তুচ্ছভাব, অপদার্থ হেয়ভাব প্রাণে জাগ্রত করে উহা প্রকৃতপক্ষে সেরূপ হেয় বা অবজ্ঞার আস্পদ নহে। আমাদিগের পূর্ব্ব-পুরুষ ঋষিগণের প্রাণের চির-আনন্দ এই 'মুদী' নামে বিজড়িত। অথচ

পাশ্চাত্যশিক্ষার প্রভাবে এমন আনন্দদায়ক মনোরম নামটীর প্রতি আমরা একবার দৃক্‌পাত না করিয়া ঘৃণার ভাবে দেখিয়া থাকি। এমন প্রাণের বস্তু 'মুদী'কে ছাড়িয়া নীরস শুষ্ক 'Oilman' কে যে কি প্রকারে ভাললাগে তাহা বলিতে পারি না। যাঁহার প্রাণ আছে হৃদয় আছে তিনি অবশ্যই ঋষি-উচ্চারিত এই 'মুদী' নামে পূর্ণ হর্ষ লাভ করিবেন।

মুদীর দোকানের প্রধান প্রধান সামগ্রীগুলিরও নাম এই হর্ষদ্যোতক মুদ্ ধাতু হইতেই উৎপন্ন। দেখুন ঘৃত একটী মুদীর দোকানের প্রধান দ্রব্য। খাদ্যপাকে এই ঘৃতের অন্যতম নাম 'ময়ান'। এই 'ময়ান' সংস্কৃত 'মোদন' শব্দের অপভ্রংশ মাত্র। মোদনকারী বা হর্ষজনক বলিয়াই ঘৃতের নাম 'মোদন'; যেমন 'বদন' হইতে বাঙ্গলায় 'বয়ান' আসিয়াছে সেইরূপ "মোদন" হইতেই 'ময়ানের' উৎপত্তি। যখন রুটী লুচি বা অন্য কোন পিষ্টকজাতীয় খাদ্য প্রস্তুত করা যায় তখন ঘৃতসম্পর্ক ভিন্ন তাহা বস্তুতঃ মোদনকারী হয় না; ঘৃতবিহীন পিষ্টকাদি দ্রব্য শুষ্ক ও নীরস হইয়া থাকে। তাই রুটী লুচি প্রভৃতি-কে মোদনকারী করিবার জন্য ঘৃত ময়ান দেওয়া হয়। যেমন ঘৃত মোদনকারী দ্রব্যের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বলিয়া ঘৃতের অন্যতম নাম মোদন বা ময়ান হইয়াছে সেইরূপ যে সামগ্রীটী প্রধানতঃ ঘৃতের দ্বারা মোদনীয় তাহারও নাম "মোদ্য" হইয়াছে। আমাদের দেশের প্রচলিত 'ময়দা' শব্দটী সংস্কৃত 'মোদ্য' শব্দ হইতে প্রসূত বলিয়া বোধ হয়। 'মোদ্য' অর্থাৎ যাহা ঘৃতের দ্বারা মোদনীয় অর্থাৎ যাহাতে ঘৃতের ময়ান মাখান হয় এই 'মোদ্য' শব্দটী লোকমুখে একটু বিকৃত হইয়া 'ময়দা' আকার প্রাপ্ত হইয়াছে। কি হিন্দুস্থানে কি বঙ্গে সর্ব্বত্রই এই কারণে গোধূমচূর্ণ ময়দা নামে অভিহিত হয়। বস্তুতঃ গোধূমচূর্ণ ময়দার সহিত ঘৃতের যেরূপ প্রগাঢ় সখ্য এমন আর অন্য কিছুর সঙ্গে নহে। ভক্ত বা ভাত এবং ডাল ও তরীতরকারী প্রভৃতি ঘৃতের সাহায্য বিনাও খাওয়া যায়, কিন্তু ময়দা ঘৃত সাহায্য বিনা খাওয়া চলে না। ঘৃতাক্ত হইয়া তবে ময়দা সকলকে প্রমুদিত বা হর্ষান্বিত করে; কি গজা প্রভৃতি পিষ্টক, কি রুটী, কি লুচি সকল প্রকার খাদ্যেই ময়দা ঘৃত সাহায্যেই নিজ গুণের পরিচয় দিয়া থাকে। অনেকস্থলে গোধূম-চূর্ণ 'আটা' নামেও অভিহিত হইতে দেখা যায়। কিন্তু

'আটা' শব্দে কেবল যে গোধূমচূর্ণকে বুঝায় তাহা নয়, গোধূমের ন্যায় অন্যান্য দ্রব্যের চূর্ণকেও 'আটা' বলে। যথা, ভুট্টার আটা, যবের আটা ইত্যাদি; হিন্দুস্থানী পাচকেরা "উরদ্‌কি ডালকা আটা," 'মূগকা চূণ বা মূগকা আটা', 'গেঁহুকা আটা' ইত্যাদি বলিয়া থাকে। উহারা কোন দ্রব্যের চূর্ণকে সচরাচর আটা বলে। তাহা হইলেই বুঝা যাইতেছে চাল, গোধূম প্রভৃতি শস্যচূর্ণের নামই 'আটা'। 'আটা' শব্দের উৎপত্তি 'আবৃত্ত' শব্দ হইতেই হওয়া সম্ভব। যাহা যন্ত্রাবৃত্ত অর্থাৎ চাক্কি বা জাঁতায় পেষিত হয় তাহাই 'আটা'। ধান্য প্রভৃতি যাহা জাঁতায় আবৃত্ত হইয়া চূর্ণ হয় তাহাই আটা, তাই বলিয়া ইষ্টকের চূর্ণ যাহা যাঁতায় আবৃত্ত হয় না তাহাকে আটা বলে না। খাদ্যপাকে যখন দেখি সংস্কৃত 'আবর্ত্তন' শব্দ বঙ্গপ্রাকৃতে 'আওটান' শব্দে পরিণত হইয়াছে, তখন 'আবৃত্ত' হইতে যে 'আটা' আসিতে পারে তাহা সহজেই অনুমেয়।

আবার দেখুন 'বৈদল' বা ডালজাতীয়ের মধ্যে যাহা শ্রেষ্ঠ, রসনার বিশেষ তৃপ্তিজনক সেই মুগের ডালও এই মুদ্ ধাতুকে নিজঅঙ্গীভূত না করিয়া যায় নাই। মুগের ডালের সংস্কৃত নাম "মুদ্গ"। মুদ্গ শব্দের অর্থ যাহা 'মুদ বা 'হর্ষকে প্রাপ্তি করায়'। বৈদিক কালে মুদ্গ ডাল ঋষিদিগের এত অধিক প্রিয় বস্তু ছিল যে অনেক ঋষি "মুদ্গ ভক্ষণকারী" এই নামেই প্রসিদ্ধ হইয়াছিলেন। বৈদিক ঋষিদিগের মধ্যে অনেকের নাম যে 'মুদ্গল' দেখিতে পাওয়া যায়, নিরুক্তকারের মতে উহা 'মুদ্গগিল' শব্দের সংক্ষেপ মাত্র।

যেস্থলে হর্ষে চক্ষুদ্বয় মুদ্রিত করিতে ইচ্ছা হয়—প্রাণ জুড়ান তৃপ্তি উপভোগ করা যায়, সেই স্থলেই যেন হর্ষদ্যোতক মুদ শব্দ আপনা আপনি প্রাণ হইতে উত্থিত হয়। নয়নানন্দকারী শস্পশ্যামল ক্ষেত্র দেখিলে কাহার না প্রাণ জুড়ায়? তাই তাহা 'মোদোদ্যান' বা 'ময়দান' নামে অভিহিত। কি খাদ্য কি ঔষধ কি অন্যান্য বিষয় যেখানে ঋষিরা প্রাণজুড়ান হর্ষ লাভ করিয়াছেন সেইখানেই 'মুদ' বা 'মোদ' শব্দের ব্যবহার না করিয়া তৃপ্ত হন নাই। সুমিষ্ট লড্ডুক মোদনকারী, তাই তাহার নাম হইল 'মোদক'। আমাদের 'মোয়া' যেমন 'খইয়ের মোয়া' এই 'মোদক' শব্দ হইতেই উৎপন্ন ঔষধের মধ্যে যাহা মিষ্ট তাহাও 'মোদক' নাম প্রাপ্ত হইয়াছে। 'মোদককার' হইতে বাঙ্গলায় 'ময়রা' আসিয়াছে। সুমিষ্ট জমাট ক্ষীর যাহা একরূপ মোদকেরই

তুল্য তাহারও নাম 'মেওয়া'—ইহাও মোদক শব্দজাত। বাদাম পেস্তা প্রভৃতি মোদনকারী ফলেরও নাম 'মেওয়া'। বস্তুতঃ বাদাম পেস্তা প্রভৃতি ফলগুলি অধিকাংশ খাদ্যদ্রব্যের মোদনার্থই ব্যবহৃত হইয়া থাকে, অর্থাৎ অনেক খাদ্যের সঙ্গে সহকারীরূপে থাকিয়া তাহাদের ঔৎকর্ষ সাধন করে।

উপরে যে সকল মোদনকারী দ্রব্যাদির নাম করিলাম সেইগুলি এবং তাহাদেরই স্বজাতীয় অন্যান্য নানা দ্রব্যসমূহ মুদীর দোকানের উপকরণ সামগ্রী। এই সকল ভারতপ্রসূত দ্রব্যসমূহ এই মুদীর বিপণি হইতেই এককালে দেশবিদেশে পরিচালিত হইত; শস্যশ্যামল ভারতের বিপণি হইতে চাল, ডাল প্রভৃতি নানা দ্রব্য দেশবিদেশে নীত হইত। এখনও তাহার চিহ্ন দেশবিদেশে পাওয়া যায়। তাই এখনও দেখা যায়, আমাদের দেশ হইতে সেই সকল দ্রব্য বিদেশে গিয়া তাহাদের ভাষার মধ্যে নিজনাম অঙ্কিত করিয়া আসিয়াছে। যেমন ধান বা চাল ইহা মুদীর প্রধান আসবাব; ধান্যের মাহাত্ম্য জগতে কাহারও অবিদিত নাই। সমগ্র আসিয়াখণ্ডে ইহাই সর্ব্বপ্রধান খাদ্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে। কিছুদিন হইল কোন ভাষাবিৎ ইংরাজপণ্ডিত ভারত-দ্বীপপুঞ্জের ধান্যের নাম 'আটিয়া' (Atia) হইতে 'আসিয়া' নামের উৎপত্তি পর্য্যন্ত আকর্ষণ করিতে কুণ্ঠিত হন নাই। য়ুরোপ ও আসিয়া ভূখণ্ডের অধিকাংশ ভাষায় ধান্যের নামগুলি সংস্কৃত হইতে উৎপন্ন দেখা যায়। ভারতের বৈদিক শব্দই দেশবিদেশের চালের নাম সরবরাহ করিয়াছে। বৈদিক ব্রীহি শব্দের 'ব' লুপ্ত হইয়া এবং 'হ' 'স'তে পরিণত হইয়া ঈষৎ পরিবর্ত্তিত আকারে ইংরাজীতে 'রাইস্', ফরাসী ও জর্ম্মণভাষায় 'রিস্', লাটিন ও গ্রীকভাষায় 'অরিসা' হইয়াছে। ধান চালের নাম ও উহার আদর য়ুরোপীয়েরা যে ভারতের নিকট শিক্ষা করিয়াছে তাহা উহারা নিজেরাই স্বীকার করে, তজ্জন্য আমাদের সে কথা লইয়া বিস্তারিত আলোচনা নিষ্প্রয়োজন। এক্ষণে য়ুরোপের কথা ছাড়িয়া আমাদের বাঙ্গলার 'চাল' শব্দের উৎপত্তি কিরূপে আসিল সে বিষয় আলোচনা করা যাক। কিছুকাল পূর্ব্বে পূজনীয় দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় সংস্কৃত 'তণ্ডুল' হইতে বাঙ্গলার 'চাল' শব্দের উৎপত্তি নির্দ্ধারণ করিয়াছেন, তিনি বলেন—"যখন আতপ চালের কথা হইতেছে, তখন বুঝিতে হইবে যে 'তণ্ডুল' হইতে 'তাঁড়ুল' আসিয়াছে, 'তাঁড়ুল' হইতে 'তাউল' আসিয়াছে, 'তাউল' হইতে 'চাউল' আসি-

য়াছে।" * কিন্তু ইহা অত্যন্ত কষ্টকল্পিত বলিয়া মনে হয়। সহজ কথা, যাহা চালনী বা কুলায় চালিয়া লওয়া হয় অর্থাৎ তুষবর্জ্জিত করা হয় তাহাই 'চাল'। তুষযুক্ত যাহা তাহা ধান্য।

চাল, ডাল, ঘৃত, তৈল প্রভৃতি নিরামিষ মোদনকারী দ্রব্যেই আমাদের মুদীর দোকান সুসজ্জিত থাকিত, আর এক্ষণে oilman's storesএ এ সকল দ্রব্য অল্পই সঞ্চিত থাকে কিন্তু ভারে ভারে বিদেশানীত আমিষদ্রব্য এমন কি অমেধ্য ঘোটকাদি অখাদ্য মাংস প্রভৃতিও টিনবদ্ধ হইয়া আমাদের দেশকে প্লাবিত করিতেছে। যেস্থলে মুদীর বিপণিতে বিশুদ্ধ পরিতৃপ্তি উপভোগ্য ছিল, এক্ষণে তাহার স্থলে oilman's storesএর অপরিতৃপ্ত হিংসাসুখ-মত্ততা আসিয়া রাজত্ব করিতে চাহিতেছে। বস্তুতঃ, দেহের বলমাংসকর হইলেও হিংসালব্ধ আমিষাহারে সে হর্ষ সে তৃপ্তি পাওয়া যায় না যেমন পবিত্র নিরামিষ আহারে পাওয়া যায়। অথচ আমিষাহারের ন্যায় নিরামিষ দ্রব্য কিছু কম বলপুষ্টিকর নহে। কিন্তু নিরামিষ দ্রব্যের চারিদিকে আনন্দবার্ত্তা। আশা করি সেই আনন্দ সেই আমোদ ভারতের গৃহে গৃহে বিরাজ করুক—মুদীর বিপণিতে ভারতের অন্ন ভারতবাসীরা অক্লেশে লাভ করিয়া জ্ঞানে বীর্য্যে প্রমুদিত হউন।

শ্রীঋতেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

---

* সাহিত্য পরিষদ পত্রিকা, ১৩০৪ সাল, ৪র্থ ভাগ, ৪র্থ সংখ্যা দেখ।

পুরাতন।

ওগো, নূতন ভুলিয়া নূতন ছাড়িয়া
এস পুরাতন মাঝে!
এস সুমোহন বেশে সুমধুর হেসে
সেই পুরাতন সাজে।
হেথা পুরাতন অলি চুমে ফুলকলি
পুরাণো পাখীর গান,
সেই পুরাণো জোছনা, তব চির-চেনা—
পুরাতনে মাখা প্রাণ!
পুরাণো চাঁদিনী মাধবী যামিনী
পুরাতন বীণা বাজে
পুরাতন সুর, করুণ মধুর
মাখা পুরাতন লাজে!
হেথা, নূতন আসে না, নূতন বাসনা
নূতনের নাহি লেশ
হেথা, পুরাতন স্মৃতি, পুরাতন গীতি
পুরাতনে ভরা দেশ!
এস হৃদয়ের প্রীতি মোহন মূরতি
নূতনের স্মৃতি ভুলি
তব পুরাণো আসন করিয়া যতন
হেথায় রেখেছি তুলি।
এস এস প্রিয় এস, এস সখা এস
মধুর বসন্ত রাতে,
এস চির স্মরণীয়, চির বরণীয়
মধুর দখিণে বাতে,
এস, অমিয় হাসি—জোছনা রাশি—
কোমল মধুর মুখ,
এস এস হৃদে এস এস প্রিয় এস
এস পুরাতন সুখ।

শ্রীঃ দেবী।

সোণায় অরুচি।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

যথাসময়ে গৃহে আসিলাম। এমনই অবস্থায় কয়মাস কাটিল—পিতৃগৃহ হইতে পঙ্কজিনী আসিলেন না। যখনই আনিবার জন্য দাদা চেষ্টা করিতেন—পত্র লিখিতেন, তখনই একটা না একটা ওজর করিয়া আসার বিলম্ব ফেলাইতে লাগিলেন। এমনই ভাবে দেখিতে দেখিতে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবার পর দেড় বৎসরের অধিক কাল কাটিয়া গেল। এদিকে এফ, এ, পরীক্ষা দিতে আর তিন মাস মাত্র বাকি আছে। এমন সময় সহসা অগ্রজ মহাশয় কঠিন রোগগ্রস্ত হইলেন। শৈশব হইতে অতিরিক্ত অধ্যয়নাদি মানসিক কঠোর পরিশ্রম, তারপর দারুণ অর্থচিন্তা, এই সবে পিতার মৃত্যুর পর দুই বৎসর যাইতে না যাইতেই হঠাৎ তিনি কঠিন রোগগ্রস্ত হইলেন। রোগগ্রস্ত হইয়াও যতদিন পারিলেন, ততদিন চাকুরী করিলেন। তারপর দিন দিন তাঁহার শারীরিক শোচনীয় অবস্থা দেখিয়া, অগত্যা বাধ্য হইয়া তাঁহাকে চাকুরী ছাড়াইয়া বাড়ী বসাইতে হইল। দাদার চাকুরী পরিত্যাগের পর আয়ের পথ একেবারেই রুদ্ধ হইয়া গেল। এখন কেবলমাত্র আমার বৃত্তির কয়েকটী টাকার উপর সম্পূর্ণ নির্ভর। সেই বৃত্তির কুড়িটী টাকা, ইহার মধ্যে বেতনের কয়েকটী টাকা দিয়া, অবশিষ্ট যৎসামান্য কয়েকটী টাকার উপর নির্ভর করিয়া এই বৃহৎ পরিবার প্রতিপালন ও রোগীর ঔষধ পথ্য সংগ্রহ করিতে হইবে। এমনই অবস্থায় বড় কষ্টে কয়মাস পর আমি ঢাকা কালেজ হইতে এফ, এ, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলাম। আমাদের বিপদ বিপদের অনুগামী হইলেও, এবার বিধাতা একটু প্রসন্ন হইলেন,—এফ, এ, পাসের পর আমি গুণানুসারে মাসিক পঁচিশ টাকা বৃত্তি পাইলাম। আর ঠিক সেই সময়ে দাদার একটী কন্যা জন্মিল। বড় দুঃখের সময় দাদার সেই শিশুকন্যার সতত হাসিমাখা কচি মুখখানি দেখিয়া আমি প্রীতিপ্রফুল্ল মুখে কন্যার শেফালিকা নামকরণ করিলাম।

এতদিন, দাদার কর্ম্ম পরিত্যাগের পর এই কয়মাস আমার সেই বৃত্তির টাকা কয়েকটী ও দাদার উপার্জ্জিত পূর্ব্ব সঞ্চয়ের যৎসামান্য অর্থ অবলম্বন করিয়া বড় কষ্টে কাটিল। কিন্তু এখন আর সে সঞ্চিত অর্থ নাই,—এদিকে দাদাও দিন দিন অর্থচিন্তায় গভীর দুঃখে ও ঘোর হতাশে, কোথায় আরোগ্য হইবেন, না, দিন দিন রোগ বৃদ্ধি হইয়াই চলিল। শেষ, আমি নিরুপায় হইয়া অনেক যত্নে মাসিক পনেরো টাকা বেতনে একটা প্রাইভেট্ মাষ্টারী জুটাইয়া লইলাম; এবং কালেজের অধ্যক্ষ্য ও অধ্যাপক মণ্ডলীর অনুগ্রহে কালেজের বেতনের দায় হইতে অব্যাহতি লাভ করিলাম। কিন্তু রোগ বৃদ্ধির সহিত দিন দিন যেমন খরচ বৃদ্ধি হইতেছিল, তাহাতে সামান্য বৃত্তির পঁচিশটী টাকা ও মাষ্টারীর পনেরোটী, এই চল্লিশটী মুদ্রায় দিন আর কোন মতেই কাটে না। এমনই ভাবে ঘোর নিরুপায় হইয়া আমি মান অপমান পরিত্যাগ করিয়া, অন্ততঃ যে পর্য্যন্ত আমি বি, এ, পরীক্ষা না দিতেছি, সে পর্য্যন্ত সেই দুই বৎসরের জন্য মাসিক একটা অধ্যয়নের সাহায্য পাইবার আশায়, আবার আমার সেই শ্বশুর মহাশয়কে পত্র লিখিলাম। যথা সময়ে পত্রের উত্তর আসিল। পত্রের উত্তরে লিখিলেন,—"তুমি মাস মাস যে বৃত্তি পাইতেছ, তাহার দ্বারায় ঢাকা কালেজে কেন, মেসে থাকিয়া কলিকাতায় পড়িতে পার এবং সুচারুরূপে ঐ টাকা হইতেই কলিকাতার ব্যয় নির্ব্বাহ হইতে পারে, তখন আমার কাছে পড়িবার সাহায্য প্রার্থনা করা নিষ্প্রয়োজন। তুমি যদি বিলাত যাইতে স্বীকৃত হও তবে এখনও আমি তোমার বিলাতে অধ্যয়নের সম্পূর্ণ ব্যয়ভার বহন করিতে স্বীকৃত আছি; কিন্তু বিলাত না গেলে এক কপর্দ্দকও দিব না। ন্যায্য ব্যয় করিতে আমি কিছুমাত্র কুণ্ঠিত নহি; কিন্তু এক কপর্দ্দক অপব্যয় করিতে বড়ই কাতর। সুতরাং অপব্যয় করিবার জন্য আমার নিকট অর্থ সাহায্য আর চাহিও না,—চাহিলেও দিব না। আশা করি তুমিও আর কখন আমার নিকট অর্থ প্রার্থী হইবে না।" আমার ধনশালী সদরআলা শ্বশুর মহাশয়ের পত্র পাঠ করিয়া ঘৃণায় ও ক্ষোভে আমার হৃদয় জ্বলিয়া উঠিল।

এফ, এ, পাসের পর বড় কষ্টে এমনই ভাবে আরও কয়মাস গেল। কয় মাসে আমাকে অনেকগুলি টাকা ঋণ করিতে হইল, কিন্তু ঋণ করিয়াও চারিদিক

কুলাইয়া উঠিতে পারিলাম না। অন্যদিকে দাদার অবস্থাও দিন দিন মন্দ হইতে মন্দতর হইতে লাগিল। আমি তখন অন্য কোন উপায় না দেখিয়া, অগত্যা দাদার সেই বালিকা পত্নীর উপদেশানুসারে তাঁহারই পিতৃদত্ত অলঙ্কার-রাশির উপর হস্তক্ষেপ করিতে হইল। যখন আর কুলাইয়া উঠিতে পারিতাম না, তখন অগত্যা আমাকে বাধ্য হইয়া সেই বালিকা বউঠাকুরাণী অপরাজিতারই গায়ের এক একখানি অলঙ্কার বিক্রয় করিয়া, সেই বিক্রয়লব্ধ অর্থে আমাদের আর্থিক অনাটন কতকটা দূর করিতেছিলাম।

দেখিতে দেখিতে এমনই অবস্থায় পূজা আসিল। গত পূর্ব্ব বৎসর পূজার পূর্ব্বে আমার স্ত্রী পঙ্কজিনী সেই যে পিত্রালয়ে গিয়াছিলেন; তারপর এই দীর্ঘ দুই বৎসর মধ্যেও আর তিনি স্বামীগৃহে আইসেন নাই, যখনই তাঁহাকে আনিবার প্রস্তাব হয়, তখনই একটা না একটা প্রতিবন্ধক উপস্থিত করিয়া আমার শ্বশুর মহাশয় তাঁহাকে স্বামীগৃহে পাঠাইতে বিরত হইতেন। এবারও আবার পূজোপলক্ষে শ্বশুরগৃহ হইতে আমার নিমন্ত্রণ আসিল; কিন্তু আমি নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিলাম না—করিতে কিছুমাত্র প্রবৃত্তিও হইল না। এমনই ভাবে যথাকালে পূজা কাটিয়া গেল। পূজার পর দেখিলাম যে, এক সেই বালিকা বউঠাকুরাণীর দ্বারায় আর কোন মতেই সংসার চলে না, তাই অগত্যা বাধ্য হইয়া অনেক পীড়াপীড়ির পর আমার স্ত্রীকে আনিলাম। কিন্তু স্ত্রীর দ্বারায় সংসারের কাজ কর্ম্মের বিশেষ সুবিধা হউক আর না হউক, শুধু সময়ে সময়ে বিশেষ বাক্য যন্ত্রণা সহ্য করিতে হইতেছিল। এমনই অবস্থায় বড় কষ্টে আরও এক বৎসর কাটিয়া গেল, বি, এ, পরীক্ষা দিবার আর ছয় মাস মাত্র বাকি আছে। অন্যদিকে অগ্রজ মহাশয়ও শনৈঃ শনৈঃ মরণের পথে অগ্রসর হইতে লাগিলেন।

আরও কয়মাস কাটিল। আগামী এপ্রেল মাসে বি, এ, পরীক্ষা—এবার আমাকে বি, এ, পরীক্ষা দিতে হইবে। আমি যেবার বি, এ, পরীক্ষা দিই, সেবার ঢাকা কালেজে বি, এ, পরীক্ষার কেন্দ্রস্থল নির্দ্দিষ্ট ছিল না। সুতরাং কলিকাতা যাইয়া আমাকে বি, এ, পরীক্ষা দিতে হইবে। এদিকে এতদিন ধরিয়া ব্যয়ের অকুলনে বৃত্তি বা প্রাইভেট টিউটরীর একটী পয়সাও রাখিতে পারি নাই। রাখা তো দূরের কথা, এই দুই বৎসরে আমার বৃত্তির টাকা—

টিউটরীর টাকা,—ইহা ছাড়া বউঠাকুরাণী অপরাজিতার গায়ের গহণাগুলি একে একে বিক্রয় করিয়াও রোগীর সেবাশুশ্রূষায় এবং সংসারের খরচ চারি দিক কুলাইয়া উঠিতে না পারিয়া, বরং এই দীর্ঘকালে অনেকটী টাকা ঋণগ্রহণ করিতে হইয়াছে। এখন আর উপায় নাই,—ঋণ পাইবারও পথ নাই; এদিকে বি, এ, পরীক্ষার ফী ত্রিশ টাকা, পরীক্ষা দিতে কলিকাতা যাইবার ব্যয়—সেও ন্যূনকল্পে ত্রিশ, ইহা ছাড়া পরীক্ষা দিয়া না আসা পর্য্যন্ত বাসার ব্যয়, সেও প্রায় একশত টাকা,—মোট একশত ষাট টাকা ন্যূনপক্ষে দেড়শত টাকা এখন আমার দরকার। এতদিন দায়ে পড়িয়া, নিজের মান অপমান পরিত্যাগ করিয়া বাধ্য হইয়া নিজের অবস্থা বিপর্য্যয় জানাইয়া আমার শ্বশুরকে পত্র লিখিলেও, তিনি আমার বর্ত্তমান দুরবস্থা দেখিয়াও এক কপর্দ্দক অর্থ সাহায্য করেন নাই; বরং পাছে তাঁহারই প্রদত্ত, তাঁহারই দুহিতার গায়ের গহণাগুলি আমাদিগের এই ঘোর দুর্দ্দিনে বেচিয়া খাইয়া বসি; এই ভয়ে এবার তাঁহার দুহিতাকে স্বামীগৃহে পাঠাইবার কালে পঙ্কজিনীর গায়ের সামান্য দুই তিনখানি গহণা ব্যতীত, একখানিও গহণাও তাঁহার সঙ্গে পাঠান নাই। অন্যদিকে কন্যাকে উপযুক্ত রকম শিক্ষাদান করিয়াছিলেন যে, যদি কখন অর্থের জন্য তাঁহার নিকট কোন গহণা চাহি, তাহা হইলে গায়ের গহনা দিয়া স্বামীকে যেন তাঁহার বিপদ হইতে রক্ষা না করেন। কিন্তু এখন আর উপায় নাই—এখন আবার সেই স্বার্থান্ধ শ্বশুর মহাশয়কে টাকার জন্য পত্র লিখিতে হইল। পত্রে আর আর কথা লিখিবার পর লিখিলাম যে,—"বি, এ, পরীক্ষা দিবার সময় নিকট—ফী দাখিলের আর দিন নাই, এক সপ্তাহ মাত্র বাকি আছে। আমাদের বর্ত্তমান অবস্থা জানিতেছেন। এই দুই বৎসর বড় কষ্টে ও বড় যন্ত্রণায় আমার দিন কাটিলেও আপনার নিকট কোন সাহায্য পাই নাই। কিন্তু এখন আর সাহায্য না পাইলে কোন মতেই চলিতেছে না; কেননা, এখন আপনি সাহায্য না করিলে, আমার এই দীর্ঘ দুই বৎসরের কঠিন পরিশ্রম একেবারে মাটি হইয়া যায়—পরীক্ষা দেওয়া হয় না। তাই আপনার নিকট আমার বিনীত প্রার্থনা, পত্র পাঠ আমাকে দেড়শত টাকা পাঠাইয়া দিয়া আমাকে এই বিপদ হইতে মুক্ত করিবেন। বর্ত্তমানে আমার বড় দুঃসময় আসিয়াছে, এখন আপনি আমার বিষাদ মলিন মুখের পানে না

চাহিলে, আর কে এই চিরহতভাগ্যের মুখপানে চাহিবে? যদিও আমি নানা কারণে আপনাদের উপদেশানুসারে চলিতে পারি নাই, তবুও আমার বর্ত্তমান দুরবস্থার কথা ভাবিয়া যাহা ভাল হয় করিবেন। যদি আপনার অর্থ সাহায্য করিবার ক্ষমতা না থাকিত, তবে আপনাকে অর্থের জন্য এত পীড়াপীড়ি করিতাম না। জগদীশ্বরের অনুগ্রহে আপনার অর্থের কিছুমাত্র অভাব নাই, এমন অবস্থায় আমি আপনার হতভাগ্য জামাতা—আমাকে বিপদমুক্ত করা কি আপনার কর্ত্তব্য নহে,—একবার স্থিরচিত্তে আপনিই ভাবিয়া দেখিবেন। ফলতঃ মনে রাখিবেন যে, আপনি টাকা না পাঠাইলে আমার ফী দাখিল হইবে না—পরীক্ষা দেওয়াও ঘটিবে না। আমার ভবিষ্যৎ জীবনের সুখ দুঃখ—উন্নতি অবনতি এখন সম্পূর্ণ আপনার উপর নির্ভর—যাহা ভাল হয় করিবেন।"

আমার শ্বশুরকে পত্র লেখার পর দেখিতে দেখিতে এক সপ্তাহ কাটিয়া গেল; কিন্তু পত্রের কোন উত্তর পাইলাম না—টাকাও পাইলাম না। এদিকে ফী দাখিলের আর একটি মাত্র দিন আছে। আমি টাকার কোন যোগাড় করিতে না পারিয়া, জগৎ অন্ধকার দেখিলাম। এমনই অবস্থায় বড় কষ্টে আমার দিন কাটিয়া গেল। রাত্রিতে আমার স্ত্রী পঙ্কজিনীকে কহিলাম,—"আগামী কল্য আমার 'ফী' দাখিলের দিন—এ পর্য্যন্ত কোথায়ও টাকার জোগাড় করিতে পারিলাম না। এখন তুমি অনুগ্রহ না করিলে, আমার দুই বৎসরের এই হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রম একেবারে মাটি হইয়া যায়, আমার ভবিষ্যৎ আশায় ছাই পড়ে। এখন তুমি তোমার গায়ের গহনা ক'খানি আমাকে দান করিয়া—আমার উপস্থিত বিপদ দূর কর। বিধাতা চিরদিন আমাকে এমন ভাবে রাখিবেন না—একদিন অবশ্যই সুদিন দিবেন, তখন আবার তোমাকে রত্নালঙ্কারে মনের সাধে সাজাইব। আর আমি তোমার স্বামী; তুমি এখন এ অনুগ্রহ না করিলে—কে করিবে বল?"

আমার কাতর প্রার্থনায় পঙ্কজিনী দৃক্‌পাত না করিয়া ঘৃণার সহিত কহিলেন,—"আগে বুঝিয়া চলিলেই তো, এখন আর স্ত্রীর গা'র গহনা বেচিতে হইত না। তখন বাবার হিত কথা, মা'র উপদেশ শুনিলে না, বরং তাঁহাদিগকে অপমান পর্য্যন্ত করেছিলে, এখন আবার তাঁহাদেরই প্রদত্ত অলঙ্কারের উপর তোমার লোভ কেন? যদি বাঙ্গাল না হ'য়ে আমাদের দেশের স্বামী

হ'তো সে প্রাণ গেলেও এমন অপমানজনক কার্য্য করিতে কখনই স্বীকৃত হইতেন না। আর তোমার ব্যবহার দেখে আমার মনে হচ্ছে যে, বাঙ্গাল দেশের লোকের মান অপমান পর্য্যন্ত জ্ঞান নাই—না।"

পঙ্কজিনীর প্রতি কথায় ক্রোধের জ্বালা হইলেও মুখে ক্রোধের কোন লক্ষণ প্রকাশ না করিয়া ধীর ধীরে কহিলাম,—"যাহা বলিয়াছ—ঠিক। যদি আমার মান অপমানই জ্ঞান থাকিবে পঙ্কজিনি! তবে তোমার গা'র অলঙ্কার চাহিব কেন? যাক্ সে সবে আর কাজ নেই—এখন কাল বি, এ, পরীক্ষার ফী দাখিলের শেষ দিন, কাল ফী দাখিল না করিলে, আর আমার পরীক্ষা দেওয়া হইবে না। এখন তুমি দাও, আবার আমার সুদিন আসিলে আগে তোমারই এই ঋণ পরিশোধ করিব।"

সুদিনের কথা শুনিয়া পঙ্কজিনী পূর্ব্বের ন্যায় ঘৃণার সহিত কহিলেন,—"তোমার কি কখন সুদিন আসিবে? কখনই না। বাবা বলেছেন—'তোমার রন্ধ্রগত শনি'; সুতরাং তোমার জীবনে সুদিনের আশা নাই। যদি তাহাই হইত তবে বাবা ও মার হিতকথায় কর্ণপাত করিতে কখন বিরত হইতে না।"

পাঠক,—"কাটা ঘায়ে নুনের ছিটা",—কথা শুনিয়াছেন তো? আমার প্রাণাধিকা পত্নী পঙ্কজিনীর আজিকার এই কথাগুলি ঠিক তাহাই,—"কাটা ঘায়ে নুনের ছিটা"। পঙ্কজিনীর তখনকার সেই বড় দুর্দ্দিনের নিষ্ঠুর কথাগুলি আমার হৃদয়ের ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র রক্তকণিকায় এখনও তেম্নিভাবে জ্বলিতেছে; যতদিন আমার এ নশ্বরদেহ শ্মশানসৈকতে শোয়াইতে না পারিব ততদিন ঠিক তেম্নিভাবেই চিরকাল ধরিয়া রাবণের চিতার ন্যায় আমার হৃদয়ে জ্বলিতে থাকিবে। কিন্তু কি জানি কেন, তখন পত্নীর মুখে এ হেন স্নেহশূন্য তীব্র বাক্য শুনিয়াও আমার হৃদয়ে বড় একটা রাগ হইল না বরং অন্তঃকরণে দয়ার উৎস ছুটিল। আমি তখন আপনার অবস্থা ভাবিয়া হৃদয় হইতে ক্রোধের অঙ্কুর পর্য্যন্ত উৎপাটিত করিয়া কাতর কণ্ঠে কহিলাম—"সবই আমার দোষ—সব অপরাধই আমি স্বীকার করিয়া লইতেছি। এখন যাহাতে আমি নির্ব্বিঘ্নে পরীক্ষা দিতে পারি তুমি তাহার একটা উপায় করিয়া দিয়া এ যাত্রা আমাকে রক্ষা কর।"

পঙ্কজিনী। আমি তো আর টাকার তোড়া নিয়ে বসি নাই যে, তোমায়

টাকা দিব।

আমি। ইচ্ছা করিলেই দিতে পার—তোমার বুদ্ধিহীন হতভাগ্য স্বামীকে বর্ত্তমান বিপদ হইতে উদ্ধার করিতে পার। তোমার টাকা না থাক, গায়ে যে দু'খানা আছে তাহা দিলেই আমি এ বিপদ হতে উদ্ধার পাই, নহিলে চির-দিনকার উন্নতির পথে কাঁটা পড়ে।

আমার কাতর কণ্ঠস্বরেও পঙ্কজিনীর হৃদয় কিছুমাত্র দ্রব হইল না; বরং রাগে ফুলিতে ফুলিতে কহিলেন—"বিয়ে ক'রে এনে ক'হাজার টাকার গহনা দিয়েছিলে যে, নিতান্ত বেহায়ার মত তাই আবার চাহিতেছ।"

আমি। দেওয়ার দিন এখনও যায় নাই—সুখের দিন এখনই কি গেল। আগে উপার্জ্জন করি, পরে দেখে নিও দিতে থুতে পারি কি না?

এবার পঙ্কজিনী ঘৃণার হাসি হাসিয়া কহিলেন—"উপার্জ্জন যা কর্ব্বে তার পরীক্ষা তো এখনই দেখছি। কথা বলতে একটু লজ্জাও হয় না—এতটুকু আত্ম-সম্মান জ্ঞান পর্য্যন্ত কি তোমার নেই।"

পঙ্কজিনীর কথায় এবার আর স্থির থাকিতে পারিলাম না—উন্মত্তের ন্যায় কহিলাম—"দরিদ্রের—বিধাতা কর্ত্তৃক পীড়িতের আবার আত্ম-সম্মান জ্ঞান কি থাকিবে—পঙ্কজিনি!" তারপর ক্ষণকাল নীরব থাকিয়া পরে কহিলাম—"এখন কি করিবে—বল।"

স্থিরকণ্ঠে পঙ্কজিনী কহিলেন—"করিব আর কি? আমার কাছে কিছুই হইবে না—অন্য পথ দেখ।"

প্রাণাধিকা পত্নীর স্থির অবিচলিত বাক্যে এবার আমার কান্না আসিল; কিন্তু বলপূর্ব্বক সে কান্না রোধ করিয়া কাতর কণ্ঠে কহিলাম,—"দেখ পঙ্কজিনি! তুমি বড়লোকের মেয়ে—আজ আমার বিপদে এমনই কথা বলিতেছ। আর ঐ দেখ বউঠাকুরাণি! দরিদ্রের কন্যা, সেই বউঠাকুরাণী তোমারই সমবয়েসী, আজ এই দুই বৎসর ধরে সংসারের বড় দুরবস্থা দেখে দিনের পর দিন আপ-নার গা হ'তে আপনারই পিতৃদত্ত এক একখানি গহনা খুলে দিয়ে সংসার চালাইয়া আসিতেছেন—আমাকে কঠোর অর্থচিন্তার দায় হ'তে সাধ্যানুসারে অব্যাহতি দিয়া আপনার চরিত্রগৌরব দেখাইতেছেন। আর তুমি আমার স্ত্রী—বড়লোকের মেয়ে, তোমার এই ব্যবহার। হায়! বড়লোক—সংসারে

তুমিই যদি বড়লোক, তবে এ সংসারে ছোটলোক কে? ইতর কে?" কথা কয়েকটা বলিতে এবার আমার চখে জল আসিল—সহস্র চেষ্টায়ও অশ্রুবেগ রোধ করিতে পারিলাম না।

পঙ্কজিনী। "তোমার আর বৃথা বক্তৃতা আমার ভাল লাগে না—অমন ঢের ঢের বক্তৃতা শুনেছি।" এই বলিয়া নীরব হইলেন।

আমি পঙ্কজিনীর শেষ কথায় আর কোন উত্তর না করিয়া শুইয়া শুইয়া বিষণ্ণমনে আকাশ পাতাল কতকি ভাবিতে লাগিলাম। তবে এইখানে একটা কথা বলিয়া রাখি। সংসারে মানুষের একটা না একটা দুর্ব্বলতা আছে। শুধু মনুষ্যচরিত্রে কি—বড় বড় দেবচরিত্রেও দেখা যায়, তাঁহারাও এই দুর্ব্ব-লতার হস্ত হইতে একেবারে মুক্ত নহেন। তখন আমি ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র মানব, আমার যথেষ্ট মানসিক বল থাকিলেও আবার আমারই একটা দুর্ব্বলতা থাকিবে—আশ্চর্য্য কি? সংসারে প্রায়ই দেখিয়া আসিতেছি যে, স্ত্রী স্বামীর মনের মত না হইলে স্বামী আপনার বলে সেই দুর্ব্বিনীতা স্ত্রীকে বশীভূত করিয়া লন; কিন্তু আমি আমার মানসিক দুর্ব্বলতা প্রযুক্ত তাহা পারি-লাম না। অন্যে হয়ত আমারই মত অবস্থায় পড়িলে বলপূর্ব্বক স্ত্রীর গা হইতে অলঙ্কার রাশি উন্মোচন করিয়া লইয়া, আপনি উপস্থিত বিপদ হইতে মুক্ত হইতেন। কিন্তু আমার কেমন কি হৃদয় দুর্ব্বলতা যে, আমি আমার এমন অপ্রিয়বাদিনী দুর্ব্বিনীতা স্ত্রীর কঠোর বাক্যযন্ত্রণায় হৃদয়ের প্রত্যেক গ্রন্থি ছিন্ন হইলেও তাঁহার সম্পূর্ণ অমতে তাঁহার গা হইতে বলপূর্ব্বক অলঙ্কাররাশি কাড়িয়া লইয়া, নিজের বর্ত্তমান বিপদুদ্ধারের কোনই চেষ্টা করিতে পারিলাম না। শুধু আপনার দুর্ভাগ্য ভাবিয়া নীরব অশ্রুপাতে রজনী কাটাইলাম।

ক্রমশঃ

শ্রীউমেশচন্দ্র মৈত্রেয়।

ভিনিস ভ্রমণ।

৩

মাঝে মাঝে উৎসবের সময় যখন এই সেণ্টমার্ক স্কয়ারটী সজ্জিত করা হয়—যখন অসংখ্য দীপমালা চারিপার্শ্ব হইতে নানাবর্ণের আলোকে ইহাকে উজ্জ্বলিত করে—তখন ইহার দৃশ্য যে কত সুন্দর হয় তাহা বর্ণনাতীত। স্কয়ারটী দেখিতে যেন একটী বৃহদাকারের দেশীয় অট্টালিকা, তিনদিকে তিন চারি তালা ইষ্টক নির্ম্মিত হর্ম্ম্যরাজী ও একদিকে সমুদ্রতট। ইহার নিম্নতলে ভিনিসের প্রধান প্রধান বিপণি এবং সেগুলি সকল প্রকার পণ্যদ্রব্যে পরিপূর্ণ। সম্মুখে ফুট-পাথের উপর দিয়া বরাবর বারাণ্ডা চলিয়াছে। বাজার করিতে হইলে বৃষ্টিতে ভিজিবার কোন ভয় নাই, রৌদ্রের উত্তাপও সহ্য করিতে হয় না। সেখানে ইচ্ছামত পাদচারণা করা চলে। দোকানগুলিতে এমন সুন্দর সুন্দর দ্রব্য দেখিতে পাইলাম যে তাহা ক্রয় করার লোভ সম্বরণ করিতে পারিলাম না। সে সকল দ্রব্যের মধ্যে কিছু বিশেষত্ব দৃষ্ট হইল। তাহার মধ্যে কিছুই বিজাতীয় নাই—সবই ভিনিসবাসী অথবা ইটালীয়েনদিগের হস্ত নির্ম্মিত এবং তাহাতে যথেষ্ট শিল্পকৌশলের পরিচয় পাওয়া যায়। কেনই বা যাইবে না? সকল প্রকার শিল্পবিদ্যায় ভিনিস বহুকাল হইতে পারদর্শী। সমগ্র ইউরোপ মধ্যে ভিনিসই সর্ব্বপ্রথম শিল্পবিদ্যায় প্রাধান্য লাভ করে। ভিনিসের লেস্ (Venetian lace) বহুমূল্য সামগ্রী। আগে ইহার এত উন্নতি হইয়াছিল যে ইউরোপীয় মহিলাদিগকে একেবারে মুগ্ধ করিত। সেরূপ কৌশল-নির্ম্মিত সুন্দর লেস আর কুত্রাপি হইত না। এবং ইহার মূল্যও কিছু কম নহে। আগেকার ন্যায় বহুমূল্য লেস্ আজকাল প্রস্তুত করা সুকঠিন। এখনও বিবাহ উপলক্ষে ইউরোপীয়দিগের মধ্যে বহুমূল্য ভিনিসের লেস্ ব্যবহৃত হইয়া থাকে। আমি একটী কারখানায় গিয়াছিলাম। সেখানে দেখিলাম বহুসংখ্যক অল্পবয়স্কা স্ত্রীলোক হস্তে লেস্ প্রস্তুত করিতেছে। যন্ত্রগুলি সামান্য আকারের এবং অনায়াসেই ইতস্ততঃ বহন করিতে পারা যায়। কার-

খানার প্রধান কর্ম্মচারী লেসের একটী চাদর আমাকে গতাইবার জন্য অত্যন্ত পীড়াপীড়ি করিতে লাগিলেন। বলিলেন এই একটীমাত্র চাদর মহিলারা কত প্রকার ভাবে ব্যবহার করিতে পারেন—এবং নিজেই চাদরটী অঙ্গে পরিয়া দেখাইতে লাগিলেন। তাহার দাম তাঁহার মতে অতি সামান্যমাত্র—মোটে এক পাউণ্ড অর্থাৎ পনের ষোল টাকা! ভাবলুম না জানি ইহা একটী অপূর্ব্ব সামগ্রী হইবে, এবং একটী ক্রয় করিবার ইচ্ছা বলবর্ত্তী হইয়া উঠিল। কিন্তু সৌভাগ্যবশতঃ আমি তখনও সংসারের ফাঁদে পদক্ষেপ করি নাই এবং সেই রমণীদের চিত্তহারী ভিনিসদেশীয় লেস্‌টুকুনের যে কি মহিমা তাহা তখনও উপলব্ধি করিতে পারি নাই। সুতরাং আমি সেই ভিনিসিয়ান লেস-ব্যবসায়ীর চাটুবাক্যে বিমোহিত হই নাই এবং আমার টাকা আমার কাছেই রহিল। এখন মনে হইতেছে আমাদের দেশেও লেস্ প্রস্তুত করা সুকঠিন নহে। ঐরূপ যন্ত্রের সাহায্যে আমাদের স্ত্রীলোকেরা অনায়াসেই লেস্ প্রস্তুত করিতে পারেন এবং তাহাতে তাঁহাদেরও যথেষ্ট উপায় হইতে পারে। ভিনিস সহরে একটী উপযুক্ত লোক পাঠাইয়া এই শিল্পকার্য্যটী শিখিতে পারিলে বাস্তবিকই আমাদের অসহায়া বিধবা স্ত্রীলোকদের জীবিকা উপার্জ্জনের একটী উত্তম সংস্থান হয়। সেণ্টমার্ক মধ্যে ক্যাম্পানাইল (Campanile) নামক একটী অত্যুচ্চ ইষ্টকনির্ম্মিত হর্ম্ম্য আছে। ইহা চতুষ্কোণ, এক একটী দিক চল্লিশ ফুট লম্বা, এবং ইহার উচ্চতা তিনশত পঞ্চাশ ফুট। ইহার সর্ব্বোচ্চ শিখরে একটী পরীর মূর্ত্তি আছে। ৯১১ খৃষ্টাব্দে ইহা আরম্ভ করা হইয়াছিল এবং ১৫১০ সালে শেষ হয়। ইহার উপরে আরোহণ করিবার নিমিত্ত বিস্তৃত সোপান আছে। ইহার অগ্রভাগ হইতে সমগ্র ভিনিস সহরের যে দৃশ্য দেখিতে পাওয়া যায় তাহা বর্ণনাতীত। কথিত আছে পুরাকালে যে সকল ব্যক্তি ধর্ম্মের জন্য জীবন উৎসর্গ করিয়া পরে কোন ধর্ম্মবিরুদ্ধ কর্ম্ম করিত তাহা-দিগকে খাঁচার মধ্যে বদ্ধ করিয়া এই ক্যাম্পানাইলের উপর হইতে ঝুলিয়া রাখা হইত যদবধি না মৃত্যু তাহাদিগকে এই ভবযন্ত্রণা হইতে মুক্ত করিত। ফরাসী সম্রাট নেপোলিয়ন সমগ্র ইটালী জয় করত যখন ভিনিস সহরে গিয়া-ছিলেন তখন তিনি অশ্বপৃষ্ঠে আসীন হইয়া বরাবর ইহার উপর আরোহণ করিয়াছিলেন, কিন্তু দুঃখের বিষয়, এই সুন্দর ঐতিহাসিক দৃশ্যটী আজ আর

নাই, তিন চার বৎসর হইল ভগ্ন হইয়া পড়িয়া গিয়াছে। এখন তাহার স্তূপাকৃতি ভগ্নাবশেষ ছাড়া আর কিছুই দেখিতে পাওয়া যাইবে না। কিন্তু ইটালিয়ানরা চেষ্টা করিতেছে যাহাতে ইহার পুনরুদ্ধার হইতে পারে।

এই স্কয়ারের একপার্শ্বে একটী কাচের কারখানা দেখা গেল। খুব ক্ষুদ্র বস্তু হইতে খুব বৃহদাকারের অনেক কাচনির্ম্মিত দ্রব্য সজ্জিত রহিয়াছে—সেগুলি আবার কত প্রকারের বিচিত্র কারুকার্য্য সুশোভিত। ভিনিসিয়ান কাচ জগতে খুবই বিখ্যাত। আমি যে সময় যাইলাম দেখি কারিগরগণ কার্য্যে ব্যস্ত। একজন বলিল আমায় আপনার নামটা লিখিয়া দিন। আমি অমনি এক টুকরা কাগজে লিখিয়া দিলাম। মুহূর্ত্ত মধ্যে একটী চিত্রবিচিত্র কাচের গুলী প্রস্তুত করিয়া দিল এবং তাহার উপর আমার নাম অঙ্কিত রহিয়াছে। ভিনিসবাসীরা সকল প্রকার কারুকার্য্যে অতিশয় সুনিপুণ।

স্কয়ারের অপর দিকে ভিনিসরাজদিগের প্রাচীন রাজপ্রাসাদ। ইহারই ছবি শ্রাবণ মাসের পুণ্যে দেখিতে পাইবেন। যদিও এই প্রাসাদটীর বাহ্যদৃশ্য যে খুবই সুন্দর তাহা নয়, কিন্তু ইহার মধ্যে ভিনিসের সভ্যতা ও ঐশ্বর্য্যের রাশি রাশি প্রমাণ জলন্ত অক্ষরে লিখিত রহিয়াছে। ইহার কারুকার্য্য অতিশয় উচ্চশ্রেণীর এবং তাহাতে বিদ্যাবুদ্ধি যথেষ্ট ব্যয় করিতে হইয়াছে সন্দেহ নাই। ভিনিস সহরের যাহা কিছু উৎকৃষ্ট ছিল বা আছে তাহার এই প্রাসাদের মধ্যে যত্নের সহিত রক্ষিত আছে। এই প্রাসাদের সহিত একটী সেতুর দ্বারা পার্শ্ববর্ত্তী রাজকীয় কারাগার সংলগ্ন আছে। সেতুটীর অনেক নীচে একটী খাল প্রবাহিত হইতেছে। এই সেতুটীর নাম "দুঃখ সেতু" বা Bridge of Sighs। যে সকল কয়েদীরা এই সেতু পার হইয়া রাজপ্রাসাদের বিচারালয়ে একবার প্রবেশ করিত তাহাদিগকে আর সশরীরে পুনরায় সেই কারাগার মধ্যে ফিরিয়া যাইতে হইত না। প্রাসাদের মধ্যে এমন অনেক গুপ্ত কুঠরী আছে ও ছিল যেখানে একবার প্রবেশ করিলে আর রক্ষা নাই। তাহার যে কি হইল তাহা আর কাহারও জানিবার উপায় নাই। এই নিমিত্তই সেতুটীর "দুঃখ সেতু" নামকরণ হইয়াছে।

রিয়াল্‌টো (Rialto) নামে আর একটী সেতু দেখিলাম। এই সেতুর নাম যিনি সেক্ষপিয়ারের Merchant of Venice পড়িয়াছেন তাঁহার অবিদিত

নাই। সাইলক্ অ্যান্‌টোনিওর সহিত কথোপকথনে তাঁহাকে বলিল—"অ্যান্‌টোনিও, তুমি কতবার আমাকে রিয়ালটোর উপর তিরস্কার করিয়াছ।" আবার অন্য জায়গায় দেখা যায় "আজ রিয়ালটোর খবর কি?" অর্থাৎ আজ বাজারে বাণিজ্য সম্বন্ধে কি খবর শুনলে? সেক্ষপিয়ার এই সেতুটীকে অমর করিয়া দিয়াছেন। সেতুটীর উপরেই অনেকগুলি পুরাতন ঘর এখনও রহিয়াছে।

এরূপ কথিত আছে প্রতি বৎসর এড্রিয়াটিক সমুদ্রের সহিত ভিনিসরাজের (Doge) বিবাহ হইত। এই প্রথাটী অনেক কাল হইতে চলিয়া আসিতেছিল। ইহার অর্থ, ডোজে সমুদ্রকে বিবাহ করিয়া উহাকে নিজ আয়ত্তের মধ্যে রাখিয়াছেন। এই বিবাহ প্রতি বৎসর অতি সমারোহের সহিত সম্পন্ন হইত। রাজা তাঁহার প্রধান অমাত্যগণ ও অন্যান্য সভাসদ্গণের সহিত একত্রিত হইয়া গীতবাদ্য করিতে করিতে গণ্ডোলায় (Gondola) আরোহণ করতঃ সমুদ্রবক্ষে যাইতেন এবং একটি অঙ্গুরীয় জলমধ্যে নিক্ষেপ করিয়া এড্রিয়াটিক সাগরকে মহিষীরূপে পরিণত করিতেন।

শ্রীযোগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়।

সত্যলোক।

কীর্ত্তনের সুর।

চল সেই পথে যে পথে চলিলে
পায় ধ্রুব সত্যলোক ;
তুচ্ছ স্তুতিনিন্দা যেথা নাহি মিলে
সবে সদা বীত শোক।
যে পথে চলিতে শত কষ্ট সহে
ঋষি মুনি অকাতরে,
সেই লোকে চল,—বৈরাগ্যের যষ্টি
ল'য়ে থেকো সদা করে।
চলিতে চলিতে সুখের আলয়ে
পথে কোথা দাঁড়ায়োনা ;
দস্যু প্রলোভন বিনাশিতে মন
রচে মায়ার ছলনা।
বহু দুর গিয়ে, দেখা পাবে শেষ
উচ্চ এক হেম চূড়ে ;
দেখিবে সেথায়, সেই ধ্রুবলোকে
সত্যের নিশান উড়ে।
সেথা গেলে পরে, জ্বালাময় ভবে.
আর না আসিবে ঘুরে ;
দুঃখ শোক ভুলে চিরকাল তরে
রহিবে সে দেবপুরে।

শ্রীঋতেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

—

সাংখ্যস্বরলিপি।

নটনারায়ণ—ঝাঁপতাল।

অগণন ভুবন ভারধারী প্রভাব তব,
বিশ্বম্ভর ঈশ, আনন্দরূপ।
সকল গুণ সাগর, অসীম পরাৎপর,
এক ধ্রুবনায়ক।

তালি। ১ । ২ঃ হা । ন্তঃ, । ৩ । ০ ।
মাত্রা। ৩ । । । ৩ । ২ ।

(স্থা)ঃ— সা গা$\frac{১}{২}$ রে$\frac{১}{২}$ । গা পা মা । গা গা$\frac{১}{২}$ রে$\frac{১}{২}$ ।
(স্থা)ঃ— অ গ — । ণ ন ভু । ব ন — ।

রে$\frac{১}{৪}$ সা$\frac{১}{৪}$ রে রে । মা + মা । মা৩ । রে২ ।
ভা — — র । ধা — । রী । — ।

পা৩ । ধা২ । মা২ পা । মা গা । রে সা নিং ।
— । — । — প্র । ভা — । ব ত ব ।

পা২ । ধা$\frac{১}{২}$ নি$\frac{১}{২}$ সা$\frac{১}{২}$ রে$\frac{১}{২}$ + রে । সা রে ।
২ ২..........
বি । শ্ব — — ম্ — । ভ র ।

সা + সা নি । সা গা½ রে½ । গা + গা পা ।
ঈ — শ । আ — — । ন — ন্দ ।

মা মা½ গা½ । রে গা সা ।
রূ — — । — — প ।

২..
(স্ত)ঃ— পা পা । নি সা রে । সা + সা ।
(স্ত)ঃ— স ক । ল গু ণ । সা — ।

২.......... ২...................
সা সা সা । সা গা½ রে½ । গা + গা মা ।
গ র অ । সী — — । ম — প ।

গা রে । সা নি + নি । পা + পা ।
২..........
রা ৎ । প র — । এ — ।

পা রে পা । ধা + ধা । মা গা + গা । (স্থা)ঃ—
ক রু ব । না — । য় ক — । (স্থা)ঃ—

সাঃ গা½ রে½ ।
— — — ।

শ্রীসুষমা দেবী।

বঙ্গে মহালয়া।*

সংসারে সর্ব্বত্র দুই পক্ষ দেখিতে পাইবে; প্রতিদিনের দিবা ও রাত্রি দুই পক্ষ, প্রতিমাসের শুক্ল ও কৃষ্ণ দুই পক্ষ, প্রতি বৎসরের উত্তরায়ণ ও দক্ষিণায়ণ দুই পক্ষ, এইরূপ যেদিকে দেখনা কেন দেখিবে দুই পক্ষের ভরে জগৎ গতিশীল হইয়া চলিয়াছে।

"শুক্লকৃষ্ণ গতীহ্যেতে জগতঃ শাশ্বতে মতে" (গীতা)

এই দুই পক্ষের এক পক্ষ শুক্ল বা প্রকাশশীল ও অপর পক্ষ কৃষ্ণ বা সেরূপ প্রকাশশীল নহে। প্রকাশশীল পক্ষ বহির্মুখী, এবং অপ্রকাশশীল পক্ষ অন্তর্মুখী। প্রকাশভাবাপন্ন পক্ষের অপর নাম দেবপক্ষ এবং অপ্রকাশভাবাপন্ন পক্ষের অপর নাম **পিতৃপক্ষ**। গ্রীষ্মপ্রধান ঋতুতে যখন উত্তরায়ণ বা দেবপক্ষের প্রভাব তখন পশুপক্ষী জীবজন্তু ও সমগ্র প্রকৃতি বহির্মুখী বা প্রকাশ ভাব ধারণ করে, আর শীতপ্রধান ঋতুতে যখন দক্ষিণায়নের প্রভাব তখন সকলি অন্তর্মুখী বা অপ্রকাশভাব ধারণ করে, সংকুচিত হইয়া পড়ে—পশুপক্ষী উদ্ভিদ এবং জীবজন্তু সকলেই যেন জড়ত্ব প্রাপ্ত হয়। হিন্দুরা এই দুই পক্ষের দুই প্রকৃতির অনুযায়ী দুই উৎসব প্রবর্ত্তন করিয়াছেন—উত্তরায়ণের প্রধান উৎসব **দোল** এবং দক্ষিণায়নের প্রধান উৎসব **দুর্গোৎসব**।

দুর্গোৎসবের পূর্ব্বেই **মহালয়া** দুর্গোৎসবের আবাহন করিয়া দেয়। এই সময়ে বর্ষচক্র ভ্রাম্যমান হইতে হইতে **পিতৃপক্ষ দক্ষিণায়নে** মিলিত হয় বলিয়াই পিতৃতর্পণ বা পিতৃশ্রাদ্ধের জন্য ইহা প্রশস্ত কাল। **মহালয়া** শব্দের দুই অর্থ করিতে পারা যায়, এক **লহা-লয়**, আরেক **মহা-আলয়**। দক্ষিণায়ন বা পিতৃপক্ষে সমস্ত প্রকৃতি মৃতভাবাপন্ন হয়। এইকালে উত্তরায়ণের জীবন্ত সতেজভাব লয় প্রাপ্ত হয়—বৃক্ষলতা সমূহ পরিশীর্ণ এবং জীবজন্তু সকলেই

* ইহা আশ্বিন মাসে মহালয়ার পূর্ব্বেই লিখিত হইয়াছে। শ্রীঋ, না, ঠা।

নির্জীব অবস্থা প্রাপ্ত হইতে চলে বলিয়া ইহাকে মৃতকাল বা মহা-লয়ের কাল বলা যাইতে পারে। আরেকদিকে ইহা মহা-আলয়ের কাল—জীবজন্তু সকলেই এই কালে আপন আপন আলয়ে বা গৃহে প্রবেশ করিবার চেষ্টা পায়। দক্ষিণায়নে সকলেই গৃহ বা আলয়াভিমুখী হয়। এককথায় উত্তরায়ণ বা গ্রীষ্মপ্রধান কাল বহির্মুখী বাপ্রসারণের কাল, আর শীতপ্রধান দক্ষিণায়ন অন্তর্মুখী বা সংকোচনের কাল। উত্তরায়ণে প্রকৃতি বহির্দেশে গমন করিতে যায়, দক্ষিণায়নে প্রকৃতি অন্তর্প্রদেশে আগমন করিতে চায়। উত্তরায়ণে দোলোৎসব কেন? সে সময়ে বসন্তবাতাসে বৃক্ষলতা পুষ্প নবকিসলয় সকলি আন্দোলিত, মানবচিত্ত নবভাবে নব আনন্দে দোদুল্যমান—হৃদয় সম্প্রসারিত। আবার দক্ষিণায়নে দুর্গোৎসব কেন? এ সময়ে স্থিরা প্রকৃতি দুর্গতি অপসারণের জন্য অন্নপূর্ণারূপে বিরাজমানা, মানবচিত্ত সংযত, অন্তরে সম্বদ্ধ, নিজ আলয়ের দুর্গতি অপসারণের জন্য যত্নবান।

আমাদের এই ইংরাজ প্রবর্ত্তিত নব্যযুগও দক্ষিণায়ন ও উত্তরায়ণরূপ পক্ষদ্বয় অবলম্বনে কালের একটী ক্ষুদ্র চক্রে আবৃত্ত হইতে চলিয়াছে। গত ঊনবিংশ শতাব্দী উত্তরায়ণ বা দেবপক্ষের ক্রোড়ে ক্রীড়া করিয়া লয় হইয়াছে—এক্ষণে বিংশশতাব্দী আগত, এবং দেবপক্ষ অন্তর্হৃত; বিংশশতাব্দীতে দক্ষিণায়ন বা পিতৃপক্ষ আনুকূল্য বিস্তার করিবার জন্য উন্মুখ হইয়াছে। উনবিংশ শতাব্দীর প্রাক্কালে যখন রামমোহন ও দ্বারকানাথ বঙ্গে নব্যযুগের প্রবর্ত্তন করেন, তখন বঙ্গের মুখে রক্তিমাভা যেন ফুটিয়া উঠিয়াছিল, তখন সকলেই আনন্দে গদগদ, উৎসবে ভাবে দোদুল্যমান। সেই সময়ে দ্বারকানাথ কর্ত্তৃক নবরাগে আনন্দধ্বনি ও মহাকোলাহলে বঙ্গের যেন দোলোৎসব সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে বলা যাইতে পারে। শাস্ত্রে আছে দোলের পর হইতে প্রধানতঃ দেবপক্ষের আবির্ভাব হয়, আমাদের বঙ্গও ঐ দোলোৎসবের পর হইতে ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ পর্য্যন্ত দেবভাবে দ্যুতিমান ছিল—সে সময়ে দেবপক্ষের প্রতাপ ছিল। এক্ষণে সেকাল অতীত গর্ভে বিলীন। এই বিংশ

শতাব্দী দেবপক্ষ হইতে পিতৃপক্ষে পদার্পণ করিয়াছে। এক্ষণে দেবপক্ষের বহির্মুখী উদার ভাব—সার্বভৌমিক ভাব লুপ্তপ্রায়, অন্তর্মুখী পিতৃভাবে সকলে অনুপ্রাণিত। পিতা যেমন আপনার গৃহের পালনে ব্রতী, আজ দেখিতেছি সমগ্র বঙ্গদেশে আবালবৃদ্ধবনিতা সকলেই স্বদেশপালনরূপ পিতৃব্রত গ্রহণ করিয়াছেন। এখনসমস্ত বহিঃশক্তি কেন্দ্রীভূত হইয়া অন্তরের কার্য্যে নিযুক্ত। এখন সকলের মন বিশ্বপ্রেমে বিস্ফারিত না হইয়া স্বদেশপ্রেমে সংকুচিত হইয়া আসিয়াছে। আর সে সকল কথা নাই, সার্ব্বজনীন উদারতা বা সার্বভৌমিকতার কথা আর বড় একটা শোনা যায় না। কেবল স্বদেশ স্বদেশ রব। এক্ষণে মহালয়ার কাল কেন বলিতেছি? একদিকে বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদ হইয়া উহার মহা-লয় বা মহা-মৃত্যু সংঘটিত হইয়াছে, অন্যদিকে স্বদেশরূপ মহা-আলয়ের (home) প্রতি লোকের অত্যধিক অনুরাগ প্রকটিত। পিতৃপক্ষ বা দক্ষিণায়নের কাল আনন্দের কাল কেন?—পালনের কাল বলিয়া। দক্ষিণায়নে ধান্য গোধূমাদি প্রায় সমস্ত অন্ন উৎপন্ন হয় এবং গৃহে গৃহে সঞ্চিত হইয়া থাকে, তাই আশা হয় আমাদের নব্যযুগের এই বিংশশতাব্দীরূপ পিতৃপক্ষে পিতৃগৃহ বা স্বদেশ প্রতিপালিত হইবে—স্বদেশের উৎপন্ন দ্রব্য স্বদেশেই সঞ্চিত থাকিবে। এই শুভক্ষণে সকলে পিতৃভূমি স্বদেশ প্রতিপালনে ব্রতী হও। পিতৃব্রত ধারণ কর। আকাশে পিতৃগণ জাগ্রত হইয়াছেন, তাঁহাদের শ্রদ্ধায় মনপ্রাণ নিয়োগ কর। আজ মহামায়ার বিরাট মূর্ত্তি সর্ব্বত্র প্রতিভাত। মহামায়ার এমন মূর্ত্তি কৈ পূর্ব্বে ত দেখা যায় নাই। স্বদেশের প্রতি এই বিরাট মায়া—মহা-মায়ার আবির্ভাব এমনটা কে কবে দেখিয়াছেন? আজ বঙ্গে দুর্গতিনাশিনী মহাশক্তি সঞ্চারিত হইবার সময় আসিয়াছে; বঙ্গের এই মহালয়ার কালে সেই শক্তি উদ্বোধিত। দুর্গোৎসব কালে পুরাতন বস্ত্র ত্যাগ করিয়া নববস্ত্র পরিধান করিবার প্রথা প্রচলিত; সমগ্র দেশ বুঝি তাই শক্তি উৎসবের কালে পুরাতন বিদেশী বস্ত্র ত্যাগ করিয়া স্বদেশের নববস্ত্র পরিধানে উন্মুখ।

আর ভয় নাই—গৃহে অন্নপূর্ণার আবির্ভাব হইবে—ঘরের অন্ন ঘরেই থাকিবে—গৃহ অন্নে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিবে। আজ এই ১৯০৫ সাল—ইহা পঞ্চমীতে শক্তির বোধন মাত্র হইল, ১৯০৬ সালে শক্তিদেবীর ষষ্ঠীপূজা হইবে। ১৯০৭ সালে সপ্তমীপূজা এবং ১৯০৮ সালে মহাষ্টমী, তৎপরে ১৯০৯ সালে নবমী, পরে ১৯১০ সালে বিজয়া দশমী, তখন দেখিব বঙ্গবাসী এই পাঁচ বৎসর কঠোর শক্তিসাধনায় সিদ্ধি লাভ করিয়াছেন। সেই সিদ্ধিযোগে শক্তি আয়ত্ত হইলে, যেদিন বঙ্গবাসী স্বার্থ সম্পূর্ণ বিসর্জ্জন দিতে পারিবে সেইদিন দেশব্যাপী বিজয়োৎসব হইবে। সেইদিন আলিঙ্গন আনন্দে গীতে বাদ্যে সমগ্র বঙ্গদেশ প্রতিধ্বনিত হইবে। সেই বিজয়ার দিন হইতে গৃহে গৃহে আনন্দের জয়ধ্বজা তুলিও। পিতৃপুরুষের উদ্দেশে আকাশ-প্রদীপ জ্বালিও। তখন দেখিব ভারতের লক্ষ্মী ফিরিয়া আসিয়াছে—ধনধান্যপূর্ণ সোণার ভারতে হেমজ্যোতি পুনরায় প্লাবিত করিয়াছে।

শ্রীঋতেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

৺ মাইকেল মধুসূদন দত্তের অপ্রকাশিত পত্র।

(৩)

প্রিয় রাজ,

এই আমার তৃতীয় পত্র তোমায় লিখিতেছি। "কৃষ্ণকুমারী" বাহির হইয়াছে, এবং আজ আমি সহরে গিয়াই তোমায় একখানি এই বহি ডাকে পাঠাইয়া দিতে প্রকাশককে লিখিব। আশা করি সেই বিভাগের কর্ত্তাগণ উপহারটী শীঘ্র পাঠাইয়া তাঁহাদিগের সাহিত্যিক রুচির পরিচয় দিবে। ইহা পাইবামাত্রই আমাকে নিশ্চয় লিখিবে। তোমার সব চিঠি মাশুল দিয়া পাঠাইও। এই ছোট চিঠি লিখিলাম বলিয়া মার্জ্জনা করিও।

তোমার স্নেহের
মাইকেল মধুসূদন দত্ত।

(৪)

প্রিয় রাজনারায়ণ,

তোমার দয়াব্যঞ্জক পত্র ও ধর্ম্মব্যাখ্যানপূর্ণ গ্রন্থখানি পাইয়া তোমায় শত শত ধন্যবাদ দিতেছি। ধার্ম্মিকপ্রবর! আমি তন্মধ্যে অনেকগুলি ব্যাখ্যান পড়িয়াছি এবং সেগুলি আমার খুব ভালও লাগিয়াছে। রঙ্গলাল আমায় একবার বলিয়াছিল যে তুমি বঙ্গভাষার একজন সুলেখক। তোমার এই গ্রন্থখানি সেই কথার সমর্থন করে। আজকালকার বাঙ্গলা লেখা যে সকল দোষে কলঙ্কিত তোমার রচনার মধ্যে একটুও সে সকল দোষ দেখা যায় না। তাহা ছাড়া ইহাতে তোমার সেই মনোভাব (যাহা সাধারণের বড় একটা প্রিয় নহে) ফুটিয়া বাহির হইয়াছে। আমার যদি ধর্ম্মবিষয়ে আরেকটু আস্থা থাকিত—আমি দুঃখের সহিত বলিতেছি আমার বেশী নাই—তাহা হইলে আমি এই বইখানিকে আমার নিত্য সহচর করিতাম। কিন্তু তুমি জান যে কবিতা আমাকে একেবারে বশ করিয়া রাখিয়াছে, বোধকরি তোমার এই বন্ধুবেচারী ভিন্ন আর কেহ কাবিতায় এত অধিক মত্ত হয় নাই। সরস্বতীর সেবায় আমি দিবারাত্রই নিযুক্ত। তাহা হইলে বুঝিতে পারিতেছি যে "মেঘনাদ"কে কিছুক্ষণের জন্যও ছাড়িয়া থাকা অসম্ভব। যদি তুমি তাহাই চাও তাহা হইলে আমি পাগল হইয়া যাইব। "বিদ্যা আগে পরে রাজ্য"—ইহাই আমার মন্ত্র। আর তাহা হইলে আবার প্রকৃতিস্থ হইতে দুই রাত্রিরও বেশী লাগিবে। আমি চাই যে বৎসর শেষ হইবার পূর্ব্বেই যেন লেখা শেষ হইয়া যায়। এবং আমি জানিবার জন্য উৎকণ্ঠিত হইয়া আছি যে আমি বীররসের কাব্যরচনায় কতদূর কৃতকার্য্য হইয়াছি। আরও আমি যে সাহিত্য-রাজ্যে একজন ভীষণ বিদ্রোহী হইয়া উঠিয়াছি এ অবস্থায় আমার বন্ধুর উৎসাহপূর্ণ সহানুভূতি সান্ত্বনা প্রার্থনীয়। আমি ত অনেক দিন হইতেই যুদ্ধে বদ্ধপরিকর হইয়া আছি এবং বাক্‌দেবীর অর্চ্চনা করিয়া আসিতেছি—যেন আমি ঐ সকল ভণ্ডদিগের মধ্যে একজন যাহারা সম্মানের যোগ্য ব্যক্তি না হইয়াও রাশীকৃত সম্মানের অধিকারী। কবিতার সঙ্গে সঙ্গে নিজেরও উন্নতি পথ অগ্রসর হওয়া প্রার্থনীয়। যদি তুমি "মেঘনাদ"কে অপদার্থ বলিয়া মনে কর তাহাতে আমি একটুও দুঃখিত হইব না।

তোমার সহিত দেখা হইবে সেই মনে করিয়া সত্যসত্যই আমি ভীত হইয়াছি, তথাপি আশা করি তোমার দেখা করা সম্বন্ধে কিছুতেই যেন মতের পরিবর্ত্তন না হয়। তোমার বন্ধু ডি. এন. টির * সহিত আমার সাক্ষাৎ সম্বন্ধে জানাশুনা নাই। আমি শুনিয়াছি যে তাঁহার কোন পুত্র একজন ভাল কবি! তিনি আমার প্রিয় মেঘদূতের একটী পাঠোপমোগী অনুবাদ করিয়াছেন।

হাঁ, কুমার স্বামীকে আমার মনে পড়ে। হায়! আমি তাঁহার কি উপকার করিতে পারি? যদি তুমি মনে কর তাঁহার যৎকিঞ্চিৎ দানগ্রহণে আপত্তি নাই তাহা হইলে আমি খুশীর সহিত সুবিধামত তাঁহাকে কিছু অর্থ সাহায্য করিব। তুলনায় বলিতে গেলে আমাদের উভয়েরই সমান দারিদ্র্য অবস্থা। আমার এমন সংগতি নাই যে যে সব বই আমি পড়িতে ইচ্ছা করি তাহা ক্রয় করিয়া লই!!

তোমার যখন ইচ্ছা তুমি তিলোত্তমা সমালোচনা করিতে পার, তাহা সুখেরই বিষয়। কিন্তু যে সময়ে তাহা করিতে ইচ্ছা করিতেছ ততদিনে আমার বোধ হয় ইহার দ্বিতীয় সংস্করণ বাহির হইবে। যাহোক, তাহাতে কিছু আসে যায় না; তোমার মত বিশেষতঃ যখন বিশেষ বিচার পূর্ব্বক প্রদত্ত হইবে তখন তাহা অন্ততঃ আমাদের মধ্যে একশ্রেণীর লোকদের উপর নিশ্চয়ই বিশেষ প্রভাব বিস্তার করিতে পারিবে। বোধ হয় বলিলে তুমি হাসিবে—কিন্তু আমি নিশ্চয় করিয়া বলিতেছি যে, যে অবধি তোমার ঐ গ্রন্থখানি প্রকাশিত হইয়াছে সেই অবধি তোমার নাম সদাসর্ব্বদা লোকের মুখে লাগিয়াই আছে। রাজেন্দ্রকে জিজ্ঞাসা করিতে পার—অনেকেই বলিয়াছে "ওঃ মেদিনীপুরের রাজনারায়ণ বোস লোকটী খুব বুদ্ধিবান চালাক। মনে হয় তিনি ঐ গ্রন্থের যথার্থ আদর বুঝিয়াছেন। এ বিষয়ে তিনিই ঠিক।

মেঘনাদের দ্বিতীয় অধ্যায়ের প্রায় অর্দ্ধেকটা শেষ হইয়া গিয়াছে। ঠিক সময়ে তুমি ইহা দেখিতে পাইবে। আমি যে অন্যান্য লেখক অপেক্ষা বেশী পরিশ্রমী তাহা নয়; সময়ে সময়ে আমি অতিশয় অলস হইয়া পড়ি; কিন্তু আবার এক এক সময় প্রাণের মধ্যে এমন এক উচ্ছ্বাসের বেগ আসে যে তখন আমার লেখনী পার্ব্বত্য নির্ঝরের ন্যায় ছুটিতে থাকে। মদ্য এবং যাবতীয় নীচ পাপবৃত্তির বিষয় বলিতে গেলে—যদিও আমি একটী সাধু পুরুষ

নহি ও মদ্যপান একেবারে করিব না বলিয়াও প্রতিজ্ঞা করি নাই, কবিতা লিখিবার কালে আমি কখনই সুরাপান করি না, যদিও কখন করি তাহা হইলে তখন আমার মনের ভাবগুলি একেবারে বিক্ষিপ্ত হইয়া যায়। তিলোত্তমার মধ্যে একটী ছত্র নাই যাহা এমন কি এক গ্লাস গোলাপী শেরী বা বিয়ারের ন্যায় মৃদু মাদক দ্রব্যের সাহায্যে লিখিত হইয়াছে।

আমার মনে হয় তুমি যে বই লিখিতেছ তাহা জনসাধারণের স্থায়ী উপকারে আসিবে। ইহাপেক্ষা আর বেশী কি বাঞ্ছনীয়? বন্ধু, আমরাই ঐ সকল পণ্ডিত উপাধীধারী বিদ্যাহীন লোকগুলিকে (সাহিত্য জগৎ হইতে) বিদূরিত করিব। আমি তাহাদিগকে পণ্ডিত না বলিয়া নির্গুণ মূর্খ বলি। তোমার সহিত আমার সাক্ষাৎ হইলে আমাদিগের সাহিত্য সম্বন্ধে তোমার নিকট আমার শত সহস্র বিষয় বলবার আছে। আমি সংকল্প করিয়াছি যে আমি অমিত্রাক্ষর ছন্দে তিনটী ক্ষুদ্র কবিতা লিখিব এবং পরে মিত্রাক্ষর ছন্দে কিছু লিখিয়া যাইব; মনে করিও না যে আমি পয়ার এবং ত্রিপদী ছন্দে লিখিয়া তোমাদের বিরক্তি উৎপাদন করিব।

না, আমার ইচ্ছা যে ইটালিয়েন অট্টোভা রিমার (Ottova Rima) ছন্দে একটী উপন্যাস লিখি। সে সব বিষয়ে পরে কথা হইবে। এই এলোমেলো চিঠির জন্য ক্ষমা করিও। আমি জানিতে চাই রাবণের এই মহিমান্বিত পুত্রটীর সম্বন্ধে তোমার কি অভিমত। সে একটী উন্নতমনা লোক ছিল, এবং যদি না সেই দুরাচার বিভীষণের কুমন্ত্রণার জালে পতিত হইত, তাহা হইলে সে পদাঘাতে বানর সৈন্যদিগকে সমুদ্রগর্ভে প্রেরণ করিত। কথা হচ্চে, যদি আমাদিগের কবিকুলের পিতা রামকে মনুষ্য সহচর দ্বারা বেষ্টিত করিতেন, তাহা হইলে আমি মেঘদূতের মৃত্যু উপকরণ লইয়া আর একটী ইলিয়াড লিখিতাম; এখন যেমন দেখিতেছি, তাহাতে তুমি আশা করিতে পার না, যে কোন যুদ্ধ ঘটনা থাকিবে।—ইহা বড়ই দুঃখের বিষয়।

এখন বিদায়। ভগবানের আশীর্ব্বাদ তোমাদের উপরে পতিত হউক।

তোমারই স্নেহের
মাইকেল মধুসূদন দত্ত।

শৃণ্বন্তু বিশ্বেঽমৃতস্যপুত্রা।*

"শৃণ্বন্তু বিশ্বেঽমৃতস্যপুত্রাঃ" ॥
"বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তং" ॥

শরতের এই সুমধুর প্রভাতকালে কাহার হৃদয় না সেই সূর্য্যের অন্তরাত্মার মহিমা গান করিতেছে? মলয়বায়ু সুদূর সাগর পার হইতে সংবাদ আনিতেছে যে এই মধুময় প্রভাতে সেখানেও সেই দেবদেবের অনন্ত মহিমা বিঘোষিত হইতেছে; আবার স্রোতস্বতী জাহ্নবী উদাসভাবের আবাসস্থান হিমালয় হইতে পুরাতন ঋষিদিগের পবিত্র গান সকল লইয়া সাগরের সমীপে উপস্থিত করিয়া দিতেছে, বিমল আকাশ সেই দেবদেব পরমদেবের পদতল হইতে রোমাঞ্চশরীরে জগতের মহাগীত অবিশ্রান্ত শুনিতেছে। বোধ হয় এইরূপ কোন শরতের প্রভাতে মহাতেজের কণিকামাত্রে উদ্ভাসিত, কনকতপনের সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ কোন পুরাতন ঋষি আপনার হৃদয়ের গভীর সন্দেহ সহসা নিরাকরণ হইতে দেখিয়া এবং তৎপরিবর্ত্তে নূতন আলোকের দেখা পাইয়া জগতের উচ্চসিংহাসনে দাঁড়াইয়া সুগভীর বজ্রনিনাদে ঘোষণা করিয়াছিলেন যে—

"শৃণ্বন্তু বিশ্বেঽমৃতস্য পুত্রা
আ যে ধামানি দিব্যানি তস্থুঃ।
বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তং
আদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ ॥"

"হে দিব্যধামনিবাসী অমৃতের পুত্র সকল! তোমরা শ্রবণ কর, আমি তিমিরাতীত জ্যোতির্ম্ময় মহান্ পুরুষকে জানিয়াছি।"

এমন জ্বলন্ত অগ্নিময় বাক্য কাহার হৃদয় হইতে বিনির্গত হইতে পারে?—যিনি ব্রহ্মরসামৃতপানে পূর্ণপ্রাণ হইয়াছেন; যিনি দিবানিশি বিশ্বপিতার ধ্যানে মুদিতনয়ন রহিয়াছেন, তাঁহারই প্রাণ হইতে এরূপ সুগভীর তেজপূর্ণ বাক্য

* ২৪শে সেপ্টেম্বর, ১৮৯০।

সকল বাহিরিতে পারে। কেবল যে সেই পুরাতন ঋষিদিগের মুখ হইতেই এইরূপ তেজোময়ী বাণী বিনির্গত হইবে, তাহা নহে; পরন্তু আমরাও যদি সেই তেজোময় মহান্ পুরুষকে ধ্যান করি, তাঁহার প্রসাদে আমাদেরও হৃদয় হইতে জ্বলন্ত বাক্য স্বতঃ উচ্ছ্বসিত হইয়া তাঁহারই মহিমা ঘোষণা করিবে এবং সকলের হৃদয়ে অমৃত বর্ষণ করিতে পারিবে। তবে ভাই সকল, আইস এমন মধুময় প্রভাত বৃথা যাপন না করিয়া সেই পরম পিতার উপাসনায় নিযুক্ত থাকি, হৃদয়কে উন্নত করি এবং সত্যব্যবহারকে প্রাণের সহিত আলিঙ্গন করিয়া থাকি।

হে জ্যোতির্ম্ময় মহান্ পুরুষ! সূর্য্য তোমারি জ্যোতির কণামাত্র গ্রহণ করিয়া জগতকে আলোক প্রদান করিতেছে, চন্দ্রমা তোমারি অমৃতের কণামাত্র গ্রহণ করিয়া জগতকে অমৃতবর্ষণ দ্বারা সুশীতল করিতেছে। আমার এমন ক্ষমতা নাই যে তোমার মহিমা সুন্দররূপে বর্ণনা করিতে পারিব; তোমার নিকট করযোড়ে প্রার্থনা করিতেছি যে তুমি আমার আত্মায় আবির্ভূত হও, তাহা হইলে স্বতই হৃদয় হইতে তোমার মহিমা গান উত্থিত হইয়া জগতকে অশ্রুজলে ভাসাইতে পারিবে। যে পরমাত্মন্ আইস তুমি হৃদয়ে আইস এবং তোমার বিষয়ে অবিশ্রান্ত গান করিবার ক্ষমতা প্রদান কর।

শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

গুরুনানক ও বৈদ্য হরিদাস।

গুরুনানক এইরূপে স্তব্ধভাবে পড়িয়া থাকেন, কাহারও সঙ্গে কথাবার্ত্তা নাই—সংসারের যাবতীয় কর্ম্ম একেবারে ছাড়িয়া দিয়াছেন। সকল আত্মীয় কুটুম্বেরা গুরুনানকের অবস্থা দেখিয়া দুঃখ করেন। তাঁহারা পরস্পর বলাবলি করেন, যে, "কালু জমীদারের পুত্র পাগলা হইয়া গেছে।" নানকের যাহারা শৈশবসঙ্গী ছিল, তাহারা তাঁহার সহিত দেখা করিতে আসিলে বা কোনরূপ কুশলপ্রশ্নাদি জিজ্ঞাসা করিলে, নানক এমনিভাবে তাহাদের সঙ্গে দেখা করেন, যেন পূর্ব্বে কখন কোনরূপ আলাপ পরিচয় ছিল না। উহারা নানকের এই ভাব দেখিয়া বড়ই মর্ম্মাহত হইয়া চলিয়া যায়। গুরুনানক কিন্তু কি জানি কি ভাবে মগ্ন হইয়া থাকেন। খাওয়া দাওয়া নাই, একান্তে বসিয়া থাকেন। নানকের এই অবস্থা দেখিয়া তাঁহার মাতা তাঁহাকে বলিতে লাগিলেন, "বৎস! তুমি কেন আপনার এমন দশা করিয়াছ? গৃহের কাজ কর্ম্ম দেখ শোন—কিছু রোজগার করিয়া আন। সকল আত্মীয়স্বজনদের সুখী কর। ফকিরদের সঙ্গ ত্যাগ কর। বুদ্ধিমানের মত কাজ কর্ম্ম কর। জ্ঞাতগোষ্ঠীর লোকের সঙ্গে একত্র বসিয়া আলাপ পরিচয় কর। পরিবারের সকলে তোমার শরীরের দশা দেখিয়া কত দুঃখ করে। ভাল রকম রোজগার করিয়া যদি নিজের কাছে কিছু সঞ্চয় করিতে পার, তাহা হইলে কোন উচ্চবংশীয় ক্ষত্রী তোমার সঙ্গে তাহার কন্যার বিবাহ দিবে। তাহা হইলে আমারও প্রাণে সুখ হইবে। তখন তোমাকে সকলে প্রশংসা করিবে। এখন তোমার এইরূপ অবস্থা দেখিয়া লোকেরা উপহাস করে। তাহারা বলে 'নানক নিষ্কর্ম্মা—কোন কাজ কর্ম্ম করে না, বুদ্ধিহীন। কেহ বা বলে "নানক বড় দুর্ব্বল। বেদীবংশীয়দের ঐ সকল বাক্য বজ্রের তুল্য আমাকে আঘাত করে। ঐসকল মর্ম্মবিদারক বাক্য শুনিয়া শুনিয়া রাত্রিদিন আমার প্রাণ দগ্ধ হইতে থাকে।" মাতার এই সকল কথা শুনিয়াও গুরুনানক তবু চুপ হইয়া রহিলেন—একটী কথাও বলিলেন না। দিবারাত্রি পাগলের মত সেইভাবে পড়িয়া থাকেন।

মাতা যদি পীড়াপীড়ি করিয়া কিছু খাওয়াইয়া দেন ত আহার করেন, নতুবা আহারই করেন না। তাঁহার মাতার মন কিন্তু কিছুতেই স্থির থাকিতে পারে না। তাঁহার মাতা তাঁহাকে নানারূপে বুঝাইবার চেষ্টা করেন। তিনি বুঝাইয়া বলেন, যে, "কাজ কর্ম্ম কর চাই, না কর নিজের শরীরের জন্য কিছু ঔষধই না হয়, খাও। তোমার মুখ ফ্যাকাশে হইয়া গেছে—শরীর দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছে। একটু বুদ্ধিমানের মত হও।" গুরুনানকের মাতা তৃপ্তা দেবী এইরূপ বড় দুঃখে ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করেন "হে ভগবান! আমার পুত্রকে এই রোগ হইতে অব্যাহতি দাও।" একদিন নানকের হাত ধরিয়া তাঁহার মাতা বলিলেন—"বৎস! তোমার কি অসুখ হইয়াছে বল, আমি বৈদ্য ডাকিয়া আনিয়া চিকিৎসা করাইব।" অনেক কথা বলিলেও বাবা নানক চুপই হইয়া রহিলেন। জ্ঞাতিগোষ্ঠীর লোকেরা মধ্যে মধ্যে প্রায়ই নানকের খবর লইতে আসেন। কি যে অসুখ কেহ বুঝিতে পারে না। পরিবারের সকল লোকে নানকের এই অবস্থা দেখিয়া তাঁহার পিতা কালুকে তিরস্কার করিতে লাগিল—"আচ্ছা তুমি তোমার ছেলের এই অবস্থা দেখে কেমন করিয়া চুপ করিয়া আছ? তোমার ছেলে কয়দিন না খেয়ে দেয়ে পড়ে আছে তুমি কোন ভাল বৈদ্যকে আনিয়া দেখাও। তোমার একই পুত্র। কিছু টাকা খরচ কর, ছেলে ভাল হ'য়ে যাবে। ছেলে বেঁচে থাকলে ছেলেতে খেটেখুটে টাকা ঘরে আনিতে পারিবে। পুত্রের প্রতি স্নেহহীন হইয়া টাকা কড়িতে বেশী মায়া করিও না। টাকার চেয়ে ছেলে বেশী। পুত্রের আরোগ্য হইলে পয়সার সুখ হবে। পয়সা যতই হউক না কেন পুত্র বিনা সব বৃথা। তুমি বৈদ্যকে এখনি ডাকাইয়া পাঠাও।" এই সব শুনিয়া নানকের পিতা কালু তখনি উঠিয়া বৈদ্যকে ডাকিতে গেলেন। নানকের পিতৃব্য লালু নানকের পাশেই বসিয়া রহিলেন। নানক মুখে কাপড় ঢাকা দিয়া পড়িয়া রহিলেন।

মহিতা বা ক্ষেত্রপতি কালু হরিদাস নামা কোন বৈদ্যরাজকে ডাকিয়া আনিলেন। বাবা নানক যেখানে পড়িয়াছিলেন সেইখানে বৈদ্য আসিয়া বসিলেন। কালু বৈদ্যরাজকে বলিলেন—"আপনি এর হাত দেখিয়া বলুন যে কি ব্যারাম হয়েছে। রাতদিন এমনি ভাবে পড়িয়াই থাকে, কিছু খায়

দায় না। এর মুখ ফ্যাকাশে ও শরীর কৃশ হয়ে গেছে।" এই কথা শুনিয়া হরিদাস বৈদ্য নানকের কাছে আরো সরিয়া গিয়া বসিলেন। নানকের মুখের কাপড় উঠাইয়া উঁহার মুখ দেখিয়া তারপরে নাড়ী দেখিবার জন্য হাত ধরিলেন। যখন বৈদ্য মহাশয় নাড়ী দেখিতে লাগিলেন, তখন নানক বৈদ্যের কাছ হইতে হাত ছিনাইয়া লইলেন। তখন নানক আপনি উঠিয়া বসিলেন। বৈদ্যকে বলিলেন—তুমি যে আমার হাত ধরিয়াছ কি জন্য? হরিদাস বলিলেন—"রোগ নির্ণয় করিবার জন্য। যেমন রোগ বুঝিব, সেই রকম ঔষধও দিব। পথ্যের সঙ্গে যদি ঔষধ খাও ত ভাল হইয়া যাবে। আর শরীর ভাল হইলে সুখ পাবে, আরাম পাবে।" এইবারে গুরুনানক বৈদ্যকে এক 'শবদ্' বলিলেন—

বৈদ্ বুলায়া বৈদগী
পকড় চণ্ডোলে বাঁহ্।
ভোলা বৈদ ন জাণয়ী
করক্ কলেজে মাহ॥
বৈদা বৈদ সবৈদ্ তুঁ
পহেলা রোগ্ পছাণ্।
এয়্সা দারু লোড় লহ্
জিৎ বঞ্চে বোগা ঘাণ॥
জিৎ দারু রোগ্ উঠিয়হ্
তন্ সুখ্ বসে আয়্।
রোগ্ গঁওয়ায়েহ্ আপণা
তা নানক বৈদ্ সদায়॥

ইহার অর্থ—"আমার চিকিৎসার জন্য বৈদ্য ডাকিলেন। বৈদ্য আমার হাত ধরিয়া নাড়ী দেখিতেছেন। কিন্তু ভ্রান্ত বৈদ্য ইহা জানে না যে আমার রোগ হৃদয়ের মধ্যে। বৈদ্যের বৈদ্য সুবৈদ্য তুমি প্রথমে মূল রোগ অর্থাৎ জন্মমরণাদি ভবরোগের কথা জান। এমন ঔষধ দাও, যাহাতে সমস্ত রোগ দূর হইয়া যায়—শরীরে সুখ হয়। প্রথমে তুমি নিজের রোগ অগ্রে চিকিৎসা কর, তখন বলিব যে তুমি বৈদ্য।" গুরুনানকের মুখে এই প্রবীণের

বাক্য শুনিয়া হরিদাস কিছুক্ষণ স্তম্ভিত হইয়া পরে বলিলেন—"মহারাজ বলুন আমি রোগী কিসে—আমার কি রোগ আছে?" গুরুনানক তখন বৈদ্যরাজকে আধ্যাত্মিক রোগের কথা বুঝাইয়া বলিলেন—"প্রথম হইতে অহং রোগ সকল প্রাণীরই আছে। এই জন্যই লোকেরা বড় দুঃখী হইয়া থাকে। এই অহং রোগই জন্মমরণের কারণ। কোন ঔষধেই এ রোগ যাইবার নয়। এই দুঃখে যে নিজেকে নিজে দুঃখী বলিয়া জানে, সে অন্যকে কি প্রকারে সুখী করিবে। এমন ঔষধ বল যাহাতে অহং রোগ যায়, আর অচল সুখ পাওয়া যায়। যে এই ঔষধ জানে সেই প্রকৃত বৈদ্য। যে জন্মমরণ হইতে মুক্ত তাহার আর রোগ হয় না। হে হরিদাস! আমি আপনার প্রিয় পরমেশ্বরে মগ্ন আছি—এ রোগের ঔষধ কিছুই নাই। সংসারে বহু রোগ আছে তাহাদের ঔষধও অনেক আছে। যাহা জন্মমরণের কারণ সেই মমতা রোগ প্রথমে দূর কর। সর্ব্বত্র পরমেশ্বর ব্যাপ্ত আছেন জানিয়া কাহার প্রতি ঈর্ষা করিও না। পরমাত্মা একরস সচ্চিদানন্দ পূর্ণ।" গুরুনানকের অমৃততুল্য এই উপদেশ শ্রবণে হরিদাসের চৈতন্য হইল। তিনি কালুকে স্পষ্টই বলিলেন—"নানকের কোনই রোগ নাই। উহার জন্য কোনই চিন্তা করিবেন না। এ পরমেশ্বরে মগ্ন—সংসারের দুঃখ দূর করিতে সমর্থ।" এই বলিয়া হরিদাস নানক ও তাঁহার পিতা কালুকে প্রণিপাত পূর্ব্বক চলিয়া গেলেন।

শ্রীঋতেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

পদরাগ।

(৬) তুমি আদি চিরকবি!

বিভাস—ঝাঁপতাল।

তুমি আদি চিরকবি!
অনন্ত আকাশে জ্যোতির অক্ষরে
কিবা আঁকিয়াছ ছবি;
তুমি আদি চিরকবি!
শুভ্র ছায়াপথ চারু রচনায়
ফুটিয়াছে শশি রবি;
তুমি আদি চিরকবি!
বনে বনে তব সুষমা রচনা
ফুটে কুসুম' সুরভি,
তুমি আদি চিরকবি!
হৃদয়ে লিখেছ অক্ষর রচনা
অপ্রতিম প্রেমছবি,
তুমি আদি চিরকবি!

(৭) অন্নপূর্ণা।

রামকেলী—ঢিমেতেতালা।

জননী গো অন্নপূর্ণা এসেছি হে তব দ্বারে,
তোমার প্রসাদ অন্ন একমুষ্টি লভিবারে;
ভ্রমিয়াছি সারাপথ
অবশেষে শ্রান্ত পদ

ক্ষুধায় কাতর প্রাণ আর চলিতে না পারে;
দাও তব সুধা অন্ন
জীবন হইবে ধন্য,
ধনধান্য পরিপূর্ণ আছে তব ভাণ্ডার।
দয়াময়ী! ফিরায়োনা শূন্য হস্তে অভাগারে।

(৮) তুমি যাকে দাও সেই পায়।

বেহাগ—মধ্যমান।

(দয়াময়) তুমি যাকে যাহা দাও সেই তাহা পায়।
নিজ চেষ্টা বলে করি সে বল কোথায়?
মোরা কর্ম্ম করি মিলে,
শুভ ফল তুমি দিলে
সে ফল সঁপিব তব চরণ সেবায়;
প্রেমানন্দে লয়ে যাব প্রসাদ সবাই।

(৯) মহাধনী।

কেদারা—আড়াঠেকা।

সারাদেশ খুঁজে তবু
না পায় সে ধন
হৃদয় ভাণ্ডারে যাহা
রেখেছ গোপন।
বৈরাগ্যের চাবি ল'য়ে
যে খুলিবে দ্বার
দেখিবে পশিয়া সেথা
ঐশ্বর্য্য অপার,—

ফুরাবেনা—অসীম সে।
সেই রত্ন মণি
যত পার লয়ে যাও
হবে মহাধনী।

(১০) স্বাধীনতা।

বাহার—ঝাঁপতাল।

শান্তি চাহি, চাহি মুক্তি, চাহি চির-স্বাধীনতা,
চাহিনা শৃঙ্খলে বদ্ধ করিতে জীবনলতা।
মুকত সমীরভরে জীবন খেলিবে যবে
মঙ্গল কুসুম গন্ধ বিশ্বে সমীরিত হবে।
দূর কর অধীনতা, নরক-যন্ত্রণা ঘোর,
জীবনে স্বাধীন ভাব ফুটিয়া উঠুক মোর।

শ্রীঋতেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

পবিত্রতা।*

যেখানে লোকে দেবার্চ্চনা করে, সে স্থান তাহারা কেমন পরিষ্কার রাখে, পুষ্পের গন্ধে, ধূপধূনার গন্ধে কেমন সুবাসিত করে। কিন্তু যিনি নিরাকার অদৃশ্য পরমাত্মাকে আপনার আত্মাতে স্থান দেন, তাঁহার কত কর্ত্তব্য—সদ্‌গুণরূপ ধূপধূনা দ্বারা আত্মাকে সুগন্ধিত করা, পবিত্র উদক দ্বারা আত্মার পাপমলিনতা ধৌত করা। হৃদয়কে সাধ্যমত পরিষ্কৃত না করিয়া পরমাত্মাকে যেন কেহ হৃদয়ে আহ্বান না করেন। যখন আত্মা হইতে পবিত্র সমীরণ সাধুচিন্তা উদিত হয়, তখন ঈশ্বরের জন্য তাহা উপযুক্ত হয়। সেই যে আমাদের পরম পিতা পরম মাতা তাঁহার প্রিয় স্থান আমাদের আত্মা; অতএব তাঁহার স্থানকে পরিষ্কৃত কর; আমাদিগের অপবিত্রতাতে তাঁহার প্রিয় আবাসস্থান যেন অপবিত্র না হয়। জ্ঞান প্রেম পবিত্রতা ধর্ম্ম অর্জ্জন কর; তিনি আমাদের সহায় হইবেন। সদ্‌গুণে উন্নত হও, অনন্তলোকে উন্নত হইবার সোপান পাইবে। হে পরমাত্মন! আমাদের নিকট প্রকাশিত হও; যাহাতে তোমাকে পবিত্র হৃদয় অর্পণ করিতে পারি, তোমার পবিত্র সমীরণে বিচরণ করিতে পারি, এ প্রকার করুণা বিতরণ কর; কুটিলভাব শঠতা আমাদের মনে যেন স্থান না পায়; সকলের মনে তোমার উদার সরল পবিত্র ভাব প্রেরণ কর।

৺হেমেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

---

* ১৮৯৩ শক, ১৪ই ফাল্গুণ, রবিবার, প্রাতঃকালে পূজ্যপাদ পিতৃদেব ৺হেমেন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্ত্তৃক লিখিত।

চকোলেট্।

(খাদ্যপাক।)

উপকরণ।—কোকো চা-চামচের চারি চামচ, দুধ পাঁচ ছটাক, মাখন আধ পোয়া, চিনি এক পোয়া, ভ্যানিলা এসেন্স দু চার ফোঁটা।

প্রণালী।—কোকো, চিনি, মাখন, দুধ, (দুধ ঘন পাঁচ ছটাক হইলেই ভাল হয়) সমুদয় একত্রে চড়াইয়া দাও। দিয়া নাড়িতে থাক। গাঢ় হইয়া আসিলে, গজার রসের মত চার তার বাঁধিলে নামাইয়া একটি পাত্রে একটু মাখন মাখাইয়া লইয়া ঢাল। উহাতে এখন তিন চার ফোঁটা ভ্যানিলা এসেন্স ছড়াইয়া দাও। ঠাণ্ডা হইলে বরফির আকারে কাট, কিম্বা ছোট ছোট নাড়ু পাকাও।

শ্রীসুদক্ষিণা দেবী।

ওঁ
পুণ্য
পুণ্যং প্রাণান্ ধারয়তি পুণ্যং প্রাণদমুচ্যতে

ক'য়নাক বেশী কথা।

বিভাস—একতাল।

ক'য়নাক বেশী কথা,
চিত্তে পান কর অমৃত স্বরস,
ভুলে যাও দুঃখব্যথা।
না দেখিয়া তাঁরে বৃথা রব করে
যত ভগ্ন-মনোরথ,
ভগ্ন রথ যথা কলরব করে
যেতে অতি দূর পথ।
যদি দেখা পেলে, থাক যোড়করে
স্তব্ধ নেত্রে নির্নিমেষ,
বৃথা বাক্যভার লয়ে তব স্কন্ধে
ভ্রমিয়োনা সারাদেশ।

শ্রীঋতেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

রামমোহন রায়—কলিকাতা বাসের পূর্ব্বে

রামমোহন রায়ের সম্পূর্ণ জীবনী আমরা লিখিতে বিরত রহিলাম। তাঁহার জীবনের যে সকল ঘটনা ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠা সূচিত করিয়া দিয়াছিল, সেই সকল ঘটনা এবং তাহাদের অভিব্যক্তির কারণ সকল আলোচনা করিব। বর্ত্তমান অধ্যায়ে কলিকাতায় বাসস্থান নির্দ্দিষ্ট করিবার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত রামমোহনের কার্য্যকলাপ আলোচিত হইবে।

এ পর্য্যন্ত অনুসন্ধানে যতদূর জানা গিয়াছে, তাহাতে দেখা যায় যে তাঁহার প্রথম প্রকাশ্য কার্য্য একখানি পুস্তক লিখন। পুস্তকটীর নাম "হিন্দুদিগের পৌত্তলিক ধর্ম্মপ্রণালী।" এই সময়ে রামমোহনের বয়স ছিল ন্যূনাধিক ষোল বৎসর। পাশ্চাত্য জ্ঞান ও সভ্যতার রশ্মিপ্রবেশের সম্পূর্ণ প্রয়োজন এবং "পৌত্তলিকতার নিবিড় অন্ধকারে সমগ্র দেশ নিমজ্জিত" না থাকিলেও মূর্ত্তিপূজা প্রধানত বঙ্গদেশের জনসাধারণ্যে যখন বিশেষ প্রচলিত ছিল, সেই সময়ে আত্মীয়স্বজনের ইচ্ছার বিরুদ্ধে মূর্ত্তিপূজার প্রতিরোধক এরূপ একখানি পুস্তক লেখা নিশ্চয়ই হৃদয়ের স্বাধীনতার পরিচায়ক। অরুণদেব যেমন সূর্য্যের অগ্রবর্ত্তী দূত, সেইরূপ স্বাধীনতাই প্রতিভার আলোকধারী দূত। তখন পুস্তক মুদ্রণের ব্যবস্থা প্রবর্ত্তিত হয় নাই। তথাপি বোধ হয় রামমোহন রায় নবীন যৌবনের প্রথম উদ্যমের কথা পিতা প্রভৃতি আত্মীয়স্বজনের নিকট ব্যক্ত করিয়া সন্তোষ লাভ করিয়াছিলেন এবং তাহাতেই বোধ হয় তাঁহার মনোভাব সকল প্রকাশ হইয়া পড়িয়াছিল। পূর্ব্ব অধ্যায়ে বলিয়া আসিয়াছি, যে তিনি নবম বৎসর বয়সে পাটনায় আরবী ও পারসী শিখিবার জন্য প্রেরিত হয়েন। তথায় কয়েক বৎসর থাকিয়া আরবী ভাষায় কোরাণ, ইউক্লিড ও এরিষ্টটল আয়ত্ত করিয়াছিলেন। এই সকল গ্রন্থ, বিশেষত মুসলমানধর্ম্ম তাঁহার উপর আজীবন বিশেষ প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। গ্রন্থের নামেও এই কথার যাথার্থ্য উপলব্ধ হইবে। এই নামের মধ্য দিয়া মুসলমানদিগের "বুৎপরস্তি"-গোছের একটা ভাব উঁকিঝুঁকি মারিতেছে।

তাঁহার চৌদ্দ বৎসর বয়ঃক্রম কালে একবার সন্ন্যাসী হইয়া গৃহ হইতে চলিয়া যাইবার প্রবল ইচ্ছা হইয়াছিল কিন্তু পিতামাতার বিশেষ অনুরোধে তাঁহার সন্ন্যাসী হওয়া ঘটিল না। এই ভাবটী বোধ হয় তাঁহার মাতামহকুলের সংসর্গে লাভ করিয়াছিলেন। রামমোহন রায়ের উপরোক্ত পুস্তক লিখনের ফলে তাঁহার পিতা ও আত্মীয়স্বজন বিশেষ বিরক্ত হইয়াছিলেন বলিয়াই বোধ হয়। পুস্তকে বোধ হয় মুসলমানদিগের ন্যায় মূর্ত্তিপূজার বিরুদ্ধে কিছু বেশী রকমের তীব্র আক্রমণ ছিল। রামমোহন রায়ও ভাবিলেন যে তাঁহার চিরপোষিত দেশভ্রমণের আশা সফল করিবার ইহাই উত্তম সুযোগ এবং হয়তো কিছুকাল পিতার চক্ষের আড়ালে থাকিলে তাহার বিরক্তির তীব্রতা কমিয়া যাইবে। তিনি গৃহ পরিত্যাগ করিয়া দেশভ্রমণে বহির্গত হইলেন। রামমোহন রায় অনেক বয়স পর্য্যন্ত গাছের শাখায় জাল টাঙ্গাইয়া ঝুলনশয্যায় শয়ন করিতে ভাল বাসিতেন। তাঁহার আহার ব্যবহারের বিষয় আলোচনা করিয়া বোধ হয় যে তিনি বাল্যকালে একটী ডানপিঠে পাড়াগেঁয়ে বালক ছিলেন। তখনকার কালে এরূপ দেশভ্রমণে বহির্গত হওয়া কিছু আশ্চর্য্য নহে, বিশেষত রামমোহন রায়ের ন্যায় ডানপিঠে পাড়াগেঁয়ে বালকের পক্ষে। তীর্থপর্য্যটন তখন নিত্যনিয়মিত কার্য্যের মধ্যে পরিগণিত হইত। এখন বরঞ্চ যতই তীর্থপর্য্যটনের সুবিধা হইতেছে, তীর্থমাহাত্ম্যও লোকদিগের হৃদয় হইতে ততই বিদায় গ্রহণ করিতেছে। সেকালে দেশভ্রমণের সর্ব্বপ্রধান অন্তরায় ছিল ঠগীদের হস্তে প্রাণনাশের আশঙ্কা। রামমোহন রায় সম্ভবত সন্ন্যাসীবেশে এবং অর্থহীন ভিক্ষুক অবস্থায় বহির্গত হইয়াছিলেন, তাই ঠগীদের হস্ত হইতে আত্মরক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

এই দেশভ্রমণকালে কোন বৌদ্ধসন্ন্যাসীর সঙ্গ লাভ করিয়াই হউক বা অন্য কোন কারণেই হউক, হিন্দুস্থানের পরপরে যাইয়া বৌদ্ধধর্ম্মের এবং সম্ভবত পুরাদেশীয়শাসনের বিষয় জানিবার ইচ্ছা প্রবল হওয়াতে তদভিমুখেই চলিয়াছিলেন। কেহ বা বলেন যে তিনি তির্ব্বতে উপস্থিত হইয়াছিলেন, কেহ বা তাহা স্বীকার করেন না। তির্ব্বতে তাঁহার উপস্থিত স্বীকার করিলেও ইহাতে তাঁহার ইচ্ছার দৃঢ়তার সাক্ষ্য ব্যতীত তাঁহার মহাপুরুষত্বের অন্য কোন বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায় না। তির্ব্বতে উপস্থিত হওয়া সম্বন্ধেও আমার

কিছু সন্দেহ আছে। কুমারী কার্পেণ্টার রামমোহন রায়ের শেষ জীবন বিষয়ক পুস্তকে তাঁহার যে পত্র প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাতে লিখিত আছে যে "ব্রিটিশ শাসনের প্রতি অত্যন্ত ঘৃণাবশত আমি হিন্দুস্থানের সীমানার বাহিরে কয়েকটী দেশেও গিয়াছিলাম।"

এই সময়ে নেপাল ভুটান সিকিম প্রভৃতি ইংরাজদিগের আয়ত্ত হয় নাই। সুতরাং তখন হিন্দুস্থানের সীমার বাহিরে বলিলে তির্ব্বতের পরিবর্ত্তে পূর্ব্বোক্ত প্রদেশ সকল বুঝানই সম্ভব। তির্ব্বতে গিয়া যে বৌদ্ধ অথবা অন্য কোন প্রকার ধর্ম্মের বিষয় আলোচনা করিয়াছিলেন, তাহার কোন পরিচয় তাঁহার পত্রে প্রকাশ পায় না। আমাদের অনুমান হয় যে নেপাল প্রভৃতি অঞ্চলে গিয়া তথায় লামাপন্থী তির্ব্বতীয়দিগের ধর্ম্ম আলোচনা করিবার সুবিধা পাইয়াছিলেন। নেপাল, সিকিম প্রভৃতি তখন বিশেষভাবে তির্ব্বতের অধীন ছিল, সুতরাং এই সকল প্রদেশে গিয়াও রামমোহন রায়ের বলা কিছু অসম্ভব নহে যে তিনি তির্ব্বতরাজ্যে গমন করিয়াছিলেন। আর নিজ তির্ব্বতেও গমন করাও সেকালে বিশেষ অসম্ভব কার্য্য ছিল না। তখন বৌদ্ধ ও হিন্দুসন্ন্যাসীদের ভারতে ও তির্ব্বতে সর্ব্বদাই অবাধ গতিবিধি ছিল। এখনকার মত প্রতি পদে আদেশপত্র লইয়া যাতায়াতের বিধি ছিল না। হিন্দুসন্ন্যাসীগণ মানস সরোবর, কৈলাশ প্রভৃতি তীর্থদর্শনের জন্য তির্ব্বতে যাইতেন এবং বৌদ্ধসন্ন্যাসীগণ সারনাথ, বুদ্ধগয়া প্রভৃতি তীর্থদর্শনে ভারতে আগমন করিতেন। উভয়দেশের জনসাধারণ এই সকল সন্ন্যাসীদিগকে অতিমাত্র ভক্তি করিত। সন্ন্যাসীদের সুবিধার জন্য নেপালরাজ রক্ষক প্রভৃতির নিয়মিত ব্যবস্থা করিয়া দিতেন। চীন, জাপান প্রভৃতি সমগ্র বৌদ্ধরাজ্যে আবহমান কাল বঙ্গবাসীদিগের বিশেষ আদর দেখা যায়, কারণ অনেক "বঙ্গাচার্য্য" এই সকল দেশে গিয়া বৌদ্ধধর্ম্ম সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। লেখকের পিতামহদেব যখন চীনদেশে ক্যাণ্টন সহরে গিয়াছিলেন, তখন বঙ্গদেশীয় বলিয়া বিশেষ আন্তরিক সম্মান লাভ করিয়াছিলেন। রামমোহন রায়ের তির্ব্বতভ্রমণ লইয়া যেরূপ সোরগোল করা হয়, আমাদের মতে তাহা সেরূপ সোরগোলের বিষয় নহে।

রামমোহন রায় গৃহ হইতে চলিয়া গেলে তাঁহার পিতা ভগ্নহৃদয় হইয়া

অবশেষে তাঁহার অনুসন্ধানে লোক পাঠাইলেন। চার বৎসর ভ্রমণের পর পিতৃপ্রেরিত লোকের সাক্ষাৎ পাইয়া তাঁহাদেরই সঙ্গে রামমোহন গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন। এখন পুত্রের বয়স ২০ বৎসর। সুতরাং তাঁহার পিতার সহিত অনেক সময়েই বন্ধুভাবে তর্কবিতর্ক চলিত। রামকান্ত রায় যাহা কিছু বলিতেন, তাঁহার প্রত্যেক উক্তির উত্তরে রামমোহনের একটী করিয়া "কিন্তু" থাকিত। সময়ে সময়ে রামকান্ত রায় নিতান্ত দুঃখিতস্বরে বলিয়া ফেলিতেন "আমি যাহা কিছু বলিব, তোমার তাহার প্রত্যুত্তর এবং একটা "কিন্তু" থাকিবেই।" সর্ব্বপ্রকার স্বাধীনতা-প্রিয় বালক রামমোহনের পিতার সহিত প্রতি পদে উত্তরপ্রত্যুত্তর করা ভাল লাগিত না। পিতার সম্মতি লাভ করিয়া রামমোহন রায় কাশীধামে শাস্ত্রাধ্যয়নের নিমিত্ত পুনরায় যাত্রা করিলেন। রামকান্ত তাঁহাকে এবারে অর্থসাহায্য করিতে লাগিলেন। বৎসর দশ কাশীধামে থাকিয়া উপনিষদাদি ভালরূপে আয়ত্ত করিয়া গৃহে ফিরিলেন।

রামকান্ত রায় ক্রমে কর্ম্মে অশক্ত হইয়া পড়িতেছিলেন, কাজেই রামমোহন রায়কে উপার্জ্জনের চেষ্টায় প্রবৃত্ত হইতে হইল। কর্ম্মের আশায় মুরশিদাবাদ গেলেন। তথায় থাকিবার কালে "তুহফতুল মহদীন" অথবা "একেশ্বরবাদীদিগের প্রতি দান" নামক একখানি পুস্তক এবং তাহার কিছু পূর্ব্বে "নানাধর্ম্মবিষয়ক আলোচনা" নামক আর একখানি পুস্তক আরবী ভাষায় লিখেন। এই শেষোক্ত পুস্তকে মহম্মদীয় ধর্ম্মের উপর বোধ হয় কিছু তীব্র কটাক্ষপাত ছিল। এই কারণে সম্ভবত তাঁহাকে মুরশিদাবাদ পরিত্যাগ করিয়া গৃহে প্রত্যাগমন করিতে হইয়াছিল। এদিকে তাঁহার পিতাও মৃত্যুমুখে অগ্রসর হইতেছিলেন। রামমোহনের সম্মুখেই রামকান্ত রায়ের পরলোক প্রাপ্তি ঘটিল। ১৮০১ সালে জন ডিগবি সাহেবের সহিত রামমোহন রায়ের কোন সূত্রে আলাপ ঘটিয়াছিল। পিতার মৃত্যুর পরেই ডিগবির অধীনে কেরাণীগিরি স্বীকার করিলেন। পিতার উত্তরাধিকারী হইলেন জ্যেষ্ঠপুত্র জগন্মোহন, সুতরাং কর্ম্ম স্বীকার করা তখন রামমোহনের নিতান্তই আবশ্যক হইয়া উঠিয়াছিল। ১৮০৫ সালে ডিগবির অধীনে প্রথম কেরাণীগিরি পাইয়া ক্রমে দেওয়ানী পদ লাভ করিলেন। কলেক্টরের সেরেস্তাদারকে তখন লোকে দেওয়ান বলিত এবং এই পদই সেকালে দেশীয়দিগের প্রাপ্য সর্ব্বোচ্চ পদ

বলিয়া পরিগণিত হইত। ক্রমে রামমোহন রায় এবং ডিগবি সাহেব উভয়ের পরস্পরের মধ্যে প্রগাঢ় বন্ধুতা জন্মিল। মৃত্যু পর্য্যন্ত সেই বন্ধুতা স্থায়ী হইয়াছিল। তাঁহারা উভয়ে মিলিয়া ইংরাজী ও দেশীয় সাহিত্যের চর্চ্চা করিতেন এবং তদ্বিষয়ে পরস্পর পরস্পরকে সাহায্য করিতেন। ডিগবি সাহেব ১৮০৯ সালে রংপুরের কলেক্টর করেন। এই রংপুরে অবস্থিতিকালেই রামমোহন রায়ের কার্য্যগুণে ডিগবি সাহেব তাঁহার জমাবন্দোবস্তী কার্য্যে বিশেষ সুখ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন।

রংপুরে রামমোহন রায় সন্ধ্যার পর আপনার বাসাবাটীতে তত্ত্বালোচনার জন্য সভা আহ্বান করিতেন। মাড়োয়ারী বণিকদিগের অনেকে এই সভার সভ্য ছিলেন। রামমোহন রায় রংপুরে থাকিতেই পারসী ভাষায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পুস্তক রচনা করিয়াছিলেন এবং বেদান্তের কিয়দংশ অনুবাদ করিয়াছিলেন।

১৮১১ সালে রামমোহনের জ্যেষ্ঠভ্রাতা জগন্মোহনের মৃত্যু হয়। বিধবা ভ্রাতৃবধূ রামমোহনের নিষেধ সত্ত্বেও পতির সহগমন করিলেন। কিন্তু যখন চিতাগ্নির উত্তাপ সহ্য করিতে না পারিয়া তিনি একবার পলায়নের চেষ্টা করেন, সেই সময়ে আত্মীয়স্বজনগণ বলপূর্ব্বক বৃহৎ বৃহৎ বংশদণ্ডের সাহায্যে তাঁহাকে চিতাগ্নি হইতে উঠিতে না দিয়া দগ্ধীভূত করিলেন রামমোহন রায় নাকি স্বচক্ষে এই ঘটনা দেখিয়া অত্যন্ত অভিভূত হইয়া পড়িয়াছিলেন এবং সেই অবধি এই কুপ্রথা রহিত করিবার জন্য বদ্ধপ্রতিজ্ঞ হইলেন।

রামমোহন রায় পিতার মৃত্যুর পর অবধি একটু বেশী প্রকাশ্যভাবে নিজ মত প্রকাশ করিতেছিলেন দেখা যায়। ইহার ফলে তাঁহার মাতা এবং অন্যান্য আত্মীয়ের সহিত আন্তরিক সদ্ভাব থাকিতে পারে নাই। রংপুরে থাকিতে যখন তত্ত্বালোচনার সভা স্থাপন করিলেন, তখন তত্রস্থ জজকোর্টের দেওয়ান গৌরীকান্ত ভট্টাচার্য্য তাঁহার বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়া কয়েকটী নিন্দাপূর্ণ পুস্তক প্রকাশ করিয়াছিলেন। এদিকে রামমোহন গৃহের মধ্যে মাতাকে প্রধানত প্রতিকূল দেখিয়া বিষয়ের অংশের জন্য কোনই চেষ্টা করেন নাই। জ্যেষ্ঠভ্রাতা ছিলেন, তিনিই বিষয়ভার গ্রহণ করিলেন, রামমোহনও নিশ্চিন্ত হইলেন। পৈতৃক বিষয়ের জন্য বিশেষ গ্রাহ্য না করিবার আরও একটী কারণ এই বর্দ্ধমান রাজের সহিত এই বিষয় লইয়া বহুকাল যাবৎ বিবাদ

চলিয়া আসিতেছি—লাভের গুড় পিঁপড়ায় খাইতেছিল। যাইহৌক জ্যেষ্ঠভ্রাতার মৃত্যুর পর দেনার দায়েই হউক বা ভ্রাতুষ্পুত্রের পৈত্রিক বিষয় রক্ষা করিবার অক্ষমতা বশতই হউক, যখন তাহা রামমোহন রায়ের হস্তে আসিয়া পড়িল, তখন তিনি তাহা রক্ষা করিতেও বাধ্য হইলেন। তাঁহার মাতা কিন্তু আপত্তি করিলেন যে বিধর্ম্মী পুত্র বিষয় পাইতে পারে না। তাঁহার মত সকল হিন্দুধর্ম্মের বিপরীত নহে ইহা প্রমাণিত হওয়ায় মাতার উত্থাপিতা আপত্তি আদালতে অগ্রাহ্য হইল। রামমোহন রায় যথাপূর্ব্ব মাতাকেই বিষয় পর্য্যবেক্ষণের ভার প্রদান করিয়া স্বয়ং তাঁহার জমিদারী সংলগ্ন এক প্রান্তভূমিতে একটী ক্ষুদ্র বাসস্থান নির্ম্মাণ করিয়া রাখিলেন—কর্ম্মস্থান হইতে আগমন করিলে তথায়ই থাকিতেন। সেই বাসগৃহে "ওঁতৎসৎ" বা "একমেবাদ্বিতীয়ং" খোদিত করিয়া রাখিয়াছিলেন। মাতা ব্যতীত রামমোহনের জ্ঞাতি রামজয় বটব্যাল যথেষ্ট অত্যাচার ও উপদ্রব করিতেন। রামমোহন উক্ত জ্ঞাতির সহিত বিবাদ করিবার অক্ষমতা বুঝিয়াই সম্ভবত ধৈর্য্যধারণ করিয়াছিলেন। সেই ধৈর্য্যগুণে ক্রমে সেই সকল অত্যাচার আপনাপনিই থামিয়া গেল।

শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

সোণায় অরুচি।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

অসহ্য মানসিক যন্ত্রণায়—কঠোর অর্থচিন্তায় রাত্রি প্রভাত হইল,—রাত্রিতে ভাল একটা নিদ্রা হইল না! বড় কষ্টে ও মর্ম্মান্তিক যন্ত্রণায় রাত্রি কাটিয়া গেলে পর, প্রভাতবিহগের কাকলির সঙ্গে সঙ্গেই, আমি বিষণ্ণ মনে শয্যা হইতে উঠিয়া আবার টাকার খোঁজে বাহির হইলাম,—আজ 'ফী' দাখিলের শেষ দিন। আজ যেমন করিয়াই হউক ফী দাখিল করিতে না পারিলে আর পরীক্ষা দেওয়া হইবে না। আজ এই দীর্ঘ দুই বৎসর শত সহস্র কষ্ট স্বীকার করিয়া—শরীর নষ্ট করিয়া যে হাড়-ভাঙ্গা পরিশ্রম করিয়া আসিতেছিলাম, আজ এক রকম করিয়া 'ফী'র টাকা দাখিল করিতে না পারিলে সবই পণ্ড হইবে—ভস্মে ঘৃতাহুতি মাত্রে পরিণত হইবে।

যে যে স্থানে ঋণ পাইবার আশা ছিল, নিজের অদৃষ্ট চক্রের ঘোর আবর্ত্তে পড়িয়া, প্রত্যেক স্থানেই ব্যর্থমনোরথ হইয়া, বেলা প্রায় দ্বিতীয় প্রহরের সময় উন্মত্তাবস্থায় বাসায় ফিরিলাম। বাসায় ফিরিয়া আসিয়া আবার আমার স্ত্রী পঙ্কজিনীর তোষামোদে প্রবৃত্ত হইলাম। তোষামোদে প্রবৃত্ত হইলাম সত্য; কিন্তু নারীর তথা সদরআলানন্দিনীর কঠোর প্রতিজ্ঞার নিকট আমার সব তোষামোদ বাক্য ব্যর্থ হইল। পঙ্কজিনীর সেই প্রতিজ্ঞা অচল অটল,—পাষাণের ন্যায়ই অচল অটল রহিল। শেষ, অনেক যত্ন ও চেষ্টায়, অজস্র তোষামোদ ও মিষ্ট কথায়ও যখন কর্ম্মোদ্ধার করিতে পারিলাম না, তখন—— লিখিতে এখন ঘৃণা ও লজ্জা হয়,—আমি আমার ক্রোধবেগ সহ্য করিতে না পারিয়া পঙ্কজিনীর গালে চড় মারিতেও উদ্যত হইলাম। তাহাতে পঙ্কজিনী কালভুজঙ্গিনীর ন্যায় গ্রীবা উত্তোলন করিয়া আমাকে অজস্র কটুবাক্য বর্ষণ করিতে লাগিলেন। একে দ্বিপ্রহর কাল, তাহাতে স্নান নাই, আহার নাই,—মুখে একটু জল পর্য্যন্ত নাই, রাত্রিতে ভাল নিদ্রা পর্য্যন্ত হয় নাই। সব চাহিতে জীবনের সব আশা ভরসায় জলাঞ্জলি দিতে বসিয়াছি;

সুতরাং পঙ্কজিনীর অজস্র কটূবাক্যে আমি আর স্থির থাকিতে পারিলাম না,—উত্তরোত্তর আমার ক্রোধ বৃদ্ধি হইতে লাগিল। শেষ, আমি আর স্থির থাকিতে না পারিয়া এবার একটা চড় মারিয়া ফেলিলাম। ইহাতে পঙ্কজিনী চীৎকার ছাড়িয়া কাঁদিয়া উঠিল। কিন্তু এ কান্নায় এবার আর আমার মন ভিজিল না,—হৃদয়ের এক কোণে একটুমাত্র কারুণ্যহিল্লোলও বহিল না; বরং তাঁহাকে কাঁদিতে দেখিয়া কহিলাম,"—আজ তোমারই একদিন বা আমারই একদিন। এতদিন তোমায় কিছু বলি নাই—আজ বলিব। হয় এখন আমার মতানুসারে কাজ কর, নয় তোমাকে যথোচিত শাসন করিব,—এমন সময়ে বউঠাকুরাণী—দাদার স্ত্রী—সেই ছোটলোকের মেয়ে অপরাজিতা আসিয়া পঙ্কজিনীকে আমার কাছ হইতে টানিয়া লইলেন। আমি বউ-ঠাকুরাণীকে বাধা দিয়া কহিলাম,—"আপনি এখন এখান হ'তে চলিয়া যান। আজ একবার দেখিব।" এই বলিয়া অপরাজিতার হাত হইতে পঙ্কজিনীকে মুক্ত করিবার চেষ্টা করিলাম,—পারিলাম না। এমন সময়ে দাদা আমাকে স্নেহপূর্ণ—করুণাপূর্ণ মধুর কণ্ঠস্বরে ডাকিলেন।

দাদার আহ্বানে আমি তাঁহার নিকট উপস্থিত হইলে, তিনি আমার গভীর নিরাশাব্যঞ্জক মুখ দেখিয়া একে একে সব জিজ্ঞাসা করিলেন। এতদিন এই দীর্ঘকাল সংসারের কথা দাদার নিকট বড় একটা প্রকাশ করি নাই,—প্রকাশ করা আবশ্যক বিবেচনাও করি নাই। এখন তিনি নিজে কঠিন রোগগ্রস্ত,—তারপর অর্থচিন্তা। এমন স্থলে অর্থচিন্তার দায় হইতে যতই তাঁহার চিত্তকে মুক্ত রাখা যায়, তাঁহার মরণাহত জীবনের পক্ষে ততই মঙ্গল,—এই ভাবিয়া সংসারের আয় ব্যয় সম্বন্ধে প্রকৃত কথা তাঁহাকে প্রায়ই বলিতাম না। তবে তিনি আপনার দূরদর্শিতার বলে সকলই জানিতেন,—জানিতেন যে, এই দীর্ঘ কাল তাঁহারই সাক্ষাৎ লক্ষ্মীস্বরূপিণী বালিকা ভার্য্যার পিতৃদত্ত এক একখানি গহনার বিক্রয়লব্ধ অর্থ, আর আমারই বৃত্তি ও গৃহশিক্ষাদান-লব্ধ বেতনের কয়েকটী টাকার উপর নির্ভর করিয়া দিন চলিতেছিল। কিন্তু তবুও তিনি সময়ে সময়ে উপদেশ করিতেন যে,—"ইহারই মধ্যে যেন তেন প্রকারে পরীক্ষার 'ফী' ও কলিকাতা যাইবার ও থাকিবার ব্যয়ের টাকা সংগ্রহ করিয়া রাখিও,—এখন সেজন্য সংসার চলুক আর না চলুক,—রোগে তাঁহার ঔষধ

পথ্য হউক আর না হউক।” কিন্তু আমি কোথা হইতে সে অর্থ সংগ্রহ করিব? এই দীর্ঘ দুই বৎসর যে ভাবে আমাদের দিন চলিয়া আসিতেছিল,—ঈশ্বর জানেন। এই দুই বৎসরে এমন দিন গিয়াছে যে, কোন দিন দুই বেলা আমাদের অন্ন পর্য্যন্ত জুটিয়া উঠে নাই। তারপর তাঁহার চিকিৎসাপত্র,—মনে হয়, রীতিমত চিকিৎসা করিতে পারিলে, বুঝি তিনি এমনই অকালে এমন করিয়া আমাদের মায়া পরিত্যাগ করিয়া যাইতেন না। সুতরাং এমন অবস্থায়, বর্ত্তমান ভুলিয়া কোথা হইতে আমি অর্থ সংগ্রহ করিব? তাই এত দিন পরে অগত্যা বাধ্য হইয়া দাদার পীড়াপীড়িতে সংসারের সকল কথা প্রকাশ করিতে হইল।

দাদা একে একে আমার কথাগুলি শুনিলেন। তারপর বেদনা ব্যঞ্জক হৃদয়ে অশ্রুপূর্ণ দীননয়নে হৃদয়ের অন্তঃস্থল হইতে একটা মর্ম্মান্তিক দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া কহিলেন,—“এখন উপায়? আমিই তোমার জীবনের সব সুখের কণ্টক স্বরূপ হইয়াছি; নহিলে, আজ তোমার পরীক্ষা দিবার ভাবনা কি ছিল?” তারপর অনেকক্ষণ ভাবিয়া ভাবিয়া, শেষ কহিলেন,—“তোমার শ্বশুরকে এ বিষয়ে পত্র লিখিয়া কিছু সাহায্য চাহিলে, হয়ত এমন অসময়ে সাহায্য না করিয়া স্থির থাকিতে পারিতেন না।”

আমি। “যথাসময়ে পত্র লিখিয়াছিলাম; কিন্তু পত্রের উত্তর পাই নাই—উত্তর পাইব না। যদি সেখান হইতে টাকা পাইতাম, তবে এখানেও তাঁহার মেয়ের নিকট হইতে গহনা পাইতাম।”

দাদা। “এখন উপায়! অপরাজিতার তো আর গহণা নাই, শুধু দু’ হাতে দু’গাছি সোণার বালা আছে। ক’দিন হাত টানাটানিতে, একবার বালা দু’গাছি চহিয়াছিলাম; কিন্তু একে একে বিনা ওজরে সবই দিয়াছে বলিয়া ঐ বালা দু’গাছি দিতে কতকটা অমত প্রকাশ করিয়াছিল। তবে তখন বিশেষ পীড়াপীড়ি করি নাই, কিন্তু এখন উপায় নাই,—একবার চাহিয়া দেখি।” এই বলিয়া বউঠাকুরাণীকে ডাকিলেন।

এবার আমি বাধা দিয়া কহিলাম,—বৃথা তাঁহাকে ডাকিয়া কি করিবেন। যে বংশে তিনি জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার নিকট চাহিলেই তিনি

অম্লান অন্তঃকরণে বালা দু’গাছি দিবেন। কিন্তু এখন শুধু দু’গাছি বালার কাজ নয়; ন্যূন পক্ষে আমার দেড় শত টাকার দরকার। পরীক্ষার ‘ফী’, কলিকাতা যাতায়াতের ব্যয়, বাসা খরচ প্রভৃতিতে আমার নিজেরই পঞ্চাশ ষাট টাকা দরকার, তারপর পরীক্ষা দিয়া আসা পর্য্যন্ত এখানকার সংসারের ব্যয় তাহাও এক শ—মোট দেড় শত টাকার প্রয়োজন। মোট টাকা সংগ্রহ না হইলে, শুধু শুধু বালা দু’গাছি বিক্রয় করিয়া ‘ফী’ দাখিল করিলে কি হইবে? বরং এখন ‘ফী’ দাখিল করিয়া পরীক্ষা দিতে না পারিলে অনর্থক ‘ফী’র অতগুলি টাকা জলে যাইবে।”

আমার কথা শুনিয়া দাদার সেই মরণক্লিষ্ট মুখখানি একেবারে মলিন হইয়া গেল। তিনি আপনার মনে অনেকক্ষণ আকাশ পাতাল ভাবিয়া ভাবিয়া, শেষ, পুনরায় আমার স্ত্রীকেই অনুরোধ করিলেন। ভাশুর হইয়া ভাদ্রবধূকে অনেক অনুনয় বিনয় করিলেন, কিন্তু স্বার্থপর ধনগর্ব্বিতা পঙ্কজিনীর প্রতিজ্ঞা কিছুতেই টলিল না,—দাদার সহস্র অনুরোধেও দৃক্‌পাত করিলেন না। দাদা ব্যর্থমনোরথ হইয়া ভগ্ন-হৃদয়ে ফিরিয়া আসিলে, আমি আবার একবার উঠিয়া পঙ্কজিনীর কাছ হইতে বলপূর্ব্বক অলঙ্কার লইবার মানসে আমার শয়নগৃহে আসিয়া পঙ্কজিনীর নিকট দাঁড়াইতেই, বউঠাকুরাণী হাত ছাউনি দিয়া আমায় ডাকিলেন।

বউঠাকুরাণীর আহ্বানে আমি বাহিরে আসিলে, তিনি ধীরে ধীরে কহিলেন,—“আপনার কত টাকার দরকার।”

আমি। “পরীক্ষা দিয়া আসা পর্য্যন্ত ন্যূনকল্পে আমার দেড় শত টাকার দরকার।”

বউঠাকুরাণী এবার আপনার মনে আপনি অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত কি ভাবিলেন তারপর প্রীতিপ্রফুল্ল মুখে আমাকে কহিলেন,—“বেলা হ’য়েছে,—আপনি স্নানকরে আসুন, আমি টাকা সংগ্রহ করে দিতেছি।”

আমি চকিতের ন্যায় কহিলাম,—“কোথা হইতে আপনি এত টাকা সংগ্রহ করিয়া দিবেন।”

সপ্তদশ কি অষ্টাদশ বর্ষের বালিকা বউঠাকুরাণী অম্লান অন্তঃকরণে আপনার হাত হইতে তাঁহারই বিবাহের—তাঁহারই পিতৃদত্ত অলঙ্কার রাশির

মধ্যে একমাত্রাবশিষ্ট সেই সোণার বালা দু'গাছি প্রীতিপ্রফুল্ল মুখে খুলিয়া, আমার হাতে দিয়া কহিলেন,—"এই নিন, ইহাতে কতক টাকা উঠিবে। অবশিষ্ট টাকা শেফালিকার হাতের বাজু ও বালা এবং গলার মালা হইতে হইবে";—এই বলিয়া শেফালিকার গা' হইতে বাজু ও বালা আর কণ্ঠ হইতে কণ্ঠমালা খুলিয়া লইয়া আমার হাতে দিয়া কহিলেন,—"এখন এগুলি, চাই বাঁধা দিয়ে হউক—চাই বিক্রয় করিয়া হউক, যেমন করিয়া টাকা সংগ্রহ করিতে পারেন, করিয়া আপনার কার্য্য নির্ব্বাহ করুন।"

এদিকে গাত্র হইতে অলঙ্কার উন্মোচন করিতে দেখিয়া, শেফালিকা—দুই বৎসরের শিশু কন্যা শেফালিকা চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিল। বালিকার কান্না দেখিয়া, আমার হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যাইতেছিল, কিন্তু বউঠাকুরাণী সে দিকে একবারও দৃক্‌পাত না করিয়া শেফালিকার গাত্র হইতে অলঙ্কার উন্মোচন করিয়া আমার হাতে দিলেন। আমি অলঙ্কার হাতে করিয়া ফিরাইয়া দিতে উপক্রম করিয়া কহিলাম যে,—"এমন করিয়া বালিকাকে কাঁদাইয়া, তাহারই গায়ের গহনা বিক্রয় করিয়া আমার পরীক্ষা দিয়ে কাজ নেই।" কথা কয়েকটী বলিতে এবার শ্রাবণের বারিধারার ন্যায় প্রবলবেগে অশ্রু আসিয়া উপস্থিত হইল।

আমার চোখে জল দেখিয়া বউঠাকুরাণী সরলতা পরিপূর্ণ হাসি হাসিয়া কহিলেন,—"সে কি? এক মুহূর্ত্তের কাতরতা দেখিয়া চিরজীবনের উন্নতির পথে কাঁটা দিবেন কেন? আজ শেফালিকার কান্না দেখে আকুল হইতেছেন সত্য; কিন্তু দুই বছর পর, যখন সামান্য কয়েকখানি অলঙ্কারের পরিবর্ত্তে, তাহারই কাকার স্নেহে সারা গায়ে অলঙ্কার পরিতে পাইবে,—তখনকার সুখের বিষয় একবার ভাবিলে, ভবিষ্যতের সুখে বর্ত্তমানের দুঃখ দূর হইয়া যায়।" এই বলিয়া একবার স্নেহপূর্ণ দৃষ্টিতে আমার পানে চাহিয়া কহিলেন, —"এখন স্নান করে আসুন—বেলা দু'পোর পড়ে গেল,—স্নান করে এসে আহার ক'রে কালেজে যান।"

এবার বউঠাকুরাণী অপরাজিতার কথা ও কার্য্য দেখিয়া আমি কেমন এক রকম হইয়া যাইতেছিলাম,—আমার তখন মনে হইতেছিল যে, এই দীর্ঘ চারি বৎসর অনন্ত নরকযন্ত্রণা ভোগ করিবার পর, এখন না জানি কোন

অজানিত স্বর্গে যাইতেছিলাম। এমনই ভাবে আরও কতক্ষণ গেল। তার পর ভাবিলাম,—"বউঠাকুরাণী ও আমার স্ত্রী,—উভয়েই সমবয়েসী। একজন আশৈশব দরিদ্রের কন্যা—অন্যজন বড়লোক সদরআলার মেয়ে। একজন—আমার বউঠাকুরাণী—বর্ত্তমান কালে সংসারে ভ্রাতৃবিচ্ছেদ ঘটাইবার মূল কারণ; অন্যজন আমারই পত্নী—জীবনে শান্তিস্বরূপিণী, আমার সুখ দুঃখের তুল্যাংশভাগিনী। অথচ আজিকার আমার এই অতিঘোর দুর্দিনে, আমার সেই সুখ দুঃখের তুল্যাংশভাগিনী প্রেয়সী ভার্য্যা আপনার একমাত্র হিংসা, দ্বেষ প্রভৃতির বশবর্ত্তিনী হইয়া আমার এই বড় ঘোর বিপদে একবার দৃক্‌পাতও করিলেন না,—দৃক্‌পাত আবশ্যক জ্ঞান করিলেন না। অন্যদিকে, দাদার স্ত্রী—চিরদরিদ্রের কন্যা, দরিদ্রের মর্ম্মকাতরতা আপনার হৃদয়ে আপনি বুঝিলেন, অমনি অম্লান অন্তঃকরণে আপনারই পিতৃদত্ত একমাত্র অবশিষ্ট দু'গাছি সোণার বালা, আর তাঁহারই একমাত্র দুহিতা দুই বৎসরের বালিকা—আমাদের বড় আদরের বড় স্নেহের শেফালিকা—শেফালিকারই মাতামহ দত্ত বাজু, বালা ও গলার মালা খুলিয়া দিয়া, নারীজাতির মহত্ব ও গৌরব দেখাইয়া দিলেন; এবং একবার—এক মুহূর্ত্তের জন্যও বালিকার কাতর আর্ত্তনাদে দৃক্‌পাত করিলেন না বরং হাস্যমুখে অলঙ্কার রাশি আমার হাতে দিয়া সরলতা পরিপূর্ণ মধুর হাসি হাসিতে কহিলেন,—"এই নিন! দুঃখ বোধ করিতেছেন, কেন? লোকে বিপদ আপদ হ'তে উদ্ধার পাইবার জন্যই গহনা গড়ায়! আজ এই গহনা ক'খানির দ্বারায় যদি আপনার উপকার হয়, আর সেই উপকারে যদি আমাদের চিরজীবনের ঘোর দারিদ্র্যতার শেষ হয়, তবে এক মুহূর্ত্তের কাতরতায়, তেমন মহৎ কার্য্য হইতে পশ্চাৎপদ হওয়া কখনই যুক্তি-সঙ্গত নহে। আজ শেফালিকার কান্না দেখিয়া দুঃখ হইতেছে; কিন্তু যেদিন ঈশ্বরের আশীর্ব্বাদে উপার্জ্জন করিতে সক্ষম হইবেন, তখন আবার আপনার উপার্জ্জিত অর্থে অলঙ্কার গড়াইয়া আপনার স্নেহের শেফালিকাকে পরাইবেন, একবার সেইদিনকার ভবিষ্যৎ সুখকল্পনায় আজিকার এই দুঃখ দূর করুন।"

এবার বউঠাকুরাণীর কথায় আর স্থির থাকিতে পারিলাম না, তাই আত্ম-হারার ন্যায় উদ্বেলিত হৃদয়ে কহিলাম,—"বড় বিপদে পড়িয়া আজ আপনারই কথা রাখিলাম। কালে যদি ঈশ্বর দিন দেন, তবে আবার ইহারই অধিক

অলঙ্কারে শেফালিকাকে, আর সেই সঙ্গে চিরদরিদ্র আমরা—আমাদের সাক্ষাৎ গৃহলক্ষ্মী আপনি—আপনাকে একদিন শরতের কলঙ্কশূন্য শরৎ সুন্দরীর ন্যায় মনের সাধে রত্নালঙ্কারে সাজাইয়া আজিকার এই হৃদয় বেদনার সমাপ্তি করিব।"

আত্ম-প্রশংসা শুনিয়া বউঠাকুরাণী বাধা দিয়া কহিলেন,—"কি ছাই বকিতেছেন, এখন বাজে কথা রাখিয়া স্নান ক'রে আসুন।"

আমি। "স্নান আহার পরে করিব। যদি আপনার স্নেহে ও আশীর্ব্বাদে টাকার যোগাড় হইল, তখন আগে 'ফী' দাখিল করিয়া আসি। বিলম্ব করিলে হয়ত কাজ পণ্ড হইবে—এমনই বিলম্ব হ'য়ে গিয়াছে।" এই বলে গহনাগুলি হাতে করিয়া চলিয়া গেলাম।

নবম পরিচ্ছেদ।

যথাসময়ে বি, এ, পরীক্ষা দিয়া কলিকাতা হইতে ঢাকায় আসিলাম। ঢাকা আসিয়া প্রথমেই দেখিলাম যে, পঙ্কজিনী, তাঁহার জ্যেষ্ঠভ্রাতা তারকনাথ যখন তাঁহাকে দেখিবার জন্য ঢাকা আইসেন, তখন সকলের সম্পূর্ণ অমতে জেদ করিয়া ভ্রাতার সহিত পিত্রালয়ে চলিয়া গিয়াছেন। এমন দুর্দ্দিনে একমাত্র বউঠাকুরাণীর উপর সংসার রাখিয়া চলিয়া গিয়াছে শুনিয়া আমার মনে বড় ঘৃণার উদয় হইল, এবং তখনই মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিলাম যে, এবার পঙ্কজিনী ও তাঁহার পিতা,—আমার সেই শ্বশুর মহাশয়কে একবার কাঁদাইব। এই ভাবিয়া আর পঙ্কজিনীকে আনিবার সঙ্কল্প পরিত্যাগ করিলাম।

এমনই ভাবে ঢাকা আসিয়া এক সপ্তাহ মধ্যে হঠাৎ যশোহরে একটা স্কুলের মাষ্টারী পাইয়া, দাদা ও তাঁহার স্ত্রী কন্যা সহকারে সেই কার্য্যস্থানে চলিয়া গেলাম।

কর্ম্মস্থানে আসিয়া কার্য্যে যোগ দিবার পর এক পক্ষ কাটিয়া গেল। এক পক্ষ পরে, হঠাৎ অগ্রজ মহাশয়ের ব্যারাম আরও বৃদ্ধি হইল। আমি এখন আপনার সাধ্যানুসারে যত্নপূর্ব্বক তাঁহার চিকিৎসা ও শুশ্রূষা চালাইতে লাগিলাম। কিন্তু বিধাতার আদেশে চিকিৎসায় কোন ফলই পাওয়া গেল না।

এমনই অবস্থায় বি, এ, পরীক্ষার ফল বাহির হইবার ঠিক এক পক্ষ পরেই, নিষ্ঠুর দেবতার অবিচারে, অগ্রজ মহাশয় আমাদের মায়াজাল ছিন্ন করিয়া, ইহ সংসার হইতে চিরবিদায় গ্রহণ করিলেন।

* * * *

অগ্রজ মহাশয়ের মৃত্যুর পর যথাকালে যথাসাধ্য তাঁহার শ্রাদ্ধাদি শেষ হইয়া গেল। শ্রাদ্ধাদি শেষ হইলে, অনেকটা ভাবিয়া চিন্তিয়া যে পর্য্যন্ত আমার বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ সমাপ্ত না হয়, সে পর্য্যন্ত বউঠাকুরাণী ও শেফালিকা—অগ্রজ মহাশয়ের শ্বশুর গৃহে এবং মেজদিদিকে তাঁহার মামাশ্বশুরের গৃহে পাঠাইয়া দিয়া, আমি স্কুলের মাষ্টারী ছাড়িয়া দিয়া ঢাকায় আসিলাম। ঢাকায় আসিয়া ঢাকার বাসা ও দ্রব্যাদি যাহা কিছু অবশিষ্ট ছিল তাহা বিক্রয় করিয়া, সেই বিক্রয়লব্ধ অর্থে পূর্ব্বকৃত ঋণের কতকাংশ পরিশোধ করিয়া, জন্মশোধ আমার শৈশবের ও প্রথম যৌবনের অভিনয়ক্ষেত্র ঢাকা হইতে চির বিদায় গ্রহণ করিয়া কলিকাতা আসিলাম।

* * * *

কলিকাতা আসিয়া অল্পদিন মধ্যেই একটা স্কুলের মাষ্টারী জুটাইয়া লইলাম, এবং কালেজ খুলিলে প্রেসিডেন্সী কালেজে এম, এ, পড়িবার জন্য ভর্ত্তি হইলাম।

এমনই অবস্থায় কলিকাতা আসিয়া মাষ্টারী করিতে করিতে কয় মাস কাটিল। কয় মাস মাষ্টারী করিয়া হাতে কিছু টাকা সংগ্রহ হইলে পর, সর্ব্বপ্রথমে সেই টাকায় শেফালিকার গলার মালা, হাতের বাজু ও বালা, পায়ের চরণপঙ্কম প্রভৃতি কয়েকখানি সোণা রূপার গহনা গড়াইয়া, যথাসময়ে শেফালিকাকে পাঠাইয়া দিলাম। গহনা পাঠাইবার পর পরই, বউঠাকুরাণী অপরাজিতার নিকট হইতে একখানি পত্র পাইলাম। বউঠাকুরাণী পত্রে অন্যান্য বিষয় লিখিয়া পর লিখয়াছেন যে,—"যদি আপনি ডাকে শেফালিকার গহনাগুলি না পাঠাইয়া, যখন পূজোর ছুটিতে শেফালিকাকে দেখিতে আসিতেন, সেই সময়ে গহনাগুলি আনিয়া, আপনি স্বহস্তে শেফালিকার গায়ে পরাইয়া দিতেন, তবে আমি অধিক সুখী হইতাম। কেন না একদিন, যখন আপনি বড় বিপদে পড়িয়া, যে শেফালিকার গা' হইতে অলঙ্কার খুলিয়া লইবার

কালে শেফালিকার কাতর ক্রন্দনে আপনি নিজে কাঁদিয়াছিলেন, এখন সেই শেফালিকার গায়ে আপনি স্বহস্তে গহনা পরাইয়া তাহার কচি মুখে মধুর হাসি দেখিলে, আপনার অতীতের সেই বড় দুঃখ নিশ্চয়ই দূর হইত। যাহা হউক, আমি শেফালিকাকে আপনার প্রেরিত সব গহনাগুলি পরিতে দিয়াছি, —শুধু গলার মালাটা দিই নাই। পূজোপলক্ষে কালেজ বন্ধ হইলে, যখন আপনি শেফালিকাকে দেখিতে আসিবেন, তখন স্বহস্তে আপনি আপনার শত আদরের ও শত স্নেহের শেফালিকাকে তাহার গলার মালা পরাইয়া তাহার কচি মুখের মধুর হাসি দেখিবেন। দীর্ঘকাল শ্রীমতী পঙ্কজিনীর কোন সংবাদ পাই নাই, বোধ হয় বালিকা বয়সে চপলতা বশতঃ না বুঝিয়া একদিন যে কুকার্য্য করিয়াছিল, এখন বোধ হয়, সেই লজ্জায়ই আমাকে পত্র লেখে না। যাহা হউক, আপনি পত্র লিখিবার কালে তাহাকে লিখিয়া দিবেন যে, সে যেন মধ্যে মধ্যে আমাকে পত্র লিখিয়া সুখী করিতে অন্যমত না করে। আপনার শেফালিকা ভালই আছে। ইতি"

এবার বউঠাকুরাণীর সরলতা পরিপূর্ণ পত্র পড়িতে পড়িতে আমার চোখে জল আসিল। হায়! আমি আর কোন্ মুখে—কোন্ প্রাণে শেফালিকার গায়ে গহনা পরাইব। যেদিন মধুমতীনদী সৈকতে অমন দেবপ্রতিম অগ্রজকে জন্মশোধ বিদায় দিয়াছিলাম, যেদিন জন্মশোধ অমন সাক্ষাৎ লক্ষ্মীস্বরূপিণী—বউঠাকুরাণী অপরাজিতার সৌভাগ্য সূর্য্য চিরদিন তরে মধুমতীর জলে ডুবিয়াছিল, সেইদিন সেই কাল মূহুর্ত্তে—সেই শ্মশান সৈকতে—অগ্রজ মহাশয়ের সেই পরম পবিত্র চিতার সম্মুখে আমি কঠিন প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলাম যে, এ জীবনে কখন একবারের জন্যও স্বর্ণ স্পর্শ করিব না। এখন কি বলিয়া আবার আমি আমার নিজের প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিব—জীবন থাকিতে কখন সে প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিতে পারিব না। তাই শেষ অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া পর বউঠাকুরাণীকে পত্র লিখিতে বসিলাম। পত্র লিখিতে বসিয়া অন্যান্য কথা লিখিবার পর লিখিয়া দিলাম যে,—"আপনি নিজে আমার হইয়া শেফালিকার গলায় সোণার মালা পরাইয়া দিবেন, তাহা হইলেই আমি সমধিক সুখী হইব। যেদিন বড় বিপদে পড়িয়া আপনার মনে ব্যথা দিয়া আপনার হাতের একমাত্রাবশিষ্ট সোণার বালা দু'গাছি লইয়াছিলাম,—যেদিন বালিকা

শেফালিকার কাতর আর্ত্তনাদে বারেকমাত্র দৃকপাত না করিয়া বালিকার গায়ের গহনা লইয়াছিলাম, সেদিন—সেই বড় অসময়ে আপনার কার্য্যে ও কথায় মোহিত হইয়া মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলাম যে,—"বিধাতা সুদিন দিলে মনের সাধে আবার রত্নালঙ্কারে আমার বড় স্নেহের শেফালিকা ও বড় আদরের বউঠাকুরাণী আপনি,—আপনাকে রত্নালঙ্কারে সাজাইয়া আজিকার এই গভীর হৃদয়বেদনা দূর করিব।" কিন্তু বিধাতা আমার উপর নিতান্তই বাম, তাই আমার মনের সাধ মনেই বিলীন হইয়া গিয়াছে। তারপর যেদিন মধুমতী নদীসৈকতে আমার ইহসংসারের একমাত্র স্নেহবন্ধন ছিন্ন হইয়াছিল, সেইদিন—সেই কাল মুহূর্ত্তে হতভাগ্য আমি—আমার পক্ষে সেই পরম পুণ্য ও পবিত্র তীর্থক্ষেত্রে, মনে মনে কঠিন প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়াছি যে,—এ জীবনে যতদিন বাঁচিব—একদিন এক মূহুর্ত্তের জন্যও স্বর্ণ স্পর্শ করিব না। সুতরাং সোণা ছুঁইতে আমার আর অধিকার নাই,—শেফালিকার গলায় মালা পরাইবার ক্ষমতাও আমার নাই। তবে আবার যদি কখন মরিয়া মানুষ হই, তখন এবারকার এ অতৃপ্ত সাধ যেন পূর্ণ করিতে পারি,—বিধাতার নিকট ইহাই আমার একমাত্র প্রার্থনা,—জীবনে দ্বিতীয় প্রার্থনা নাই।"

* * * *

যথাসময়ে আবার বউঠাকুরাণীর পত্র পাইলাম। এবার তিনি লিখিয়াছেন,—"আপনার অনুরোধে আজ শেফালিকার গলায় আপনার প্রদত্ত মালা পরাইলাম। মালা পরাইলাম সত্য; কিন্তু আপনার প্রতিজ্ঞার কথা শুনিয়া মনে একটা দারুণ আঘাত পাইলাম। আপনি যদি সোণা না ছুঁয়িবেন তবে কেমন করিয়া শেফালিকাকে ক্রোড়ে করিবেন? আপনাকে পাইলে শেফালিকা যে আর কাহাকেও চায় না। ছিঃ, কেন এমন কঠোর প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন? আপনি গৃহী—আপনার স্ত্রী আছে;—এমন অবস্থায় এমন অকল্যাণকর প্রতিজ্ঞা করিয়া ভাল করেন নাই। আমি আপনার প্রতিজ্ঞার কথা শুনিয়া কতদূর মনে কষ্ট পাইলাম,—পত্রে কি লিখিব। আমার জন্য, কেন এমন কঠোর প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন? আপনার বড় বিপদের সময়, যখন আপনাকে হাতের বালা খুলিয়া দিয়াছিলাম, তখন এক মূহুর্ত্তের জন্য মনে কোন দুঃখ বা কষ্ট জ্ঞান করি নাই। যদি কোন দিন অলঙ্কারে আমার

লোভ থাকিত তবে হয়ত আমিও কখন সংসারের ব্যয়ে নিজের গা' হতে এমন করিয়া অলঙ্কার রাশি খুলিয়া দিতাম না। যে অমূল্য রত্ন কণ্ঠে ধারণ করিতে পারিলে, সংসারে নারীজাতি সকলের বরণীয়া হয়, আমার পিতা মাতার উপদেশে শৈশব হইতে সেই অমূল্যরত্ন পরিতে সতত যত্ন ও চেষ্টা করিয়া আসিতেছিলাম; কিন্তু আমার জন্মজন্মান্তরের কর্ম্মফলে জীবনে যখন তাহাই চিরদিন পরিতে পারিলাম না,—তখন সামান্য সোণায় আর কি দুঃখ হইবে? যাহা হউক, যাহা করিয়াছেন তাহার আর উপায় নাই—এখন যাহা করিলে চারিদিক রক্ষা হয় তাহাই করিবেন। পূজা আসিতেছে—পূজোপলক্ষে শেফালিকাকে দেখিয়া যাইতে ভুলিবেন না। শ্রীমতী পঙ্কজের কথা কিছুই লেখেন নাই—কেন? আমি তাহাকে বার বার পত্র লিখিয়া কোনই উত্তর পাই নাই। আপনি যদি তাহার পত্রের উত্তর পাইয়া থাকেন—লিখিবেন। শেফালিকা ভাল আছে। ইতি"

ক্রমশঃ

শ্রীউমেশচন্দ্র মৈত্রেয়।

ভাষা।

মনুষ্যজাতি পরস্পরের সহিত ব্যবহার করিবার কালে, যত প্রকার চিহ্ন দ্বারা মনের ভাবগুলি স্পষ্টরূপে ব্যক্ত করিতে চেষ্টা করে, সে সকলই ভাষার মধ্যে অন্তর্গত হইতে পারে।

প্রথম যখন মানবজাতি সৃষ্ট হইল, তখন তাহারা আপনার আপনার মনের ভাব অপরের নিকট ব্যক্ত করিতে উৎসুক হওয়াতে ভাষার উৎপত্তি হইতে লাগিল। প্রথমতঃ শারীরিক অঙ্গভঙ্গী দ্বারা অল্পস্বল্প ভাব ব্যক্ত হইতে লাগিল। হয়ত গালে হাত দিয়া বসিয়া থাকিলে ভাবনা বুঝাইত। কিন্তু মানবমণ্ডলী যতই উন্নতিপদে আরোহণ করিতে লাগিল, ভাবের প্রসারতা ততই বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। সুতরাং তখন কেবলমাত্র শারীরিক চিহ্নের দ্বারা সমস্ত ভাব প্রকাশ অসম্ভব বিবেচনা করিয়া অন্য প্রকার চিহ্ন খুঁজিতে আরম্ভ করিল। সেই সময়ে চিত্রাত্মক অক্ষর (Hieroglyphic) আবিষ্কৃত হইল। যেরূপ কার্য্য হইত, তাহার প্রতিকৃতি আঁকিয়া বুঝান হইত। যদি কন্যা হইত, তাহা হইলে সমস্ত জল, মাঝে মাঝে এক একটী বাড়ীর বা বৃক্ষের শিখরদেশ জলের উপর উঠিয়া আছে এইরূপ প্রতিকৃতি দ্বারা লোকে বুঝিতে পারিত। মিসর দেশে এইরূপ অক্ষরের বিশেষরূপ চলন ছিল। অন্যান্য দেশেও ইহার চলন ছিল বটে; কিন্তু মিসরের ন্যায় বিস্তৃতরূপে নহে। একবার দেরায়স নামে পারস্যরাজ সীথিয়া দেশ জয় করিতে গিয়া অধিবাসীদিগের নিকট বশ্যতাস্বীকার প্রার্থনা করিলেন; তাহাদের দূত দেরায়সকে এক পক্ষী, এক ইঁদুর, এক ভেক এবং পাঁচটী তীর উপহার প্রদান করিল। রাজা মহা আনন্দিত মনে ভাবিতে লাগিলেন যে ইহাই বুঝি সীথিয়দিগের বশ্যতাস্বীকার চিহ্ন। ইতিমধ্যে এক পারিষদ্ বলিয়া উঠিল—"না, না, মহারাজ ইহার অর্থ বশ্যতা নহে; আমার নিকট শ্রবণ করিতে আজ্ঞা হউক; ইহার অর্থ এই যে যদি আপনি পক্ষীর ন্যায় উড়িতে না পারেন, যদি ইঁদুরের ন্যায় গর্ত্তমধ্যে বাস করিতে না পারেন এবং যদি ভেকের ন্যায় সন্তরণ করিতে না পারেন,

তাহা হইলে সীথিয়দিগের ধনুর্ব্বাণ হইতে আপনার রক্ষা পাওয়া দুষ্কর।—কালে এইরূপে সঙ্কেত হইতেই চিত্রাত্মক অক্ষরের উৎপত্তি। ক্রমে ভাবের সম্পূর্ণতার সহিত অক্ষরেরও সম্পূর্ণতা হইতে চলিয়াছে।

অক্ষর অসম্পূর্ণ থাকিলে ভাষাও অসম্পূর্ণ থাকে। অন্যান্য ভাষার সহিত তুলনা করিলে সংস্কৃত ভাষা সম্পূর্ণ। ইহাও একেবারে সম্পূর্ণ নয়। ইংরাজীতে 'ত' একেবারে নাই; ফরাসী ভাষায় 'ট' একেবারে নাই। সংস্কৃত ভাষায় 'ত' ও 'ট' উভয়ই আছে। তবে আবার ইহাতেও 'জেড্' (*Z*) নাই। অন্যান্য ভাষায় অধিক অসম্পূর্ণতা; সংস্কৃত ভাষায় অতি অল্প। বাঙ্গালা ভাষা প্রায় সমস্ত সংস্কৃতের অপভ্রংশ; সুতরাং ইহাতেও অন্যান্য ভাষা অপেক্ষা অপূর্ণতা অল্প বিদ্যমান। ভাষা দ্বারা মানবের ইতিহাস অনেকটা অভ্রান্তরূপে জানিতে পারা যায়। এ বিষয়ে পরে সবিস্তারে বলা যাইবে।

ভাষাকে যত প্রকারে দেখিবে, নিয়মও তত অধিক হইতে থাকিবে। ব্যাকরণের কতকগুলি নিয়ম; উচ্চারণের কতকগুলি; অলঙ্কার শাস্ত্রের কতকগুলি; ন্যায় শাস্ত্রের কতকগুলি; আর ভাষাতত্ত্বের কতকগুলি নিয়ম আছে। এইগুলির প্রত্যেক নিয়মের সহিত মিলাইয়া ভাষার প্রতি ভিন্ন ভিন্ন ভাবে দৃষ্টি করা যাইতে পারে।

ব্যাকরণ পড়িলে বুঝা যায় যে কি প্রকারে একটী পংক্তি বিশুদ্ধরূপে রচিত হইতে পারে; শব্দের কিরূপ পরিবর্ত্তনে অর্থের কিরূপ পরিবর্ত্তন ঘটে ইত্যাদি। অলঙ্কার শাস্ত্র অধ্যয়ন করিলে বুঝা যায় যে কিরূপে কোন্ কথা বলিলে অথবা লিখিলে লোকের মন সেইদিকে অত্যন্ত আকৃষ্ট হয়। ন্যায়শাস্ত্রের পক্ষে ভাষা তর্ক প্রকাশ করিবার একটি প্রধান উপায়। ভাষাতত্ত্ব যাবতীয় ভাষার সহিত তুলনা করিয়া তাহাদের সাদৃশ্য দেখাইবার জন্য কতকগুলি নিয়ম আবিষ্কার করিয়া দেয়। এই ভাষাতত্ত্বের ইংরাজী নাম ফাইললজি (philology)।

শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

কত দিনে আর।

একবিংশ-বর্ষ আজি ফুরায়-ফুরায়,
প্রিয় নিকেতন ত্যজি' অজ্ঞাত আশায়
সুদূর প্রবাসে এই আসিয়াছি একা!
বাঞ্ছিত যা' মানবের সৌভাগ্য-সম্ভ্রম
আসিতেছি প্রতিদিন লভি' অনুপম,
হৃদয়ের শান্তি-তৃপ্তি কোথা তবু সখা?
স্বদেশের স্মৃতিটুকু স্বপনের মত—
প্রাণেশ! তোমার যুগ্ম চরণ-কমল
মানসে অঙ্কিত হ'য়ে আছে অবিরত!
ফুরা'য়েও না ফুরায় দীর্ঘ দিনমান—
ক্ষণে-ক্ষণে করিতেছে উদাস-চঞ্চল
স্মরিয়ে তোমারে, আর প্রিয় বাসস্থান!
উঠিতেছে সুখ মাঝে তীব্র হাহাকার—
ফিরে যাব নিজ গৃহে কত দিনে আর?

শ্রীজীবেন্দ্র কুমার দত্ত।

"টম্ কাকার কুটীর" * প্রণেত্রী শ্রীমতী হ্যারিয়েট বিচার ষ্টৌ।

যাঁহার যত্নে, যাঁহার প্রয়াসে, যাঁহার লেখনীর প্রভাবে এক্ষণে সমুদয় পাশ্চাত্য জগৎ হইতে পাশবিক দাসত্বব্যবসায় বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে, আজ সেই প্রাতঃস্মরণীয়া উন্নতহৃদয়া মিসেস্ হ্যারিয়েট ষ্টৌর সংক্ষিপ্ত জীবনী আলোচনা করিব।

ভাল বীজ হইতে যেমন ভাল বৃক্ষ উৎপন্ন হইয়া সুমধুর ফল প্রদান করে সেইরূপ সুপ্রসিদ্ধ অশেষগুণসম্পন্ন ডাক্তার লাইম্যান বীচার সদ্‌গুণালঙ্কৃতা পরদুঃখকাতরা হ্যারিয়েট বীচারকে উপহার স্বরূপে জগতকে দান করেন। ডাক্তার বীচার ১৭৭৫ খৃষ্টাব্দে আমেরিকার কনেক্‌টিকাট প্রদেশান্তর্গত নিউহেভন্ নামক স্থানে এক লৌহ কর্ম্মকারের বংশে জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পিতা ডেভিড বীচার কনেক্‌টিকেট্ প্রদেশের একজন বিখ্যাত কর্ম্মকার ছিলেন। ডাক্তার লাইম্যান বীচারকেও বাল্যকালে তাঁহার পিতার কারখানায় হাতুড়ি ঠুক্‌ঠাক করিতে হইয়াছিল। স্বোপার্জ্জিত অর্থে তিনি কলেজে প্রবেশ করিয়া বিদ্যোপার্জ্জন করিয়াছিলেন। সুপ্রসিদ্ধ আমেরিকান ধর্ম্মশাস্ত্রবিদ ডাইটের নিকট আধ্যাত্মিক বিষয় শিক্ষা লাভ করিয়া ১৭৯৮ খৃষ্টাব্দে ইষ্ট হ্যাম্পটনের গির্জ্জার কর্ত্তৃত্ব পদ প্রাপ্ত হন। ইনি মদ্যপানের অত্যন্ত বিরোধী ছিলেন। দাসব্যবসায়ের বিরুদ্ধে ও ধর্ম্মশাস্ত্র সম্বন্ধে তিনি অনেক ভাল ভাল গ্রন্থ লিখিয়া গিয়াছেন। তিনি ৮৭ বৎসর বয়সে ইহলোক হইতে অপসৃত হন। এই সুদীর্ঘ কাল মধ্যে লাইম্যান বীচার যে সমুদয় লোকহিতকর কার্য্য করিয়া গিয়াছেন সে সকল বিষয় আলোচনা করিতে গেল একখানি বৃহৎ গ্রন্থ হইয়া পড়ে; এস্থলে এইটুকু বলিলেই যথেষ্ট হয় যে, এই ধীমান্ পুরুষের স্বীয় অধ্যবসায় এবং অত্যধিক সাহিত্যানুরাগ তাঁহা হইতে

* "Uncle Tom's Cabin."

তাঁহার পুত্র কন্যা প্রভৃতি বংশাবলীতে এতটা বিস্তৃতি লাভ করিয়াছিল যে সমুদয় আমেরিকা মহাপ্রদেশে "বীচার" নামই প্রসিদ্ধ হইয়া গিয়াছে।

ইহার ত্রয়োদশটী পুত্র কন্যা এবং সকলেই কোন না কোন গুণে স্বনামখ্যাত। ইহাদের মধ্যে হেনরী, এডওয়ার্ড, চার্লস্ এই তিন পুত্র পিতার ন্যায় ধর্ম্মের জন্য জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন। কিন্তু হ্যারিয়েট বীচার "টম কাকার কুটীর" নামক একটী গ্রন্থ লিখিয়া জগতে অক্ষয় কীর্ত্তি রাখিয়া গিয়াছেন।

এই বিদুষী দয়াশীলা রমণী ১৮১৪ খৃষ্টাব্দে আমেরিকায় কনেক্‌টিকাট্ প্রদেশের লিচ্‌ফিল্ড নগরে ১৫ই জুন তারিখে জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পিতার যত্নে ইনি বাল্যকালে অতিশয় সুচারুরূপে সুশিক্ষা লাভ করিয়াছিলেন। পঞ্চদশ বৎসর বয়ঃক্রমে হ্যারিয়েট হার্টফোর্ডে তাঁহার জ্যেষ্ঠা ভগ্নী ক্যাথরিণ বীচার প্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয়ে শিক্ষয়িত্রীর কার্য্য করিতে আরম্ভ করেন। এই অল্প বয়সে অন্যান্য বালিকারা সামাজিক আমোদপ্রমোদ লইয়া মত্ত থাকেন, কিন্তু হ্যারিয়েট তাঁহার ভগ্নী ক্যাথরিণের সহিত স্বদেশীয় বালিকাদিগের শিক্ষার বিস্তৃতি এবং উন্নতির জন্য জীবন উৎসর্গ করিলেন। পাঁচ বৎসর ধরিয়া ক্রমাগত দৈহিক ও মানসিক পরিশ্রমের ফলে ক্যাথরিণের স্বাস্থ্যভঙ্গ হইল। সুতরাং কিছু দিনের জন্য ক্যাথরিণকে তাঁহার প্রাণের প্রিয় কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করিতে বাধ্য হইতে হইল। এই সময় হ্যারিয়েট বিংশতি বর্ষ বয়ঃক্রমে পদার্পণ করিলেন। এত অল্প বয়সেও তাঁহার স্বভাব গাম্ভীর্য্যপূর্ণ ছিল ও তাঁহার চরিত্রে একটী গভীর মহত্ত্ব দৃষ্ট হইত।

হ্যারিয়েট বীচার রেভারেণ্ড ক্যালভিন ষ্টৌ নামক একজন পাদরীর পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার স্বামী একজন যথার্থ পণ্ডিত ছিলেন। বিবাহিত জীবনের প্রথমে তিনি সংসার লইয়াই একটু ব্যস্ত ছিলেন। পুত্র কন্যাদিগের শিক্ষা প্রভৃতি সাংসারিক কর্ত্তব্যে তাঁহাকে যথেষ্ট নিযুক্ত থাকিতে হইত। এই সময় কখনও কখনও ছোট ছোট গল্প সাময়িক পত্রে বাহির করিতেন; এবং এই সকল গল্প একত্র করিয়া "মে-ফ্লাওয়ার" ও "স্যাবাথ্ অতিবাহিত করিবার দুই প্রকার উপায়" নামে দুইখানি পুস্তিকা প্রকাশিত করেন। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি ইঁহার পিতা ডাক্তার বীচার ঘৃণিত দাসব্যবসায়ের

ঘোর বিরোধী ছিলেন, সুতরাং তাঁহার পুত্র কন্যাগণও স্বভাবতই বাল্যকাল হইতেই দাসত্ব প্রথা ঘৃণার চক্ষে দেখিতেন। ক্রীতদাসদিগের উপর তাহাদের প্রভুগণের অমানুষিক অত্যাচার দেখিলে ইঁহারা মনে মনে অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হইতেন। এরূপ অত্যাচার তখন আমেরিকার প্রায় সর্ব্বস্থানেই প্রচলিত ছিল। হ্যারিয়েট এবং তাঁহার ভ্রাতা ও ভগ্নিগণ বাল্যকাল হইতেই অত্যন্ত নম্র-প্রকৃতি, পরদুঃখকাতর, মহান্ ও উন্নত হৃদয় যুক্ত ছিলেন। হ্যারিয়েট বিবাহের পর সাংসারিক ব্যাপারে ব্যস্ত থাকা সত্ত্বেও কর্ত্তব্য কর্ম্ম হইতে বিরত হয়েন নাই। তিনি এই সময় পলায়নপর দাস ও দাসসন্তানদিগকে আশ্রয় দিয়া তাহাদিগকে যতদূর সাধ্য ভাল ব্যবহারের সহিত প্রতিপালন করিতেন। ইহাদিগকে যত্ন করা তাঁহার সাংসারিক নিত্য কর্ম্মের একটি অঙ্গস্বরূপ ছিল। এইক্ষণে তিনি সাহিত্যালোচনা হইতে বিরত থাকিলেও দাসদিগের প্রতি শ্বেতাঙ্গগণের আসুরিকঅত্যাচারে মরমে মরিয়া দাসগণের পলায়নে সাহায্য করিতে ত্রুটী করিতেন না। তাহাদিগকে অন্ন বস্ত্র দিয়া তাহাদের কষ্ট দূর করিতে যথাসাধ্য চেষ্টা করিতেন।

কোন একটি ভাল কর্ম্মের প্রারম্ভে অনেকের শত্রুতা দেখিতে পাওয়া যায়; এই কারণে "দাস বন্ধু" নামক সভার সভ্যগণ যখন আমেরিকার দাসগণকে স্বাধীনতা প্রদানের মন্ত্রণা করিতে লাগিলেন তখন ইঁহাদিগেরও বহু শত্রু হইল। দাসপ্রভুরা যখন দেখিল যে তাহাদিগের বহু অর্থকর উপায়ের এইবার বুঝি অন্তিম কাল উপস্থিত হইল তখন তাহারা খুব গোলযোগ আরম্ভ করিল। শ্রীমতী ষ্টোর স্বামী "দাসবন্ধু সভার" একজন মিত্র ছিলেন। তাঁহার নিজের প্রত্যক্ষ দৃষ্ট দাসগণের প্রতি অমানুষিক অত্যাচার সমূহ লিপিবদ্ধ করিয়া উপরি উক্ত "দাসবন্ধু সভা"কে বিশেষ সহায়তা করিয়াছিলেন। রেভরেণ্ড ষ্টো "লেন সেমিনারী" কলেজের খৃষ্টীয় ইতিহাসের অধ্যাপক ছিলেন; দাস-বিরোধী দলের নেতা যখন লেন সেমিনারীতে দাস ব্যবসায়ের বিরুদ্ধে ওজস্বিনী ভাষায় বক্তৃতা দিয়া ইহার কুফল বুঝাইয়া দিতে লাগিলেন তখন ছাত্রগণের মধ্যে মহা হুলুস্থুল বাধিয়া গেল। এমন কি যে যে ছাত্র বহু দাসের অধীশ্বর ছিল তাহারা সকলেই আপন আপন দাসগণকে মুক্ত করিয়া দিল। অন্যেরা দাসগণের শিক্ষার জন্য বিদ্যালয় প্রভৃতি স্থাপনের প্রয়োজন

করিতে লাগিল। এই সমুদয় দেখিয়া আমেরিকার দক্ষিণ প্রদেশের তুলা চিনি প্রভৃতি ব্যবসায়ীগণ অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিল। ইহাদের অধীনে শত শত দাস ছিল। প্রত্যেক দাসটীকে ক্রয় করিতে ইহাদিগের কত না অর্থ ব্যয় হইয়াছে। ইহারা পশুর মত খাটিয়া খাটিয়া ইহাদের প্রভুদের অর্থের ভাণ্ডার পূর্ণ করিতেছে। অতএব এই সকল দাসগণকে মুক্ত করিলে তাহারা দেখিল যে তাহাদিগের ক্রয়ের টাকা ত জলে যাইবেই, উপরি তাহাদের ব্যবসায়েরও বহু ক্ষতি হইবে, সুতরাং এই সব নিষ্ঠুর দাসব্যবসায়ীরা কিছুতেই দাস-স্বাধীনতার পক্ষাবলম্বী হইতে পারিল না। তাহারা যাবতীয় দুষ্টলোকদিগকে অরাজকতার কার্য্যে উত্তেজিত করিয়া দিল। ইহারা ডাক্তার বীচার ও হ্যারিয়েট ষ্টোর বাটী, লেন সেমিনারী প্রভৃতি কতকগুলি বাটী লুটপাট করিবার উপক্রম করিল। এই সকল উৎপাত নিবারণের জন্য বোর্ড অফ্ ট্রাষ্টিস্ ছাত্রগণকে দাসদিগের কোন কথায় থাকিতেও নিবারণ করিয়া দিল। ইহাতে সমুদয় ছাত্র লেন সেমিনারী ছাড়িয়া চলিয়া গেল ও কলেজও ছাত্রাভাবে আর চলিল না। অবশেষে বাধ্য হইয়া প্রধান অধ্যক্ষ ডাক্তার লাইম্যান বীচার কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করিলেন; প্রোফেসার ষ্টো মাসাচুসেট্ প্রদেশের ধর্ম্ম-বিজ্ঞান সেমিনারী নামক একটী কলেজের অধ্যাপকের পদে নিযুক্ত হইলেন। এই সময় হ্যারিয়েট ষ্টো তাঁহার জগদ্বিখ্যাত "টমকাকার কুটীর" একটি মাসিক পত্রে প্রকাশিত করিতে লাগিলেন। সকলে মহা আগ্রহের সহিত পড়িতে লাগিল। যখন উহা গ্রন্থরূপে বাহির হইল তখন ইহার কাটতি কুলাইয়া উঠান মুস্কিল হইল। সংস্করণের পর সংস্করণ যেমন বাহির হইতে লাগিল তেমনি অত্যল্প কাল মধ্যেই তাহা নিঃশেষ হইতে লাগিল। ভিন্ন ভিন্ন ভাষায় এই পুস্তক অনূদিত হইয়া প্রকাশিত হইল এবং তেমনি বিক্রয়ও হইতে লাগিল। ইহা গল্প কি উপন্যাস নহে। ইহার প্রত্যেক ঘটনাগুলি সমুদয়ই সত্য ঘটনা-মূলক। গ্রন্থোল্লিখিত কতকগুলি ঘটনা গ্রন্থকর্ত্রী নিজে দেখিয়াছেন এবং কতকগুলি ঘটনা খুব বিশ্বস্ত লোকের মুখে শুনা। "টমকাকার কুটীরে" যে ভূগর্ভস্থিত লুক্কায়িত রেলওয়ের কথা পড়া যায় তাহা গ্রন্থকর্ত্রীর বাটীর পার্শ্ব দিয়াই গিয়াছিল। দক্ষিণ দেশীয় নিপীড়িত দাসদিগকে মুক্ত করিবার জন্য কতিপয় দাস বন্ধুদিগের দ্বারা উক্ত রেলওয়ে খোলা হয়। কারণ সেই সময়

আমেরিকার দক্ষিণেই দাস ব্যবসায় অত্যন্ত চলিত ছিল। উত্তর আমেরিকা ক্যান্যাডায় কেহ দাস ব্যবসা করিতে পারিত না। সুতরাং ক্রীত দাসেরা যদি একবার কায়ক্লেশে কোন রকমে ক্যানেডা প্রভৃতি স্থানে চলিয়া আসিতে পারিত তাহা হইলে আর তাহাদিগকে কে পায়! ইংরাজশাসিত স্বাধীন ভূমিতে আসিয়া তাহারাও স্বাধীন হইয়া যাইত। তখন সেখানে আর তাহাদিগকে কাহারও "এ আমার দাস" ইহা বলিয়া দাবী করিবার অধিকার থাকিত না। এই জন্য "দাসবন্ধু সভার" সভ্যেরা দাসগণকে মুক্ত করিবার ইহাপেক্ষা আর শ্রেষ্ঠ উপায় না দেখিয়া ভূগর্ভে রেলওয়ে খুলিয়া উহার দ্বারা দলে দলে দাসগণকে গভীর রাত্রে দক্ষিণ হইতে উত্তরে চালান করিয়া মুক্ত করিয়া দিতেন।

শ্রীমতী ষ্টোর এই "টম্‌কাকার কুটীর" এত প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল যে এই গ্রন্থ পড়ি নাই বলিলে লোকসমাজে হাস্যাস্পদ হইতে হইত। ইহা প্রকাশিত হইবার পর অনেক লোক ইহার সত্যতা সম্বন্ধে সন্দিগ্ধ হইয়া বলিয়াছিলেন ইহা ঔপন্যাসিক গল্প, গ্রন্থকর্ত্রীর স্বকপোলকল্পিত ঘটনা ব্যতীত আর কিছুই নহে। মনুষ্যের দ্বারা মনুষ্যের প্রতি এরূপ পিশাচতুল্য ব্যবহার হইতে পারে না। কিন্তু মিসেস্ ষ্টো ইহার প্রতিবাদ করিয়া, যে যে ঘটনা তাঁহার স্বচক্ষে দেখা এবং যে যে ঘটনা তাঁহার কোন আত্মীয় বা বিশ্বস্ত লোকের সমক্ষে ঘটিয়াছিল তাহাদের নাম প্রকাশিত করিয়া একখানি ক্ষুদ্র পুস্তক লিখিয়া জগতের নিকট "টমকাকার কুটীরের" সত্যতা আরও দৃঢ় করিয়া দিয়াছিলেন। বাস্তবিক এই পুস্তকে আফ্রিকাবাসীগণের প্রতি শ্বেতাঙ্গদিগের ঘোর পশুতুল্য ব্যবহার পড়িতে পড়িতে অশ্রু সংবরণ করা যায় না। টমকাকার কুটীরে কয়টি ঘটনাই বা বিবৃত করা হইয়াছে; চল্লিশ লক্ষ দাসের প্রতি তাহাদের পশুবৎ অধম প্রভুদিগের দ্বারা পৈশাচিক আরও কত অত্যাচার হইয়া গিয়াছে তাহার খোঁজ কে রাখিয়াছে। আমাদের বাঙ্গলা দেশে আসামে নীলকর, চা-করদিগের দ্বারা কুলীদিগের প্রতি অতি নিষ্ঠুর অত্যাচার যাঁহারা প্রত্যক্ষ করিয়াছেন তাঁহারা বুঝিতে পারিবেন শ্বেতাঙ্গেরা আপনাদের পকেট পূর্ণ করিবার জন্য কি কাজ না করিতে পারেন, খৃষ্টধর্ম্ম প্রচার করিতে আসিয়া তাহারা কিরূপ খৃষ্টধর্ম্মানুযায়ী কর্ম্ম সকল অনুষ্ঠান

করেন!

১৮৫৩ খৃষ্টাব্দে মিসেস ষ্টো তাঁহার স্বামী এবং ভ্রাতার সহিত ইংলণ্ডে গমন করেন। লণ্ডনে উপস্থিত হইলে ইংলণ্ডীয় ভদ্রগণের দ্বারা টমকাকার কুটীরের গ্রন্থকর্ত্রী অতিশয় সমাদৃত হইয়াছিলেন। ইংলণ্ড হইতে উঁহারা ইউরোপের প্রসিদ্ধ বড় বড় নগর সমুদয় পরিদর্শন করিয়া পরে পুনরায় গৃহে প্রত্যাগমন করেন। বাটীতে আসিয়া তিনি তাঁহার ভ্রমণ বৃত্তান্ত লিখিয়া প্রকাশ করেন। ইহা পড়িলে, তিনি কি প্রকার উচ্চ ভাবে ইউরোপে এবং ইংলণ্ডে সমাদৃত হইয়াছিলেন তাহা জানা যায়। ইহার পর তিনি টমকাকার কুটীরের ন্যায় দাসকাহিনী বিবৃত করিয়া 'ড্রেড' নামক আর একখানি পুস্তক লিখিয়া প্রকাশিত করেন। এই পুস্তকখানিও জগতে বড় অল্প সমাদর লাভ করে নাই। টমকাকার কুটীরের সমান না হউক ইহার ঠিক নিম্নস্থান অধিকার করিয়াছিল। হ্যারিয়েট ষ্টো বাল্যকাল হইতেই ক্রীত দাসগণের এই সমুদয় দুঃখের বিষয় দেখিয়া শুনিয়া এরূপ সুন্দরভাবে দুঃখের কাহিনী লিখিয়া গিয়াছেন যে তাঁহার লিখিত পুস্তক পড়িলে ঘটনাগুলি চক্ষের সম্মুখে ভাসিতেছে মনে হয়।

কর্ণহিল মাসিক পত্রের সম্পাদক থ্যাকারে মিসেস ষ্টোকে তাঁহার মাসিক পত্রে লিখিতে অনুরোধ করাতে "অ্যাগ্নেস অফ সরেণ্টো" নামক একখানি উপন্যাস ঐ পত্রে তিনি বাহির করেন। এই দাসব্যবসায় রহিত করিবার চেষ্টার জন্য আমেরিকায় ভীষণ অন্তর্বিদ্রোহাগ্নি প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠিয়াছিল। শ্রীমতী ষ্টো ইহার যে একটী প্রধান কারণ ছিলেন তাহার আর সন্দেহ নাই। ইহার পর তিনি "ইংলণ্ডীয় মহিলাগণের প্রতি পত্র" নামক একখানি পুস্তক লিখিয়াছিলেন ইহাতেও তিনি দাসগণের দুরবস্থার চিত্র অতি সুন্দর ভাবে চিত্রিত করিয়াছেন। তাঁহার এই পত্রের একস্থানে দেখিতে পাই:—

"সম্প্রতি এক যুদ্ধে একটি যোদ্ধা হত হইলেন, তিনি তাঁহার মাতার বহু সন্তানের মধ্যে মৃতের একমাত্র অবশিষ্ট জীবিত পুত্র ছিলেন। ঐ রমণী তাহার কোন এক দাসীর একাদশ পুত্রের সমস্তগুলি বিক্রয় করিয়া তাহাকে বৃদ্ধকালে অতিশয় কষ্ট প্রদান করেন, শেষ সন্তানটীকে তাহার নিকট রাখিবার জন্য দাসীর কত কাকুতি মিনতি অশ্রু কিছুই কর্ণপাত করেন নাই। প্রভুপুত্রের

মৃত্যু সংবাদ আসিলে ঐ দাসী তাহার মনিবকে আসিয়া বলিল "এখন আমরা সমান হইলাম, তুমি আমার প্রভু হইয়া আমার সমস্ত সন্তান বিক্রয় করিয়াছ এখন তোমার প্রভু তোমার সমস্ত সন্তান লইলেন। এখন আর আমাদের মৃত্যুর পর গোর দিবার কেহ নাই। এখন আমি তোমাকে মার্জ্জনা করিলাম।" ঐ পত্রের আর একস্থানে তিনি বলিয়াছেন "ইহা মনে রাখিয়ো, যে দাসব্যবসায়ের উন্নতি ইচ্ছা করা, আমাদের দক্ষিণ দেশীয় লোকদিগের পুত্র কন্যা ও বংশের উপর ভগবানের ঘোর অভিসম্পাত ইচ্ছা করা ব্যতীত আর কিছুই নহে। জানিও! যদি আমরা এই যুদ্ধে জয় লাভ করি তাহা হইলে এই সমুদয় দাসব্যবসায়ী এবং ঘোর দাসব্যবসায়ের পক্ষপাতী ব্যক্তিগণের বংশধরগণ আমাদিগকে দু হাত তুলিয়া আশীর্ব্বাদ করিবে। এবং আমরাও ইহাদের বংশধরদিগকে চির নরক হইতে উদ্ধার করিতে সমর্থ হইব।"

এই মহানুভবা মহিলা দাসদিগের পরিত্রাতা হইয়াই যেন জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। এত অর্থ, এত পরিশ্রম ও মহামূল্য সময় নষ্ট করিয়া দাসদিগের স্বপক্ষে লড়িয়া তাঁহার কি এত লাভের আকাঙ্ক্ষা ছিল! কিছুই না! কেবল মাত্র মনুষ্যের সঙ্গে মনুষ্য যে একটি সূক্ষ্ম সূত্রে গ্রথিত আছে তাহারই টানে নীগ্রোদিগের কাল রং সত্ত্বেও উহাদের দুঃখে তাঁহার প্রাণ কাঁদিত। এক মাতার বহু সন্তান হইলে যেমন কেহ বা কাল কেহ বা সুন্দর হয়, কিন্তু তাই বলিয়া কাল ভাই কি ভগ্নীকে সুন্দর ভাই কি ভগ্নী যেমন ঘৃণা করে না সেইরূপ জগন্মাতার অসংখ্য সন্তানের মধ্যে কত চেহারার কত প্রকার রূপের লোক দেখিতে পাওয়া যায়, তাই বলিয়া কাল কিম্বা সুশ্রীসম্পন্ন না হইলে ঘৃণা করা কখনই কর্ত্তব্য নহে। মিসেস ষ্টৌ এইরূপ উন্নত উদার প্রকৃতির মহিলা ছিলেন। দয়াপূর্ণ হৃদয় তিনি মনুষ্যসাধারণকে সমান চক্ষে দেখিতেন। যতকাল সূর্য্য উদয় হইবে, যতকাল দাসবংশের একটী লোকও জীবিত থাকিবে ততকাল মিসেস্ ষ্টৌর নাম জগতে জ্বলন্ত অক্ষরে লেখা থাকিবে, ততকাল তিনি লোকসমাজে পূজিত হইবেন।

শ্রীসুষমা দেবী।

কুচবেহার ও কামরূপ।

কুচবেহার পুরাকালে কামরূপ রাজ্যের অন্তঃর্গত ছিল। কুচবেহারের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব ছিল না। খৃঃ ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যভাগে কামরূপপতি নরনারায়ণ মল্লনারায়ণ তদীয় ভ্রাতা শুক্লধ্বজের সহিত কামরূপরাজ্য ভাগ করিয়া লন। শুক্লধ্বজ সাধারণত চিলা রায় নামে খ্যাত। শুক্লধ্বজ আসাম পাইলেন। ইহাতেই বুঝা যায় কুচবেহারের ইতিহাস কামরূপের ইতিহাসের সহিত সংযুক্ত। মহাভারত, রামায়ণ, পুরাণ ও তন্ত্রাদি গ্রন্থ এবং পুরাকালের ভারত পর্য্যটকদিগের বিবরণ ও মুসলমান ঐতিহাসিকদিগের লিখিত বৃত্তান্ত অবলম্বন করিয়া কামরূপের ইতিহাস বর্ণিত হইতেছে। বিষ্ণুপুরাণ ও মৎস্যপুরাণ প্রভৃতি পুরাণ গ্রন্থে ভারতবর্ষের সমগ্র পূর্ব্বাংশ কামরূপ বা কামরূপা নামে উল্লিখিত হইয়াছে। * এখন কামরূপ আসাম (অসমদেশ) কে বুঝায়।

প্রাগজ্যোতিষ কামরূপের প্রাচীন নাম। † মহাভারত ও রামায়ণে কামরূপ প্রাগ্‌জ্যোতিষ ও তদধিপতি প্রাগজ্যোতিষেশ্বর নামেই উল্লিখিত আছে। কামরূপ নাম অপেক্ষাকৃত আধুনিক—তন্ত্রে ও অপেক্ষাকৃত আধুনিক পুরাণেই এই নামের প্রথম উল্লেখ দেখা যায়। প্রাগ্‌জ্যোতিষ, কামরূপ অপেক্ষা অনেক ক্ষুদ্র ছিল। শোণিতপুর, জৈয়ন্ত ও কাছারাদি প্রাচীন দেশ সকল প্রাগ্‌জ্যোতিষের অঙ্গীভূত হইবার পর কামরূপ আখ্যা প্রাপ্ত হয়। শোণিতপুর রাজা বাণের রাজ্য ছিল। শ্রীকৃষ্ণের প্রপৌত্র অনিরুদ্ধ বাণরাজার কন্যা ঊষাকে হরণ করিয়া লইয়া যান।

"অনিরুদ্ধো রণেরুদ্ধো বলেঃ পৌত্রীং মহাবলঃ।
বাণস্য তনয়ামূষা মুপযেমে দ্বিজোত্তম॥
যত্র যুদ্ধমভূদ্ঘোরং হরিশঙ্করয়োর্ম্মহান্।
ছিন্নং সহস্রং বাহূনাং যত্র বাণস্য চক্রিণা॥ (বিষ্ণুপুরাণ।)

---

* বিষ্ণুপুরাণ অধ্যায় ১, শ্লোক ১—১৫; মৎস্যপুরাণ ১১৪ অধ্যায়, শ্লোক ৪৫।
† হেমচন্দ্র কোষ দেখ।

ভৈরবী নদীর উপর যে রুদ্রেশ্বরের ও বুড়ীগঙ্গার উপর যে শিবের মন্দির
আছে তাহা বাণরাজা কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হইয়াছিল বলিয়া কথিত আছে।

জৈয়ন্তপুরের রাজারা বভ্রবাহন হইতে উদ্ভূত। বভ্রবাহন চিত্রাঙ্গদাও অর্জ্জু-
নের পুত্র। চিত্রাঙ্গদা মণিপুর রাজার কন্যা। ব্রহ্মপুত্রের দক্ষিণকূলে হিড়িম্ব-
দেশ বা কাছার। এইস্থানে ঘটোৎকোচ রাজা ছিলেন। তিনি ভীম ও
হিড়িম্বার পুত্র ছিলেন। ঘটোৎকচের নামের শেষাংশ 'কচ' হইতে কাছারের
নাম হইয়াছে। * বিধর্ভ নগর আসামের সদীয়া নামক দেশের সন্নিধানে
ছিল। তত্রত্য রাজার কন্যা রুক্মিণী ছিলেন। শিশুপালের সহিত যাহাতে
না বিবাহ হয় এই ভয়ে শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে হরণ করিয়া লইয়া যান।

সমগ্র কামরূপ পবিত্র বলিয়া গণ্য। পুরাকালে কামরূপ চারটি "পীঠে"
বিভক্ত ছিল—(১) কামপীঠ (২) রত্নপীঠ (৩) সুবর্ণপীঠ ও (৪) সৌমারপীঠ
কুচবিহার রত্নপীঠ ও কামাপীঠের অংশবিশেষ ছিল।

কামরূপের প্রথম রাজা একজন দানব ছিল। আর্য্যেরা অনার্য্যদিগের
প্রতি দানব রাক্ষস যক্ষ কিরাৎ পিশাচ অসুর প্রভৃতি শব্দ প্রয়োগ করিতেন।
এই দানব রাজার নাম মহীদানব ছিল। ইহার বংশের আরো তিনপুরুষ
কামরূপের রাজা ছিলেন। এই বংশের শেষ রাজার নাম রত্নাসুর ছিল।

রত্নাসুর দানবের পর প্রাগজ্যোতিষপুর অর্থাৎ কামরূপ ঘটক নামক
জনৈক কিরাৎ কর্ত্তৃক অধিকৃত হয়। তিনি নরক নামক অসুর কর্ত্তৃক যুদ্ধে
পরাজিত ও নিহত হন।

নরক প্রাগজ্যোতিষ বা কামরূপের রাজা হন। পৃথিবীর গর্ভে ও বিষ্ণুর
ঔরসে নরক রাজার জন্ম। নরক পৃথিবীকে বর দিয়াছিলেন যে, তাহার গর্ভ-
জাত পুত্র কামরূপের রাজা হইবে। এই বর অনুযায়ী নরক ঘটক কিরাৎকে
হত্যা করিয়া রাজা হইতে পারিয়াছিলেন। নরক বিদর্ভপতির কন্যা মায়া-
দেবীকে বিবাহ করেন।

বিষ্ণু নরককে কামাখ্যা দেবীর মন্দিরের সেবায় নিযুক্ত করেন। তিনি
তাঁহাকে বর দিয়াছিলেন যে, যতকাল তিনি কামাখ্যা দেবীকে সন্তুষ্ট রাখিবেন
ততকাল তিনি অমর থাকিবেন ও তাঁহার সমৃদ্ধি থাকিবে। তিনি অসুররাজ

* গুণাভিরাম বরুয়ার "আসাম বুরঞ্জি" অধ্যায় ১১, পৃষ্ঠা ৭।

বাণের বিমাতা নামক এক ব্যক্তি ব্রহ্মপুত্রনদীর দক্ষিণকূলে রাজ্যস্থাপন করেন।
না। নরকার ও জয়ন্তী সংসর্গে পড়িয়া দেঁাহার রাজ্যের অন্তর্ভূক্ত করদ রাজ্য
তিনি কামাখ্যা দেবীর পূজা বন্ধ করিলেন
করিতে আসিলে তিনি তাঁহার প্রতি অবজ্ঞারাজা হন। তিনি একটী অসাধারণ
দেন নাই। মুনি নরককে শাপ দিলেন। কার যুদ্ধ হয়। কাছাররাজ তাঁহার
রাষ্ট্রমধ্যে বিদ্রোহাদি নানা অলক্ষণের সূত্রপাত হরিলেন। কাচার রাজকুমারী
ব্রহ্মার স্মরণাপন্ন হইতে বলিলেন। সদাশিব ব্রহ্মা স তাঁহার যুদ্ধ হয়। কপিলী
পূর্ব্ববৎ করিয়া দিলেন। বাণের উপদেশে তিনি বিরক্তান্বিত কলেবর হইয়া
হইলেন ও দেবতাদিগের সহিত যুদ্ধ আরম্ভ করিলেন। যান। কাছারীরা
ভীরুপাক্ষ ও মুরু এই চারিটি পরাক্রান্ত অসুর সৈন্যাধ্যক্ষ তাঁহ
পূর্ব্ব পশ্চিম দক্ষিণ রক্ষা করিতেন। তিনি হয়গ্রীবের সাহায্যে নাকি তাঁহার
করিলেন ও তাঁহার রাজছত্র ও হইতে কুণ্ডলদ্বয় কাড়িয়াক্ষণ করেন না।
এতদ্ব্যতীত এক শত আট হাজার দেব ও গন্ধর্ব্ব কুমারী হিমাই শত বৎসর
হরণ করিয়া আনিলেন। শ্রীকৃষ্ণ নরককে যুদ্ধে পরাজয় ও বধ মৃগাঙ্ককে
ইন্দ্রের রাজছত্র ও অদ্বিতীয় কুণ্ডলদ্বয় উদ্ধার করেন ও হৃত কুমারীকে রাজ্য
মোচন করেন। পৃথিবী দেবীর অনুরোধে শ্রীকৃষ্ণও নরকের জ্যেষ্ঠপু
দত্তকে কামরূপের সিংহাসনে বসাইলেন। ক জাতি

নরকের চারিটি পুত্র ছিল—(১) ভগদত্ত (২) মদহর্ষে (৩) মদবন ও বলিয়া
সুমালি। ভগদত্তের রাজত্বকালে অর্জ্জুন কামরূপ আক্রমণ করেন। য়াদিগের
অসংখ্য চীন ও কিরাৎ সৈন্য লইয়া তাঁহার সহিত যুদ্ধ করেন কিন্তু
হন। ভগদত্ত দ্রৌপদীর হস্তের জন্য পাণ্ডবদিগের প্রতিদ্বন্দ্বী বোত্তর দিকে
পাণ্ডবদিগের হস্তে লাঞ্ছনা ভোগ করেন। তিনি তাহার কন্যা ভা হইয়াছে।
দুর্য্যোধনকে দিয়া তাঁহার সঙ্গে সন্ধি স্থাপন করিয়াছিলেন এবং কুরুপাণ্ডভ্রংশ।
কৌরবদিগের পক্ষে অসমসাহসিকতার সহিত যুদ্ধ করেন। তিনি শেষে অ ইহাঁর
কর্ত্তৃক নিহত হন। ভগদত্ত কামাখ্যা দেবীর ভক্ত ছিলেন। তিনি কামাখ্যা
দেবীর দত্ত একটী "শক্তি কবচ" ধারণ করিতেন। এই কবচের বলে তিনি
জয়ী হইতেন। কুরুপাণ্ডব যুদ্ধে কবচযুক্ত হস্ত ছিন্ন হয় ও একটী চিল এই হস্ত
লইয়া কামরূপের একটী শালবৃক্ষে বসে। এই কবচ কুচবেহারের অন্তর্গত

ভৈরবী নদীর উপর যে রুদ্রেশ্বরের ও বুড়ীগঙ্গার উপর যে শিবের মন্দির
ছে।
আছে তাহা বাণরাজা কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হ লিয়া কথিত আছে।
ন্তস্ত। শ্রীহরিবা, দিত্র ও অর্জ্জু-
জৈয়ন্তপুরের রাজারা বভ্রবাহন হ
রাজা হন। প্রালম্ভর দুই স্ত্রী ছিল
নের পুত্র। চিত্রাঙ্গদা মণিপুর রাজ ড়িম্ব-
রোর ও তারার গর্ভে বনমালার জন্ম
দেশ বা কাছার। এইস্থানে ঘ
লেন—তিনি সমুদ্রতীর পর্য্যন্ত রাজ্য বিস্তা
হিড়িম্বার পুত্র ছিলেন। ঘটে
র্ম্মণ" উপাধি ধারণ করিয়াছিলেন। বনমালা খৃঃ
নাম হইয়াছে। * বিধর্ভ
করিয়াছিলেন। নরক বা ভগদত্তের বংশের ভাস্কর
ছিল। তত্রত্য রাজার
রাজা বর্ম্মা উপাধি ধারণ করিয়া রাজা হইয়াছিলেন।
না বিবাহ হয় এই ভ
লিয়া পরিচিত ছিলেন। ৬৩৯ খৃষ্টাব্দে যখন ভিউ-এন্ সাঙ্গ
সমগ্র কামরূপ
করেন তখন ভাস্কর কামরূপের রাজা ছিলেন। ভাস্কর বর্ম্মা
বিভক্ত ছিল—(১
নরপতি হর্ষবর্দ্ধন শিলাদিত্যের করদ রাজা ছিলেন। ভাস্কর বর্ম্মার
কুচবিহার রত্নপী
ন কুচবেহার (তখন কুচবেহারের নাম হয় নাই), আসাম ও ভুটান
কামরূপে
অন্তর্গত ছিল। কুচবেহারের অন্তর্গত কামাতপুরে কামরূপের
প্রতি দানব
ছিল। নরক বংশীয় সুবাহু ও সুপারু কামরূপের রাজা হন।
এই দানব
হমালয়ে যোগী হইয়া যান—সুপারুকে তাঁহার মন্ত্রী বিনাশ করেন।
কামরূপে
বোক্ত রাজাদিগের সময় বৌদ্ধদিগের ধর্ম্মবিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে কামরূপে
রত্না
প্রজার মনান্তর হয় এবং লোকসকল বৌদ্ধ হইতে আরম্ভ হয়। এই
জনৈক
রে কামরূপের ভিন্ন:ভিন্ন অংশে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজার আবির্ভাব হয়।
পরাজি
৭৮ অব্দে দেবেশ্বর নামক জনৈক শূদ্র ধীবর কামরূপের রাজা হন।
নরব
কামখ্যার ভক্ত ছিলেন এবং কামরূপ হইতে বৌদ্ধধর্ম্ম বিলুপ্ত করিয়া-
ঔরসে নর
বৌদ্ধগণ কামাখ্যার মন্দির ক্ষতিগ্রস্ত করিয়াছিল, দেবেশ্বর সেই
জাত পুত্র ব
পুনরায় সংস্কার করনে।
হত্যা কি

কামরূপের ক্ষত্রীয় রাজা।

দেবীকে
৩৭৮ খৃষ্টাব্দে নাগশঙ্কর নামক জনৈক ক্ষত্রীয় কামরূপের রাজা হন। ইনি
বি
আপনাকে খরতোয়া নদীর পুত্র বলিয়া পরিচয় দিতেন। প্রতাপ গড়ে তাঁহার রাজধানী ছিল। নাগেশ্বর মন্দির এই রাজা কর্ত্তৃক স্থাপিত হয়। এই বংশ খৃঃ অষ্টম শতাব্দীর শেষ ভাগ পর্য্যন্ত ৪০০ বৎসর যাবৎ কামরূপে রাজত্ব করিয়াছিলেন। এই বংশের একটী রাজকুমারীর অবৈধ গর্ভজাত আরিমাও

বা আরিমাতা নামক এক ব্যক্তি ব্রহ্মপুত্রনদীর দক্ষিণকূলে রাজ্যস্থাপন করেন। তিনি কাছার ও জয়ন্তী রাজ্যকেও তাঁহার রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করদ রাজ্য করিয়াছিলেন।

আরিমাওর পর তৎপুত্র জঙ্গল বলাহু রাজা হন। তিনি একটী অসাধারণ যোদ্ধা ছিলেন। কাছারের রাজার সঙ্গে তাঁহার যুদ্ধ হয়। কাছাররাজ তাঁহার সহিত তাঁহার কন্যার বিবাহ দিয়া সন্ধি স্থাপন করিলেন। কাচার রাজকুমারী বিশ্বাসঘাতকতা করায় পুনরায় কাছাররাজের সহিত তাঁহার যুদ্ধ হয়। কপিলী নদীর তীরে যুদ্ধ হয়—জঙ্গলবলাহু পরাজিত হন। রক্তান্বিত কলেবর হইয়া যুদ্ধক্ষেত্র হইতে পলায়ন করিতে গিয়া নদীতে ডুবিয়া যান। কাছারীরা তাঁহার রাজ্য অধিকার করে।

আরিমাত্ত নাম আরি মৎস্য হইতে হইয়াছে। এই মৎস্য নাকি তাঁহার আদিপুরুষ ছিলেন। এই কারণে তদ্বংশীয়রা এই মৎস্য ভক্ষণ করেন না। এই বংশের চারিটি রাজা— মীনাঙ্ক, পজাঙ্ক, শিবাঙ্ক ও মৃগাঙ্ক দুই শত বৎসর কাল কামরূপের লোহিত্যপুরে রাজত্ব করিয়াছিলেন। কেহ কেহ মৃগাঙ্ককে আরি মাতার প্রপৌত্র বলে। তিনি জয়সিংহ নামক একটী ব্রাহ্মণকে রাজ্য দান করিয়াছিলেন।

কামরূপের এই প্রতাপগড়ের রাজবংশের শেষে চুটিয়া নামক এক জাতি উত্তর কামরূপে পরাক্রান্ত হয়। চুটিয়াদিগের রাজা কুবেরের বংশীয় বলিয়া কথিত ছিল। উত্তরকোল বা ব্রহ্মপুত্রের উত্তরোপত্যকা ভূমি চুটিয়াদিগের রাজ্যের অন্তর্গত ছিল।

কামরূপের অহং জাতিরা পরাক্রান্ত হইয়া চুটিয়াদিগকে পূর্ব্বোত্তর দিকে বিতাড়িত করয়িাছিল। অহংদিগের নাম হইতে আসাম নাম হইয়াছে। কাহারও মতে, আসাম অসমতল বলিয়া 'আসাম' 'অসম' শব্দের অপভ্রংশ।

একটী ক্ষত্রীয় সন্ন্যাসী দক্ষিণ কামরূপে একটি রাজ্য স্থাপন করেন। ইহাঁর পরে এই বংশের ৮টি রাজা কামরূপে রাজত্ব করেন—প্রথমটীর নাম সুবলী শেষেরটীর নাম রামচন্দ্র।

পরে পালরাজারা কামরূপে রাজত্ব করে। কাহারও মতে ইহারা বঙ্গ-দেশের পালবংশের শাখাবিশেষ। এই বংশের প্রবর্ত্তকের নাম ধর্ম্মপাল

ভৈরবী নদীর উপর যে রুদ্রেশ্বরের ও বুড়ীগঙ্গার উপর যে শিবের মন্দির
আছে তাহা বাণরাজা কর্তৃক নির্ম্মিত হ ছে। লিয়া কথিত আছে।
স্তম্ভ। শ্রীহরিবং বিত্র ও অর্জ্জু-
জৈয়ন্তপুরের রাজারা বভ্রবাহন হ রাজা হন। প্রালম্ভর দুই স্ত্রী ছিল
নের পুত্র। চিত্রাঙ্গদা মণিপুর রাজ ডিম্ব-
রোর ও তাহার গর্ভে বনমালার জন্ম
দেশ বা কাছার। এইস্থানে ঘ লেন—তিনি সমুদ্রতীর পর্য্যন্ত রাজ্য বিস্তা
হিড়িম্বার পুত্র ছিলেন। ঘটে
র্মণ" উপাধি ধারণ করিয়াছিলেন। বনমালা খৃঃ
নাম হইয়াছে। * বিধর্ত করিয়াছিলেন। নরক বা ভগদত্তের বংশের ভাস্কর
ছিল। তত্রত্য রাজার রাজা বর্ম্মা উপাধি ধারণ করিয়া রাজা হইয়াছিলেন।
না বিবাহ হয় এই ভ লিয়া পরিচিত ছিলেন। ৬৩৯ খৃষ্টাব্দে যখন তিউ-এন্ সাঙ্গ
সমগ্র কামরূপ করেন তখন ভাস্কর কামরূপের রাজা ছিলেন। ভাস্কর বর্ম্মা
বিভক্ত ছিল—(১ নরপতি হর্ষবর্দ্ধন শিলাদিত্যের করদ রাজা ছিলেন। ভাস্কর বর্ম্মার
কুচবিহার রঙ্গপী ন কুচবেহার (তখন কুচবেহারের নাম হয় নাই), আসাম ও ভুটান
কামরূপে অন্তর্গত ছিল। কুচবেহারের অন্তর্গত কামাভপুরে কামরূপের
প্রতি দানব ছিল। নরক বংশীয় সুবাহু ও সুপারু কামরূপের রাজা হন।
এই দানব হমালয়ে যোগী হইয়া যান—সুপারুকে তাঁহার মন্ত্রী বিনাশ করেন।
কামরূপে বৌদ্ধ রাজাদিগের সময় বৌদ্ধদিগের ধর্ম্মবিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে কামরূপে
রত্না প্রজার মনান্তর হয় এবং লোকসকল বৌদ্ধ হইতে আরম্ভ হয়। এই
জনৈক রে কামরূপের ভিন্ন:ভিন্ন অংশে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজার আবির্ভাব হয়।
পরাজি ৭৮ অব্দে দেবেশ্বর নামক জনৈক শূদ্র ধীবর কামরূপের রাজা হন।
নরব কামখ্যার ভক্ত ছিলেন এবং কামরূপ হইতে বৌদ্ধধর্ম্ম বিলুপ্ত করিয়া-
ঔরসে নর বৌদ্ধগণ কামাখ্যার মন্দির ক্ষতিগ্রস্ত করিয়াছিল, দেবেশ্বর সেই
জাত পুত্র ব পুনরায় সংস্কার করনে।
হত্যা কি

কামরূপের ক্ষত্রীয় রাজা।

দেবীকে
৩৭৮ খৃষ্টাব্দে নাগশঙ্কর নামক জনৈক ক্ষত্রীয় কামরূপের রাজা হন। ইনি আপনাকে করতোয়া নদীর পুত্র বলিয়া পরিচয় দিতেন। প্রতাপ গড়ে তাঁহার রাজধানী ছিল। নাগেশ্বর মন্দির এই রাজা কর্তৃক স্থাপিত হয়। এই বংশ খৃঃ অষ্টম শতাব্দীর শেষ ভাগ পর্য্যন্ত ৪০০ বৎসর যাবৎ কামরূপে রাজত্ব করিয়াছিলেন। এই বংশের একটী রাজকুমারীর অবৈধ গর্ভজাত আরিমাও

বা আরিমাতা নামক এক ব্যক্তি ব্রহ্মপুত্রনদীর দক্ষিণকূলে রাজ্যস্থাপন করেন। তিনি কাছার ও জয়ন্তী রাজ্যকেও তাঁহার রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করদ রাজ্য করিয়াছিলেন।

আরিমাওর পর তদ্‌পুত্র জঙ্গল বলাহু রাজা হন। তিনি একটী অসাধারণ যোদ্ধা ছিলেন। কাছারের রাজার সঙ্গে তাঁহার যুদ্ধ হয়। কাছাররাজ তাঁহার সহিত তাঁহার কন্যার বিবাহ দিয়া সন্ধি স্থাপন করিলেন। কাচার রাজকুমারী বিশ্বাসঘাতকতা করায় পুনরায় কাছাররাজের সহিত তাঁহার যুদ্ধ হয়। কপিলী নদীর তীরে যুদ্ধ হয়—জঙ্গলবলাহু পরাজিত হন। রক্তান্বিত কলেবর হইয়া যুদ্ধক্ষেত্র হইতে পলায়ন করিতে গিয়া নদীতে ডুবিয়া যান। কাছারীরা তাঁহার রাজ্য অধিকার করে।

আরিমাত্ত নাম আরি মৎস্য হইতে হইয়াছে। এই মৎস্য নাকি তাঁহার আদিপুরুষ ছিলেন। এই কারণে তদ্বংশীয়রা এই মৎস্য ভক্ষণ করেন না। এই বংশের চারিটি রাজা— মীনাঙ্ক, পজাঙ্ক, শিবাঙ্ক ও মৃগাঙ্ক দুই শত বৎসর কাল কামরূপের লোহিত্যপুরে রাজত্ব করিয়াছিলেন। কেহ কেহ মৃগাঙ্ককে আরি মাতার প্রপৌত্র বলে। তিনি জয়সিংহ নামক একটী ব্রাহ্মণকে রাজ্য দান করিয়াছিলেন।

কামরূপের এই প্রতাপগড়ের রাজবংশের শেষে চুটিয়া নামক এক জাতি উত্তর কামরূপে পরাক্রান্ত হয়। চুটিয়াদিগের রাজা কুবেরের বংশীয় বলিয়া কথিত ছিল। উত্তরকোল বা ব্রহ্মপুত্রের উত্তরোপত্যকা ভূমি চুটিয়াদিগের রাজ্যের অন্তর্গত ছিল।

কামরূপের অহং জাতিরা পরাক্রান্ত হইয়া চুটিয়াদিগকে পূর্ব্বোত্তর দিকে বিতাড়িত করয়িাছিল। অহংদিগের নাম হইতে আসাম নাম হইয়াছে। কাহারও মতে, আসাম অসমতল বলিয়া 'আসাম' 'অসম' শব্দের অপভ্রংশ।

একটী ক্ষত্রীয় সন্ন্যাসী দক্ষিণ কামরূপে একটি রাজ্য স্থাপন করেন। ইহাঁর পরে এই বংশের ৮টি রাজা কামরূপে রাজত্ব করেন—প্রথমটীর নাম সুবলী শেষেরটীর নাম রামচন্দ্র।

পরে পালরাজারা কামরূপে রাজত্ব করে। কাহারও মতে ইহারা বঙ্গদেশের পালবংশের শাখাবিশেষ। এই বংশের প্রবর্ত্তকের নাম ধর্ম্মপাল

ছিল। আসামের তেজপুর পর্য্যন্ত তাঁহার রাজ্য বিস্তৃত ছিল। ধর্ম্মপালের এক ভাই ছিলেন মাণিক চন্দ্র। তিনি পূর্ব্বেই গতায়ু হইয়াছিলেন। তিনি তাঁহার বিষয় ও তাঁহার নাবালক পুত্র গোপিচন্দ্রের তত্ত্বাবধারণের কার্য্য তাঁহার স্ত্রী ময়নামতীর হস্তে ন্যস্ত করিয়া গিয়াছিলেন। তিনি তাঁহার পুত্রকে রাজা করিয়া পরে ধর্ম্মপালের বিরুদ্ধে যুদ্ধ আরম্ভ করিলেন। ধর্ম্মপাল পরাজিত হইয়া নিরুদ্দেশ হইয়া গেলেন। গোপি চন্দ্র রাজা হইলেন। যৌবনে তিনি অত্যন্ত পাপাসক্ত ছিলেন। পরে চৈতন্য হইলে তিনি সন্ন্যাস ব্রত অবলম্বন করেন। তাঁহার মাতার গুরু হরিপা তাঁহার চরিত্র সংশোধন করেন।

গোপি চন্দ্রের পুত্র একটী আকাট মূর্খ ছিল—ইহার নাম ভবচন্দ্র ছিল। তাঁহার মন্ত্রী তাঁহার চেয়ে এক কাটি মূর্খ ছিল—ইহার নাম গবচন্দ্র ছিল। "হবচন্দ্র রাজা গবচন্দ্র নন্ত্রী" প্রবাদরূপে পরিণত হইয়াছে। ভবচন্দ্র খুব জাঁকজমকে থাকিত। পালবংশের শেষ রাজার নাম পলা রাজা ছিল। ক্ষেন বংশের প্রথম রাজা কর্ত্তৃক তিনি পরাজিত হন এবং তাহার বংশ বিলুপ্ত হয়। পালরাজাদিগের রাজত্ব কালে রঙ্গপুর কামরূপের অন্তর্ভূত ছিল।

সম্ভবতঃ "পাল" বংশের শেষ রাজার উত্তরাধিকারী কেহ ছিল না। তাঁহার মৃত্যুর পর ব্রহ্মপুত্রের উত্তরাংশে কামরূপে এক প্রকার অরাজকতা আরম্ভ হইয়াছিল। কোচ, মেচ, গারো, কাচারী ও ভূটিয়া জাতিরা উপদ্রব করিতে লাগিল। এই সময়ে একটী কৃষক বালক ঘটনাক্রমে বা অতুল প্রতিভাবলে কামরূপের রাজা হন। ইহার নাম কান্তনাথ ছিল, ও ইহার পিতার নাম ভক্তেশ্বর ও মাতার নাম অঙ্গনা ছিল। কান্তনাথ, যখন পাঁচ বৎসরের তখন তাঁহার পিতার মৃত্যু হয়। তিনি ও তাঁহার জননী নিঃসম্বল ও অনাথ হইলেন। এই অবস্থায় তাঁহার মাতা অঙ্গনা পুত্রের সহিত জনৈক ব্রাহ্মণের নিকট কর্ম্ম গ্রহণ করিল। পুত্রটী ব্রাহ্মণের গরু চরাইত। কান্তনাথের অনবধান বশত ব্রাহ্মণের গরু তাঁহার প্রতিবেশীদিগের ক্ষেত্রের শস্য নষ্ট করিতে লাগিল। তাহারা ব্রাহ্মণের নিকট আবেদন করিল। একদিন চুপিচুপি কান্তনাথ গরু চরাইতেছে কি খেলিতেছে দেখিবার জন্য মাঠে গেল। তিনি দেখিলেন কান্তনাথ মাঠের মধ্যে ঘুমাইতেছে আর একটী ভীমাকার কালসর্প তাহার মস্তকের উপর চক্রবিস্তার পূর্ব্বক ছায়া দান করিতেছে। এতদ্দর্শনে ব্রাহ্মণ

তাঁহার হস্ত পদাদির রেখা সকল নিরীক্ষণ করিলেন—তাহাতে রাজচক্রবর্ত্তীর চিহ্নসকল বর্ত্তমান ছিল। তিনি তাঁহাকে না জাগাইয়া গৃহে ফিরিলেন। পরদিন হইতে তিনি তাঁহাকে গোসেবা হইতে অব্যাহতি দিলেন। কিন্তু তাঁহার নিকট হইতে এই প্রতিজ্ঞা করাইয়া লইলেন যে, যদি কখন তিনি রাজা হন তাহা হইলে তিনি ওই ব্রাহ্মণটিকে তাঁহার গুরু করিবেন। পরে প্রতিভাবলে কান্তনাথ কামরূপের রাজা হইলেন—কথানুযায়ী ব্রাহ্মণটিকে তাঁহার গুরু করিলেন। কান্তনাথ কামরূপের 'খেন' রাজবংশের প্রথম রাজা বা প্রবর্ত্তক ছিলেন। কান্তনাথ নীলধ্বজ নাম ধারণ করিয়া কামরূপের সিংহাসনে অধিরোহণ করেন। তিনি কুচবেহারের কামতপুরে কামতেশ্বরীর মন্দির স্থাপন করেন। তদীয় বংশের রাজাগণ "কান্তেশ্বর" বা "কামতেশ্বর" উপাধি ধারণ করিতেন।

নীলধ্বজের মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র চক্রধ্বজ কামরূপের রাজা হন। এই 'খেন' বংশের রাজত্বকালে গোঁশানী মারির মন্দির আবিষ্কৃত হয়। রাজা ভগদত্ত কুরুক্ষেত্রযুদ্ধে অর্জ্জুনকর্ত্তৃক নিহত হন। তিনি হস্তে শক্তিকবচ ধারণ করিতেন। যখন অর্জ্জুন তাঁহার কবচযুক্ত হস্ত খণ্ডিত করিয়াছিলেন, সেই সময়ে একটী চিল্ সেই হস্ত হইয়া কামরূপে ফটিককুণ্ড নামক হ্রদের উপর একটী শিমুল বৃক্ষের উপর বসিয়াছিল। এখানে হস্তটি পড়িয়া মাটির ভিতর অন্তর্ধান হইয়া যায়। একটি মেচুণী এই শিমুল বৃক্ষের তলা খুঁড়িতে খুঁড়িতে হস্তসমেত কবচ পাইল। রাজা কামতেশ্বরীর মন্দীরের ভিতর এই কবচ স্থাপন করিলেন।

চক্রধ্বজের পর তাঁহার পুত্র নীলাম্বর কামরূপের রাজা হন। তিনি 'খেন' বংশের শেষ রাজা। তাহার রাজত্ব রঙ্গপুর ও কুচবেহার (তখন নাম হয় নাই) পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। তাঁহার রাজত্বকালে প্রজাদিগের মধ্যে কেহ দরিদ্র ছিল না।

রাজা নীলাম্বরের মৃত্যু অত্যন্ত শোচনীয়। তাঁহার পাঁচটী রাণী ছিল। ছোট রাণীটিকেই তিনি অত্যন্ত ভালবাসিতেন। তাঁহার নাম রনমালা ছিল। শশীপাত্র নামক একব্যক্তি তাঁহার মন্ত্রী ছিল। তাঁহার পুত্র মনোহরের সহিত ছোট রাণীর অবৈধ সম্বন্ধ ছিল। এই ঘটনা রাজা জানিতে পারিয়া ক্রোধান্ধ

হইয়া মনোহরকে কাটিয়া তাহার মাংস ছোট রাণীকে স্বহস্তে রন্ধন করাইয়া মন্ত্রীকে নিমন্ত্রণ করিলেন। মন্ত্রী সমস্ত অবগত হইয়া রাত্রিযোগে পলাইয়া বঙ্গেশ্বর হোসেন শাহার নিকট গেলেন এবং এক দল মুসলমান সেনা লইয়া কামাতপুর আক্রমণ করিলেন। বার বৎসর ধরিয়া যুদ্ধ চলে—পরে বিশ্বাস-ঘাতকতার দ্বারা কামাতপুর মুসলমানেরা অধিকার করিল। হোসেম শাহ নিরুপায় হইয়া নীলাম্বরের নিকট এই মর্ম্মে দূত প্রেরণ করিলেন—"আমি কামাতপুর লইবার আশা পরিত্যাগ করিয়াছি। এক্ষণে আপনার সহিত সন্ধিস্থাপন পূর্ব্বক স্বরাজ্যে গমন করিতে ইচ্ছুক। আমাদের বেগমেরা আপনাদিগের রাণীদিগের সহিত দর্শনলাভ করিতে উৎসুক হইয়াছে। তাঁহারা আপনার অনুমতি অপেক্ষা করিতেছে।" সরলপ্রকৃতি রাজা অনুমতি প্রদান করিলেন। এই অনুমতি পাইয়া বঙ্গেশ্বর কতিপয় নারীবেশধারী সৈনিক পুরুষ লইয়া পালকী করিয়া কামতপুরের ভিতর প্রবেশ করিলেন এবং কামত পুর অধিকার করিয়া লইলেন।

কামতপুর লইয়া হোসেন শাহ নীলাম্বরের অন্দরমহলাভিমুখে গমন করিলেন—রাণীরা ও অন্যান্য রাজপরিবারবর্গেরা আত্মহত্যা পূর্ব্বক মুসলমানদিগের হস্ত হইতে আত্মরক্ষা করিলেন। নীলাম্বরকে ধৃত করিয়া একটি লৌহপিঞ্জরের মধ্যে লইয়া মুসলমানেরা গৌড়াভিমুখে যাত্রা করিল। পথিমধ্যে তাঁহার শিরশ্ছেদনের আজ্ঞা হইল। তিনি মুহূর্ত্তের জন্য পিতৃতর্পণাদি করিবার জন্য মৃত্যু হইতে অব্যাহতি পাইলেন। "কজলীকুণ্ডে"র নিকট হোসেন শাহ পিঞ্জর হইতে তাঁহাকে স্নানতর্পণাদি করিবার জন্য বাহির করিয়া দিলেন। নীলাম্বর জলেতে ডুব দিলেন—আর উঠিলেন না। মুসলমানেরা ভাবিলেন তাঁহাকে কুমিরে ধরিয়া লইয়া গিয়াছে। মুর্সলমানরা শিকার পাইয়াছে বলিয়া ক্রোধে কামতপুরের দেবদেবীর মন্দির ভগ্ন করিয়া ও মন্ত্রী শশিপাত্রকে হত্যা পূর্ব্বক নগর লুণ্ঠন করিয়া গৌড় প্রত্যাগমন করিল। ১৪৯৮ খৃষ্টাব্দে এই ঘটনা ঘটে। যেস্থলে পিঞ্জর শূন্য রাখা ছিল সেই স্থানের নাম "পিঞ্জবারির ঝার"। হিন্দুদিগের বিশ্বাস স্বয়ং চণ্ডী নীলাম্বরকে আশ্রয় দিয়াছিলেন—তাঁহাকে কুমিরে খায় নাই।

মোসেন শাহ তদীয় পুত্রকে নীলাম্বরের রাজ্যের শাসন কর্ত্তা নিযুক্ত

করিলেন এবং তাহাকে আরো পূর্ব্বাঞ্চলের দেশসকল জয় করিতে আদেশ দিয়া বঙ্গে ফিরিলেন। দুর্ভাগ্যক্রমে মুসলমানেরা কামরূপে অহম্‌দিগের দেশ আক্রমণ করিল। অহম্‌রা গৃহ পরিত্যাগ করিয়া পর্ব্বতে আশ্রয় গ্রহণ করিল পরে যখন বর্ষাকালে পথ্‌ঘাটে চলাচল অসম্ভব হইল তখন অহম্‌রাজ দলবলসহ পাহাড় হইতে নামিলেন এবং মুসলমানদিগের খাদ্যসামগ্রী বন্ধ করিয়া দিলেন। অগত্যা হোসেন পুত্র অর্দ্ধেক সৈন্য হারাইয়া লাঞ্ছনা ভোগ করিয়া নম্রতা সহকারে সন্ধি স্থাপন করিয়া ঘরের ছেলে ঘরে পলায়ন করিলেন। অহংকর্ত্তৃক মুসলমানেরা কামরূপ হইতে বিতাড়িত হইলে ব্রহ্মপুত্রের পশ্চিমাংশে একপ্রকার অরাজকতা উপস্থিত হইল। এই সময়ে "ভূইয়া" উপাধিধারণ পূর্ব্বক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজা উত্থিত হয়। এই সকল "ভূইয়া" রাজাদিগের মধ্যে হজো নামে এক কোচ ছিল। কথিত আছে তাহার হীরা নামক কন্যার গর্ভে মহাদেবের ঔরসে বিশ্বসিংহ নামক এক পুত্র জন্মগ্রহণ করে। এই পুত্রই কামরূপের ও কুচবেহারের কোচরাজবংশের প্রবর্ত্তক। পরবর্ত্তী প্রবন্ধে এই কোচবংশপ্রবর্ত্তকের সম্বন্ধে একটী বিস্তারিত বিবরণ প্রদত্ত হইবে।

শ্রীনগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়।

পদরাগ।

(১১) করোনাক আশা।

রাগিণী সাহানা তাল—আড়াঠেকা।

কভু করোনাক আশা—ও যে চির কর্ম্মনাশা ;
কিছু স্থির নহে জেনো সব শুধু ভাসা ভাসা।
আশার অক্ষরে লেখ যদি জীবনফলকে
অচিরে মুছিয়া যাবে তাহা নিষেধ পলকে।
বাঁধিয়োনা গৃহ তব বৃথা আশাবালুচরে,
মুহূর্ত্তে ভাসিয়া যাবে কোথা নিরাশা-সাগরে ;
ছাড়িয়া আশার মদ ধ'রে থাক ধ্রুবপদ,
করে যাও হিতকাজ হবে চির নিরাপদ।

(১২) কেন বিষাদে মগন ?

রাগিণী ভৈরোঁ তাল—ঢিমাতেতালা।

কেন বিষাদে মগন ?
আনন্দেতে বিভাসিত অনন্ত গগন ;—
কেন বসে' আছ লয়ে হৃদয় ভগন ?
শূন্য হাতে আছ বসে',
হারায়েছ নিজদোষে
পিতার অমৃতধাম প্রসাদ ভবন ;
কাছে তাঁর ক্ষমা চাহ,
হও তাঁর আজ্ঞাবহ
আবার ফিরিয়া পাবে যাহা নিজধন—
অতুল সম্পদরাশি আনন্দে তখন।
কেন বিষাদে মগন ?

(১৩) চিরকাল রহিব তোমার পথে।

রাগিণী পাঁজ—তাল সুরফাঁকতাল।

আজ হতে বলিতেছি চিরকাল
রহিব তোমার পথে,
বৃথা কভু আর কাটাবনা কাল
তুচ্ছ সব মনোরথে।
পথে কামক্রোধ যদি করে রোধ
বাধা না মানিব প্রাণে ;
শিলাখণ্ড ঠেলি নির্ঝরিণী যথা
চলে গো সাগর পানে।
প্রেমের লহর তুলিয়া জীবনে
মিলিব অনন্তধামে ;
মুকত পরাণ সুখে গাবে গান
তোমার মঙ্গল নামে।

(১৪) কেন আছ বসে ?

রাগিণী মুলতান তাল—একতালা।

কালস্রোত বহে যায়,
কেন আছ বসে ?
দিবস কেন হে বৃথা
কাটাও আলসে ?
রয়েছ মগন সদা
বিলাসের রসে,
পড়ে আছ সুখপঙ্কে
জড়তার বশে ;—
জাননাক কিছু পরে

কি হবে দুর্দ্দশা!
এই বেলা ছাড় সব
বিষয়লালসা—
কর শুভমতি এক
চরণে ভরসা।

(১৫) দণ্ড মঙ্গলের জন্য।

রাগিণী সাহানা তাল—ঝাঁপতাল।

দণ্ড যে দিয়াছ নাথ
তাহা মঙ্গলের জন্য,
কষ্টেতে তোমারে ডেকে
হইয়াছি চির ধন্য।
সুখ সমীরণে ভাসি
তোমারে ভুলিয়া গিয়া,
বিলাসের পুষ্পহাসি
জীবনে তুলিতে গিয়া,
বিষময় শত শত
কণ্টকে হইলে ক্ষত
যাতনায় যবে হই
তব পদে অবনত,
তোমার অমৃতসেকে
তখন জীবন পেয়ে,
চলিহে তোমার পথে
মঙ্গল সঙ্গীত গেয়ে।

শ্রীঋতেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

যোগীগায়ক হরিদাসস্বামী।

ভারতে বৈষ্ণব সাধকেরা যে ভাবে সঙ্গীতকে সজীব ও সরস করিয়া তুলিয়াছিলেন, এভাবে কোন সম্প্রদায় করে নাই—করিতে সমর্থ হয় নাই ইহা বলিলে তেমন অত্যুক্তি হয় না।

বৈষ্ণবগায়কযোগীদিগের দ্বারা ভারত সঙ্গীত এককালে বড়ই গৌরবান্বিত হইয়া উঠে;—সে সঙ্গীতসৌরভে চতুর্দ্দিক আমোদিত হইয়া উঠিয়াছিল। তাঁহারা কল্পনা বলে, মধুর মন্ত্র বলে গানকে সজীব করিয়া তুলিতে চেষ্টা করিতেন। আমরা অনেকে আজকাল গানকে যে ভাবে দেখি, সে ভাবে তাঁহারা গানকে দেখিতেন না—দেখিতে চাহিতেন না; গান শুনিবামাত্রই তাঁহারা গানের প্রাণের প্রতি অগ্রে দৃষ্টিপাত করিতেন।—তাঁহারা এইটী স্পষ্ট বুঝিতেন, যে, যেমন প্রাণহীন দেহ কোন কাজের নয়, সেইরূপ প্রাণহীন গানও অপদার্থ, কোন কর্ম্মের নয়।—তাই, গানে প্রাণটুকু যথার্থরূপে ফুটাইয়া তুলিবার জন্য তাঁহারা কি না শ্রমসাধন করিয়া গিয়াছেন!—নীরবে শ্যামলতাসমাচ্ছন্ন শিলোচ্চয় শোভিত বিচিত্র উপলপরিবৃত নদীতীরে—অথবা পর্ব্বতোপরি, গিরিগুহায় একাকী আসীন হইয়া প্রকৃতির কোলে সঙ্গীতের প্রাণ অন্বেষণ করিতেন।—অন্বেষণ করিয়া প্রকৃতি হইতে যখন সঙ্গীতের প্রকৃত প্রাণ উপলব্ধি করিতে সমর্থ হইতেন, তখন তাঁহাদের কি আনন্দই না হইত! এ আনন্দ সকলে সেরূপ বুঝিতে পারিবেন না; যাঁহারা যথার্থ হৃদয়বান তাঁহারা সঙ্গীতের প্রাণময় আনন্দমর্য্যাদা অনুভব করিতে পারিবেন।—সঙ্গীত যে কি জিনিষ তৎসম্বন্ধে একজন সঙ্গীতজ্ঞ ইংরাজ পণ্ডিত বলেন "Poetry is a great art; so is music; but as a medium for emotion, each is greater alone than in company, although various good ends are obtained by linking the two together, providing that the words are kept in subordination to the greater expression-medium of music. Even then they are

কি হবে দুর্দ্দশা!
এই বেলা ছাড় সব
বিষয়লালসা—
কর শুভমতি এক
চরণে ভরসা।

(১৫) দণ্ড মঙ্গলের জন্য।

রাগিণী সাহানা তাল—ঝাঁপতাল।

দণ্ড যে দিয়াছ নাথ
তাহা মঙ্গলের জন্য,
কষ্টেতে তোমারে ডেকে
হইয়াছি চির ধন্য।
সুখ সমীরণে ভাসি
তোমারে ভুলিয়া গিয়া,
বিলাসের পুষ্পহাসি
জীবনে তুলিতে গিয়া,
বিষময় শত শত
কণ্টকে হইলে ক্ষত
যাতনায় যবে হই
তব পদে অবনত,
তোমার অমৃতসেকে
তখন জীবন পেয়ে,
চলিহে তোমার পথে
মঙ্গল সঙ্গীত গেয়ে!

শ্রীঋতেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

যোগীগায়ক হরিদাসস্বামী।

ভারতে বৈষ্ণব সাধকেরা যে ভাবে সঙ্গীতকে সজীব ও সরস করিয়া তুলিয়াছিলেন, এভাবে কোন সম্প্রদায় করে নাই—করিতে সমর্থ হয় নাই ইহা বলিলে তেমন অত্যুক্তি হয় না।

বৈষ্ণবগায়কযোগীদিগের দ্বারা ভারত সঙ্গীত এককালে বড়ই গৌরবান্বিত হইয়া উঠে;—সে সঙ্গীতসৌরভে চতুর্দ্দিক আমোদিত হইয়া উঠিয়াছিল। তাঁহারা কল্পনা বলে, মধুর মন্ত্র বলে গানকে সজীব করিয়া তুলিতে চেষ্টা করিতেন। আমরা অনেকে আজকাল গানকে যে ভাবে দেখি, সে ভাবে তাঁহারা গানকে দেখিতেন না—দেখিতে চাহিতেন না; গান শুনিবামাত্রই তাঁহারা গানের প্রাণের প্রতি অগ্রে দৃষ্টিপাত করিতেন।—তাঁহারা এইটী স্পষ্ট বুঝিতেন, যে, যেমন প্রাণহীন দেহ কোন কাজের নয়, সেইরূপ প্রাণহীন গানও অপদার্থ, কোন কর্ম্মের নয়।—তাই, গানে প্রাণটুকু যথার্থরূপে ফুটাইয়া তুলিবার জন্য তাঁহারা কি না শ্রমসাধন করিয়া গিয়াছেন!—নীরবে শ্যামলতাসমাচ্ছন্ন শিলোচ্চয় শোভিত বিচিত্র উপলপরিবৃত নদীতীরে—অথবা পর্ব্বতোপরি, গিরিগুহায় একাকী আসীন হইয়া প্রকৃতির কোলে সঙ্গীতের প্রাণ অন্বেষণ করিতেন।—অন্বেষণ করিয়া প্রকৃতি হইতে যখন সঙ্গীতের প্রকৃত প্রাণ উপলব্ধি করিতে সমর্থ হইতেন, তখন তাঁহাদের কি আনন্দই না হইত! এ আনন্দ সকলে সেরূপ বুঝিতে পারিবেন না; যাঁহারা যথার্থ হৃদয়বান তাঁহারা সঙ্গীতের প্রাণময় আনন্দমর্য্যাদা অনুভব করিতে পারিবেন। —সঙ্গীত যে কি জিনিষ তৎসম্বন্ধে একজন সঙ্গীতজ্ঞ ইংরাজ পণ্ডিত বলেন "Poetry is a great art; so is music; but as a medium for emotion, each is greater alone than in company, although various good ends are obtained by linking the two together, providing that the words are kept in subordination to the greater expression-medium of music. Even then they are

apt to hinder the developement of the music.'' সঙ্গীত এমনই স্বাধীনভাবে অন্তরের ভাব ধ্বনিত করিতে পারে! কিন্তু যে সঙ্গীত নির্জ্জীব সে পারে না, সেই কারণে সঙ্গীতের যোগসাধনের দ্বারা তাহার প্রাণ আয়ত্ত করা চাই; তাহার, এক কথায় প্রাণায়াম করা চাই, তবে সঙ্গীত সার্থকতা লাভ করে। ভারতে বৈষ্ণবগায়কযোগীদিগের দ্বারা এককালে সঙ্গীত অশেষ উন্নতিলাভ করে। তাঁহাদের কাছে আমরা চিরকৃতজ্ঞতাপাশে বদ্ধ হইয়া আছি। সেই সকল বিখ্যাত বৈষ্ণব গায়ক যোগীদিগের অন্যতম হইতেছেন হরিদাস স্বামী। তিনি শুদ্ধ সঙ্গীত আলাপের দ্বারা রাগসকল মূর্ত্তিমান করিয়া তুলিতে পারিতেন এইরূপ লোকপ্রসিদ্ধি আছে। সঙ্গীত যোগীদিগের কাছে ইহা কিছু আশ্চর্য্য নহে। প্রাচীন কালে সঙ্গীতযোগীদিগের সঙ্গীতযোগের দ্বারা যে অনেক প্রকার অলৌকিক ক্রিয়াসাধনের কথা শুনা যায় তাহা আমার শুধু কথার কথা গল্প বলিয়া মনে হয় না। বাস্তবিক পূর্ব্বকালে ভারতে, শুধু ভারতে কেন অন্যান্য দেশেও সঙ্গীতযোগের নানারূপ অলৌকিক ক্ষমতার চর্চ্চা হইত। তাহার ফলে পৃথিবীতে সঙ্গীতের সিদ্ধপুরুষদিগের আবির্ভাব হইত। এখন ভারত হইতে—ভূভারত হইতে যথার্থ সে সঙ্গীত যোগসাধনা একপ্রকার উঠিয়া গিয়াছে। যে সঙ্গীতযোগের দ্বারা তানসেন একবার সম্রাট আকবরের প্রাসাদের বর্ত্তিকাসমূহ আলোকিত করিয়া দিয়াছিলেন। কথিত আছে, তানসেন যেমন সভার ওস্তাদদিগের চক্রে পড়িয়া দীপক গাহিলেন, অমনি রাজসভাগৃহের আলোক বর্ত্তিকাসমূহ দীপ্তি লাভ করিল! এইরূপ সব অলৌকিক শক্তিতে সঙ্গীতযোগীরা পূর্ব্বে সিদ্ধি লাভ করিতে সতত চেষ্টা করিতেন। তানসেন, তাঁহার এই যোগশক্তি হরিদাস স্বামীর নিকট প্রাপ্ত হয়েন। পাশ্চাত্যবিজ্ঞানাভিমানীরা এ সকল অনেক সময়ে বৃথা বাজে গল্প বলিয়া উড়াইয়া দেন, সেই জন্য তাঁহাদের নিকটে সঙ্গীতের প্রভাব সম্বন্ধে কিছু পাশ্চাত্য দৃষ্টান্ত দেখাইয়া তাহাদিগকে সঙ্গীতযোগসাধনের অলৌকিকতার প্রতি বিশ্বাস উদ্রেক করিয়া দিতেছি: কোন ইংরাজী পত্রে একস্থলে পড়িয়াছি:—

"—The influence of music, as demonstrated by a series of experiments was the snbject of a remarkable paper read by

Mrs. Amelia Holbrook at the Actors' Home, Staten Island, recently. Certain kinds of music, asserted Mrs, Holbrook, prevent the hair from falling out and other kinds produce baldness. Those who play their own compositions on the piano preserve, and often acquire, a luxurient growth of hair. The violencello and harp also have a tendency to preserve the hair, but wind instruments especially the trombone and cornet are fatal to hirsute adornneent. Wagner is the best of all composers for nervous diseases because his music is largely deocriptive. At the close of the paper several professional musiciaus stated that Mrs. Holbrook's deductions coincided with their own observations."

তাহা হইলে, উপরোক্ত আধুনিক বিদেশীয় বাক্যের দ্বারাও আমরা সঙ্গীতযোগের আশ্চর্য্য ফল সকল দেখিতে পাইতেছি: কোন-জাতীয় সঙ্গীত কেশ বৃদ্ধি করে, কোন-জাতীয় সঙ্গীত কেশপতনে সহায়তা করে; এইরূপ নানারূপ সঙ্গীতের নানাপ্রকার ক্ষমতা। ভারতের সঙ্গীতযোগীরা সঙ্গীতযোগের ক্ষমতাটী বিশেষরূপে বুঝিতেন—সঙ্গীতযোগের দ্বারা বিশ্বকে বশ করা যায় সমগ্র জগৎ জয় করা যায়; তাই, তাঁহারা সঙ্গীতের মূল যে নাদ তাহাকে ব্রহ্ম বলিয়া গিয়াছেন। স্বামীহরিদাস এই নাদব্রহ্মসাধনের দ্বারা সঙ্গীতযোগে মহাসিদ্ধি লাভ করেন। আর্য্যশাস্ত্র মতে নাদব্রহ্মসাধন বিনা সঙ্গীতযোগে সিদ্ধিলাভ হয় না। তানসেন স্বামীজীর কাছে মন্ত্রগ্রহণ করতঃ নাদব্রহ্মসাধন করেন; এই হেতু তানসেনও সঙ্গীতে অমন সিদ্ধিলাভ করিতে সমর্থ হয়েন।

হরিদাসস্বামীর নাম স্মরণ হইলেই সঙ্গে সঙ্গে আমাদের বিখ্যাত যোগীগায়ক তানসেনকে মনে আসে। যে তানসেনের নামে ভারত ধন্য, সমস্ত পৃথিবী ধন্য, সেই তানসেনের সর্ব্বপ্রথম ও প্রধান গুরু হইতেছেন হরিদাস স্বামী।

স্বামীজীর বিষ্ণুভক্তি প্রবলা ছিল; পরম বৈষ্ণবসাধক হইয়া তিনি তাঁহার

জীবনকাল অতিপাত করেন; জাতিতে ব্রাহ্মণ ছিলেন। প্রকৃত ব্রাহ্মণের ন্যায় তাঁহার সরল অন্তঃকরণ প্রকৃতির সরল ছবি চাহিত। বাল্যাবস্থা হইতেই তিনি ধর্ম্মের মধুরতা অনুভব করিতে সমর্থ হয়েন; তাঁহার সমবয়স্ক বন্ধু-বালকেরা যখন আমোদপ্রমোদে মত্ত হইয়া ক্রীড়া করিয়া বেড়াইত, তখন তাহাদের সঙ্গ কোলাহল তাঁহার ভাল লাগিত না, বিরলে বসিয়া বিজনে বসিয়া বিশ্বের অন্তরাত্মার সেই নিস্তব্ধ শব্দ, স্তব্ধ অন্তরীক্ষের সেই অনাহত নাদ শ্রবণ করিবার জন্য তাঁহার প্রাণ ব্যাকুল হইয়া উঠিত, তৎকালে সে প্রাণে তজ্জন্য কত প্রার্থনা, কত চিন্তা, কত গান ধ্বনিত হইয়া উঠিত;—তিনি তাঁহার সঙ্গীবালকদিগের নিকট হইতে পলাইয়া গিয়া কোনও জন-কোলাহলশূন্য স্থানে প্রান্তরের মধ্যে যাইয়া অন্তরের শান্তিময়ী গীতিবাণী শুনিবার চেষ্টা করিতেন। যথার্থ সঙ্গীতপ্রাণ ব্যক্তির পক্ষে ইহা কিছু বিচিত্র নহে। বাল্যকাল হইতেই সঙ্গীতসরস্বতী অন্তঃসলিলা হইয়া তাঁহার অন্তরে প্রবাহিত হইত; তাহার বলে তিনি সঙ্গীতের শক্তি নিয়মাদি উপলব্ধি করিতে সক্ষম হয়েন—বুঝিয়াছিলেন যে সঙ্গীতের নিয়ম তাহা প্রকৃতিরই অন্যতম নিয়মমাত্র; সেই কারণে তিনি স্বভাবের ক্রোড়ে বসিয়া সঙ্গীত-যোগের নিয়মতত্ত্বদর্শন বিচক্ষণতা লাভ করেন।

অনেকে সঙ্গীতকে শব্দকোলাহল বলিয়া মনে করেন; এটী তাঁহাদের ভারি ভুল।—আসলে সঙ্গীত যে জিনিষ তাহা শৃঙ্খলাবদ্ধ নিয়মাবদ্ধ ভাব, শব্দ বিশৃঙ্খলতা নহে। অনেকে যে অবোধের মত কৌতুক সহকারে বলেন "সঙ্গীত ও শব্দ কোলাহল মাত্র ইহা তাঁহারা কেন বলেন? স্বভাবের মধ্যে সঙ্গীতের কণিকামাত্র ইঙ্গিত যদি কখনো তাঁহাদের হৃদয়কে যথার্থ স্পর্শ করে তো বুঝিবেন সঙ্গীতের আদ্যন্তে নিয়মাবদ্ধ ভাব-শৃঙ্খলা জাগ্রত করিয়া বিরাজ করিতেছে! চিত্রে যেমন বিশৃঙ্খল বর্ণসমূহ লইয়া কোন কার্য্য সম্পন্ন হয় না; বর্ণসকল যথাযোগ্যস্থানে বিন্যস্ত হইলে তবে যেমন চিত্রের বিচিত্রতা সম্পাদিত হয়, সঙ্গীত রাজ্যেও তাই; স্বরবর্ণসমূহের বিহিতবিন্যাসে সঙ্গীত প্রকাশ পায়। ইহা স্বদেশীয় ও বিদেশীয় সঙ্গীততত্ত্ববিৎ মাত্রেই স্বীকার করিয়া থাকেন। হরিদাসস্বামীও প্রকৃতির অন্তরস্থিত আহত ও অনাহত নাদের সাহায্যে সঙ্গীতের স্বরবর্ণসমূহের বিহিত বিন্যাস বিশেষরূপে আলোচনা

ও আয়ত্ত করত রাগরাগিণীসকল আশ্চর্য্যরূপে স্বাভাবিক ও মূর্ত্তিমান করিয়া তুলিতে পারিতেন। তানসেন হরিদাসের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়া তাঁহার এই অলৌকিক ক্ষমতার ছায়ামাত্র প্রাপ্ত হয়েন। সেই ক্ষমতার বিন্দুমাত্র লাভ করিয়া তানসেন সঙ্গীতে কি প্রকার মহত্ত্ব লাভ করেন ও রেবার রামরাজার রাজসভা এবং আকবর বাদ্‌শাহের দরবার উজ্জ্বল করিয়া তোলেন—রামরাজা ও আকবর সাহকে একবারে বিমুগ্ধ করিয়া ফেলিয়াছিলেন।

স্বামী হরিদাস সম্রাট আকবরের সময়ের লোক। কাহারো মতে তিনি চতুর্দ্দশ শতাব্দির লোক, কেহ বলেন, তিনি ষষ্ঠদশ শতাব্দির লোক; যাই হৌক ইহা ঠিক যে তিনি আকবর বাদসাহ'র সমসাময়িক; তাহা হইলেই তিনি প্রকৃতপক্ষে পঞ্চদশ বা ষষ্ঠদশ শতাব্দির লোক ছিলেন, এবিষয়ে বিন্দুমাত্র সংশয় নাই।—সম্রাট আকবর সাহ ১৫৫৬ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৬০৫ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করিয়াছিলেন।

হরিদাস স্বামীর সঙ্গীতবিষয়ক অলৌকিক ব্যাপারসকলের কাহিনী বাদসাহ আকবরের কাণে গিয়া পঁহুছয়; তিনি তাহাতে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ লাভের জন্য ব্যাকুল হইয়া আগ্রা হইতে তানসেনকে সমভিব্যাহারে করিয়া লইয়া বৃন্দাবনে যান—বৃন্দাবনে স্বামীজী তখন ছিলেন—। স্বামীজী বাদসাহ্ আকবরের আগমনে কিঞ্চিন্মাত্র বিচলিত হয়েন নাই, আপনার মহিমায় আপনি মগ্ন ছিলেন। তাহা দেখিয়া সম্রাট তাঁহার যাহাতে মনোরঞ্জন হয়, তদ্বিষয়ে বিশেষ মনোযোগী হইয়া যোগী হরিদাসের তৃপ্ত্যর্থে সাতিশয় যত্ন করিতে লাগিলেন। অনন্তর বহু যত্নের পর বাদশাহ স্বামীজীর সন্তোষ উৎপাদন করিলেন। হরিদাস স্বামী সম্রাটের প্রতি অত্যন্ত প্রসন্ন হইয়া অমূল্য অমূল্য উপদেশ রত্ন দান করিলেন। আকবর সাহ তাঁহার সেই অমূল্য উপদেশ আদেশবৎ শিরোধার্য্য করিয়া—যথার্থ সাধুদর্শনে যেন কৃতার্থ হইয়া সানন্দে দিল্লীতে প্রত্যাগমন করিলেন।

হরিদাস স্বামীর সহিত আকবর সাহের সাক্ষাত হইবার পর হইতে, তিনি তাঁহাকে আর ভুলিতে পারেন নাই, এমনি তাঁহার প্রতি বাদসাহ আকৃষ্ট হইয়াছিলেন। কিছুকাল পরে স্বামীজীর দেহত্যাগের সংবাদ পাইয়া আকবর সাহ বড়ই ব্যথিত ও যেন মৃতবৎ হইয়া পড়িয়াছিলেন।

স্বামী হরিদাস বিবাহ করেন নাই। তাঁহার পিতার নাম আশধীর ; হরিদাসের পিতামহের নাম জ্ঞানধীর। হরিদাসের প্রপিতামহের নাম ব্রহ্মধীর।

হরিদাস স্বামী যোগীর ভাব, তাঁহার প্রপিতামহ ব্রহ্মধীর হইতেই প্রকৃতপক্ষে পাইয়াছেন। তাঁহার পিতৃপুরুষদিগের নিকট তিনি তাঁহার যোগীজন সুলভ মহত্বের জন্য ঋণী। কারণ ব্রহ্মধীর একজন ব্রাহ্মণসাধক ছিলেন, জলেশ্বর রাজ্যে কোলভূমে একেলা বসিয়া সাধন ধ্যানধারণাদি করিতেন। ব্রহ্মধীরের পুত্র জ্ঞানধীরও একজন পরম বৈষ্ণব ভক্ত ছিলেন, তীর্থাদি পর্য্যটন করিয়া বেড়াইতেন, বিবাহ করিবেন না স্থির করিয়াছিলেন, কিন্তু নিয়তি কেন্ন বাধ্যতে, তীর্থযাত্রা উপলক্ষে এক সময়ে অনুবায় আসিলে, তাঁহার সহসা এক ব্রাহ্মণ কন্যার সহিত ঘটনাক্রমে বিবাহ হইয়া গেল। বিবাহের কিছু কাল পরে তাঁহাদের এক পুত্র হইল ; তাঁহার নাম আশধীর। তিনি আবার বৃন্দাবনে আসিয়া গঙ্গাধর নামক জনৈক ব্রাহ্মণের কন্যার পাণিগ্রহণ করেন। এই বিবাহফলে যে পুত্র জন্মগ্রহণ করেন, তাঁহার নাম হরিভক্ত আশধীর হরিদাস রাখেন। এই হরিদাস কালে পিতৃপুরুষদিগের মহত্বের জন্য ও নিজ সাধনায় বিখ্যাত সঙ্গীতযোগী সুবিখ্যাত হরিদাস স্বামী হইয়া উঠেন, ও ভারতসঙ্গীতের এক নবযুগের সৃষ্টি করেন।

শ্রীহিতেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

নাহি দিই দুখ।

(সাখ্যস্বরলিপি।)

ইমনকল্যাণ—কাওয়ালি।

কারো মনে আমি যেন নাহি দিই দুখ
বলুক সে যেরূপ বলে
চলুক সে যেরূপ চলে
বাধা দিব না, করিব যাতে পায় সুখ
দেখিব, কিন্তু সে হিতে না হয় বিমুখ।
লক্ষ্য মোর এই শুধু হিত হোক্ তার
তাহ'লেই পূর্ণ হয় কামনা আমার।
কলহ আর কোলাহল
বৃথা এ ভব হলাহল
কি হবে বহিয়া বৃথা এ মালিন্যভার।
কাটে যেন কাল হিত করিয়া সবার
এইটুকু তাঁর কাছে প্রার্থনা আমার।

তালি। ১ । ২ । ৩ । ০ (স্থা, স্ত,) ॥
মাত্রা। ৪ । ৪ । ৪ । ৪ ॥

২.........
স্থা ঃ—II ন্‌সা সা ধা ধা । পা পম্‌পা গা গা ।
স্থা ঃ—II কা রো ম নে । আ মি যে ন ।

রে সা রে২ । গা৪ II । (স্ত)ঃ— পা গা২ পা ।
না হি দিই । দুখ II । (স্ত)ঃ— ব লুক্ সে ।

পা২ পা২ । পা পা৩ । + পা৪ । পা পা ⌒মা ধা ।

যে রূপ্ । ব লে । — । চ লু —ক্ সে ।

২ ২......

ধা২ ধা২ । ধা ধা৩ । + ধা৪ । পা ধা ধা সা । সা৪ ।

যে রূপ্ । চ লে । — । বা ধা দি ব । না ।

....

সা রে রে । রে২ রে২ । সা রে সা রে ।

ক রি ব । যা তে । পা — — —য়্ ।

....

গা৪ । গা গা গা২ । গা২ গা২ । গা রে২ সা ।

সুখ্ । দে খি ব । কি ন্তু । সে — — ।

.... ২..................

সা২ সা২ । পা ধা২ রে । সা৪ ॥

হি তে । না হয় বি । মুখ্ ॥

(স্ত-দ্বি):— গা গা পা ধা । পা ধা পা ধা ।

(স্ত-দ্বি):— ল ক্ষ্য মো —র্ । এ ই শু ধু ।

২..

সা সা সা২ । সা৪ । সা সা নি২ । নি ধা

হি ত হোক্ । তার্ । তা হ' লেই । পূ র্ণ

ধা পা । পা ⌒মা গা ⌒মা । পা৪ । পা পা

হ —য়্ । কা ম না আ । মার্ । ক ল

পা পা । পা পা ৲পা২ । পা½ পা½ পা পা পা ।

হ আর্ । কো লা হল্ । বৃ থা এ ভ ব ।

২...............

ধা ধা ধা২ । সা সা সা সা । ধা ধা পা পা ।

হ লা হল্ । কি হ বে ব । হি য়া বৃ থা ।

২..

পা ধা রে২ । রে রে সা২ । সা সা ধা ধা ।

এ — মা । লি ন্য ভার্ । কা টে যে ন ।

পা ⌒মা পা২ । গা গা রে গা । গা৪ । পা পা

কা —ল্ হিত্ । ক রি য়া স । বার্ । এ ই

পা পা । ⌒মপা গা পা২ । গা৩ রে । গা৪ ।

টু কু । তাঁ — র । কা — । ছে ।

গা২ মা রে । রে২ + রে½ নি রে । সা৪ ॥

২

প্রা — র্থ । না — — — । মার্

শ্রীহিতেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

নিয়মিত উপাসনা।

তোমাদের যে আমি কেবল ভালবাসি তাহা নয়, আমি চাই তোমরাও আমাকে ভালবাস। ইহাদ্বারা দৃষ্টান্ত দেখাইতেছি পিতা যেমন পুত্রের ভালবাসা চান পরমেশ্বর তেমনি তাঁহার পুত্রদিগকে কেবল ভালবাসেন না, তাহাদের ভালবাসা চান। আমি যে তোমাদের ভালবাসি তাহা কি প্রকারে জানিতে পার? তোমাদের মঙ্গল হউক এই আশীর্ব্বাদ দ্বারা। তোমরা আমাকে প্রণাম দ্বারা তোমাদের ভালবাসা জানাইতে পার। আমাদের যদিও মঙ্গল ইচ্ছা থাকে কিন্তু এমন শক্তি নাই যে সবটা মঙ্গল দিতে পারি; ঈশ্বরের মঙ্গল ইচ্ছা আছে আবার তাঁর শক্তি আছে যে মঙ্গল দিতে পারেন। তাঁহার যাহা মঙ্গল ইচ্ছা তিনি তাহা বিধান করেন। আমরা আশীর্ব্বাদ করিতে পারি এবং কিছু কিছু সম্পন্নও করিতে পারি। আবার ইহাও হইতে পারে যে আমরা যাহা মঙ্গল ভাবিয়া আশীর্ব্বাদ করিতেছি বাস্তবিক তাহা কল্যাণ নয়, কিন্তু ঈশ্বর মঙ্গলই বিধান করেন। তিনি কেবল আমাদিগকে ভালবাসেন না তিনি আবার ভালবাসা চান—তাঁর সঙ্গে এই আমাদের নিগূঢ় সম্বন্ধ। আমরা কিসে জানিতেছি যে আমাদের তাঁহাকে শ্রদ্ধা ভক্তি প্রীতি প্রণাম পূজা আরাধনা করিবার অধিকার আছে। যখন শক্তি দিয়াছেন তখন তিনি সেই শক্তির কার্য্য চাহিতেছেন। আমাদের শ্রদ্ধা পবিত্রস্বরূপের উপর যায়; সকল হইতে পবিত্র ঈশ্বর অতএব সেই শ্রদ্ধা তিনি আকর্ষণ করিতেছেন—আমাদের শ্রদ্ধা সর্ব্বসম্পদের দাতার প্রতি উত্থিত হয়। অতএব আমাদের তাঁহাকে কৃতজ্ঞতা ভক্তি প্রীতি করিবার অধিকার আছে। যে ব্যক্তি উপকার করে তাহার প্রতি কৃতজ্ঞ না হইলে মনুষ্য হই না, যে আমাকে ভালবাসে তাহাকে ভাল না বাসিলে মনুষ্য হই না। যখন তিনি আমাদের প্রীতি করেন তখন তাঁহাকে আমাদের প্রীতি করা উচিত। যিনি সকল হইতে গুরু তাঁহাকে আমাদের ভক্তি করা উচিত। ঈশ্বর আমাদিগকে শ্রদ্ধা ভক্তি প্রীতি দ্বারা আপনার দিকে আকর্ষণ করিতেছেন। উপাসনা আমাদের স্বভাবের অনুকূল,

শ্রদ্ধা ভক্তি প্রীতি তাঁহাকে দেওয়া উচিত। ঈশ্বরের সঙ্গে আমাদের উদাসীনের ভাব নয়। আমাদের জন্য তিনি কত করিয়া রাখিয়াছেন। এক ক্ষণকালের নিমিত্ত আমাদের ভোলেন না। তাঁহারি রাজ্যে আছি তাঁহারি ক্রোড়ে সর্ব্বদা রহিয়াছি। সর্ব্বদাই তিনি দেখিতেছেন ঈশ্বরের প্রতি যেন আমাদের এই প্রকার লক্ষ্য থাকে, তাঁহাকে নিয়মিতরূপে উপাসনা করা যেন আমাদের লক্ষ্য থাকে। নয়ত যখন একটা মৃতদেহ যাইতেছে তখন বৈরাগ্য হইল ঈশ্বরকে একবার মনে পড়িল অথবা কোথাও গিয়া একবার ভক্তি হইল, যখন ভয় পেলাম নৌকা ডুবিতেছে ঈশ্বরকে স্মরণ করিলাম, ব্যারাম হইল ঈশ্বরকে ডাকিলাম, ইহা কিছু অনুরাগের সহিত হইল না। যেমন প্রত্যহ স্নান করিতে হয়, একদিন জল পাইলাম স্নান করিলাম একদিন জল পেলাম না স্নান করিলাম না এই রকম কি করি? একদিন ভাত খেলাম একদিন খেলাম না তাহা কি করি? শ্রদ্ধা ভক্তি প্রীতি ইহাকেও সেইরূপ নিয়মিতরূপে চালনা করা উচিত। শরীরের বল হয় যেমন আহার করিলে আত্মার বল হয় সেইরূপ উপাসনা করিলে। অনিয়মিতরূপে আহারাদি করিলে যেমন শরীরের বল থাকে না তেমনি নিয়মিতরূপে উপাসনা না করিলে আত্মার বল থাকে না। যেমন আহার নিদ্রা স্নান ব্যায়াম নিয়মিতরূপে করি তেমনি নিয়মিতরূপে উপাসনা করিলে আমাদের মস্তকের উপর যে সকল বিপদ ঝুলিতেছে সেই সকল অতিক্রম করিয়া পৃথিবীতে শেষ পর্য্যন্ত চলিতে পারি, সকল সংসারের ভয় বিপদ অতিক্রম করিয়া ঈশ্বরের ক্রোড়ে যাইতে পারি। এই লক্ষ্যর চেয়ে কোন্ লক্ষ্য অধিক হইতে পারে? নিয়মিতরূপে উপাসনা করিলে উপাসনা নিশ্বাসের মত সহজ হইয়া যাবে। উপাসনাই স্বাভাবিক। ঈশ্বর আমাদিগের প্রতি যত করুণা প্রকাশ করিয়াছেন, ধন দিয়াছেন মান দিয়াছেন ঐশ্বর্য্য দিয়াছেন, সকল করুণার চেয়ে এই করুণা বড় যে তিনি আমাদের প্রীতি চান। আমরা এই তাঁর অনন্ত কোটি লোকের একটী ক্ষুদ্র লোক যে পৃথিবী তার আমরা একটী ক্ষুদ্র কীট—পাপীতাপী। তিনি এমন দয়াময় এমন স্নেহময়ী মাতা যে তিনি আমাদিগকে প্রীতি করিতেছেন। আবার তিনি চান না যে তাঁহার নিকট আমরা উদাসীনের মত থাকি, চাই আমরা তাঁকে ভালবাসি চাই না ভালবাসি। একজন রাস্তা দিয়া যাইতেছে

সে আমার সম্বন্ধে উদাসীন, তাহার সম্বন্ধে মনে করিতে পারি ভাল বাসুক নাই বাসুক কিন্তু তোমাদের মনে করিতে পারি না যে তোমরা নাই ভালবাস, তোমরা আমাকে ভালবাস এই চাই। ঈশ্বর সকলকেই ভালবাসেন সকলেরই ভালবাসা চান।

আদার মিষ্টিকটী।

(খাদ্যপাক।)

উপকরণ।—চিনি আধসের, ময়দা আধসের, ডিম চারিটা, আদা এক তোলাটাক্, গোলাপজল আধ তোলাটাক।

প্রণালী।—চিনি আর ডিমগুলা একত্র ফেটাও যে পর্য্যন্ত না শাদা হয়। তারপরে ইহাতে একটু আদার রস বা আদা ছেঁচা এবং ময়দা ও একটুকু গোলাপজল মিশাও। পাতলা করিয়া বেলিয়া সেঁক।

ওঁ

উৎসব।

ইমন কল্যাণ।

বাজিছে মঙ্গলগীতি গগনে গগনে,
দেবতারা গাহে গান বসি স্থলগনে;
সূর্য্য প্রকাশিছে তাঁর মহিমা সুযশ,
চন্দ্র বিতরিছে বিশ্বে চির সুধারস,
গ্রহতারকারা সবে দলে দলে আসি
মণিমালা উপহার দেয় রাশি রাশি;
অনন্ত উৎসব জাগে মহাসভামাঝে
বিরাজেন সিংহাসনে বিশ্বরাজরাজে॥

শ্রীঋতেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

সৌন্দর্য্য রক্ষা।

পরমাত্মার আভা পাইয়া জীবাত্মাও সুন্দর হইয়াছে। এই জীবাত্মার সৌন্দর্য্য আমাদের রক্ষা করিতে হবে, না হইলে কুৎসিৎ হইয়া পড়িব। যদি সর্ব্বাঙ্গসুন্দর অবয়ব পাইয়া তাহা ভালরূপ রক্ষা না করি, শীতে গ্রীষ্মে বর্ষায় ধুলায় ভস্মে পড়িয়া থাকি, তাহা হইলে শরীর কুৎসিৎ হইয়া পড়িবে। স্বভাবত আমাদের আত্মা সুন্দর। যখন বালককালে পরমাত্মার হাত থেকে বাহিরিয়া আসে তখন এমনি কোমল এমনি সরল এমনি সহজ এমনি নির্দ্দোষ, পাপ নাই শোক নাই—কেমন সুন্দর। সেই সৌন্দর্য্যকে যদি আমরা ভাল করিয়া না রাখি তবে সেই সৌন্দর্য্যরাগ ধুইয়া গিয়া ভিতরের খড়মাটির কুৎসিৎ কঠোরতা প্রকাশ পাইয়া পড়িবে। যে সৌন্দর্য্যের আভা পাইয়াছি তাহাকে আমরা রক্ষা করিব, তাহা না হইলে আত্মা মলিন হইয়া যাইবে। যেমন সূর্য্যকিরণের আভা পাইয়া চন্দ্র সুন্দর হইয়াছে তেমনি পরমাত্মার সৌন্দর্য্যের আভা পাইয়া জীবাত্মা সুন্দর হইয়াছে। মানুষের আত্মা ঈশ্বরের সৌন্দর্য্যকে প্রতিফলিত করিতেছে কিসের দ্বারা? সাধুভাবের দ্বারা, সরলতা ভক্তি প্রীতি দ্বারা, পবিত্রতা ন্যায় সত্য ক্ষমা দয়া এই সকলের দ্বারা। যেমন সূর্য্যের আভাকে চন্দ্র প্রতিফলিত করিতেছে তেমনি আমাদের নিজের কিছু নাই কেবল ঈশ্বরের আভা পাইয়াছি। যদি ঈশ্বরের সঙ্গে যোগ না থাকে তবে বিকৃত হইয়া পড়ি। ফুল যতক্ষণ বৃক্ষে থাকে ততক্ষণ তাহার কেমন শোভা থাকে, আর বৃক্ষ হইতে বিচ্ছিন্ন হইলে যেমন পরিম্লান হইয়া যায়, আর তার শোভা প্রফুল্লতা কান্তি কিছুই থাকে না, আমরা সেইরূপ যতক্ষণ ঈশ্বরের ক্রোড়ে অবস্থান করি ততক্ষণ আমরা প্রফুল্লতার হিল্লোলে দুলিতে থাকি ততক্ষণ আমাদের পূর্ণভাব থাকে, যখন তাঁহা হইতে বিচ্যুত হই তখন কীটপূর্ণ নরকহ্রদে পড়িয়া আপনার উপর ঘৃণা করি ও লোকের নিকট লজ্জিত হই। চন্দ্রের স্থানে যখন সূর্য্যের কিরণ পড়ে তখন পূর্ণ চন্দ্র হয়, যখন চন্দ্র সূর্য্য হইতে বিমুখ হয় তখন কালো অমাবস্যার চন্দ্রকে কেহ দেখিতে পায় না। যখন আত্মা পরমাত্মার দিকে যায়

তখন তাহাকে বেশ দেখায় যখন তাঁহা হইতে বিমুখ হয় তখন কুষ্ঠরোগীর ন্যায় গলিতাঙ্গ কালো কুৎসিৎ দেখিতে হয়। আত্মার সৌন্দর্য্য রক্ষা করিতে হইবে কেমন করিয়া? ঈশ্বরের সম্মুখে থাকিয়া। তাঁহা হইতে বিমুখ হইয়া অসহ্য ক্লেশে—কীটপূর্ণ দুর্গন্ধময় নরকে আত্মা অবস্থান করে; ঈশ্বরের সম্মুখে থাকিয়া তাঁহার সৌন্দর্য্যের কিরণে সে দেবতা হয় তাহার সৌভাগ্য হয়। অর্জ্জন করা অপেক্ষা রক্ষা করা কঠিন; আমরা যদি পিতৃধন পাই কিন্তু তাহা যদি রক্ষা না করি তাহা হইলে এক বৎসরের মধ্যে সব উড়িয়া যায়। পাইয়া রক্ষা করা চাই। আমাদের ঈশ্বরদত্ত সৌন্দর্য্যকে রক্ষা করিতে হবে। আমাদের সৌভাগ্য যে ঈশ্বরের সৌন্দর্য্যের আভা পাইয়া সুন্দর হইয়াছি—এই সৌভাগ্য রক্ষা করিতে হইবে।

সোণায় অরুচি।

দশম পরিচ্ছেদ।

এমনই ভাবে আরও এক মাস কাটিল। এক মাস পরে আবার পূজা আসিল। পূজার সময় আমার সদরআলা শ্বশুর মহাশয়ের একখানি পত্র আর দেড় শত টাকার একখানি মনি অর্ডার আসিল। সেই বিবাহের পর, সেই যে শ্বশুর গৃহে যাই, তাহার পর এই কয় বৎসর আর কখন শ্বশুর গৃহে যাই নাই, —যাইবার জন্য কখন বিশেষ একটা অনুরোধও করেন নাই। অনুরোধ সে দূরের কথা, কালে ভদ্রে তাঁহাদের আপনার বিশেষ গরজ ভিন্ন পত্রাদি লিখিয়া একটা সংবাদ গ্রহণ করিতেন না—করা কর্ত্তব্যের মধ্যে বিবেচিত হইত না। এবার হঠাৎ পত্র ও মনি অর্ডার পাইয়া আমার বিস্ময় জন্মিল। আমি প্রথমে ধীরে ধীরে পত্রখানি পড়িলাম। সংসার প্রবেশোন্মুখ নব্য জামাতা বাবা-

জীবনদের ভবিষ্যৎ মঙ্গলার্থে পত্রের কতকাংশে অবিকল নকল এখানে দিলাম। আমার স্বার্থপর সদরআলা শ্বশুর পত্রের একাংশে লিখিয়াছেন যে,—"কয় বৎসর দেখি নাই। * * * যাহা হউক, তোমার বি, এ, পাসের সংবাদে কতকটা সুখী হইয়াছি! শুনিলাম তুমি কলিকাতায় এম, এ, পড়িতেছ, আর সেই সঙ্গে মাষ্টারী করিতেছ। তোমার এ কঠোর পরিশ্রম সহ্য হইবে কি না,—জানি না। তবে আমার অভিলাষ, আমার মতে তোমার মাষ্টারী ছাড়িয়া দিয়া, শুধু এম, এ, পড়াই কর্ত্তব্য। কলিকাতা এম, এ, পড়িতে যে ব্যয় হইবে,—আমি সে ব্যয় ভার বহন করিতে স্বীকৃত আছি। * * * ! তারপর, এখন তুমি সম্পূর্ণ স্বাধীন—'তোমার আপনার উন্নতির পথের কণ্টক' এখন দূর হইয়াছে—এখন তুমি ইচ্ছা করিলে আপনার ভবিষ্যৎ উন্নতির জন্য বিলাত যাইলেও যাইতে পার। এখন বিলাত যাইতে হইলে আর কাহারো মতামত গ্রহণ করিতে হইবে না। যদি বিলাত যাওয়া স্বীকার কর—লিখিও আমি তোমার বিলাত যাইবার সমুদয় উদ্যোগ করিয়া রাখিব—এবং বিলাত যাত্রার সম্পূর্ণ ব্যয়ভার বহন করিব। * * । পূজোপলক্ষে আমরা বাড়ী যাইব, সেই সময় তুমি একবার আমাদের সহিত সাক্ষাৎ করিবে—ইহাই আমার ও তোমার শাশুড়ীর আন্তরিক অনুরোধ। তোমার পাথেয় ও কলিকাতার ব্যয়াদি বাবদ দেড় শত টাকার মনি অর্ডার করিলাম, প্রাপ্ত সংবাদ দিবে। ইতি"

দীর্ঘকাল পরে পত্র পড়িয়া রাগে ও ঘৃণায় আমি যেন ক্ষিপ্তপ্রায় হইয়া উঠিলাম। "আমার উন্নতির পথে কণ্টক এখন দূর হইয়াছে,"—কথা কয়েকটী পড়িয়া আমার চিত্তের অবস্থা কিরূপ হইল, সহৃদয় পাঠক আর সহৃদয় পাঠিকা,—আপনারাই তাহার বিচার করিবেন। আমি তখনই মনি অর্ডারখানি ফেরত দিয়া পত্র লিখিতে বসিলাম। পত্রে লিখিলাম—"যখন আমার টাকার বিশেষ প্রয়োজন হইয়াছিল—একদিন যখন টাকার অভাবে জগৎ অন্ধকার দেখিয়াছিলাম, যখন কোথায়ও টাকা সংগ্রহ করিতে না পারিয়া অবশেষে কত তোষামোদ করিয়া পত্র লিখিয়াছিলাম, তখন পাছে আপনার নিকট হইতে অর্থ লইয়া সংসারে ব্যয় করি,—এই ভয়ে টাকা পাঠান তো দূরের কথা, পত্রের উত্তর পর্য্যন্ত দিতে অসমর্থ হইয়াছিলেন; আর এখন সেই আপনি

না লিখিতেই স্বতঃ প্রবৃত্ত হইয়া আমাকে সামান্য স্কুলের মাষ্টারী ছাড়িতে উপদেশ করিয়াছেন, এবং কলিকাতা বাসের ব্যয় পাঠাইয়াছেন,—স্বার্থ এমনই বালাই। যাক্ সে সব কথা লিখিয়া আর ফল কি? তবে এই মাত্র জানিবেন যে, আমার জন্ম এমন ইতর বংশে নহে যে, আপনার মত লোকের অর্থের মোহে আমার মনুষ্যত্ব ও বিবেক বিসর্জ্জন দিব। এখন আপনার মত স্বার্থান্ধ লোকের অর্থ স্পর্শ করিতেও ঘৃণাবোধ করি,—আর ঘৃণাবোধ করি বলিয়াই আপনার প্রেরিত মনি অর্ডার আপনার কাছে ফেরত পাঠাইয়া দিলাম। ইতি"

* * * *

এমনই ভাবে যথাসময়ে প্রশংসার সহিত এম্,এ, পাস করিলাম। এম,এ, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া মাসিক দুই শত টাকা বেতনে কৃষ্ণনগর কালেজের অধ্যাপক পদে নিযুক্ত হইয়া গেলাম। কৃষ্ণনগরে আসিবার কয় মাস পর এক দিন এক সঙ্গে দুইখানি পত্র পাইলাম। একখানি বউঠাকুরাণী অপরাজিতার—অন্যখানি আমারই স্ত্রী পঙ্কজিনীর। প্রথমে বউঠাকুরাণীর পত্রখানি পাঠ করিলাম। তিনি লিখিয়াছিলেন,—"প্রায় দুই বৎসর শ্রীমতী পঙ্কজিনীকে দেখি নাই—এতদিন পত্র পর্য্যন্ত পাই নাই, সম্প্রতি তাহার পত্র পাইয়াছি। বালিকা বয়সের চপলতা বশতঃ ইতিপূর্ব্বে আপনার সহিত যে যে দুর্ব্ব্যবহার করিয়াছে, এখন বয়োবৃদ্ধি সহকারে, সেই অতীত ব্যবহারে লজ্জিত হইয়াই এতদিন আমাদিগকে পত্র লিখিতে পারে নাই,—আপনাকেও না। যাহা হউক, পূর্ব্ব কার্য্যে সে এখন ঘোর অনুতপ্ত; সুতরাং আমার অনুরোধ, আপনি এখন প্রসন্নচিত্তে তাহার সকল অপরাধ ক্ষমা করিয়া তাহাকে পত্রাদি লিখিবেন। আপনি এখন চাকুরী করিতেছেন—এ অবস্থায় আপনার বিবাহিত স্ত্রীকে আর দীর্ঘকাল পিত্রালয়ে রাখা উচিত নহে, এবং তাহাতে লোকতঃ ধর্ম্মতঃ পাপও আছে। সুতরাং আশা করি দুই এক দিনের জন্য ছুটি লইয়া শ্রীমতীকে আনিবেন। আপনি স্বামী—রাগ বা অভিমান স্বামীর উপর না করিলে, নির্ব্বোধ স্ত্রীলোক আর কাহার উপর রাগ বা অভিমান করিবে? যতদিন স্বামী বর্ত্তমান, ততদিনই নারীজাতির যত কিছু গর্ব্ব—যত কিছু রাগ, যত কিছু অভিমান। তারপর যেদিন নারীজাতির সৌভাগ্য সূর্য্য চিরদিন

জন্য অস্তমিত হয়, সেইদিন হইতে নারীজাতি পথের ধুলি অপেক্ষায়ও হেয়। এই সব মনে করিয়া, যাহাতে পঙ্কজিনীকে সত্বর আপনার নিকট আনিতে পারেন তাহারই যত্ন ও চেষ্টা করিবেন। আপনি বিদ্বান ও বুদ্ধিমান পুরুষ—নির্ব্বোধ স্ত্রীলোকের উপর রাগ করা আপনার শোভা পায় না, এবং ইহা সমূহ অকল্যাণকর। উঁহাকে আনিলেই, আমি ও শেফালিকা ও মেজ ঠাকুরঝিকে লইয়া কৃষ্ণনগর যাইব। মেজঠাকুরঝি আপনাকে কিছুই লিখিতে পারেন না, কিন্তু আমায় লিখিয়াছেন যে, শ্রীমানদিগকে লইয়া তাঁহার মামা শ্বশুরের গৃহে বাস করা তাঁহার পক্ষে সমূহ কষ্টকর হইয়াছে। এমন অবস্থায় তাঁহাকে আনাও আপনার কর্ত্তব্য। এবিষয় অধিক আর কি লিখিব, আশা করি, হতভাগিনী আমি—আমার এ অনুরোধ রক্ষা করিতে অন্যমত করিবেন না। ইতি"

তারপর পঙ্কজিনীর পত্র পাঠ করিতে প্রবৃত্ত হইলাম। পঙ্কজিনী লিখিয়াছেন ঃ—

প্রণাম জানিবেন ঃ—

আমি আপনার শ্রীচরণে সহস্র অপরাধে অপরাধিনী। একদিনকার নিজের বুঝিবার দোষে আপনার মনে কত ব্যথা দিয়াছি,—এখন তাহা মনে করিয়া, আপনি আপনার মনে মরিয়া রহিয়াছি। যাহা হউক, আপনি আমার স্বামী—আমাপেক্ষা বয়োজ্যেষ্ঠ, বিদ্বান ও বুদ্ধিমান—আপনি আমার বালিকা বয়সের সেই সহস্র অপরাধ ক্ষমা করিয়া পত্র লিখিবেন। তখন স্বপ্নেও ভাবি নাই যে, মন্দভাগিনী আমি—আমার সেই গর্হিতাচরণই আপনার জীবনের সব সুখ—সব শান্তির ব্যাঘাত হইবে। যাহা হইয়া গেছে তাহা আর ফিরিবে না, তখন অনাথিনী আমি—আমার পূর্ব্ব অপরাধ ক্ষমা করিয়া আপনার কুশল সংবাদে সুখী করিবেন এবং যত সত্বর পারেন এখান হইতে আমাকে লইয়া যাইবেন। দিদিকেও এবিষয় পত্র লিখিয়াছিলাম,—তিনি আমার কৃত পূর্ব্ব অপরাধ প্রসন্নমনে ক্ষমা করিয়াছেন। শ্রীচরণে নিবেদন ইতি।

আপনার শ্রীচরণের দাসী

শ্রীমতী পঙ্কজিনী দেবী।

পত্র দুইখানি পড়িয়া যথাসময়ে পত্রের উত্তর দিলাম। বউঠাকুরাণীর পত্রে

এবারও পঙ্কজিনীর কথা উল্লেখ করিলাম না। তবে এইমাত্র লিখিলাম যে, —"কেবল এই প্রথম চাকুরীতে নিযুক্ত হইয়াছি—এখনও সময় অতীত হয় নাই। সুতরাং আরও কিছু দিন যাউক, আগে হাতে কিছু অর্থ সংগ্রহ করি, তারপর পূর্ব্বকৃত ঋণ এখনও পরিশোধ করিতে পারি নাই, এমন অবস্থায় কেমন করিয়া বাসা করি। তবে পূর্ব্বকৃত ঋণ পরিশোধ করিলেই বাসা করিয়া আপনাদিগকে লইয়া আসিব। মেজ দিদির কথা যাহা লিখিয়াছেন—সব জানি। এতদিনই যদি গেল, তবে আরও কিছুদিন যাক। আপনি যে পিতার সন্তান, তাহাতে আমার দৃঢ় বিশ্বাস পিত্রালয়ে থাকিতে আপনার কোনই কষ্ট নাই; তবে মেজ দিদি—মেজ দিদি যদি এতই সহ্য করিলেন, আরও কিছুদিন করুন। আমি ভালই আছি। শ্রীমতী শেফালিকা ও আপনাদের কুশল সংবাদে সুখী করিবেন।"

বউঠাকুরাণীকে পত্র লিখিবার পর, পঙ্কজিনীকে পত্র লিখিলাম,—পত্র লিখিলাম কতকটা রূঢ় ভাষায়। কেননা, আমার দৃঢ় বিশ্বাস, যদিও এই দীর্ঘকাল আমার বিরহে পঙ্কজিনীর আশৈশবের অহঙ্কার রাশি কতকটা চূর্ণ হইয়াছে, তথাপি তাহার চরিত্র রীতিমত সংশোধনের মানসে পত্রের মধ্যে একটু স্নেহ বা মমতার আভাস পর্য্যন্ত দিলাম না। পত্রে লিখিলাম ঃ—

"পঙ্কজিনী! তোমার পত্র পাইলাম। আবার আমাকে পত্র লিখিয়াছ কেন? জীবনে আমি তো আর তোমার পত্রের প্রত্যাশা রাখি না। যেদিন তোমাকে দেখিলে—তোমার পত্র পাইলে, হৃদয়ে বড় সুখ—বড় শান্তি পাইতাম, আজি দুই বৎসর হইল আমার সে সুখের দিন গিয়াছে। এখন সংসারে আমি উদাসীন—সংসারে কাহারো প্রতি আমার আর স্নেহ নাই, মমতা নাই,—বলিতে কি, এ হৃদয় হইতে বহুদিন পূর্ব্বেই স্নেহের অঙ্কুর পর্য্যন্ত উৎপাটিত করিয়াছি। আশা করি, ভবিষ্যতে তুমি আর আমাকে পত্র লিখিয়া, আমার জীবনের শান্তি ভঙ্গ করিও না। এখন তুমি তো তুমি—অমন যে স্নেহের সুকুমারী শেফালিকা—যে শেফালিকার কচি মুখের মধুর হাসি দেখিলে এক দিন হৃদয়ে স্বর্গসুখ অনুভব করিতাম, এখন সে শেফালিকাও আর আমার স্নেহশূন্য হৃদয়ে স্নেহের উৎস ছুটাইতে সমর্থ নহে। আমি চির দরিদ্র—এক দিন যাহাকে দরিদ্র বলিয়া, আপনার পিতার অতুল বৈভবের মোহে মুগ্ধ হইয়া

যে দরিদ্রের বুকে কঠিন পদাঘাত করিয়া বড় অসময়ে চলিয়া গিয়াছিলে, আজ আবার সেই চিরদরিদ্র পথের ভিখারী আমি—আমাকে আবার পত্র লিখিয়াছ কেন? আশা করি, অতঃপর আর তুমি আমাকে পত্র লিখিবে না। তুমি আছ, তোমার বড় মানুষ পিতা আছেন—তাঁহার অতুল বৈভব আছে, তুমি চিরদিন তোমার পিতার সেই অতুল বৈভবের মোহে আপনার সুখের জীবন সুখে ও শান্তিতে কাটাইয়া যাও। আর আমি—আমার 'রন্ধ্রগত শনি'—শনির হাতে ক্রীড়াপুত্তল হইয়া চিরজীবন দুঃখের বোঝা বুকে করিয়া জীবনের অবশিষ্ট কয়টা দিন যেন তেন প্রকারে কাটাইয়া যাই। ইতি

হতভাগ্য—রজনী।"

যথাসময়ে পত্র দুইখানি ডাকে দিয়া আসিলাম।

একাদশ পরিচ্ছেদ।

আবার কয়দিন পরে পঙ্কজিনীর আর একখানি পত্র পাইলাম—সেই সঙ্গে বউঠাকুরাণীর আর মেজদিদিরও একখানি করিয়া পত্র পাইলাম। পঙ্কজিনীর পত্রখানি পূর্ব্ববৎ কাতরতায় পরিপূর্ণ, মেজদিদি ও বউঠাকুরাণীর পত্র দুইখানি বিবিধ উপদেশে পরিপূর্ণ। আমি পত্র দুইখানি পড়িয়া, মেজদিদি ও বউঠাকুরাণীকে ঠিক একই ভাবে লিখিলাম যে,—"আপনি যাহা লিখিয়াছেন—সব সত্য। তবে এখন এই অল্পেই নরম হইলে আবার হয়ত সময় পাইলে আপনার বিষ উদ্গীরণ করিতে কুণ্ঠিত হইবে না, তাই পূর্ব্বে একটু কাঁদানো ভাল। নহিলে, আমি এমন নীচ প্রকৃতির লোক নহি যে, নিজের বিবাহিতা পত্নীকে অন্যের গলগ্রহ করিয়া রাখিব। যা হউক, আমি পূজার সময় যাইয়া আপনাদিগকে ও শ্রীমতী শেফালিকাকে লইয়া আসিব। আপনি আমার হইয়া পঙ্কজিনীকে লিখিবেন যে, যদি তাহার স্বামীগৃহে আসাই কর্ত্তব্য হয়, তবে পিতৃগৃহের কাহাকেও সঙ্গে করিয়া পূজার পর কৃষ্ণনগরে আইসে। নতুবা আমার বিনা অভিপ্রায়ে আমার বড় অসময়ে যিনি আমাকে ত্যাগ করিয়া পিত্রালয়ে গিয়াছিলেন, জীবন থাকিতে আমি নিজে গিয়া কখনই তাঁহাকে আনিব না—স্থির নিশ্চয়। ইতি"

এমনই ভাবে আরও কয়মাস গেল। কয়মাস পর হঠাৎ একদিন কলিকাতা গেজেটে দেখিলাম যে, আমাকে কৃষ্ণনগর কালেজ হইতে পাটনা কালেজে বদলি করিয়াছে এবং পূজার অবকাশ অন্তেই পাটনা কালেজে উপস্থিত হইতে হইবে।

সহসা পাটনা কালেজে বদলির সংবাদ পাইয়া আমার মনটা বড় অপ্রসন্ন হইল। কারণ আমার স্বার্থান্ধ শ্বশুর মহাশয় এখন পাটনাতেই সদরআলার পদে নিযুক্ত আছেন। বর্ত্তমানে আমার যে প্রকার মনের গতি, তাহাতে তাঁহার নিকট হইতে যত দূরে থাকি, আমার পক্ষে ততই সুখপ্রদ এবং তাহাই আমার আন্তরিক ইচ্ছা। কিন্তু নিজের ইচ্ছায় কি হইবে? যখন পরপদ সেবায় নিজের জীবন উৎসর্গীকৃত করিয়াছি তখনই নিজের জীবনের সুখশান্তিও জন্মের মত বিসর্জ্জন দিয়াছি।

দেখিতে দেখিতে আবার বৎসরান্তরে পূজা আসিল। পূজার ছুটিতে আবার কয়মাস পর শেফালিকাকে দেখিতে গেলাম। কয়দিন শেফালিকাকে বুকে করিয়া আমোদ আহ্লাদে নিজের চিত্তমালিন্য দূর করিলাম। এমনই ভাবে কয়দিন পর, কালেজ খুলিবার এক পক্ষ পূর্ব্বেই শেফালিকার নিকট বিদায় লইয়া পথে মেজদিদির সহিত সাক্ষাৎ করিয়া কলিকাতা আসিলাম। কলিকাতা আসিবার কালে বউঠাকুরাণী ও মেজদিদি—উভয়েই মাথার দিব্য দিয়া বলিয়া দিয়াছিলেন যে,—"যেন পাটনা যাইয়াই বাসা করি এবং বাসা করিয়াই পঙ্কজিনীকে আনি। আর পাটনায় আমাদের বাসাটা যেন পুণ্যসলীলা জাহ্নবীর তীরে হয়।" পঙ্কজিনীর আসিবার সংবাদ পাইলেই মেজদিদি ও বউঠাকুরাণী—উভয়েই পাটনা যাইবেন। আমিও তাঁহাদের প্রস্তাবে স্বীকৃত হইয়া কলিকাতা যাত্রা করিলাম।

যথাসময়ে কলিকাতা আসিয়া কয়দিন কলিকাতা বাস করিয়া, পরে কালেজ খোলার পূর্ব্বদিন পঞ্জাবমেলে পাটনাভিমুখে যাত্রা করিলাম।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

নির্দ্দিষ্ট দিনে পাটনায় আসিয়া কার্য্যে নিযুক্ত হইলাম। প্রথম কয়দিন

কালেজের জনৈক অধ্যাপকের বাসায় আতিথ্য গ্রহণ করিবার পর, স্বয়ং বাসা করিয়া পরে মেজদিদি ও বউঠাকুরাণীকে পত্র লিখিলাম। পত্রে লিখিলাম—"আমি বাসা করিয়াছি,—আপনাদের ইচ্ছামত গঙ্গাতীরেই বাসা পাইয়াছি—প্রত্যহ গঙ্গাস্নান করিতে পারিবেন। এখন একটা ভাল দিন দেখিয়া সতীশ বাবুকে সঙ্গে করিয়া এখানে আসিবেন। আপনারা আসিলে পঙ্কজিনীকে আনিব।"

এদিকে পাটনা আসার কয়দিন পরে হঠাৎ আমার পাটনায় আগমন বার্ত্তা পাইয়া আমার শ্বশুর আমাকে নিমন্ত্রণ করিবার জন্য আমারই ভায়রাভাই বরদা দাস বাবুকে আমার নিকট পাঠাইয়াছেন।

বরদা দাস বাবু—সেই বরদা দাস বাবু যিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের বি, এল্, উপাধী লাভের পর ওকালতি ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হইয়া আপনার পরমারাধ্যা জননী ও পরম স্নেহাস্পদ কনিষ্ঠ ভ্রাতাদিগকে, একমাত্র পত্নী কাদম্বিনী ও শ্বশুর শাশুড়ীর প্ররোচনায় মাসিক পাঁচ টাকা মাসহারা দিয়া পৃথক করিয়া দিয়াছেন,—বিশ্ববিদ্যালয়ের রত্ন সেই বরদা দাস বাবু প্রথম সাক্ষাতে স্বাগত প্রশ্নাদি জিজ্ঞাসা করিবার পর, আমার শ্বশুরের বক্তব্য প্রকাশ করিয়া কহিলেন —"আপনি পাটনায় আসিয়া একবারও তাঁহাদের সহিত সাক্ষাৎ করেন নাই, —এজন্য তাঁহারা সমূহ দুঃখিত। তারপর, তাঁহারা এখানে থাকিতে আপনি পৃথক বাসা করিয়াছেন—লোকে দেখিলে কি বলিবে। যাহা হউক, কর্ত্তা আমাকে পাঠাইয়া দিলেন যে, তাঁহার এবং মার (শাশুড়ীর) আন্তরিক অনুরোধ রাত্রিতে আপনার নিমন্ত্রণ থাকিল—আপনি কালেজের পর অবশ্য অবশ্য যাইবেন।"

নিমন্ত্রণের কথায় আমার সেবারকার পূজার কথা মনে হইল। তাই আমি হাসিয়া কহিলাম—"কেন? আবার আমাকে নিমন্ত্রণ কেন? আবার কোন অপমান করিবার জন্য কি?"

বরদা দাস বাবু যেন কিছুই জানেন না—কিছুই শুনেন নাই, এমনই ভাবে আশ্চর্য্যের ন্যায় কহিলেন,—"সে কি কথা,—আপনাকে অপমান করিবেন কেন?"

আমি। "কেন জানি না। তবে অপমান করা ভিন্ন আমাকে নিমন্ত্রণ

করিবার কোনই কারণ দেখি না।"

এবার বরদা দাস বাবু উকিলি ফ্যাসানে বিজ্ঞতা প্রকাশসূচক আপনার ভ্রূযুগ কুঞ্চিত করিয়া গম্ভীরভাবে কহিলেন—"অতীত কার্য্যের জন্য অনুশোচনা করা আপনার ন্যায় পণ্ডিতের কর্ত্তব্য নহে। আর যদিবা কিছু বলিয়া থাকেন তবে তাহা আপনার ভালর জন্যই বলিয়াছেন। এই দেখুন, আপনি যেমন প্রতিভাশালী ব্যক্তি তাহাতে কর্ত্তার উপদেশানুসারে বিলাত গেলে এতদিন একটা লোকের মত লোক হ'য়ে আসিতে পারিতেন। আর এই জন্যই—দশের একটা করিবার জন্যই কর্ত্তার এত পীড়াপীড়ি, নহিলে অন্যে আর কেহ ত করে না!"

বরদা দাস বাবুর মুরুব্বিআনা বক্তব্য আমার ভাল লাগিল না—রাগে আমার সর্ব্বশরীর জ্বলিয়া উঠিতেছিল। তথাপি আত্ম-হৃদয় বলে ক্রোধ সংযত করিয়া কহিলাম,—"যাক্ সে সব বাজে তর্ক করিতে চাহি না। এখন আপনি বলিবেন যে, আমি নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে সম্পূর্ণ অসমর্থ।"

বরদা দাস বাবু পূর্ব্বের ন্যায় বিজ্ঞতা প্রকাশ করিয়া কহিলেন,—"সে কি কথা। আপনি বিদ্বান ও বুদ্ধিমান হ'য়ে, একদিনের একটা সামান্য কথা উপলক্ষ করে তাঁহাদিগের প্রতি এমন ক্রোধ করা কি আপনার কর্ত্তব্য।"

আমি। ক্রোধ করিব কেন? আর দরিদ্র আমি—আমার ক্রোধে বড় মানুষ তিনি—তাঁহারই বা কি ক্ষতি হইবে?

এবার বরদা দাস বাবু ধীরে ধীরে অযাচিত ভাবে আমাকে কতকগুলি নিঃস্বার্থ উপদেশ দান করিলেন। আর সেই উপদেশের প্রত্যেক বর্ণে তিনি —সেই আত্মপরায়ণ বরদা দাস বাবু যে উকিল, আমাপেক্ষা বয়োজ্যেষ্ঠ, প্রাজ্ঞ এবং বুদ্ধিমান—ইহাই প্রমাণ করিয়া দিয়া বুঝাইতে চেষ্টা করিলেন যে, তিনি যাহা উপদেশ করিতেছেন তাহাই সর্ব্বতোভাবে সমীচীন, তর্কের দ্বারায় আমাকে তাহাই বুঝাইতে যত্ন ও চেষ্টা করিলেন। কিন্তু আমি তাঁহার কোন উপদেশই গ্রহণ করিতে স্বীকৃত হইলাম না। আজ ক'বৎসর হইতে আমার হৃদয়ে আগ্নেয় গিরিগর্ভস্থ অনলের ন্যায় যে দাবানল সতত জ্বলিতেছে স্বার্থপর বরদা দাস বাবুর দুই চারিটা মিষ্ট কথায় যে দাবানল নিবিবার নয়—কখন নিবিবে না। অগত্যা তাঁহার উপদেশ গ্রহণে আমাকে সম্পূর্ণ অস্বীকৃত

দেখিয়া বরদা দাস বাবু পুনরায় কহিলেন,—"এতক্ষণ বাজে তর্ক করিলাম—এখন কি করিবেন বলুন—আমার বেলা হ'লো—কোর্টে যেতে হ'বে।"

আমি পূর্ব্বের ন্যায় স্থির কণ্ঠে কহিলাম—"রজনীরঞ্জন বাঙ্গাল—বাঙ্গাল রজনীরঞ্জনের প্রতিজ্ঞা অচল অটল—পাষাণের ন্যায় অচল। সুতরাং আপনি ফিরিয়া যাইতে পারেন, আমি নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিব না—করিতে পারিব না।"

আমার প্রতিজ্ঞার কথা শুনিয়া বরদা দাস বাবু পূর্ব্বের ন্যায় "উকিলি ফ্যাসানে" হাসিয়া কহিলেন—"তবে বিদায় হই। এই এখন কর্ত্তাকে যে'য়ে বলি, পারেন তিনি স্বয়ং আসিয়া আপনার রাগ ভাঙ্গাইয়া নিমন্ত্রণ করিয়া যান।" এই বলিয়া বরদা দাস বাবু বিদায় হইয়া উঠিয়া গেলেন। আমিও স্নান করিতে চলিলাম।

ক্রমশঃ

শ্রীউমেশচন্দ্র মৈত্রেয়।

কহাবৎ বা জয়পুরী প্রবচন।

গর্দ্দভ ও গীত।

প্রবচন। ৭৪। কালকী জয়োড়ী গধেড়ী, পরসো কা গীত গাবে।
অনুবাদ। কাল জন্মেছে গাধা, পরশুর গীত গাচ্ছে।
অর্থ। গর্দ্দভ জন্মগ্রহণ করিয়াই পূর্ব্বজন্মের অভ্যাস বশত অমঙ্গল ডাক ডাকিতে থাকে।
বঙ্গীয় প্রবচন। রাসভবিনিন্দিত স্বর।

ভাবে ভোর।

প্রবচন। ৭৫ মন মেঁ ভাবে, আপহী মুড় হিলাবে।
অনুবাদ। মনে ভাবে (আর) আপনিই মাথা নাড়ে।
অর্থ। নিজের মনে ভাবে ও তৎসঙ্গে নিজেই মাথা নাড়ে।
বঙ্গীয় প্রবচন। নিজের ভাবে নিজেই ভোর।

আত্মপ্রশংসা।

প্রবচন। ৭৬ আপকেই মূহ মিয়া মিট্ঠু।
অনুবাদ। নিজের মুখেই নিজের প্রশংসা।
অর্থ। আত্মপ্রশংসা রীতিবিগর্হিত।

অল্পের আদর।

প্রবচন। ৭৭ থোড়া স মীঠা।
অনুবাদ। কম (যাহা) তাই মিষ্টি (ভাল)।
অর্থ। কমই ভাল।
ইংরাজী প্রবচন। Too much of every thing is bad.
বঙ্গীয় প্রবচন। বেশী কিছুই (ভাল) নয়।

নীচের স্পর্দ্ধা।

প্রবচ। ৭৮ নকটো বূঁচো, সবসে উঁচো।
অনুবাদ। নাক ত নাই (অথচ) সকলের (চেয়ে) উঁচু।
অর্থ। বেহায়া সকলের বড়।
বঙ্গীয় প্রবচন। বামন হ'য়ে চাঁদে হাত।

যার ধন তার নয়।

প্রবচন। ৭৯। জীকীহী খীচড়ী, জীনেহী ড্যোড় চাটূ।
অনুবাদ। যার খিচুড়ি তাকেই দেড় হাতা।
অর্থ। যার জিনিষ সেই কম পায়।
বঙ্গীয় প্রবচন। যার ধন তার ধন নয় নেপো মারে দই।

অন্যের ব্যয়ে নিজের নাম।

প্রবচন। ৮০। মাল লুটে দরবার কো, ঔর ফতে ধায় কো নাম।
অনুবাদ। দরবারের ধন ব্যয় হয় আর ফতে দাইয়ের নামযশ হয়।
অর্থ। কারুর জিনিষ খরচ হয় আর কারুর নাম হয়। (ফতে নামক জনৈক রাজধাত্রী ছিল। তাহার যথেচ্ছা রাজধন ব্যয়ের অধিকার ছিল।
বঙ্গীয় প্রবচন। পরের ধনে পোদ্দারী লোকে বলে লক্ষেশ্বরী। (২) ফাঁক তালে নাম।

জয়পুর ও অনর্থ ব্যয়।

প্রবচন। ৮১। জয়পুরকী কামাই
ভাড়া বলিতা খাই।
অনুবাদ। জয়পুরের উপার্জ্জন ভাড়া ও ঘুঁটেতে ব্যয়িত হয়।
অর্থ। জয়পুরে ঘরভাড়া ও রন্ধনকাষ্ঠের মূল্য বেশী।

শ্রীশোভনা সুন্দরী দেবী।

বাঞ্ছিতের প্রতি।

হে বাঞ্ছিত! মোর জীবনের চির-আরাধ্য-দেবতা
কতদিন পরে আজি পাইয়াছি তোমার সন্ধান;
তোমার আমার মাঝে নাহি আজি কোনো ব্যবধান;
আজি মহা অবসর শুনাইতে গোপন বারতা।
তব লাগি আকৈশোর ভ্রমিয়াছি অভিসার-সাজে,
সাজিয়াছি এ যৌবনে উদ্‌ভ্রান্ত নবীন সন্ন্যাসী।
কোথা ছিলে প্রিয়তম! এতকাল হইয়া প্রবাসী?
জাগিত অভাগা কভু ও মহান্ অন্তরের মাঝে?
চাহিবনা অতীতেরে—ভাবিবনা দূর-ভবিষ্যৎ—
আজি বর্ত্তমান শুধু আছ তুমি রোধি' আঁখি-পথ।
পূর্ণ চারিধার মোর—নাহি কোথা তিলেক শূন্যতা।
কিছু নাই অরুন্তুদ—প্রেমে পূর্ণ আজি বিশ্ব-গীতা।
জীর্ণ অতি হৃদাসন শত ছিদ্র করিয়াছে পোকা—
বসিবে কেমনে নাথ? শুধু সাজে ও চরণ রাখা।
যত্নে-গাঁথা মালাখানি, শুষ্ক ভ্রষ্টতার দলগুলি—
অবশিষ্ট সূত্র শুধু—কেমনে তা' নিবে গলে তুলি'।
অশ্রু-বিন্দু-উপচারে নব-অর্ঘ্য করেছি রচনা,
এ ত তব যোগ্য নহে—পারিবনা করিতে অর্চ্চনা।
থাক সব দূরে পড়ি'! এস তুমি আরো কাছে মোর—
দৃঢ় আলিঙ্গনে বাঁধি' সুখ-স্বপ্নে নিশি করি ভোর।

শ্রীজীবেন্দ্র কুমার দত্ত।

রামমোহন রায় ও তাঁহার কলিকাতাবাস।

৪২ বৎসর বয়সে ১৮১৪ খৃষ্টাব্দে রামমোহন রায় কলিকাতায় বসতি প্রতিষ্ঠিত করিলেন। লোয়ার সার্কুলার রোডে মাণিকতলায় একটী বাটী ক্রয় করিয়া এবং তাহা ইংরাজীপ্রণালীতে সজ্জিত করিয়া বাস করিতে লাগিলেন। সেকালের পক্ষে তাঁহার ক্ষমতা, বিদ্যাবুদ্ধি অসাধারণ ছিল স্বীকার করিতেই হইবে। তিনি মিষ্টালাপী ছিলেন এবং তাঁহার ব্যবহার অত্যন্ত মধুর ছিল। সংসারে তিনি যেরূপ আঘাত পাইয়াছিলেন, তাহাতে তাঁহার পক্ষে সেরূপ না হওয়াই আশ্চর্য্যের বিষয় হইত। বর্ত্তমান কালে যেমন বড়লোকেরা পার্শ্বস্থ বাটীর লোকের পরিচয় লইতে কুণ্ঠিত হয়েন, সেকালে সেরূপ ছিল না। তখন ভদ্রলোকেরা পরস্পরের সহিত আলাপ পরিচয় করিতে স্বতই অগ্রসর হইতেন। ৺প্রসন্ন কুমার ঠাকুরের পিতা গোপী মোহন ঠাকুর, জষ্টিস অনুকূলচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের পিতা বৈদ্যনাথ মুখোপাধ্যায়, রাজার বাগানের জয়কৃষ্ণ সিংহ, আন্দুলের কাশীনাথ মল্লিক, ডাক্তার রাজেন্দ্র লাল মিত্রের পিতামহ বৃন্দাবন মিত্র, গোপীনাথ মুনসী, রাজা বদন চন্দ্র রায়, পণ্ডিত রঘুরাম শিরোমণি, পণ্ডিত হরনাথ তর্কভূষণ, দ্বারকানাথ মুন্সী প্রভৃতি সেই সময়কার গণ্যমান্য লোক রামমোহন রায়ের নিকটে সর্ব্বদা আসিতেন।

অধিকাংশ রামমোহন জীবনী গ্রন্থে সেকালের চিত্র যেরূপ অন্ধকারময় অঙ্কিত হইয়াছে, প্রকৃতপক্ষে সেরূপ ছিল না। তখন নূতন ইংরাজীশিক্ষার গুণে মধ্যবিত্ত ভদ্রলোকদিগের মধ্যে ইংরাজীশিক্ষা এবং তৎসঙ্গে একটা তীব্র স্বদেশপ্রেম প্রবেশলাভ করিয়াছিল। স্বদেশপ্রেমিক দলের মধ্যে চক্রবর্ত্তীর দলই সর্ব্বপ্রধান ছিল। তারাচাঁদ চক্রবর্ত্তী হইতে এই দলের নামকরণ হইয়াছিল। তারাচাঁদ চক্রবর্ত্তী এই দলের প্রাণ ছিলেন। এই দলে চন্দ্রশেখর দেব, রামগোপাল ঘোষ, নন্দকিশোর বসু প্রভৃতি অনেক শিক্ষিত ব্যক্তি ছিলেন। ইহাঁরা এবং বেথুন স্কুলের সহকারী সম্পাদক ভৈরব চন্দ্র দত্ত, নিমাই চরণ মিত্র, ঘোড়াসাঁকোর ব্রজমোহন মজুমদার, রাজনারায়ণ সেন,

রামনৃসিংহ মুখোপাধ্যায়, হলধর বসু, মদনমোহন মজুমদার, তেলিনী পাড়ার জমীদার অন্নদা প্রসাদ বন্দোপাধ্যায়, নিমকির দেওয়ান নীলরতন হালদার, ভূকৈলাসের রাজা কালীশঙ্কর ঘোষাল, দ্বারকানাথ ঠাকুর, প্রসন্নকুমার ঠাকুর, প্রভৃতি রামমোহনের মধুর ব্যবহারে এবং বৈষয়িক উপদেশ লাভের প্রত্যাশায় তাঁহার সহিত বন্ধুত্ব প্রদর্শন করিতেন।

রামমোহন রায় রংপুর হইতে কলিকাতায় আগমন কালে তান্ত্রিক সাধকবর হরিহরানন্দ তীর্থস্বামীকে সঙ্গে করিয়া আসিয়াছিলেন। তীর্থস্বামী তীর্থভ্রমণের মধ্যে রংপুরে আসিয়া রামমোহনের গুণে তাঁহার সহিত বিশেষ প্রীতিবন্ধনে আবদ্ধ হইয়াছিলেন। এই তান্ত্রিক সাধক স্বীয় ভ্রাতাকে রামমোহন রায়েরই হস্তে সমর্পণ করিয়া দিলেন। ইনিই পরে সেই সুপ্রসিদ্ধ রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ হইয়াছিলেন। রামমোহন রায়ের আর একটী সঙ্গী ছিলেন শিবপ্রসাদ মিশ্র নামক এক হিন্দুস্থানী পণ্ডিত।

রামমোহন রায় বয়সের সঙ্গে বুঝিতে সক্ষম হইয়াছিলেন যে কেবল পারসী বা আরবী ভাষায় গ্রন্থ লিখিলেই কোন ফল হইবে না। বাঙ্গালা ভাষায়, স্বদেশীয় ভাষায় পুস্তক লিখিলে অন্তত স্বদেশীয়গণের যে পড়িবার চেষ্টা হইবে তাহা তিনি বুঝিয়াছিলেন। একটা কথা সকল জীবনীগ্রন্থে দেখিতে পাই যে সেকালে বেদান্ত প্রভৃতির চর্চ্চা একেবারেই ছিল না। তাহা সত্য নহে বলিয়া বোধ হয়। তাহা যদি সত্য হইত, তাহা হইলে রামমোহন রায় প্রথমেই বেদান্তসূত্রের মূল এবং তাহার বঙ্গভাষায় ভাষ্য প্রকাশ করিতেন না। ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে তিনি বেদান্তসূত্র বঙ্গীয় ভাষ্য সহিত প্রকাশ করিয়াছিলেন। আমি মানুষকে মানুষই রাখিতে চাই, মানুষকে অমানুষ করিতে চাহি না। রামমোহন রায় অসাধারণ মহাপুরুষ ছিলেন বটে, কিন্তু তথাপি তিনি মনুষ্যই ছিলেন। ১৮১৬ খৃষ্টাব্দে তিনি কেনোপরিষদ এবং ঈশোপনিষদ এবং পরুবৎসর কঠ, মুণ্ডক ও মাণ্ডুক্যোপনিষদ সানুবাদ প্রকাশ করেন। এই সকল পুস্তক তিনি নিজব্যয়ে মুদ্রিত করিয়া বিনামূল্যে বিতরণ করিতেন। তাঁহার বিতরিত পুস্তক সকল যে লোকে সাদরে গ্রহণ করিত, তাহার প্রমাণ এই যে তিনি পরে পরে এত শীঘ্র এতগুলি উপনিষদ গ্রন্থ প্রকাশ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। মূল্যদ্বারা ক্রয় করিয়া পুস্তক পাঠ করা দরিদ্র বঙ্গবাসীর

কখনও অভ্যাস ছিল না। এখনও কোন লাইব্রেরীতে গ্রন্থকার কোন পুস্তক প্রদান করিলে তাঁহাকে সে পুস্তকের বিক্রয়ের আশা পরিত্যাগ করা উচিত।

রামমোহন রায় যে বাল্যকাল হইতেই স্বদেশের উদ্ধারসাধনে অথবা ধর্ম্ম-সংস্থাপনে কৃতসংকল্প হইয়াছিলেন, তাহার বিশেষ কোন পরিচয় পাওয়া যায় না। তবে, মূর্ত্তিপূজার বিরুদ্ধে দুএকখানি পুস্তক লিখিয়াছিলেন, তাহা তাঁহার সাহিত্যিক বুদ্ধিপ্রবণতা এবং স্বাধীন চিন্তার পরিচায়ক মাত্র। কিন্তু এই স্বাধীন চিন্তা এবং সাহিত্যপ্রিয়তা উত্তরকালে সংগ্রামক্ষেত্রে তাঁহার যথেষ্ট সহায়তা করিয়াছিল। তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতৃবধূর সহগমনই আমাদের অনুমানে তাঁহার লক্ষ্য স্থির করিয়া দিয়াছিল। লোকটা অতিশয় কর্ম্মকুশল এবং প্রত্যুৎপন্নমতিবিশিষ্ট ছিলেন—অল্পক্ষণের মধ্যেই কার্য্যকারণভাব হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিতেন। তিনি যখনই এই সহগমনের ব্যাপার দেখিলেন, সঙ্গে সঙ্গে ইহাও আলোচনা করিয়া দেখিলেন যে স্বাধীনচিন্তার স্রোত সমাজের মধ্যে প্রবাহিত না করিলে এই সহমরণপ্রথা নিবারিত হইতে পারিবে না। পুনশ্চ এই স্বাধীনচিন্তার কারণ চিন্তা করিতে যাইয়া বুঝিলেন যে যতদিন স্বদেশীয়গণ গড্ডলিকাপ্রবাহের ন্যায় গতানুগতিকভাবে বিদ্যাশূন্য ব্রাহ্মণদিগের অনুসরণ করিয়া মূর্ত্তিপূজা অবলম্বন করিবেন, সৃষ্ট বস্তুকে স্রষ্টা বলিয়া পূজা করিবেন, ততদিন স্বাধীনচিন্তার অবসর হইবে না—স্বাধীনচিন্তা অবলম্বন করিতে গেলে স্বাধীনতার মূল সেই পরমেশ্বরকে হৃদয়ে স্থান দিতে হইবে! এই সকল কারণে রামমোহন রায় প্রথমেই সতীদাহ নিবর্ত্তন প্রভৃতি অবান্তর বিষয়সকলে হস্তক্ষেপ না করিয়া একেবারে মূলে যাইয়া ব্রহ্মপূজা প্রবর্ত্তনে সচেষ্ট হইলেন। তিনি ঈশোপনিষদের ইংরাজী অনুবাদের ভূমিকায় লিখিতেছেন—"I have never ceased to contemplate with the strongest feelings of regret, the obstinate adherenee of my courtrymen to their fatal system of indolatry, inducing, for the sake of propitiating their supposed Deities, the violation of every humane and social feeliug. And this in various instances; but more especially in the dreadful acts of self-destruction and the immolation of the nearest relations, under the delution of

conforming to sacred religious rites. * * * Under these impressions, therefore, I have been impelled to lay before them genuine translations of parts of their scripture, which inculcates not only the enlightened worship of one God, but the purest principles of morality."

রামমোহন রায় যতদিন আরবী ও পারসী ভাষায় কোরাণের বয়েদ ধরিয়া পুস্তক লিখিতেছিলেন, ততদিন তাঁহার বিরুদ্ধে বিশেষ গুরুতর কোন আন্দোলন উপস্থিত হয় নাই। কিন্তু যখন শাস্ত্রসমূহকে ভিত্তি করিয়া জাতীয় বঙ্গভাষায় এবং রাজভাষা ইংরাজীভাষায় মূর্ত্তিপূজার বিরুদ্ধে পুস্তক প্রকাশ করিতে লাগিলেন, তখন চারিদিকে ঘোর অন্দোলনের তরঙ্গ উত্থিত হইতে লাগিল। ইহার কারণ এই যে, তখন বঙ্গদেশে ভাল সংস্কৃত এবং বিশেষত বাঙ্গালা পুস্তকের বড়ই অভাব ছিল। লোকেরা এই সকল পুস্তক পাইয়া আদরের সহিত পাঠ করিতে লাগিলেন। এখন, বিদ্যাশূন্য ভট্টাচার্য্যগণের, ঠাকুরঘরে নিয়মিত ঘণ্টানাড়াই জীবনের ব্রত ছিল; তাঁহারা দেখিলেন যে যদি সকলেই মূর্ত্তিপূজা পরিত্যাগ করিয়া ব্রহ্মপূজা অবলম্বন করেন, তাহা হইলে তাঁহাদের ঘণ্টানাড়া কাজও উঠিয়া যাইবে, এক কথায়, তাঁহাদের উদরান্নের অসংস্থান ঘটিবে। তাঁহারা চতুর্দ্দিক অন্ধকার দেখিতে লাগিলেন এবং আপনাদের মধ্যে ঘোঁট বা আলোচনা করিতে লাগিলেন। সেকালে ব্রাহ্মণ পণ্ডিত ভট্টাচার্য্যদিগের হিন্দুপরিবারের সর্ব্বত্র অবাধ গতিবিধি ছিল, কাজেই হিন্দুসমাজে অন্তঃপুর প্রভৃতি সকল স্থানেই সেই সকল আলোচনার তরঙ্গ আসিয়া প্রবেশ করিল। অবশেষে তাঁহারা রাজা রাধাকান্ত দেবের শরণাপন্ন হইলেন। রামমোহন রায়ের এক হিন্দুস্থানী বন্ধু তুলাবাজারের বিহারীলাল চৌবে প্রচলিতপ্রথানুসারে ১৮১৯ খৃষ্টাব্দে নিজ ভবনে এক মহা বিচারসভা আহ্বান করিলেন। তথায় রাজা রাধাকান্তদেব সদলবলে বিচারার্থ উপস্থিত হইলেন। সুব্রহ্মণ্য শাস্ত্রীই তর্কে নেতৃত্ব গ্রহণ করিলেন। তাঁহার তর্ক এই যে, বঙ্গদেশে প্রকৃত বিশুদ্ধ ব্রাহ্মণ পাওয়া যায় না, সুতরাং এখানে বেদপাঠ হওয়া উচিত নহে। সুব্রহ্মণ্যশাস্ত্রী এই কথা বলিলে, কিছুক্ষণ সকলে নিস্তব্ধ হইয়া রহিলেন; কেহই প্রতিবাদ করিতে সাহস করিলেন

না। অবশেষে রামমোহন রায় গম্ভীরভাবে তাঁহার মত খণ্ডন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। ঘোরতর তর্কযুদ্ধের পর সুব্রহ্মণ্যশাস্ত্রীকে নিরস্ত হইতে হইল। স্বভাবতই এই বিচার সভার কথা এবং সঙ্গে সঙ্গে রামমোহন রায়ের জয়ের কথা, তাঁহার অসামান্য বিচারক্ষমতার কথা বিদ্যুতের মত চতুর্দ্দিকে বিস্তৃত হইয়া পড়িল।

রামমোহন রায় কলিকাতায় আসিয়াই এক আত্মীয়সভা স্থাপন করিয়াছিলেন। এই সভায় তত্ত্বালোচনা হইত, রামমোহন রায়ের পণ্ডিত শিবপ্রসাদ মিশ্র বেদপাঠ করিতেন এবং প্রসিদ্ধ গায়ক গোবিন্দমালা ব্রহ্মসঙ্গীত করিতেন। ক্রমে দলাদলির প্রভাবে, বিদ্যাশূন্য ভট্টাচার্য্যদিগের অনুগ্রহে তাঁহার বন্ধুবান্ধব অনেকেই তাঁহাকে পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইলেন, কেবল দ্বারকানাথ ঠাকুর, রাজা কালীশঙ্কর ঘোষাল, গোপীনাথ মুন্সী, ব্রজমোহন মজুমদার প্রভৃতি কয়েকজন আজীবন তাঁহাকে পরিত্যাগ করেন নাই। রাজা জয়কৃষ্ণ সিংহ কেবল পরিত্যাগ করিয়াই ক্ষান্ত ছিলেন না। তিনি সর্ব্বত্র এই মিথ্যা অপবাদ রটনা করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন যে, আত্মীয়সভায় গোবৎস হত্যা করা হয়। সেকালে হিন্দুর বাটীতে গোহত্যার কথা লোকের নিকট কি ভয়ানক বোধ হইত, তাহা আমরা এখন বোধ হয় কল্পনায়ও আনিতে পারি না। উপরোক্ত বিচারসভায় এবং আত্মীয়সভায় গোহত্যার অপবাদ রামমোহন রায়কে হিন্দুসমাজে একজন চিহ্নিত ব্যক্তি করিয়া তুলিয়াছিল। অপবাদসমূহ অবশ্য রামমোহন রায়কে লেশমাত্র বিচলিত করিতে পারে নাই। তিনি সর্ব্বদা আপনার উদ্দেশ্যসাধনে যত্নশীল থাকিতেন, এবং প্রতিদিন সন্ধ্যাকালে গম্ভীরভাবে পরমেশ্বরের উপাসনা করিতেন। যে সকল সঙ্গী রামমোহনকে বিপদে পরিত্যাগ করিলেন না, বিপক্ষ লোকেরা তাঁহাদিগকে নাস্তিক বলিয়া আপনাদেরই গাত্রযন্ত্রণা নিবারণ করিবার চেষ্টা করিত।

অপরদিকে তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র গোবিন্দ প্রসাদ সম্পত্তির অংশ পাইবার জন্য সুপ্রীম কোর্টে এক মকদ্দমা উপস্থিত করেন। পূর্ব্বে বলিয়া আসিয়াছি যে গোবিন্দ প্রসাদই উত্তরাধিকারসূত্রে পৈতৃক বিষয় লাভ করিয়াছিলেন, এখন দেখিতেছি যে তিনিই আবার সেই সম্পত্তির অংশ পাইবার জন্য নালিশ রুজু করিয়াছেন, ইহাতেই বোধ হয় যে গোবিন্দ প্রসাদ বিষয় রক্ষা করিতে অসমর্থ

হওয়ায় যখন নিলামে তাহা উঠাইয়া দিয়াছিলেন, সেই সময়ে রামমোহন রায় তাহা সুবিধা বুঝিয়া ক্রয় করিয়া লইয়াছিলেন। কাজেই মকদ্দমায় ফলে গোবিন্দ প্রসাদ ব্যর্থমনোরথ হইলেন এবং পরিশেষে ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া রামমোহন রায়কে এক পত্র লিখিলেন। রামমোহন রায়কে এই মকদ্দমা লইয়া এতদূর ব্যস্ত থাকিতে হইয়াছিল যে তাঁহাকে বাধ্য হইয়া আত্মীয় সভার অধিবেশন দুই বৎসর কাল স্থগিত রাখিতে হইয়াছিল।

যে সকল ঘটনা রামমোহন রায়কে ইংরাজ জাতির সুনজরে আনয়ন করিয়াছিল, তন্মধ্যে তিনটী প্রধান—(১) সতীদাহের বিরুদ্ধে আন্দোলন, (২) খৃষ্টীয় মিশনরিদিগের সহিত তর্ক এবং (৩) ইংরাজীশিক্ষা বিস্তারের পক্ষে সহায়তা। যে সময়ে গোবিন্দ প্রসাদ তাঁহার নামে মকদ্দমা উপস্থিত করেন, সেই সময়ে আত্মীয় সভার কার্য্য বন্ধ ছিল দেখিতে পাই, কিন্তু রামমোহন রায় একেবারে নিশ্চিন্ত ভাবে বসিয়া ছিলেন না। ১৮১৮ খৃষ্টাব্দে সহমরণ বিষয়ক প্রবর্ত্তক ও নিবর্ত্তকের প্রথম সংবাদ প্রকাশ করেন। আমাদের অনুমান হয় যে জগন্মোহনের পত্নী-চতুষ্টয়ের মধ্যে সহমৃতা মধ্যমা পত্নী অলকমঞ্জরী গুণবতী গৃহলক্ষ্মী ছিলেন এবং রামমোহন তাঁহার গুণমুগ্ধ ছিলেন। সম্ভবত তিনি জীবিত থাকিলে গোবিন্দপ্রসাদ মকদ্দমা উঠাইতে পারিত না। বোধ হয় এই কারণে গোবিন্দ প্রসাদের মকদ্দমা অলকমঞ্জরীর সহমরণের বিষয় দ্বিগুণ বলে রামমোহনের স্মৃতিপথে এই সময়ে আনয়ন করিয়াছিল। রামমোহন রায় প্রথম পুস্তক প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে তাহার ইংরাজীতে অনুবাদও প্রকাশ করিলেন। দ্বিতীয় সংবাদ পরবৎসরে প্রকাশিত হয়। ইহারও ইংরাজী অনুবাদ সঙ্গে সঙ্গে যথাসময়ে প্রকাশিত হইল। এই দ্বিতীয় পুস্তকের অনুবাদ তদানীন্তন গবর্ণর জেনেরল মার্কুইস অব হেষ্টিংসের সহধর্ম্মিণীর নামে উৎসর্গ করিয়াছিলেন। সেকালের পক্ষে ইহা অল্প সৎসাহসের কর্ম্ম নহে। ১৮৩০ খৃষ্টাব্দে তৃতীয় পুস্তক প্রকাশিত হয়। এতদ্ভিন্ন ইংরাজী ভাষায় তিনি সতীদাহের বিরুদ্ধে সমুদয় যুক্তিতর্কের সারমর্ম্ম লিখিয়া প্রকাশ করিয়াছিলেন।

কেবল কথোপকথন ও পুস্তক প্রচার দ্বারা সহমরণ প্রথার অবৈধতা ও নিষ্ঠুরতা বুঝাইয়া দিয়া রামমোহন রায় ক্ষান্ত হইতেন না। তিনি কখন কখন কলিকাতার গঙ্গাতীরে উপস্থিত হইয়া সহমরণ নিবারণেরও অনেক

চেষ্টা করিতেন। বীরনৃসিংহ মল্লিকের পরিবারস্থ কোন একটী স্ত্রীলোক সহমৃতা হইবার জন্য গঙ্গাতীরে উপস্থিত হন। রাজা রামমোহন রায় এই সংবাদ পাইয়া তৎক্ষণাৎ তথায় উপস্থিত হইলেন এবং সহমরণ হইতে স্ত্রী-লোকটীকে প্রতিনিবৃত্ত করাইবার জন্য তাঁহার আত্মীয়গণকে নানাপ্রকারে বুঝাইতে লাগিলেন। তাঁহারা বিরক্ত হইয়া বলিলেন—"হিন্দুর কার্য্যে মুসলমান কেন?" রামমোহন রায় তাহাতে কোনপ্রকার অসন্তোষ প্রকাশ করিলেন না।

সতীদাহ বিষয়ে পুস্তক প্রকাশ করাতে, রামমোহন রায় গবর্ণমেণ্ট হইতে প্রশংসা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। এই সূত্রে গবর্ণর জেনেরল লর্ড আমহার্ষ্ট, লর্ড বেণ্টিঙ্ক, বিশপ্ হিবর প্রভৃতি অনেক সম্ভ্রান্ত ইংরাজের সহিত পরিচিত হইলেন এবং অনেকের নিকটে চিহ্নিত হইয়া রহিলেন। দ্বারকানাথ ঠাকুর রামমোহন রায়কে সতীদাহ বিষয়ে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছিলেন—তাঁহার সাহায্য ব্যতীত সতীদাহ নিবারণে রামমোহন রায় কৃতকার্য্য হইতেন কি না সন্দেহ। ১৮১৯ খৃষ্টাব্দের আগষ্ট মাসে সতীদহ নিবারণের জন্য গবর্ণমেণ্টের নিকট এক আবেদন পত্র প্রেরিত হয়। আমাদের অনুসন্ধানের ফলে বুঝিয়াছি যে রাজা রামমোহন এবং দ্বারকানাথ ঠাকুরইহার মূলে ছিলেন। ইহাঁদিগেরই সহিত লর্ড বেণ্টিঙ্ক এই বিষয়ে আলাপ করিয়া বুঝিলেন যে সতীদাহ নিবারণ একান্ত কর্ত্তব্য—অবশেষে ১৮২৯ খৃষ্টাব্দে ৪। ডিসেম্বর তারিখে সমুদয় ভারত হইতে সতীদাহ উন্মূলিত হইল। সতীদাহ নিবারণের ফলে রামমোহনের দল যেমন একদিকে গবর্ণমেণ্ট এবং ইংরাজজাতির নিকটে বিশেষ পরিচিত হইলেন ও সম্মান পাইতে লাগিলেন, অপরদিকে হিন্দুসমাজেরও আবালবৃদ্ধবনিতার নিকটেও পরিচিত হইয়া অভিশাপ ও গালাগালি লাভ করিতে লাগিলেন। রাজা রাধাকান্ত দেবের নেতৃত্বে পরিচালিত ধর্ম্মসভার অভিমানে আঘাত পড়িল, কারণ তাঁহারা সতীদাহনিবারণ প্রতিরুদ্ধ করিতে পারিলেন না। এইখানেই মহাপুরুষের মহিমা প্রত্যক্ষ উপলব্ধ হইবে। যাঁহারা মহাপুরুষ, স্বাধীন চিন্তা ও স্বাধীন ভাব যাঁহাদের জীবন তাঁহারা স্বাধীনভাবে নিজ মতামত ব্যক্ত করিতে কুণ্ঠিত হয়েন না। তাঁহারা যাহা সত্য বলিয়া বুঝিবেন, অটলভাবে অকুণ্ঠিতচিত্তে তাহা সমর্থন করিবেন। রামমোহন রায় বুঝিয়া-

ছিলেন যে সতীদাহ রহিত হওয়া কর্ত্তব্য, শত ব্রাহ্মণপণ্ডিতের অভিশাপ, সহস্র পণ্ডিতমূর্খ স্বদেশীয় এবং আত্মীয়গণের নিকট গালাগালি সকলই তুচ্ছ করিয়া জনসাধারণকে বুঝাইলেন যে সতীদাহ ভাল নহে। গবর্ণর জেনেরল-দিগের সহিত সাক্ষাৎ করা প্রয়োজন হইল, ভয়ে পশ্চাৎপদ হইলেন না। কিন্তু ধর্ম্মসভার সভ্যেরা ব্রাহ্মণদিগের বৃথা অভিশাপের ভয়েই অস্থির; তাঁহাদের স্বাধীন চিন্তা ও স্বাধীন ভাবে কার্য্য করিবার অবসর কোথায়? তাঁহারা একদিকে যেমন ব্রহ্মণ্যহীন ব্রাহ্মণেরও দাস, সেইরূপ হ্যাটকোটধারী ইংরাজ নামধারী ব্যক্তিমাত্রেরই সেবকানুসেবক। তাঁহারা নিজে মনুষ্যত্বের উচ্চভূমিতে দাঁড়াইতে পারেন না—যাঁহাদের একটু প্রতাপ দেখেন, তাঁহাদেরই চরণে মস্তক অবনত করেন। এই সকল ব্যক্তির সাধ্য কি যে গবর্ণর জেনে-রলের নিকটে গিয়া শাস্ত্রতত্ত্ব বুঝাইয়া দেন? তাঁহারা অন্তরে নিজেদের হীনতা বুঝিয়া সর্ব্বদাই জীবন্মৃত অবস্থায় অবস্থিতি করেন। ইহাঁরা সতীদাহ নিবারণের বিরুদ্ধে করিলেন কি?—এক ইংরাজ ব্যারিষ্টরের দ্বারা এক সুবৃহৎ দরখাস্ত লিখাইয়া পার্লামেণ্ট মহাসভায় প্রেরণ করিলেন। রামমোহন রায় ও দ্বারকানাথ ঠাকুরের ন্যায় জীবন্ত মানব সত্যের অপলাপে নীরব থাকিতে পারেন? দ্বারকানাথের পরামর্শে ও অর্থসাহায্যে * রামমোহন রায় ইংলণ্ডে গমন করিয়া সেই দরখাস্ত ব্যর্থ করিয়া দিলেন।

আমরা উপরে বলিয়া আসিয়াছি যে সতীদাহ নিবারণের চেষ্টার ন্যায় মিশনরিদিগের সহিত তর্কযুদ্ধও রামমোহন রায়কে ইংরাজ সমাজে পরিচিত করিয়া তুলিয়াছিল। ১৮১৯ খৃষ্টাব্দেই তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র গোবিন্দপ্রসাদ মকদ্দমায় পরাজিত হইয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া একখানি পত্র লিখিলেন। রামমোহন রায় এদিকে যখন নিশ্চিন্ত হইলেন, তখন তিনি তাঁহার মনোমত শাস্ত্রচর্চ্চায় পুনরায় মন দিলেন। তিনি যখন ডিগবি সাহেবের নিকটে কর্ম্ম করিতেন, সেই সময় হইতেই বোধ হয় বাইবেলশাস্ত্র পাঠ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। অন্তত কলিকাতায় আসিবার পর নিশ্চয়ই পাঠ করিয়াছিলেন। ১৮১৭ খৃষ্টাব্দে তিনি ডিগবিকে এক পত্রে লিখিলেন যে অন্যান্য সকল ধর্ম্মমত

* যতদূর স্মরণ হইতেছে, এই কথা বোধ হয় পিতামহদেবের মুখে শ্রবণ করিয়াছি।

অপেক্ষা "খৃষ্টপ্রচারিত" মত সকল (বাইবেলের প্রত্যেক মত নহে) সুনীতির প্রশ্রয়দাতা এবং বুদ্ধিমান ব্যক্তিমাত্রেরই উপযোগী। রামমোহন রায় তাঁহার পিতার সহিত তর্কে একটা করিয়া "কিন্তু" উঠাইতেন, এখন রামমোহনের উপরোক্ত উক্তি পড়িয়া আমাদেরও মনে একটা "কিন্তু" জাগরূক হইতেছে। রামমোহন রায় ডিগবি সাহেবের অধীনে কর্ম্ম করিয়াছিলেন, সুতরাং অন্তত কৃতজ্ঞতাবশত তাঁহার হৃদয়ে আঘাত দেওয়া অন্যায় বিবেচনা করিয়া এমন-ভাবে পত্র লিখিলেন যে তাহা মিথ্যা হইবে না অথচ ডিগবির সন্তোষ সাধন করিবে। বাইবেল যে সুনীতির প্রশ্রয় দেয় অথবা বুদ্ধিমান ব্যক্তির অবলম্ব-নীয় সে কথা বলেন নাই—বলিবেন যে খৃষ্টপ্রচারিত সত্যসকলই সুনীতিসঙ্গত এবং অবলম্বনীয়। বাল্যকালে কোরাণের সাংগ্রামিক ভাব তাঁহার ভাল লাগিয়াছিল, ক্রমে হিন্দুশাস্ত্রের তত্ত্বসকল আয়ত্ত করিয়া তর্কসংগ্রামে ব্যবহার করিতে বাধ্য হইয়া দেখিলেন যে তাহাতেও শান্তি নাই। তখন, বাস্তবিক খৃষ্টের নিজোচ্চারিত শান্তিমূল মন্ত্রসকল যে তাঁহার বয়োধিক্যের সঙ্গে সঙ্গে প্রিয় হইবে, তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি? বাল্যে অধীত হিন্দুশাস্ত্রের অন্তর্গত শান্তি মন্ত্রসকল তাহার অগাধতা বশত বোধ হয় তাঁহার অন্তঃকরণ অধিকার করিতে সমর্থ হয় নাই। কেবল যে যে অংশ ব্রহ্মপূজা সমর্থন করিয়াছে, সেই সেই অংশসকল তাঁহার হস্তে মূর্ত্তিপূজা খণ্ডনের নিমিত্ত তীক্ষ্ণ তরবারির ন্যায় ব্যবহৃত হইয়াছে। কুমারীকলেট কর্ত্তৃক উদ্ধৃত মিশনরি ইয়েট্‌স্ সাহেবের পত্র হইতেও আমরা বুঝিতে পারি যে বাইবেল অধ্যয়নের পূর্ব্বে রামমোহনের হৃদয় কঠোর বৈদান্তিক তত্ত্ব এবং কঠোর সাংগ্রামিক ভাবে পরিপূর্ণ ছিল।

১৮২০ খৃষ্টাব্দে রামমোহন রায় তাঁহার সুপ্রসিদ্ধ পুস্তক "The Precepts of Jesus, the guide to Peace and Happiness" প্রকাশ করিলেন। ইহার সংস্কৃত ও বঙ্গানুবাদ মূল পুস্তকের সঙ্গেই প্রকাশিত হইয়াছিল। ইহার ভূমিকায় একদিকে বলা হইয়াছে যে যিশুখৃষ্ট নিজে যে সকল কথা বলিয়াছেন, সেই সকল কথা অতি উচ্চ ও মানবসমাজে শান্তি আনয়ন করিতে সমর্থ, কিন্তু তাই বলিয়া সমগ্র বাইবেলকে অভ্রান্ত সত্য বলিয়া মানিতে হইবে এমন কোন কথা নাই; আরও, যীশুখৃষ্ট যে অন্যের পাপ সংগ্রহ করিয়া নিজের জীবন উৎসর্গের দ্বারা মানবজাতিকে উদ্ধারসাধন করিয়াছেন, ইহাও বিশ্বাস-

যোগ্য নহে। সহজেই বুঝা যাইতেছে যে এই পুস্তক একদিকে যেমন প্রাচীন হিন্দুসমাজের মধ্যে আন্দোলনের তরঙ্গ উপস্থিত করিয়াছিল, সেইরূপ খৃষ্টীয় মিশনরিদিগেরও মধ্যে ঘোরতর আন্দোলন উপস্থিত করিল। মূর্ত্তিপূজার পক্ষপাতী স্বদেশীয়গণের মধ্যে আন্দোলনের স্রোত চলিয়াছিল বটে কিন্তু তাহা বিশেষ প্রকাশ্য ভাব ধারণ করে নাই। যাহা প্রত্যক্ষভাবে স্বদেশীয়দিগের প্রাচীন আচারব্যবহারে হস্তক্ষেপ না করে, সে সকল বিষয়ে তাঁহাদের স্বাভা-বিক ঔদাসীন্য বশত তাঁহারা প্রকাশ্য আন্দোলন করিতে বড় একটা উদ্যুক্ত হয়েন না—উপরপড়া হইয়া স্বদেশীয়গণ বড় একটা কিছুই করিতে চাহেন না। হিন্দুসমাজের অন্তঃসলিল আন্দোলনের ফল এই হইল যে, যখন ইংরাজী শিক্ষাবিস্তারের জন্য হিন্দুকলেজ সংস্থাপনের প্রস্তাব হইল, তখন মূর্ত্তিপন্থী হিন্দু ধনী নেতৃগণ বলিলেন যে যদি কমিটিতে রামমোহন রায় থাকেন, তবে তাঁহারা কেহই তাহাতে যোগ দিবেন না এবং সেই কারণে রামমোহন রায় প্রত্যক্ষ-ভাবে হিন্দুকলেজের কমিটিতে থাকিতে পারিলেন না, তাঁহাকে সরিয়া দাঁড়াইতে হইল। কিন্তু সেকালের মিশনরিগণ প্রকাশ্যভাবে তর্কযুদ্ধে অবতরণ করিলেন, তাহার ফলে তাঁহারা রণে পৃষ্ঠপ্রদর্শন করিলেন। এই তর্কযুদ্ধের ফলে রামমোহনের নাম ইংরাজমহলে প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল।

রামমোহনের নাম সুপ্রতিষ্ঠিত হইবার তৃতীয় প্রধান কারণ ইংরাজী শিক্ষা বিস্তারের সহায়তা করা। তিনি বুঝিয়াছিলেন যে টুলো ধরণে কতকগুলি সংস্কৃত বুলি কণ্ঠস্থ করিলে একালে মনুষ্যত্ব সাধিত হওয়া অসম্ভব। তিনি বুঝিয়াছিলেন যে জ্ঞানচর্চ্চাই স্বাধীনতার একটী মূল কারণ। তাই নিজে যেমন দেশের জ্ঞানবিস্তারের জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছিলেন, তেমনই যখনই বিদ্যালয়স্থাপনের জন্য তাঁহার সাহায্য চাওয়া হইয়াছে, তখনই তাহা অকাতরে বিতরিত হইয়াছে। স্বাধীনচেতা মহাপুরুষমাত্রেরই স্বভাব পরমুখাপেক্ষা না করা। রামমোহন রায়ও পরমুখাপেক্ষা করিতেন না। তিনি জ্ঞানবিস্তারের সার্থকতা অথচ স্বদেশে তাহার অভাব যেই অনুভব করিলেন, অমনিই এক বিদ্যালয় স্থাপন করিলেন। ১৮২২ সালে সেই বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছিল। ১৮২৭ খৃষ্টাব্দে তাহার বিশেষ উন্নতির অবস্থা দৃষ্ট হয়। দুইজন শিক্ষক, একটী ১৫০৲ টাকা এবং দ্বিতীয়টী ৭০৲ টাকা

বেতনে, নিযুক্ত হইয়াছিলেন। সেকালে শিক্ষকের এরূপ বেতন কিছু অল্প নহে। প্রায় ৮০ জন ছাত্র জুটিয়াছিল। খৃষ্টীয় ধর্ম্ম শিক্ষা দেওয়া হইত না, কিন্তু নীতিশিক্ষা দেওয়া হইত এবং বুদ্ধিমান অধিকারী ছাত্রদের জন্য খৃষ্টিয় ধর্ম্মের ইতিহাসও পড়ান হইত। এই বিদ্যালয়কে রামমোহন রায় তাঁহার বন্ধুগণের শত অনুরোধ সত্ত্বেও সাধারণের সম্পত্তি করিয়া দিতে স্বীকৃত হইলেন না, কারণ তাহা হইলে তিনি নিজের মনোমত শিক্ষা প্রবর্ত্তিত করিতে অসমর্থ হইবেন। এই বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইবার কালে সেই সুপ্রসিদ্ধ প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য শিক্ষার দ্বন্দ চূড়ান্ত মাত্রায় উপস্থিত হইয়াছিল। ইংলণ্ডস্থ রাজপুরুষেরা এদেশীয় লোকের শিক্ষাসাধনার্থ একলক্ষ চব্বিশ হাজার টাকা প্রদান করেন, এবং অত্রত্য রাজপুরুষেরা তদ্দ্বারা একটী সংস্কৃত কলেজ সংস্থাপন করিতে উদ্যত হন। এখানকার গবর্ণমেণ্টের মধ্যে দুইটী দল হইল—একদল বলেন ঐ অর্থের দ্বারা ইংরাজী ভাষায় বিজ্ঞান প্রভৃতি পাশ্চাত্য জ্ঞানের বিস্তার করা হউক, অপর দল বলেন যে ঐ অর্থের দ্বারা সংস্কৃত, আরবী প্রভৃতি দেশীয় ভাষায় দেশীয় শাস্ত্রাদি আবিষ্কৃত হউক, অধীত হউক। এই দ্বন্দমূলক তর্ক কয়েক বৎসর চলিয়া পরিশেষে লর্ড আমহার্ষ্টের শাসনকাল ১৮২৩।২৪ খৃষ্টাব্দে এই দ্বন্দ অতি তীব্রভাব ধারণ করিল। ইত্যবসরে গবর্ণমেণ্টের পাশ্চাত্য-শিক্ষার পক্ষপাতী সম্প্রদায়ের হস্ত দৃঢ়তর করিবার জন্য রামমোহন রায় তাঁহার শিক্ষাসম্বন্ধীয় মতপ্রকাশক সেই সুপ্রসিদ্ধ পত্র তদানীন্তন গবর্ণর জেনেরল লর্ড আমহার্ষ্টকে বিশপ হিবরের হস্তে প্রেরণ করেন। একজন হিন্দুব্রাহ্মণের লেখনী হইতে এই পত্রখানি বাহির হইতে দেখিয়া বিশপ হিবর তাঁহার দৈনন্দিন লিপিতে আশ্চর্য্যভাব ব্যক্ত করিয়া গিয়াছেন। এখন, তাঁহার এই দৈনন্দিন লিপি এদেশের ও বিলাতের সরকারী বেসরকারী অনেক ইংরাজ আগ্রহের সহিত দেখিতেন, কাজেই হিবরের দৈনন্দিন লিপিতে রামমোহনের সম্বন্ধে ওরূপভাবে উল্লেখের ফলে ইংরাজ রাজপুরুষ এবং সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণের নিকটে তিনি পরিচিত হইয়া পড়িলেন। অবশেষে গবর্ণমেণ্ট পাশ্চাত্য-শিক্ষারই সমর্থন করিয়া সংস্কৃত কলেজের পার্শ্বেই হিন্দুকলেজ সংস্থাপিত করিলেন।

স্বদেশে শিক্ষাবিস্তার রামমোহন রায়ের আন্তরিক ইচ্ছা ছিল। তিনি

বুঝিয়াছিলেন যে সাধারণত পাশ্চাত্য ভাষায় বিজ্ঞান প্রভৃতির শিক্ষা দেওয়া না হইলে স্বদেশের উন্নতি অসম্ভব। সেই কারণে যেমন নিজে একটী ইংরাজী শিক্ষার বিদ্যালয় খুলিলেন, সেইরূপ ইংরাজ গবর্ণমেণ্টকেও ইংরাজীশিক্ষারই বিদ্যালয় খুলিবার জন্য বিশেষ অনুরোধ করিলেন। কিন্তু তিনি ইহাও বুঝিয়াছিলেন যে প্রত্যেক স্বদেশীয় ব্যক্তিকেই যে ইংরাজী ভাষা ও বিজ্ঞান শিক্ষা করিতে হইবে তাহার কোন অর্থ নাই। আর্য্য দর্শনশাস্ত্রের নিকট অপর কোন দেশেরই দর্শনশাস্ত্র স্থান পাইতে পারে না। রামমোহন রায়ও একথা বারম্বার স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। তিনি বুঝিলেন যে দর্শনশাস্ত্র শিক্ষা দিতে গেলে পাশ্চাত্যভাষার কোনই সাহায্য লইবার প্রয়োজন নাই। এই কারণে ইংরাজী বিদ্যালয় খুলিবার প্রায় চার বৎসর পরে তিনি একটী বেদবিদ্যালয় খুলিলেন—এখানে উপনিষৎ, বেদান্ত প্রভৃতি ঋষিপ্রণীত শাস্ত্র সকল আলোচিত হইত। ক্রমে এখানে খৃষ্টীয় ধর্ম্মের তত্ত্ব প্রভৃতি শিক্ষা দেওয়াও তাঁহার কল্পনায় ছিল।

কলিকাতায় বাসকালে তাঁহার জীবনের তিনটী প্রধান ঘটনা, যাহার ফলে রামমোহন রায় স্বদেশে বিদেশে মহাপুরুষ বলিয়া খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন, সেই তিনটী ঘটনার বিষয় আলোচনা করিয়া আসিলাম। পরবর্ত্তী অধ্যায়ে আমরা তাঁহার জীবনের আরও কতকগুলি কার্য্য আলোচনা করিব।

শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

JOTINDRA NATH DUTTA

পদরাগ।

(১৬) জপ'রে অন্তরে।

মুলতান—মধ্যমান।

জপরে অন্তরে পরব্রহ্ম জ্ঞানময়,
শুভ্র মহিমালোকে দূরে যাবে ভয়;
রচিলেন বিশ্ব যিনি পূর্ণ জ্ঞানবলে,
ব্যাপ্ত সর্ব্বত্র তিনি শূন্যে জলে স্থলে;
স্থিরাসনে বসি সদা হের সেই জ্যোতি,
পূর্ণ তব মনস্কাম হবে শুভ গতি।

(১৭) অন্তর্যামী।

সাহানা—ঝাঁপতাল।

অন্তর্যামি! তুমি জানিছ সকলি,
অন্তরের পাপ লুকাব কি বলি'?
তুমি জান সব কথা,
দুঃখ সুখ মনো ব্যথা,
কোন্ ভাবমেঘে চমকে বিজলি,
কোন্ মধুপানে ছোটে মুগ্ধ অলি;
যত কেন পাপী হই
আশা বুকে বেঁচে রই,

ধুয়ে দেবে সব প্রেমেতে বিগলি',
জানি মোরে, ছেড়ে যাবেনাক চলি;
যদিবা জীবন যায়,
রেখো তব পদছায়ে,
কৃপা করি দিও চরণের ধূলি।

(১৮) দুই পক্ষ।

পরজ—কাওয়ালি।

সংসারে আসিয়া যদি মুক্ত হ'তে চাও,
বিহগের মত দুই পক্ষে উড়ে যাও;—
এক পক্ষ প্রিয়কার্য্য, আর উপাসনা,
এ দুয়ের সহায়েতে পুরিবে বাসনা,
সংসারের বাধাবিঘ্ন পড়ে' রবে কোণে,
তুমি সুখে বিহরিবে মুক্ত সমীরণে।

(১৯) কোথা যাও অন্ধকারে?

সুরট—ঝাঁপতাল।

না দেখিয়া তাঁরে, কোথা যাও অন্ধকারে?
কেহ নাই সাথে, একা যেতে হবে পারে;
ওই দূরে জ্বলে দীপ এক জ্ঞানময়,
ওইখানে গেলে পরে পাইবে আলয়;
হোথা তুমি যাও চলে' ধরি সোজাপথ,
না রহিবে ভয়, পূর্ণ হবে মনোরথ।

(২০) প্রেমচন্দ্র।

ইমনকল্যাণ—সুরফাঁকতাল।

হৃদাকাশে উদিলরে প্রেমচন্দ্র মধুময়,
পুলকিছে দশদিশি অমানিশা হ'ল ক্ষয়;
নিরখিয়া প্রেমমুখ
পাইবরে চিরসুখ,
আর না রহিবে প্রাণে বিরহের জ্বালা ভয়।

শ্রীঋতেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

বার বৎসর পূর্ব্বে
বার জনে

বরাকরে বারদিন।

১

আশ্বিন মাস, খটখটে রৌদ্র, আকাশ স্বচ্ছ সুনীল, নদী, সরোবর তক্ তক্ করিতেছে, চমৎকার সময়। আমরা ক'টিতে মিলিয়া বেড়াইতে বাহির হইলাম। ইচ্ছা এদিক ওদিক চারিদিক ভ্রমণ করিয়া বেড়াই। বেড়াইবার জন্য মন উড়ো উড়ো করিতেছে, পাখীদের আকাশে উড়িতে দেখিতেছি, দূরাকাশে উর্দ্ধে দুএকটী চীল ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, তাহাদের মত হইয়া মনও দূরদেশে চলিয়া যাইতে ইচ্ছা করিতেছে, মনকে আর থামানো যায় না, তাহাতে

অ-ত, প্র-থ, অ-র এরা সকলেই ধরিয়া পড়িয়াছে "চল এবার বেরিয়ে পড়তে হবে"। কিন্তু কোথায় বাহিরিয়া পড়িব তার ঠিক নাই, শুধু সকলের বাহির হইয়া পড়িবার ইচ্ছা। আশ্বিন মাসে শরতকালে এরূপ বাহির হইবার ইচ্ছা হয় কেন? বর্ষাকালে স্বাভাবিকই অনেকটা ঘরে থাকিতে ইচ্ছা হয়।—আর বর্ষাকালে যেরূপ জল কাদা, পথে ঘাটে অসুবিধা, কে ঘরের বাহির হইয়া সুখে বেড়াইবে বল? বর্ষাও গেল, পথ ঘাট জলস্থল সব পরিষ্কার হইয়া গেল, বহিঃপ্রকৃতির পরিষ্কার ভাবের সঙ্গে আমাদের প্রকৃতিও যেন পরিষ্কার ভাব ধারণ করে ও বাহিরের প্রকৃতির সহিত মিশিতে চায়। এই জন্যই বুঝি যেন শরৎকালে বাহির হইয়া বেড়াইবার জন্য বহিঃপ্রকৃতির শোভা দেখিয়া বেড়াইবার বড় স্পৃহা হয়। মেঘাচ্ছন্ন প্রকৃতি যেমন গুম হইয়া থাকে, মানব প্রকৃতিও সেইরূপ গুম হইয়া স্তব্ধভাবে গৃহে চুপ করিয়া বসিয়া থাকিতে চায়। শরৎকালের মেঘ আকাশে উদাস ভাবে উড়িয়া আসে, আর হুহু করিয়া ফের উড়িয়া চলিয়া যায়, আমাদের মনও তাই শরতের মেঘের মত হু হু করিয়া উড়িয়া যেতে চায়, শরতের রৌদ্রের মত খটখটে হয়, শরতের আকাশের মত উদাস পরিষ্কার হয়। কিন্তু নানালোকে নানাকথা বলে, কেউ বলে এখন বড় ম্যালেরিয়ার সময়, এখন নানারোগ শোক চারিধারে। শুনিয়া আবার রোগশোকের ভয়ও জন্মে, উড়িয়া যেতে ইচ্ছা করিলেও উড়িয়া যেতে পারি না। বর্ষাকালে শারীরিক পিত্তজনিত দোষসমূহ শরৎকালে প্রকুপ্ত হইয়া রোগের সৃষ্টি করে। শরৎকালে বর্ষার পিত্তকোপজনিত নানারোগ হইয়া থাকে:

"বর্ষাসু চীয়তে পিত্তং শরৎকালে প্রকুপ্যতি।"

বরাবর এই শরৎকালকে প্রাচীন কাল হইতে সকলেই কিঞ্চিৎ ভয় চক্ষেও দেখিয়াছেন। প্রাচীন কালেও এই শরতকাল আসিলেই ইহলোক হইতে অনেকে সরিয়া যাইতেন। সেই জন্য বেদে আছে—

"শতং জীবংতু শরদঃ।"

শত শরদ জীবিত থাকুক।

যদিচ শরতকালে বটে নানা অসুখের ভয়ও আছে, তেমনি লোভও আছে: রেলোয়ে কন্সেসনে অর্দ্ধেক ভাড়ায় যাওয়া আসা। ভয়ও আছে, লোভও আছে। যাই হৌক একটা স্থির করিয়া ফেলা গেল; বরাকরের টিকিট লইয়া হাবড়ার

গাড়ীতে উঠিলাম। বরাকরের টিকিট দেখিয়া দুএকটী সাহেব জিজ্ঞাসা করিল "are you going to Barakar—ইত্যাদি।" আমরা ইংরাজীতে উত্তর দিলাম "বায়ুসেবনের জন্য যাচ্চি।" অ-প্র প্রভৃতি আত্মীয় বন্ধুবর্গের নামে আমার তোরঙ্গ প্রভৃতি luggage য়ের জন্য দিয়াছিলাম। আমি শুধু সাফ একটী ছড়ি ও ছাতা সঙ্গে লইয়া ষ্টেসনে ঘুরিতেছি। একজন ষ্টেসনের কর্ম্মচারী সাহেবও ঘুরিতে ঘুরিতে আমার সামনে আসিয়া পড়িয়াছে এবং যেন কি প্রশ্ন করিবার ইচ্ছায় আরও আমার নিকটবর্ত্তী হইল, আমার দীর্ঘ কেশ জটা ও কুন্তলময় ছিল, আমার মুখের দিকে তাকাইল। ভাবিলাম কেন তাকাইতেছে, আমি ভাবিলাম বোধ হয় লগেজের সম্বন্ধে কিছু জিজ্ঞাসা করিবে। কিন্তু তাহা নয় জিজ্ঞাসা করিল Are you a member of the Tagore family? পরে আরও বলিল 'তোমার সঙ্গে কালিকৃষ্ণ ঠাকুরের কি যোগ? তিনি তোমার কে হন?' আমি বলিলাম Grand Uncle। সে বলিল "তোমার মুখ দেখেই গোড়াতেই আমি বুঝেছিলুম যে তুমি ঠাকুর গোষ্ঠীর, তাঁর মত অনেকটা মুখের ভাব—Kalikrishna Tagore is a great traveller." আমি মনে মনে ভাবিতেছি যাক এখন রেলে চড়লে বাঁচি। কিছুক্ষণ পরেই সকলে মিলিয়া রেলে চড়িলাম। শরৎকালে আশ্বিন মাসে বরাকর যাত্রা করিলাম। স্থির হইল বরাকরে গিয়া তথা হইতে শ্যামপুরে যাইব, বরাকর হইতে সে আবার অনেকটা দূরে; তাহার চারিদিকে পাহাড়, মাঝে আমরা এক ক্ষেত্রীর বাঙ্গলায় থাকিব, পরিষ্কার স্থান। শুনিয়াছি সেখানে ম্যালেরিয়া প্রভৃতি রোগের ভয় একটুও নাই। সেখানে পূর্ব্বকালে লোকে যকৃত প্লীহা প্রভৃতি রোগ সারাইবার জন্য বরাকর নদীতে স্নান করিতে যাইত—তখন ট্রেনের গন্ধও ছিল না। খুব স্বাস্থ্যকর জায়গা ছিল।

ট্রেণ ছাড়িল। সমস্ত রাত্রি গেল প্রাতে সীতারামপুরে নাবিয়া পুনরায় বরাকরের শাখা-রেল-গাড়ীতে চড়িলাম। প্রায় দুপুর বেলায় বরাকরে পৌছিলাম। আমাদের মধ্যে আমিই বিশেষ লোকদের নজরে পড়িলাম, কারণ আমার কেশ দীর্ঘ জটাময় ও ঘন কুন্তলময় ছিল। বেশভূষা ও কেশে আমার অপরদের মধ্যে একটু পার্থক্য ছিল বলিয়া সাধারণ লোকের একটী নজরের জিনিষ হইয়াছিলাম।

আমার বেশ ও আমার কেশ
মজার হ'য়েছিল বেশ।

আমাদের জন্য বৈদ্যনাথ ব'লে ক্ষেত্রী বাবুর বাঙ্গলার একজন লোক গিয়ে বরাকরে অপেক্ষা করিয়া থাকিবার কথা ছিল। এই ঠিক ছিল যে কয়লার যে এঞ্জিনগাড়ি বরাকর হইতে শ্যামপুরে যায় সেই গাড়ীতে চড়িয়া শ্যামপুরে আসিয়া আমরা নাবিব। কিন্তু কই বৈদ্যনাথই বা কোথায় কয়লার এঞ্জিনই বা কোথায়? আমরা কিন্তু হতাশ হইলাম—অ, প্র-রা ভারি লজ্জিত হইল। কারণ তাহারাই আমাকে বলিয়াছিল যে, 'সে বাঙ্গলা খুব ভাল জায়গা, লোক সব ঠিক আছে, তুমি আমাদের সঙ্গে চল'।—কিন্তু কোথাও কিছু নাই। অনেককে জিজ্ঞাসা করা গেল যে 'বৈদ্যনাথ বলিয়া কোন লোক কি এখানে এসেছিল?' কেউ বলিতে পারিল না।—শেষে অনেকক্ষণ পরে একটী গমসাপারা লোক দেখা দিল—কাছে আসিয়া বলিল "একটু আগেই কয়লার এঞ্জিন শ্যামপুরে চ'লে গেছে, তাই একটা ঠিকে গাড়ী এনেছি সেই গাড়ী করিয়া আপনাদের নিয়ে যাবো। আমি আপনাদের জিনিষ-পত্তর নিয়ে পরে যাচ্চি।" গাড়ীর কোচমানকে বৈদ্যনাথ বোধ হয় যেখানে প্রথমে নিয়ে যেতে বলিয়া দিয়াছিল, সে সেইখানে লইয়া চলিল। অ্যাঙ্গচ ব্যাঙ্গচ করিয়া এক ভাঙা থার্ড ক্লাসের গাড়ী পাহাড়ীটিবির উপর নীচে দিয়া যাইতে লাগিল। বরাকর হইতে বহু দূরে শেষে এক নদীর ধারে, নির্সের চটি বলিয়া এক জায়গায় আসিয়া উপস্থিত হইল। আমরা কতকজন গাড়ী পছন্দ না করিয়া হাঁটিয়া চলিতে লাগিলাম। গাড়ীটী এমন হ্যাঁচট ম্যাচট করিতে লাগিল যে তার চেয়ে আমাদের কতক জনের পায়ে হাঁটা শ্রেয় বলিয়া বোধ হইল। আর কতকজন যাহারা বয়সে ছোট তাহারা ও একটী ছোট মেয়ে ও ঝি ইহারা সকলে গাড়ী পছন্দ করিল। গাড়ী থেকে তাহারা নড়িবে না। যাহোক শেষে কোনক্রমে আমরা সকলে নির্সের চটিতে আসিয়া পৌছিলাম। সেখানে আমরা থাকিবার বাঙলার কথা জিজ্ঞাসা করাতে লোকেরা নিকটবর্ত্তী একটী কাদার কুটীর দেখাইয়া দিল। অ ও প্র তাই দেখিয়া মাথায় হাত দিয়া একটা খাটিয়া ছিল তাহার উপর বসিয়া পড়িল এবং সহসা খাপ্পা হইয়া বলিয়া উঠিল।—"এই কি বাঙলা! এ যে মালির ঘর,

তোমার ক্ষেত্রী বাবু কি এই বাঙ্গলার কথা বলিয়া দিয়াছেন? তা জান্‌লে আমরা আস্‌তেম না। এ বাঙ্গলায় যে আমাদের চাকরেরাও থাকে না।" সেখানকার লোকেরা বলিল—"এই তো নির্সের চটি, এই তো এখানকার বাঙলা।" ছোট লোক তারা কি জানে? প্র-বাবুর ভয়ে ভাবনায় পেট গরম হইয়া গেল, একেবারে খাটিয়ায় হাত পা ছড়াইয়া গড়াইতে লাগিলেন আর হৃদয় ভৃত্যকে বলিলেন "ও হৃদয় একটা সোডাওয়াটার দাও বড় অসুখ করচে।" অ বাবু বলিলেন "বৈদ্যনাথ বেটা ডাকাত চোর নাহ'লে এ বাঙ্গলায় আমাদের কখনো পাঠিয়ে দেয়? বেটার চেহারা দেখলে না।" তখন সকলেই আমরা রৌদ্রতাপে ক্ষুধায় তৃষ্ণায় কাতর, মনে মনে সকলেরই কিছু ভয়ও জন্মিয়াছে। আমরা সকলেই অ বাবুর কথায় সায় দিয়া বলিলাম তা ঠিক ব'লেছ! বৈদ্যনাথটা লোকটা ভাল নয়, বেলা পড়ে' যাবে সন্ধ্যা হ'য়ে পড়বে তখন এই অজানাস্থানে মাঠের মধ্যে পাহাড়ের মধ্যে কে কি করবে কে জানে?" আমি বলিলাম 'ঠিক ব'লেছ বোলপুরে যে সর্দ্দার আছে সে শুনেছি আগে ডাকাতের সর্দ্দার ছিল, অনেকটা তার মত বৈদ্যনাথের মুখের ভাব। মুখ দেখে লোকটাকে বড় ভাল মনে হচ্চে না।"

অ—র ও প্র বলিল "এ স্থান ছেড়ে শীঘ্র চ'লে যাওয়াই ভাল, আমার বড় সন্দেহ হচ্চে। এই বেলা তাড়াতাড়ি চল এস্থান ছেড়ে চ'লে যাই।" অ—ত বলিল "তা ভাল কিন্তু বাড়ীর লোকে কি মনে করবে? সকলে আমাদের ছেলেমানুষেকাণ্ড মনে করবে।—বাড়ী ফিরে যেতেও লজ্জা করচে। কেহ বলিল "লজ্জা করচে তো থাক বিপদে পড়। শেষে স্থির হইল বরাকরে গিয়া রাণী স্বর্ণময়ীর বাঙলায় গিয়া থাকিব। সেটা শুনেছি ভাল বাঙলা সেখানে নিরাপদে থাকা যাইবে। এখানে শ্যামপুরে জনমনিষ্যি নেই। ইহাই আমাদের একরকম স্থির হইয়া গেল।—নির্সের চটির এধার ওধার খানিকটা গেলাম। বেড়াইতে বেড়াইতে কল কল শব্দ শুনিয়া নিকটস্থ নদীর ধারে গেলাম। ক্ষুদেনদী বহিতেছে দেখিলাম—অতি অল্প স্বচ্ছনির্ম্মল সলিল পাথরের উপর দিয়া নির্ঝরিণীর মত বহিয়া যাইতেছে। দেখিয়া আমাদের সকলের মনে হইল আমরা সেই স্বচ্ছসলিলে স্নান করিয়া তবে যাইব। আমাদের মধ্যে দুএকজন আগে হইতেই স্নান করিতে নামিয়াছিল। স্নান করিতে করিতে

আর্দ্রগাত্রে পাথরের উপর দিয়া দিয়া নদীর এপার ওপার করিতে লাগিল। একজন সহসা ওপারে একেবারে পাড়ের উপরে উঠিলেন। উঠিয়াই দেখিলেন একটী বিস্তৃত স্থানের মধ্যে একটী প্রকাণ্ড বাঙলা। এবং আনন্দে চীৎকার করিয়া বলিলেন "না, না, ঐই বাঙলা হবে। ক্ষেত্রীবাবু তো বলেছিলেন যে 'আপনাদের জন্য যে বাঙ্গলা ঠিক ক'রেছি সে বাঙ্গলার অনতিদূরে রেলোয়ে লাইন গেছে; ঐ যে রেলোয়ে লাইন দূরে দেখা যাচ্ছে। তবে নিশ্চয় ঐ বাঙলাই। চল চল। ঐ বাঙ্গলায় আমরা সকলে যাই।" তখন বিচার করিয়া ক্ষেত্রীবাবুর কথার সঙ্গে ঐ বাঙলার ব্যাপার সব মিলিল এবং আমরা নিঃসন্দেহ-চিত্তে সকলে নদী পার হইয়া সেই বাঙলার অভিমুখে চলিলাম এবং তথায় উপস্থিত হইয়া হাঁপ ছাড়িয়া যেন বাঁচিলাম।—কেমন বিস্তীর্ণ ভূমি, কি পরিষ্কার মুক্ত বায়ু বহিতেছে, দূরে সাঁওতালপাড়া, দূরে ঐ রেলোয়ে লাইন দেখা যাচ্চে, চারিদিকে পাহাড়ের শোভা, একটু উত্তরে পাঁড্রের পাহাড়, আরও দূরে ঐ—পরেশ নাথের পাহাড়, পশ্চিমে পঞ্চকোটের পাহাড়। এস্থানটী বড় মনোরম। শ্যামপুরটী এখন বড়ই মনোহর বলিয়া বোধ হইল। শ্যামপুরে এখানে যেন 'প্রাণপুরে' আনন্দ লাভ করিলাম। সন্ধে হ'ল। বাঙলার সম্মুখে চাঁদের আলোয় বসিয়া আমরা জোরে কথা কহিলেই অমনি তার প্রতিধ্বনি আসে। প্রতিকথায় আমাদের কে যেন সায় দেয়।—এটা হইবার কারণ বোধ হয় চারিধারে পাহাড় ও জঙ্গল বেষ্টন করিয়া আছে। তাই ধ্বনি প্রতিধ্বনি হইয়া ফিরিয়া আসে। সন্ধ্যায় সেই প্রতিধ্বনিতে এক মহানীরব গম্ভীর অনন্তের ভাব উপলব্ধি করিলাম।

ক্রমশঃ

স্বর্গীয় কবিবর বিহারী লাল চক্রবর্ত্তীর পত্র। *

১২৭১ সাল ১৫ই জ্যৈষ্ঠ।

প্রিয় সখা সমীপেষু

পুন সেই সুখহরা মর্ম্মজরা রোগ,
তোমার হৃদয়ে সখা করিতেছে ভোগ!
কেনরে বিকট কীট নিরাশ হুতাশ,
প্রায়ই সরস মনে কর এসে বাস?
একেবারে জেরে ফেল জনমের মত,
কুরে খাও সুখের মুকুল থাকে যত;
নিরমল দীপ্তিমান্ প্রফুল্ল আননে
মুড়ে রাখ বিষাদের ম্লান আবরণে;
যে নয়ন ভালবাসে ভ্রমিতে অম্বরে,
নত কোরে রাখ তারে ধরণী উপরে;
যে জন বেড়ায় হেসে ফুলের বাগানে,
বসাইয়া দাও তারে বিজন শ্মশানে?

হঠাৎ যে কোথা থেকে এই চোরাবাণ
বেঁধে গো বুকের মাজে, না পাই সন্ধান।

* এই অপ্রকাশিত পত্রটী গদ্যে পদ্যে লিখিত। কিন্তু কবিবর কাহাকে যে লিখিয়াছেন তাহা ঠিকটা জানা যায় না। কারণ পত্রে তাহার কোনও উল্লেখ নাই। তবে মনে হয় ইহা তাঁহার পরম বন্ধু দার্শনিক কবি শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়কে লিখিয়া থাকিবেন। ১২৭১ সাল ১৫ই জ্যৈষ্ঠ তারিখে ইহা লিখিত হয়। এবং সেই সময় স্বর্গীয় পিতৃদেব হেমেন্দ্র নাথ ঠাকুর কর্ত্তৃক ইহা সংগৃহীত ও সযত্নে রক্ষিত হইয়াছিল বলিয়া আজ আমরা সর্ব্বসমক্ষে প্রকাশ করিতে পারিলাম। পাঠকগণ আশা করি ইহার রসাস্বাদে তৃপ্তি লাভ করিবেন।

শ্রীখ, না, ঠা।

কেবল সদাই মন হুহু হুহু করে,
দুর্নিবার জ্বালা জ্বলে মর্ম্মের ভিতরে।
শূন্যময় ত্রিভুবন, সব অন্ধকার,
কোথাও কিছুই নাই এর প্রতিকার।
নির্জনে নিস্তব্ধ হয়ে বসিয়ে নীরবে
যতই জ্বলুক জ্বালা সহিতেই হবে।
আঃ কি আকণ্ঠবদ্ধ, কষ্ট ভয়ঙ্কর!
কতকাল হব আর হেন জ্বরজ্বর?

আজো তাই গোমুখীর ধারে
পুরাতন নিবিড় কান্তারে
বৃক্ষ স্কন্ধে যায় দেখা বিষাদের পত্র লেখা
সংস্কৃত অক্ষরের হারে।

বুঝি সেইকালে কোন জন
এই জ্বরে হয়ে জ্বালাতন
যাইয়ে বৈরাগ্য ছলে সে নির্জ্জন বনস্থলে
মনদুখ করেছে বর্ণন।

সেথা সেই নির্ঝরের সনে
খুব খুলে দেওয়া যায় মনে,
তার মত উচ্চরবে সম্বোধিয়ে বৃক্ষসবে
পোরা যায় দিগন্ত ক্রন্দনে।

সেথাকার হরিণের প্রায়
স্বাধীন সন্তুষ্ট থাকা যায় ;
নির্ঝর নির্ম্মল জল, তরুর মধুর ফল,
শোয়া যায় শাদ্বল শয্যায়।

বাঁশী লয়ে হয়ে একতান,
মিলায়ে পাখির তানে তান,
বসিয়ে শৃঙ্গের পরে ললিত করুণ স্বরে
গাও প্রকৃতির গুণ গান।

হায়! ইহা ভাবিতে যেমন,
কাজে যদি হইত তেমন,
মন রোগ প্রতিকার ঔষধের আবিষ্কার
বহু দিন হতো পুরাতন।

এ রোগের শান্তির কল্পনা,
কাঁচে সুদু জলের আল্পনা ;
হয়, প্রাণ সমর্পণ, নহে সহ আমরণ,
অন্য কথা উন্মত্ত জল্পনা।

দুদিন যে ভাল থাকা যায়,
সে কেবল পালা জ্বর প্রায়,
আচম্বিতে কোথা থেকে একেবারে ওঠে ঝেঁকে ;
প্রাণ আসে ওষ্ঠের আগায়।

ইহার মধ্যে একদিন তোমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিবার নিমিত্তে আমার অন্তঃকরণ অতিশয় উৎসুক হইয়াছিল, কিন্তু ধর্ম্মসংক্রান্ত প্রবন্ধ রচনারূপ গুরুতর তীর গ্রহণ করাতে তোমার সময় অত্যন্ত প্রয়োজনীয় হইয়া উঠিয়াছে, তাদৃশ সময়ের অল্পতা করিয়া দেওয়া একপ্রকার অকর্ত্তব্যের ন্যায় বোধ হইতে লাগিল, সুতরাং আর যাইতে পারিলাম না। আমার নিশ্চয় ভরসা আছে তুমি সমীচীনরূপে অর্থযুক্ত তেজাল ললিত সহজ পদ পরম্পরা দ্বারা পুরস্কার দাতার প্রগাঢ় প্রশ্নের যথাযথ উত্তর দান করিয়া কৃতার্থ হইতে পারিবে। কিন্তু আজিকালি সাধারণে অহৃদয়ের সংখ্যাই অধিক, তাহারা তোমার কৃতার্থতায় ঈর্ষান্বিত হইয়া, যিনি তোমার দ্বিতীয় হইবেন, তাঁহার লেখাকে প্রথম ও উৎকৃষ্ট বলিয়া ব্যাখ্যা করিবে; এবং অম্লান বদনে কহিবে যে, "ঘরে ঘরে বাঁটিয়া লইবার জন্যই পুরস্কার প্রদানের সংকল্প হইয়াছিল।" তবে কি তাহাদের ভয়ে উক্ত সুমহৎ কার্য্য হইতে অবসৃত হইতে হইবে? না, কখনই নয়; তৃণেরাই দুষ্ট ঝটিকায় ছিন্নভিন্ন হইয়া যায়; আমি যখন সরল প্রাণে উদার কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইয়াছি, তখন ধরাতল রসাতলে প্রবেশ করিলেও প্রতিনিবৃত্ত হইব না। তবে যাহাতে কেহ উচ্চবাচ্য না করিতে পারে, প্রবন্ধটিকে সেইরূপ অদ্বিতীয় উৎকৃষ্ট করিয়া তুলিতে হইবে। ইহাতে যত সময়, যত পরিশ্রম, যত মনোযোগ আবশ্যক, প্রাণপণে তাহার কুলান করা চাই। অতএব শীঘ্র শীঘ্র বেদান্তখানি সমাপ্ত করিয়া চিত্তপটে আঁকিয়া লও, নিস্তব্ধ নিশীথে যাহাদের উপর উপবিষ্ট হইয়া প্রশান্ত ভাবে তোমার পূর্ব্বারাধিত তত্ত্ব ও সাহিত্য বিদ্যার আরাধনা কর, এবং একান্ত মনে তাঁহাদের কৃপা প্রার্থনা করিতে থাক পরে অবসর বুঝিয়া নিমগ্ন হইয়া কলম হাতে বসিয়া যাও।

তোমার গাথাটি আমার অতি মধুর লাগিয়াছে। আজি চারি পাঁচ দিন হইল, পরিস্কার প্রাতঃকালে আমার গৃহের সম্মুখস্থ ছাদে পায়চারি করিয়া বেড়াইতে ছিলাম, আপনাপনিই ওই গাথার প্রথম দুই চরণ ললিতসুরসম্মিলিত হইয়া পুনঃপুনঃ আমার মুখ দিয়ে নির্গত হইতে লাগিল এবং সেই দুই চরণের দ্বিতীয় চরণ গাহিবার সময় এক একবার নেত্রযুগল ছলছল করিয়া আসিয়াছিল। কবিরা আপনার মনের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া,—তাঁহারা যে শক্তির

অনুরোধে সর্ব্বত্যাগী হইতে পারেন, যাহার সম্ভোগে ইন্দ্রের ইন্দ্রত্বও তুচ্ছ বোধ হয়, সহসা দীপ্তিমতী শক্তির অন্তর্ধান দেখিলে কি যে এক ভয়ানক নিরাশা প্রাপ্ত হন, তাহা কেবল কবিভ্রাতারাই যথার্থ অনুভব করিতে পারেন। "শুকিয়েছে যেই ফুল, প্রফুল্ল হবে কেমনে।" হায় আমি যাহার বিরহে ক্ষণমাত্রও প্রাণ ধরিতে পারি না, সে আমারে জন্মের মত পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছে! একথা চিন্তা করিতেও শরীর শিহরিয়া উঠে।

বাস্তবিক তোমার নির্ঝর শুষ্ক হইয়া যায় নাই। তাহা হইলে কখনই এরূপ যথার্থ ভাবপ্রকাশক কবিতা বাহির হইত না। অথবা কবিদের কবিত্ব শক্তি কিছুতেই বিনষ্ট হইবার নহে। তবে যখন তাঁহারা প্রকোপিত নিয়তির দুর্জয় তাড়নায় জর্জ্জরিত হইয়া চতুর্দ্দিক অন্ধকার দেখিতে থাকেন, তখন আপনার শক্তিকে স্পষ্ট দেখিতে পান না, এই মাত্র। কিন্তু তথাপি বিদ্যুৎ যেমন প্রগাঢ় মেঘে বারম্বার বিলাস করিতে থাকে, তেমনি সেই মহীয়সী শক্তি কবির বিষাদ হৃদয়ে স্ফুরিত হইয়া আলো করিয়া দেয়।

কবির অন্তর সুধার নির্ঝর
অবিরল ঝরঝরে,
চাঁদের কিরণ উজলে যেমন,
তেমন সুষমা ধরে।

জ্যোতি নিরমল, গতি ঢল ঢল,
রসের লহরী খেলা,
যেথা দিয়ে ধায়, আলো কোরে যায়,
রসায় রসিক মেলা।

কভু খেলা করে শেখরী শেখরে
পারিজাত মালা মত,

কভু মেখলায় গড়িয়ে বেড়ায়
সমীরণ বহে যত।

কভু কুঞ্জে গিয়ে বিরলে লুকিয়ে
লতা পাতা ঢাকা রহে,
সুখ কলকলে যেন গান ছলে
জন মন কথা কহে।

অসীম অম্বর, অগাধ সাগর,
আঁধার পাতালতল,
প্রমোদ কানন, নাটনিকেতন,
ভয়ানক রণস্থল।

নাহি হেন ঠাঁই, যথা গতি নাই,
সকল স্থানেতে থাকি;
যখন যথায়, সাজায় তাহায়,
তুলি দিয়ে যেন আঁকি।

যদিও অবাধে আপনার সাধে
কবির অন্তর ধায়,
তবু বাধা আছে আপনারি কাছে,
আপনি ঠেকিয়ে যায়।

এই ধরাতলে এক ভাবে চলে
হেন দশা কোন নাই,
বুঝি এ মেলায় সকল দশায়
নবতা বিধান চাই।

এক এক বার পর্ব্বত প্রকার
মনরোগ গাদ্গাদা
সহসা সমুখে বেগে আসে ঝুঁকে
প্রবাহের দেয় বাধা।

বেধে তার মূলে আকুলে ব্যাকুলে
রেগে যেন ওঠে ফুলে;
কবির নয়ন তাহারে তখন
দেখিতে না পায় মূলে।

কিন্তু এ শকতি সতী স্ত্রী যেমতি
ত্যেজিবার কভু নয়,
বদ্ধ থেকে থেকে লঙ্ঘে ও গিরিকে
শত গুণ বেগে বয়!

আমার মুদ্রিত পদ্যগুলিন্ এবং কয়েকটি শেষাস্তি গদ্য প্রবন্ধ একত্র করিয়া আজি তোমারে উপহার দিলাম। আমার সে সময়ের কাঁচা গদ্য, এ সময়ে পাঠ করিতে তোমার অবশ্যই অরুচি জন্মিবে। ইহার শেষ প্রস্তাবের মধ্যস্থল অতিশয় অসংলগ্ন; স্বপ্নদর্শনের স্থানে স্থানে নিতান্ত অহৃদয়তা ও বালকতা প্রকাশ হইয়াছে। তথাপি যদি তুমি বন্ধুর বস্তু বলিয়া আদর কর, চারি পাঁচ বৎসর পূর্ব্বে আমার ধর্ম্মের ভাব যেরূপ ছিল, অনেক বুঝিতে পারিবে, এবং তাহা হইলেই আমার গদ্যপ্রেরণের প্রধান উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইল। পূর্ণিমার ভিতরে যে কটী আমার রচনা, তাহার নীচে নামের আদ্যক্ষর লিখিয়া দিলাম। তোমার সেই গানটি ভাই আমাকে পাঠাইয়া দিও।

তোমার অনুরক্ত
শ্রীহরিলাল চক্রবর্ত্তী

ও হো হো! এ কোন্ পাতে লিখিতে কোন পাতে লিখে ফেল্লেম্!

কথালাপ।

লর্ড কর্জন কর্ত্তা নয় গিন্নি।

লর্ড কর্জন ভারতের কর্ত্তার মত ঠিক কার্য্য করেন নাই। তিনি নিপুণা গৃহিণীর মত কার্য্য করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার গৃহিণীপণা প্রশংসার্হ। গৃহিণীরা যেরূপ অন্তঃপুরের কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়া তাহারি শৃঙ্খলা করিয়া দিতে সর্ব্বদা ব্যস্ত, সেইরূপ লর্ড কার্জনও রেলবিস্তার, উত্তরপশ্চিম ও বঙ্গপ্রদেশাদি বিভাগ ইত্যাদি ভারতের অন্তঃপুরের কার্য্যে বিশেষ মনোযোগ অর্পণ করিয়া গিয়াছেন। গৃহিণীরা যেমন নিজেদের সুবিধার জন্য কোথাও একটী বেড়া দিয়া লন—হয়ত বা ভাঁড়ারের জায়গা কুলাইতেছে না একটুখানি বেড়া দিয়া সেই জায়গাটুকু সংকুলন করিয়া লন—লর্ড কার্জনও সেইরূপ উত্তরপশ্চিম প্রদেশের নববিভাগ বঙ্গের বিভাগ (Partition) আদি করিয়া ইংরাজ রাজ্যে পাকা গৃহিণীর চাল চালিয়া গিয়াছেন।

পার্টিশন (Partition) ও পর্দ্দা।

গৃহিণীরা অন্তঃপুরে পর্দ্দার ভিতরে শক্তিমতী; লর্ড কার্জনও পর্দ্দার আড়ালে থাকিয়া সেইরূপ সকল কার্য্য করিতে চাহেন। তাঁহার মনের কথা যেন সরল ভাবে ব্যক্ত না করিয়া পর্দ্দার আড়াল রাখিয়া বলেন। বঙ্গের যে Partition ইহাও এক আড়াল দিবার জন্য পর্দ্দা আবরণ। তিনি পর্দ্দার আড়ালে বসিয়া কার্য্য করিবেন সমগ্র বঙ্গ তাহা দেখিতে পাইবে না। শুভক্ষণে স্বদেশী বস্ত্রের অবগুণ্ঠনে আর তাঁহার মুখশ্রী বঙ্গদেশকে দেখিতে হইল না। অবগুণ্ঠনবতী তেজস্বিনী গৃহিণী কার্জন কি জানি কিসের জন্য অভিমান করিয়া পিত্রালয় ইংলণ্ডে চলিয়া গেলেন।

অত্যুত্থানং হি পতনায়।

"অত্যুত্থানং হি পতনায়" এই সিদ্ধ বাক্য ব্যর্থ হইবার নয়। লর্ড কার্জনের চাল বড় উঁচুরকমের ছিল। ইম্পিরিয়ালিস্‌ম্ তাঁহার প্রাণের সোহাগের জিনিষ—তিনি ইম্পিরিয়ালিস্‌ম্‌এর বড়ই পক্ষপাতী। কলিকাতার প্রধান লাইব্রেরির নাম দিলেন "ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরি", রাজসৈন্যদলের নাম দিলেন "ইম্পিরিয়াল ক্যাডেট কোর্", দিল্লীতে "ইম্পিরিয়াল দরবার" করিলেন। হিমালয়ের অত্যুচ্চ শৃঙ্গে তীর্ব্বতে চড়িয়া লর্ড কার্জন উত্থানের চরম সীমা দেখাইলেন। কিন্তু। এমন 'পড়ন্' পড়িলেন যে কোন ইংরাজশাসনকর্ত্তা সেরূপ পড়েন নাই। কোন শাসনকর্ত্তার সময়ে প্রজার এরূপ মনের অবস্থা হয় নাই। প্রজারঞ্জনই যদি রাজশাসকের কর্ত্তব্য হয় তবে লর্ড কার্জন তাহা কিছুই করিতে পারেন নাই, এইখানেই তাঁহার মহাপতন। প্রজারঞ্জনের অক্ষমতাই তাঁহার ন্যায় শাসকের মহাপতন। তিনি চড়িলেন হিমালয়ের উচ্চশৃঙ্গ তীর্ব্বতে, তিনি পড়িলেন ঠিক তাহার নীচে বঙ্গের গভীর খদে।

লর্ড কার্জনের অহংরোগ।

সকল ভক্তেরাই অহঙ্কার রোগকে সকল রোগ অপেক্ষা কদর্য্য বলিয়া গিয়াছেন। যথা, কবীর বলিয়াছেন,—

"কবীর সব্‌সে হম্ বুরে"

গুরুনানক বলিয়াছেন—

"নানক হওমে রোগ্ বুরে"

লর্ড কার্জনের সকল গুণ এই অহং রোগেই মাটী হইয়া গিয়াছে। আমি যাহা বুঝিয়াছি তাহাই শেরা, আমার কার্য্যই সকলের উপরে, আমি রাজপ্রতিনিধি যখন, তখন রাজার সমান ইত্যাদি অহংরোগই তাঁহার অনিষ্টের মূল। তিনি যে ভারতের কোন ভাল কাজ করেন নাই তাহা নয়; কলিকাতায় সাধারণের জন্য লাইব্রেরী স্থাপন, সিংহবাহিনী দেবীর তুল্য সর্ব্বজন-

পূজ্যা স্বর্গগতা ভারতের সাম্রাজ্ঞী ভিক্টোরিয়ার প্রতি শ্রদ্ধাপ্রদর্শনের জন্য "ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল হল" প্রতিষ্ঠা, সৌন্দর্য্যে ও সমৃদ্ধিতে কলিকাতাকে ভারতের রাজধানীর উপযুক্ত করিবার চেষ্টা, বহুকালের পুরাতন জীর্ণ মন্দিরাদির সংরক্ষণ ইত্যাদি তৎপ্রবর্ত্তিত নানা শুভকার্য্যের ফল হয়ত আমাদের ভবিষ্যৎ পুরুষেরা ভোগ করিয়া কৃতার্থ হইবে। কিন্তু তথাপি তিনি এমনও অনেক কার্য্য করিয়া গিয়াছেন যে যাহাতে তাঁহার অহংরোগ সকল গুণ চাপা দিয়া নিজে ফুটিয়া উঠিয়াছে, এবং তাহার তীব্র গন্ধে সেখানে কাহাকেও তিষ্ঠিতে দেয় নাই। হায়! ইহা কম নিন্দার কথা নহে, যে, লর্ড কার্জন প্রজারঞ্জন করিতে আসিয়া শেষে প্রজার বিরাগভাজন হইয়া এদেশ হইতে প্রস্থান করিলেন।

বঙ্গের কোমরবন্ধ।

এই যে বঙ্গের 'পার্টিশন' (Partition) হইল ইহার জন্য এত দুঃখ কেন? ইহাতে বাঙ্গালীর মনের ভেদও হয় নাই প্রাণের বন্ধনও শিথিল হয় নাই। তবে এত গোলোযোগ কেন? ইহা আর কিছু নয় কেবল গৃহিণী কার্জন বঙ্গবালকের কটীদেশে 'পার্টিশন'রূপ একটী কোমরবন্ধ কষিয়া বাঁধিয়া দিয়াছেন মাত্র।* যখন কোমর বাঁধিয়াছ তখন লাগিয়া যাও। বঙ্গবাসীগণ! কোমর বাঁধিয়া স্বদেশের কার্য্যে উঠিয়া পড়িয়া লাগ।

রাজভক্তি।

লর্ড কর্জনের শাসনকালে বঙ্গে যে অগ্ন্যুদ্গার দেখা দিয়াছিল তাহা ভাবী ভারতেশ্বর রাজপুত্রের আগমনে রাজভক্তির প্লাবনে যেন অনেকটা নির্বাপিত

* হয়ত কষিয়া বাঁধিবার সময় কোমরে একটু লাগিয়াছিল তাই বঙ্গবালক একটু চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিয়াছিল কিন্তু সে ক্রন্দন ক্ষণকালের জন্য। ইহাতে বঙ্গের কার্য্যস্পৃহা ও উৎসাহ দ্বিগুণিত হইয়াছে বলিতে হইবে।

হইয়া গিয়াছে। রাজপুত্রের সৌম্যমূর্ত্তি বঙ্গবাসীর দগ্ধ প্রাণে যেন এক বিন্দু অমৃতসিঞ্চনে জ্বালা নিবারণ করিয়া দিয়াছে—পুণ্যের বর্ষণে যেন পাপমলিনতা ধৌত হইয়া গিয়াছে। বৃথা কলহবিবাদ ত্যাগ করিয়া, ঈশ্বরের প্রতিনিধি রাজাকে মহৎ জানিয়া, আইস সঞ্জীবিত প্রাণে দেশের কার্য্যে ঈশ্বরের কার্য্যে উঠিয়া পড়িয়া লাগ—ভগবানের আশীর্ব্বাদ পাইয়া কৃতার্থ হইবে।

শ্রীঋতেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

মাছের পরোটা।

(খাদ্যপাক।)

উপকরণ।—আটা বা ময়দা এক পোয়া, ঘি এক ছটাক, পোনা বা ভেটকি মাছ আধপোয়া, ছোট পেঁয়াজ দুইটা (পেঁয়াজ না দিতে চাহিলে আদা দ্বিগুণ পরিমাণে দিবে), কাঁচালঙ্কা একটী, আদা এক গিরা, নুন দুতিন চুটকি, গরমমশলা-গুঁড়া এক চুটকি, * জোয়ান দুটীখানি (জোয়ান না দিলেও ক্ষতি নাই; জোয়ান দিলে বরং একটু হজমের সহায়তা করিবে।)

প্রণালী।—বেশ ভাল পরিষ্কার আটা বা ময়দায় দু তিন চুটকি নুন ও এক কাঁচ্চা ঘি খাওয়াইয়া জল দিয়া ঠেশিতে থাক। বেশ নরম করিয়া মাখ। ময়দা মাখিবার সময় বার কোযে খুব অল্প দুটীখানি জোয়ান ছড়াইয়া মাখিতে থাকিবে তাহা হইলে জোয়ানগুলি ময়দার মধ্যে লাগিয়া যাইবে। এক পোয়া ময়দায় চারখানা পরোটা হবে। ময়দার বড় বড় চারখানা গুটী

* সাত আটটা লঙ্গ, এক টুকরা দারচিনি ও একটী ছোট এলাচ গুঁড়াইয়া তাহারি এক চুটকি লইবে।

কাট। গুটিগুলিতে আবার এক একটু আটা বা ময়দার গুঁড়া মাখাইয়া পাতলা গোলাকার করিয়া বেল। বেলা হইলে প্রত্যেকের উপরে হাতে করিয়া চাপড়াইয়া ঘৃত লেপন করিয়া রাখিবে।

এইবারে মাছ সিদ্ধ করিয়া কাঁটা ইত্যাদি বাছিয়া উহার সঙ্গে আদা পেঁয়াজ ও লঙ্কা এবং গরমমশলা-গুঁড়া দিয়া একত্র পিশিয়া ফেল। খুব মোলায়েম করিয়া পিশিতে হইবে। এই পেশা মাছের খানিকটা খানিকটা লইয়া ঘৃতাক্ত রুটীগুলির উপরে খুব পাতলা করিয়া লেপ দাও। এক্ষণে মৎস্যলেপিত রুটীগুলিকে ডবল্ ভাঁজ কর; দেখিতে অর্দ্ধচন্দ্রাকার হইবে। আবার ভাঁজ দাও। ফের আরেক ভাঁজ দাও। তারপরে এইরূপে ভাঁজ-করা রুটীগুলিকে কুণ্ডলাকারে পাকাইয়া রাখ। ইহার যে মুখের দিকটা বাহির হইয়া থাকিবে সেইটা মধ্যস্থলে মুড়িয়া দিবে। এইরূপ করিবার পরে ঐগুলিকে ফের হাতে করিয়া চেপটাইয়া রাখিয়া দাও। এইবারে এইগুলিকে মোটা মোটা করিয়া বেল। মন্দা আঁচে তাওয়া চড়াও। তাওয়ার উপরে এক একটী করিয়া সেঁকিতে থাক। ক্রমাগত উল্টাইয়া উল্টাইয়া দাও। যখন দেখিবে রুটী ফুলিয়া ফুলিয়া উঠিতেছে তখন চামচে করিয়া উহার উপরে ঘি ছড়াইয়া দিয়া উল্টাইয়া পাল্টাইয়া সেঁকিতে থাকিবে। আগুনের খুব নরম আঁচ চাই। ঈষৎ লালচে পোড়া পোড়া হইয়া আসিলেই উঠাইয়া রাখিবে। চারিটা পরোটায় সমস্ত ঘিটা খাওয়াইতে হইবে। মাছ না দিয়া এইরূপে শুধু পরোটা করিলেও বেশ হয়। মাছে পেঁয়াজ দিতে না চাহিলে আদা কিছু বেশী করিয়া দিবে।

শ্রীঃ দেবী।

কচুর মালপুয়া।

(খাদ্যপাক।)

উপকরণ।—কচু দেড় পোয়া, সফেদা (চালের গুঁড়া) এক ছটাক, ময়দা আধ ছটাক, ডেলা ক্ষীর এক ছটাক, বড় এলাচ একটা, চিনি আধসের।

প্রণালী।—কচু খণ্ড খণ্ড কাটিয়া ভাল করিয়া সিদ্ধ করিতে দাও। সফেদা, ময়দা ও বড় এলাচের দানা এবং সিদ্ধ কচুগুলা এক সঙ্গে চটকাইয়া মাখ। চেপটা চেপটা আকারে বড়ার মত গড়ন করিয়া রাখ।

আধসের চিনি জল দিয়া চড়াইয়া শুকতারবন্দ অর্থাৎ পানতোয়ার মত রস হইলে নামাইয়া একটা পাত্রে রাখ। *

তিন ছটাক ঘি চড়াও। মন্দা আঁচ করিয়া দাও। তিন চারটা করিয়া বড়া এক একবার ছাড়। উল্টাইয়া পাল্টাইয়া ভাজ। আস্তে আস্তে হোক। যদি আগুনের বেশী আঁচ থাকে ত কড়া নামাইয়া বড়াগুলি ভাজিবে। ভাজা বড়াগুলি কড়া হইতে তুলিয়া তুলিয়া রসে ফেলিতে থাক।

ডেলা ক্ষীর না দিলেও চলে, দিলে ভালই হয়।

শ্রীঃ দেবী।

* রস আঙ্গুলে লইয়া দেখিবে একটু সুতার মত লাগিয়া যাইলেই বুঝিবে রস হইয়াছে।

সাংখ্যস্বরলিপি।

পুণ্যদৃষ্টি।

সিন্ধুকাফি—ঝাঁপতাল।

পুণ্যদৃষ্টি যার দেখে সেই,
হয় না গো দৃষ্টি থাকিলেই
রহিলে মালিন্য মনে,
দৃষ্টিহীন ক্ষণে ক্ষণে ;
সে হীনদর্শনে সুখ নেই
ডুবে যেতে হয় অদৃষ্টেই।
দেখিবারে চাও যদি ভালো,
আনহ অন্তরে পুণ্য আলো ;—
দেখে জাগিবে রে প্রাণ,
মোহ হতে পাবে ত্রাণ,
দূর হ'য়ে যাবে পাপ কালো,
পুণ্যোৎসব হবে জমকালো।

তালি। ২ঃ (স্থা, স্ত, ভো) । ৩ । ০ । ১ ॥
মাত্রা। ২ । ৩ । ২ । ৩ ॥

স্থাঃ—। মা সা । রে২ রে ।
স্থাঃ— পু ণ্য । দৃ ষ্টি ।

গাঁ২ । মা২ মা । পা২ । +পা৩ । মা
যার্ । দে খে । সেই । — । হ

২
গা । মা২ মা । পা ধা । নিঁ সা২ । নিঁ
য় । না রে । দৃ ষ্টি । থা কি । লে

ধা । পা২ মা । পা২ । +পা৩ ॥
— । — — । — । — ॥

(স্ত)ঃ— পা পা । পা২ ধা ।
(স্ত)ঃ— স্ন হি । লে মা ।

২......... ২ ২.........
নি নি । সা সা২ । সা নি । সা২ রে ।
লি গ্ধ । ম নে । দৃ ষ্টি । হী ন ।

২
সা নিঁ । ধা পা২ । পা সা২ নি২ ।
ক্ষ ণে । ক্ষ ণে । সে — — ।

২.........
সা২ রে । নিঁ নিঁ । ধা পা২ । মা২ ।
হী ন । দ র্শ । নে — । স্থ ।

গা মা২ । পা২ । +পা৩ । +পা ধা ।
— —থ্ । নেই । — । ডু বে ।

২......
নিঁ সা সা । নিঁ পা । মা পা২ ।
থা — — । ঘো র । অ দৃ ।

গাঁ২ । +গাঁ৩ ॥
ষ্টে । — ॥

(ভো)ঃ— মা মা । মা২ মা । পা২ ।
(ভো)ঃ— দে খি । বা রে । চাও ।

পা২ মা । পা২ । +পা২ মা । +পা২ ।
য দি । ভা । — — । — ।

+পা৩ । মা মা । মা২ মা । মা মা ।
লো । অ ন । হ অ । ন্ত রে ।

মা২ পা । মগাঁ২ । গাঁ২ সা । +রে২ ।
পু ণ্য । আ । লো — । — ।

+রে৩ । পা পা । পা২ ধা ।
— । দে খে । জা গি ।

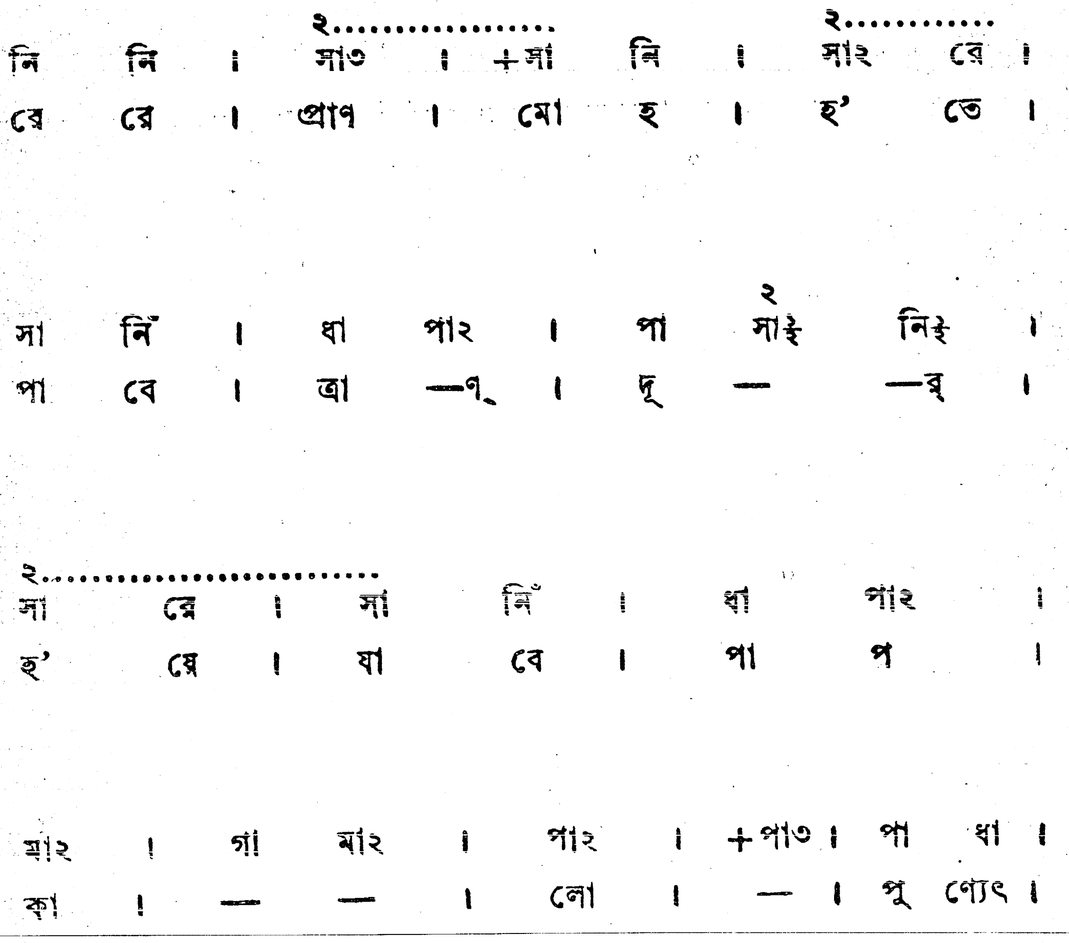

শ্রীহিতেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

পুণ্য পঞ্জিকা।

পৌষ।—১৩১২, ইং ১৯০৫।

দিন	পৌষ	ডিসেম্বর	তিথি		দিন	পৌষ	ডিসেম্বর	তিথি	
শ	১	১৬	চ	কৃষ্ণপক্ষ	র	১৬	৩১	প	শুক্লপক্ষ
র	২	১৭	ষ		সো	১০	১	ষ	জানুয়ারি
সো	৩	১৮	স		ম	১৮	২	স	
ম	৪	১৯	অ		বু	১৯	৩	অ	
বু	৫	২০	ন		বৃ	২০	৪	ন	
বৃ	৬	২১	দ		শু	২১	৫	দ	
শু	৭	২২	এ		শ	২২	৬	এ	
শ	৮	২৩	দা		র	২৩	৭	দ্বা	
র	৯	২৪	ত্র		সো	২৪	৮	ত্র	
সো	১০	২৫	চ	বড়দিন	ম	২৫	৯	চ	
ম	১১	২৬	অ		বু	২৬	১০	পূ	
বু	১২	২৭	প্র	শুক্লপক্ষ	বৃ	২৭	১১	প্র	কৃষ্ণপক্ষ
বৃ	১৩	২৮	দ্বি		শু	২৮	১২	দ্বি	
শু	১৪	২৯	তৃ		শ	২৯	১৩	তৃ	পৌষ পার্ব্বণ
শ	১৫	৩০	চ						

১লা পৌষ সূর্য্যোদয়—ঘ ৬।৮ মি ; সূর্য্যাস্ত—ঘ ৫।১৪ মি।
২৯শে ঐ ঐ —ঘ ৬।৪৭ মি ; ঐ —ঘ ৫।২৮ মি।
অন্নপ্রাসন—পৌষ ১৩।২৪।

ওঁ

পুণ্য

পুণ্যং প্রাণান্ ধারয়তি পুণ্যং প্রাণদমুচ্যতে

পূর্ব্বদ্বার।

ভৈরব—চৌতাল।

প্রভাতগগনে পূর্ব্বদ্বার খুলিয়াছে,
মিলে সবে বন্ধুগণ যাই তাঁর কাছে।
নিদ্রাঘোরে কেহ থেকোনাক অচেতন,
মঙ্গল মুহূর্ত্তে কর দেবদরশন।
সূর্য্য তাঁরে প্রণমিতে নিদ্রা হ'তে জাগে,
নীলাকাশ অরুণিত তাঁর পদরাগে,
বনের পাদপরাজি কুসুমের ডালি
শুভ্র আনিয়াছে দিতে চরণেতে ঢালি;
এ সময়ে দূর কর মোহ অবসাদ,
ত্যজ নিদ্রাঘোর, লবে যদি পরসাদ।

শ্রীঋতেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

গুরুনানকের উপনয়ন।

গুরুনানক যখন নবম বর্ষে পদার্পণ করিলেন তখন তাঁহার পিতা কালু তাঁহার উপনয়ন দিবার জন্য কুলপুরোহিত হরদয়ালকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। শুভ মুহূর্ত্ত দেখিয়া পুরোহিত যজ্ঞোপবীত ক্রিয়ার আবশ্যকীয় সমস্ত সামগ্রী একত্র করিলেন। কালুর জ্ঞাতিগোষ্ঠী ও আত্মীয়স্বজন সকলে নির্দ্দিষ্ট দিনে নিমন্ত্রিত হইলেন। স্বজাতীয় সকল বন্ধুবান্ধব ও বহু ব্রাহ্মণ সেই দিনে নানকের উপনয়নোপলক্ষে নিমন্ত্রিত হইয়া আসিলেন। বেদবিহিত নিয়মানুসারে আসন স্থাপিত হইল। বেদীবংশীয় সকলে এবং নিমন্ত্রিত বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণগণ স্ব স্ব স্থানে উপবেশন করিলেন। স্নান সমাপনান্তে নানক আসনে আসিয়া বসিলেন—যেন তারামণ্ডলের মধ্যে পূর্ণ চন্দ্রের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। কুলগুরু হরদয়াল ক্ষত্রিয় রীত্যনুসারে সমস্ত কৃত্য সমাপ্ত করিলেন। অনন্তর তিনি বেদিবংশের চিরাগত কুলাচার যথাবিহিত রীত্যনুসারে নানককে শিক্ষা দিতে প্রবৃত্ত হইলেন। সন্ধ্যা, তর্পণ, শিখা, সূত্র, যজ্ঞোপবীত মালা, তিলক ও ষটকর্ম্ম পুরোহিত হরদয়াল এই সকল বিষয়ে নানককে শিক্ষা দিতে লাগিলেন। কিন্তু নানক তখন নিতান্ত বালক হইলেও সত্যের প্রতি অনুরাগ তাঁহার সেই সময়েই প্রস্ফুরিত। নিঃসার কেবল কতকগুলা কুলাচার পালনেই যে সত্যপালন হইবে তাহা তাঁহার মনে স্থান পাইল না। তাই তখন সেই নবম বর্ষীয় বালক পুরোহিতকে প্রশ্ন করিতে ক্ষান্ত হইলেন না—"হে মিশ্রজী! এই যজ্ঞসূত্র ধারণ করিয়া আমার কি লাভ হইবে? এই যজ্ঞোপবীত ধারণে ধর্ম্মই বা কি বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইবে আর কি উচ্চপদই বা পাইব? ইহা গলায় ধারণ না করিলেই বা কি অধোগতি হয় আমাকে বলুন।" ইহাতে গুরু পুরোহিত হরদয়াল বলিলেন, "যজ্ঞোপবীত ধারণ না করিলে অপবিত্র থাকে—আসনের অধিকারীই হয় না। যখন ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বেদবিহিত নিয়মানুসারে যজ্ঞোপবীত ধারণ করে তখন হইতে ধর্ম্ম কর্ম্মের যথার্থ অধিকারী হয়।" পরে গুরুনানক যুক্তিযুক্তবচনে হরদয়ালকে বুঝাইয়া

বলিলেন, যে, "নানা পাপাচরণ করিয়া কেবল যজ্ঞসূত্র ধারণ করিলেই পবিত্র হয় না। যজ্ঞসূত্রধারীর কার্য্য ও হৃদয় পবিত্র হওয়া চাই। আন্তরিক পবিত্রতা বিনা সূত্রধারণ বৃথা। পণ্ডিতজী! শুনুন, ক্ষত্রিয় ব্রাহ্মণ গলায় উপবীত দিয়াছে, কিন্তু এদিকে অসৎকর্ম্ম হইতে নিরস্ত হইতেছে না—ঘৃণ্য বিষয়ে সর্ব্বদাই লিপ্ত, এরূপ অবস্থায় ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়ের প্রকাশ্যে যজ্ঞোপবীত ধারণ করিয়া কি ফল? বিষয়ের জন্য হিংসা, দ্রোহ, অধর্ম্ম, অন্তকাল পর্য্যন্ত খলব্যবহার, মিথ্যা কপটাচরণ এ সকল ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়কে নীচ চণ্ডালে পরিণত করে—ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়ও এরূপ করিলে অন্তে যমদণ্ড ভোগ করিবে, তাহা হইলে তাহার যজ্ঞোপবীত ধারণ করিয়া কি ফল হইল? যে ইহলোকে পাপ করিবে সেই নরক ভোগ করিবে।" নানকের ন্যায় নিতান্ত অল্পবয়স্ক বালকের মুখে এইরূপ গভীর গুরুবাক্য শুনিয়া সকলে যেন স্তম্ভিত হইয়া রহিল। হরদয়াল কিয়ৎকাল বিরক্ত ও মৌনভাবে অবস্থিতি করিলেন। সকলে মনে মনে বলিতে লাগিলেন 'হে পরমেশ্বর! এ বালক হইয়া কি কথা বলিতেছে!' তখন গুরু হরদয়াল হতবুদ্ধির ন্যায় হইয়া নানককে বলিলেন "আচ্ছা তুমিই বল কোন্ যজ্ঞসূত্র ধারণ করিলে মানবের ধর্ম্ম থাকে?" তখন গুরুনানক কিরূপ যজ্ঞসূত্র ধারণ করা কর্ত্তব্য—যজ্ঞোপবীত সম্বন্ধে তাঁহার মত সংক্ষেপে বুঝাইয়া একটী শ্লোক উচ্চারণ করিলেন—

দয়া কপাহ সন্তোখ্ সূৎ
জৎ গণ্ঠী সৎ বট্
এহ জনেয়ু জীয়কা
হয়ী ত পাণ্ডে ঘৎ।
না এহ তুট্টে ন মল্ লগে
না এহ জলে না জায়
ধন্ন সু মানস নানকা
জো গল্ চল্লে পায়॥

"দয়ার কার্পাস, সন্তোষের সূত্র, সংযমের গ্রন্থি ও সততার বেষ্টন (বট) এইরূপে প্রস্তুত সূত্রই জীবের যজ্ঞসূত্র হইবার উপযুক্ত। হে পুরোহিত যদি তোমার কাছে এই সূত্র থাকে ত আমাকে পরাইয়া দাও। এই সূত্র ছিন্ন

হয় না, মলিন হয় না, ইহা অগ্নিতে দগ্ধ হয় না বা নষ্ট হয় না। সেই লোক ধন্য যে এই যজ্ঞসূত্র গলায় ধারণ করে।" তারপরে গুরুনানক বলিলেন যে; "এই কার্পাস সূত্রের যজ্ঞোপবীত কোন কাজেরই নয়, ইহা লইয়া কেন বৃথা ফিরিতেছ? যাহা সত্যের উপবীত, যাহা নষ্ট হইবার নয়, তাহাই তুমি আমার গলায় দাও। যদি তাহা না পার ত ঐ কার্পাসসূত্র আমার গলায় বৃথা পরাইয়ো না।" ইহার উত্তরে পণ্ডিত হরদয়াল বলিলেন—"এই যজ্ঞসূত্র কিছু আজ আমি নূতন প্রবর্ত্তন করি নাই। ইহা আদি কাল হইতে চলিয়া আসিতেছে। আমি নিজে যদি নূতন প্রবর্ত্তন করিতাম ত ইহা নিরর্থক বলিতে পারিতে।" গুরুনানক বলিলেন—"এই যজ্ঞসূত্র ত এইখানেই পড়িয়া থাকিবে—ইহা ত সঙ্গে যাইবে না।" তাহাতে পুরোহিত হরদয়াল বলিলেন "এই যজ্ঞোপবীত সেই আদিকাল হইতে মহা মহা জ্ঞানী সনকাদি ঋষি মুনি সকলেই ধারণ করিয়া আসিতেছেন, আজ তুমি তাহাতে আপত্তি করিতেছ! ইহার উত্তরে গুরুনানক আরেকটী শ্লোক বলিলেন—

চৌকড়্ * মূল্ অনায়া
বহ্ চৌকে পায়া
সিখা কন্ধ চড়াইয়ঁা
গুরু ব্রাহ্মণ থীয়া।
ওহ্ মূয়া
ওহ ঝড়্ পয়া
বেতগ্গা গয়া॥
লখ্ চোরীয়ঁা লখ জারীয়ঁা
লখ কুড়ীয়ঁা লখ গাল্।
লখ ঠগীয়ঁা পহ্নামীয়ঁা
রাত দিনস্ জীয় নাল॥

"এক আধলার মূল্য দিয়া যজ্ঞোপবীত আনিল, পরে আসনে বসিয়া তাহা ধারণ করিল, সূত্র স্কন্ধে চড়াইবার শিক্ষাও পাইল, ব্রাহ্মণ গুরু হইলেন। ঐ

* চৌকড়=আধলা।

লোকও মরিল, ঐ সূত্রও পড়িয়া রহিল, বিনা সূত্রেই সে লোক পরলোকে চলিয়া গেল। যজ্ঞোপবীত পরিয়া লোকে লক্ষ চুরী লক্ষ ব্যভিচার লক্ষ মিথ্যা লক্ষ গালি বর্ষণ করে, আর লক্ষ ঠগের কার্য্য লক্ষ নিন্দা এ সকল দিবারাত্রই করিতে ব্যস্ত।" তৎপরে গুরুনানক বুঝাইয়া বলিলেন "হে পণ্ডিতজী! এই সকল আচারপ্রথাসমূহ মনুষ্যেরা প্রবর্ত্তন করিয়াছেন—মনুষ্যেরা আসন রচনা করিয়া নিজেরাই তাহাতে উপবেশন করে এবং কোন ব্রাহ্মণকে গুরু মানিয়া তাঁহার কাছ হইতে যজ্ঞসূত্র গ্রহণ করে। কিন্তু যখন সেই যজ্ঞসূত্র-ধারী মনুষ্য মৃত হয় তখন তাহার যজ্ঞোপবীত তাহার সঙ্গে সঙ্গে জ্বলিয়া যায় আর সেই জীব কিছু সূত্র সঙ্গে লইয়া যায় না। অতএব মনুষ্যের গলায় সেইরূপ যজ্ঞসূত্র অর্পণ করা কর্ত্তব্য যাহা অগ্নিতে দগ্ধ হয় না, যাহা পরলোকে সঙ্গে যায়। যে সকল বস্তু সংসারের, সে সকল এইখানেই থাকিয়া যাইবে। সেই সকল সংসারের নশ্বর দ্রব্য পরমেশ্বরের স্থানে শোভা পায় না। যাহা পরমেশ্বরের কাছে শোভা পায় তাহা অবিনশ্বর। হে পণ্ডিতজী! আমার পরমেশ্বরকে লইয়া প্রয়োজন, আমাকে সংসারের বিষয় শুনাইতেছ বৃথা! উহাতে আমার কিছুই প্রয়োজন নাই।" যখন বালক নানকের এই সকল সরল সত্য বাক্য হরদয়ালের অন্তর আলোকিত করিল তখন তিনি আনন্দে মগ্ন হইয়া বাঃ বাঃ শব্দে নানকের প্রশংসা করিতে লাগিলেন—আর বলিলেন যে, "হে পরমেশ্বর! তুমি এই ক্ষুদ্র বালকের প্রতি কি দয়া করিয়াছ যে এই বালক এই সকল গভীর জ্ঞানগর্ভ বাক্য বলিতেছে!" নানকের জন্মকালেই হরদয়াল জ্যোতিষশাস্ত্রানুসারে গণনা করিয়া দেখিয়াছিলেন যে, যে সকল নক্ষত্র উঁহার জন্মমুহূর্ত্তে শুভদৃষ্টি দিয়াছে তাহাতে এই শিশু ভবিষ্যতে এক অসাধারণ মহাপুরুষ হইবে। তাই নানকের কথায় পুরোহিত হরদয়ালের শ্রদ্ধা না হইয়া যায় নাই। তবে নানকের পিতা কালুর সমস্ত আয়োজন বৃথা নষ্ট হইবে এবং তাঁহাকে অপ্রতিভ হইতে হইবে সেই কারণে হরদয়াল নানককে মিনতিপূর্ব্বক বলিলেন—"হে নানক তোমার উপনয়ন উপলক্ষে তোমার পিতা কালু কত না অর্থ ব্যয় করিয়াছেন। আর সকল ভাই বন্ধু আত্মীয়স্বজন আজ এখানে একত্রিত হইয়াছেন; তুমি যদি এ সময়ে যজ্ঞোপবীত ধারণ না কর ত এ সকলই বৃথা হইবে। যত আত্মীয়স্বজন আসিয়াছেন, যত

বেদপাঠী ব্রাহ্মণ আসিয়াছেন, সকলে তাহা হইলে নিরর্থক আসিয়া চলিয়া যাইবেন। এখন যাহা তোমার ভাল মনে হয় তাহাই কর।" ইহাতে গুরু নানক আরও একটী শ্লোক বলিলেন—

তগ্ কপাহ কতীয়ে
ব্রাহ্মণ্ বটে আয়।
কুহ বক্‌রা রিন্ খায়।
সভকো আখে পায়।
হোয় পুরাণা স্থটিয়ে
ভী ফির্ পাইয়ে হোর্।
নানক তগ্ ন তুটয়ী
জে তগ্ হোবে জোর্॥

"কার্পাসকে চর্কায় কাতিয়া সূত্র তৈয়ারী হয়, পরে ব্রাহ্মণেরা তাহাতে পুরণ দেন। সেই যজ্ঞসূত্র গলায় ধারণ করিয়া আবার লোকে ছাগল কাটিয়া রাঁধিয়া খায়। সেই ব্রাহ্মণে আবার সকলকে যজ্ঞোপবীত পরিবার জন্য বলে। যখন যজ্ঞসূত্র পুরাণো হইয়া যায় তখন লোকে আরো অন্য যজ্ঞসূত্র গ্রহণ করে। নানক বলিতেছেন এমন যজ্ঞসূত্র পরিতে হইবে যাহা কখনও ছিন্ন বা নষ্ট হইবার নহে।" পণ্ডিত হরদয়াল তখন নানকের পিতা জমীদার কালুকে বলিলেন "তোমার পুত্র কোন দেবতা। আপন ইচ্ছায় যদি যজ্ঞসূত্র ধারণ করিলেন ত করিলেন।" তারপরে পণ্ডিত হরদয়াল নানককে যজ্ঞসূত্র দিয়া বলিলেন—"হে নানক! এই যজ্ঞসূত্র পবিত্র কর।" গুরুনানক তাহাতে যজ্ঞসূত্র গ্রহণ করিলেন। তখন হরদয়াল পুনরায় নানকের জ্ঞানগর্ভ মধুর বাক্য শুনিবার মানসে তাঁহাকে বলিলেন—"হে নানক যে যজ্ঞসূত্র ছিন্ন হয় না, যাহা মলিন হয় না, যাহা পরমেশ্বরের সভায় সঙ্গে যায়, সেই সূত্রের বিষয় আমাদিগকে শুনাও।" তখন নানক একটী শ্লোকে তাহা বলিলেন—

নায় মন্নিয়ে পৎ উপজে
সালাহী সচ্ সূৎ।
দরগহ্ অন্দর পাইয়ে
তগ্ ন তুট্টস্ পূৎ॥

"পরমেশ্বরের নাম মনন, যাহা দ্বারা প্রতিষ্ঠা হয় এবং পরমেশ্বরের স্তুতি ও সত্য এই তিনে মিলিয়া যে যজ্ঞসূত্র হয় তাহাই পবিত্র—উহা পরমেশ্বরের স্থানে পাওয়া যায় এবং উহা নষ্ট বা ছিন্ন হয় না।" গুরুনানক বুঝাইয়া বলিলেন যে, "পরমেশ্বরের নাম মনন উহাই সেই অবিনশ্বর সূত্রের কার্পাস, আর তাঁহার ভজন স্তুতি উহাই চর্কায় সূত্র কাতন, সত্যই সূত্র। পরমেশ্বরের ভক্ত সদ্‌গুরুর কাছে এই সূত্র পাওয়া যায়। এই সূত্র নষ্ট হইবার নহে।"

গুরুনানকের কথা হরদয়াল ও সভাস্থ সকলে মনে ধারণ করিলেন এবং সকলে ধন্য ধন্য বলিতে লাগিল। পরে বেদীবংশীয়দিগের ও ব্রাহ্মণগণের ভোজন সমাপ্ত হইল। ব্রাহ্মণেরা উপযুক্ত দক্ষিণা লাভ করিলে নানককে আশীর্ব্বাদ করিতে করিতে প্রস্থান করিলেন। অবশেষে জ্ঞাতিগোষ্ঠীর সকলে প্রসন্ন মনে প্রস্থান করিলেন।

শ্রীঋতেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

সোণায় অরুচি।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

আমার পাটনা আসার প্রায় এক মাস পরে মেজদিদি ও বউঠাকুরাণী শেফালিকাকে লইয়া পাটনায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। পাটনায় আসিয়া এ পর্য্যন্ত পঙ্কজিনীকে আনি নাই বলিয়া মেজদিদি ও বউঠাকুরাণী আমাকে বিস্তর অনুযোগ করিলেন। শেষ বউঠাকুরাণী কহিলেন,—"আজ অপরাহ্ণে আমি নিজে গিয়াই পঙ্কজিনীকে আনিব।" দিদিও সেই কথায় সায় দিয়া গেলেন।

বউঠাকুরাণীর কথায় আমি বাধা দিয়া কহিলাম—"অপমানিত হইবার জন্য আপনাদিগকে সেখানে গিয়ে কাজ নাই। বৈকালে আমার চাকর ও ঝিকে গাড়ী নিয়ে পাঠাইয়া দিবেন,—ইচ্ছা হয় আসিবে, না হয় না আসিবে।"

বউঠাকুরাণী ও মেজদিদি অগত্যা তাহাতেই স্বীকৃত হইলেন।

*　　*　　*　　*

সেইদিন অপরাহ্ণে কালেজ হইতে বাসায় আসিতে না আসিতেই শেফালিকা হেলিতে দুলিতে আসিয়া, হাসিয়া কহিল,—"কাকিমা এসেছে।" আমিও অন্তঃপুর মধ্যে প্রবেশ করিতে যাইয়াই পঙ্কজিনীকে দেখিতে পাইলাম। তিন বৎসরের অধিক কাল পর, হঠাৎ পঙ্কজিনীকে দেখিয়া, তাহার মলিন ও শীর্ণ মূর্ত্তি দেখিয়া বেশ বুঝিতে পারিলাম যে, এতদিনে পঙ্কজিনীর হিংসা, দ্বেষ, পরশ্রীকাতরতা পূর্ণ হৃদয়ের কতকটা পরিবর্ত্তন সাধন হইয়াছে।

এমনই অবস্থায় রাত্রি প্রায় নয়টার সময় আহারাদি করিয়া, আমার শয়নগৃহে শয্যায় বসিয়া কালেজের ছাত্রদের সাপ্তাহিক পরীক্ষার কাগজ দেখিতেছিলাম, সহসা ঘরের দ্বার খোলার শব্দ পাইয়া চাহিয়া দেখি, দীর্ঘ তিন বৎসর পর আমারই স্ত্রী পঙ্কজিনী শয়ন গৃহে প্রবেশ করিয়াছেন। এই দীর্ঘকালে পঙ্কজিনীর শারীরিক ও মানসিক অনেকটা পরিবর্ত্তন সাধিত হইয়াছে। আর সে অহঙ্কার নাই, তাঁহার পিতার অতুল বৈভবের মোহে তাঁহার বদনে, চলনে ধরণে সতত যে গর্ব্ব—সতত যে আত্মাভিমান শিখা জ্বলিতে দেখা যাইত,—তাহা আর নাই। তবে একটা দেখিলাম—দেখিলাম যে, আশৈশবের সে অত্যধিক অলঙ্কারপ্রিয়তা, এখনও পূর্ব্বের ন্যায়ই আছে—সে বেশবিন্যাস—সে বসন ভূষণের ঘটা—এখনও ঠিক তেম্নিভাবেই আছে—কিছু মাত্র পরিবর্ত্তন ঘটে নাই। আমি প্রদীপের আলোকে দেখিলাম যে, দীর্ঘ তিন বৎসর পর পঙ্কজিনী আজিকার এই নিশীথে সর্ব্বপ্রথম স্বামীসমীপে আসিয়াও অলঙ্কারের লোভ সংররণ করিতে পারেন নাই, তাই আপনার দেবতাবাঞ্ছিত অতুল সৌন্দর্য্যরাশি মূল্যবান রত্নালঙ্কারে আবৃত করিয়া আমার গৃহে প্রবেশ করিয়াছেন। আশা, বোধ হয় পিতার অতুল বৈভবের মোহে আবার একবার আমার চিত্তকে মোহিত করিবার জন্য—আমাকেই দেখাইবার মানসে নানাবিধ মূল্যবান রত্নখচিত স্বর্ণালঙ্কারে আপনার বাহু, প্রকোষ্ঠ, কণ্ঠ, বক্ষ প্রভৃতি সুশোভিত করিয়া, ধীরে ধীরে মলিন মুখে শয্যার উপর আসিতেছিলেন; কিন্তু সহসা আমা কর্ত্তৃক বাধা প্রাপ্ত হইয়া শয্যার উপর না উঠিয়া থমকিয়া দাঁড়াইলেন। আমি

পঙ্কজিনীকে দাঁড়াইতে দেখিয়া কহিলাম,—"আবার কি মনে করিয়া আমার নিকট আসিয়াছ।"

এবার আমার প্রশ্নে পঙ্কজিনী সহসা কোন উত্তর দিতে পারিলেন না, শুধু গঠিত পাষাণ প্রতিমার ন্যায় আমার উপর আপনার আকর্ণ বিশ্রান্ত বিশালায়ত চক্ষুদ্বয় স্থিরভাবে স্থাপিত করিয়া, পূর্ব্ববৎ এক পদ অগ্রসর করিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। আমি অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত নিম্নদৃষ্টিতে আপনার মনে আপনি কত কি ভাবিলাম—অতীত কালের কত অস্পষ্ট স্মৃতি আমার মনে হইল আর সেই সঙ্গে ক্ষুদ্র দুই বিন্দু অশ্রুজল আসিয়া আপনার মনে গড়াইয়া পড়িল। এমনই ভাবে ক্ষণকাল অতীত হইলে আমি মুখ তুলিয়া চাহিলাম। মুখ তুলিয়া পঙ্কজিনীর মুখের দিকে চাহিয়া দেখি যে, পঙ্কজিনীর সেই আকর্ণ বিস্তৃত নীলেন্দীবর নয়নে ধীরে ধীরে অশ্রুপ্রবাহ আসিতেছিল—জল আসিতেছিল সত্য; কিন্তু বেশ বুঝিতে পারিলাম যে, নয়নে জল আসিলেও পঙ্কজিনী আপনার আশৈশবের সেই দুর্দ্দমনীয় হৃদয়বলে প্রাণপণে অশ্রুপ্রবাহ রোধ করিতে যত্ন ও চেষ্টা করিতেছিলেন; কিন্তু কৃতকার্য্যতা লাভ করিতে সম্যক পারিতেছিলেন না। এমনই অবস্থায় একবার কথা বলিতে চেষ্টা করিলেন—কথা বলিতে পারিলেন না।

আমি পঙ্কজিনীর বর্ত্তমান অবস্থা দেখিয়াও সহজে ভুলিলাম না—ভুলিতে পারিলাম না; ভুলিতে চেষ্টা করিতেই অতীতের সেই মর্ম্মান্তিক পূর্ব্বস্মৃতি আসিয়া আমার হৃদয়জ্বালা উপস্থিত করিল। তাই আমি পুনরায় ধীরে ধীরে কহিলাম—"এখন আবার কি মনে করিয়া আসিয়াছ!"

এবার পাষাণ গলিল—আমার কথায় পঙ্কজিনী কাঁদিয়া ফেলিলেন। তারপর অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত অশ্রুবর্ষণে হৃদয়ভার কতকটা লাঘব হইলে ধীরে ধীরে কহিলেন—"স্বামীর কাছে স্ত্রী আসিবে না?"

আমি। আমি কি তোমার স্বামী হইবার উপযুক্ত—পঙ্কজিনী! যদি স্বামী হইবার উপযুক্তই হইতাম তবে এতদিন—এই দীর্ঘকাল পদে পদে প্রতি কার্য্যে এতই নির্য্যাতন করিয়া স্বামী আমি—আমার হৃদয়ে এত কঠিন শেলাঘাত করিতে না।

পঙ্কজিনী। না বুঝিয়া বালিকা বয়সের চপলতায় আর পিতার অতুল

বৈভবে একদিন যে অপরাধ করিয়াছি, এখন এই প্রায়শ্চিত্তেও কি আমার সে অপরাধ ক্ষমা করিবেন না? এই বলিয়া এবার কাঁদিতে কাঁদিতে আপনার দুই করে আমার চরণ দুইখানি স্পর্শ করিবার মানসে অগ্রসর হইলেন।

পঙ্কজিনীর কান্না দেখিয়া এবার আমার হৃদয় কতকাংশে দ্রব হইলেও মুখে সে ভাব প্রকাশ না করিয়া কহিলাম—"সাবধান, এখনও আমায় স্পর্শ করিও না—এখনও আমার কয়েকটী কথা আছে। আগে আমার কথা কয়েকটীর উত্তর দাও, পরে তোমাকে গ্রহণ করিব কিনা সে বিচার করিব।"

পঙ্কজিনী পূর্ব্বের ন্যায় কাঁদিতে কাঁদিতে কহিলেন,—"কি প্রতিজ্ঞা আছে —বলুন! এখন আপনি যাহা যাহা আদেশ করিবেন, বিনা বিচারে প্রাণপাত করিয়া তাহাই পালন করিব। এখন আমার পূর্ব্বের সে মোহ ভাঙ্গিয়াছে।

আমি। ঠিক বলিতেছ।

পঙ্কজিনী। ঠিক বলিতেছি।

আমি। তবে শুন। আমার আশা করিলে তোমাকে প্রতিজ্ঞা করিতে হইবে যে, জীবনে আর কখন তুমি তোমার পিত্রালয়ে যাইতে পারিবে না,—কেমন স্বীকার আছ কি?

আমার এবারকার কথা কয়েকটী শুনিয়া পঙ্কজিনী হঠাৎ এবার বাক্‌শূন্য হইলেন—উত্তর করিলেন না। পঙ্কজিনীকে নীরব হইতে দেখিয়া আমি কহিলাম,—"তবে কি ইহারই নাম প্রাণপাত করিয়া আমার আদেশ পালন করা।"

পঙ্কজিনী পূর্ব্ববৎ নীরব হইয়া রহিলেন।

আমি। তবে আবার কি মনে করিয়া আমার নিকট আসিয়াছ। পূর্ব্বেই তো আমি সব ভাঙ্গিয়া তোমাকে লিখিয়াছিলাম। এই বলিয়া আমার ক্যাশ বাক্স খুলিয়া, কৃষ্ণনগর হইতে আমি পঙ্কজিনীকে যে কয়খানি পত্র লিখিয়াছিলাম তাহার অনুলিপি আর কৃষ্ণনগর থাকা সময়ে পঙ্কজিনী আমাকে যে কয়খানি পত্র লিখিয়াছিলেন সেইগুলি বাহির করিয়া পঙ্কজিনীকে ফেলিয়া দিয়া কহিলাম—"একে একে পড়িয়া দেখ।"

অনেকক্ষণ ধরিয়া পঙ্কজিনী পত্র কয়খানি পাঠ করিলেন। তারপর একটী সুদীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া পত্রগুলি বিছানার উপর ফেলিয়া দিয়া, নীরব

হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন।

আমি। কেমন, পত্র পড়িলে?

কাতর কণ্ঠে পঙ্কজিনী কহিলেন—"পড়িলাম।"

আমি। যদি আমার ইচ্ছানুসারে কার্য্যই না করিবে, তবে আবার কেন আমার জীবনের শান্তিভঙ্গ মানসে এখানে আসিয়াছ।

পূর্ব্বের ন্যায় কাতর কণ্ঠে পঙ্কজিনী কহিলেন,—"এ দাসীর উপর এতদূর নিষ্ঠুর আদেশ কেন?"

আমি।—যেমন রোগ তেম্নি ঔষধ—পঙ্কজিনী। তোমার হৃদয়ে যেমন তীব্র হিংসা দ্বেষে পরিপূর্ণ তেমনই তোমার কঠোর প্রায়শ্চিত্তের দরকার। এখন বাজে কথা রাখিয়া বল, প্রায়শ্চিত্ত করিতে তুমি স্বীকৃত কিনা?

আমার কথায় পঙ্কজিনী আবার অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত আপনার মনে আপনি কি ভাবিলেন, তারপর কহিলেন,—"আপনার এ কঠোর প্রতিজ্ঞার কি কোন ব্যতিক্রম হইবে না।"

আমি।—স্ত্রীলোক তুমি—তোমারই প্রতিজ্ঞার যদি কোন ব্যতিক্রম না হয়; তবে পুরুষ আমি—তোমার স্বামী—আমারই কেন প্রতিজ্ঞার ব্যতিক্রম হইবে?"

আবার দীর্ঘকাল ধরিয়া পঙ্কজিনী আপনার মনে কত কি ভাবিলেন—আপনার মনে কত কি মীমাংসা করিলেন। তারপর আবার একবার কাতর দৃষ্টিতে আমার মুখের পানে চাহিলেন। শেষ, অনেকক্ষণ পরে, হৃদয়ের নিভৃততম প্রদেশ হইতে একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া কহিলেন—"তবে তাহাই হউক—আপনার কথায়ই স্বীকৃত হইলাম।"

আমি। শুধু স্বীকৃত হইলে হইবে না—প্রতিজ্ঞা করিতে হইবে। এই রাত্রি কাল—আমি তোমার স্বামী সম্মুখে। আমার শপথ করিয়া প্রতিজ্ঞা কর।

পঙ্কজিনী। তাহাই হউক। আমি, আপনি আমার স্বামী—আপনার শপথ করিয়া প্রতিজ্ঞা করিতেছি, জীবনে মরণে আর কখন বাপের বাড়ী যাইব না।

আমি। উত্তম। আর একটা।

কাতর কণ্ঠে পঙ্কজিনী কহিলেন,—"আর কি বলুন।"

আমি। যদি আমাকে স্পর্শ করিবার তোমার ইচ্ছা থাকে, তবে তোমার দেহের এই অলঙ্কার রাশিও জন্মসৌধ পরিত্যাগ করিতে হইবে?

অলঙ্কার রাশি উন্মোচনের কথা শুনিয়া পঙ্কজিনী আবার ম্রিয়মান হইয়া কহিলেন—"কেন?"

আমি। বড় দুঃখে ও বড় মর্ম্মান্তিক কষ্টে আমি একদিন প্রতিজ্ঞা করিয়াছি যে, জীবনে কখন স্বর্ণ স্পর্শ করিব না; সুতরাং আমার সহিত যিনি বসবাস করিতে ইচ্ছুক হইবেন, তাঁহাকেও স্বর্ণ স্পর্শ করিতে হইবে না।

পঙ্কজিনী। কেন এমন কঠিন প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন।

আমি। কেন এ প্রতিজ্ঞা করিয়াছি—জানি না। তবে যখন ভাল মন্দ, ভূত ভবিষ্যৎ বিচার না করিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছি তখন, এখন তোমার অনুরোধে কেমন করিয়া সে প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিব।

পঙ্কজিনী। আমি সধবা, এমন অকল্যাণকর আপনার আদেশ,—এ আদেশ পালন করিতে আমি সম্পূর্ণ অশক্ত।

আমি। স্বামীর আদেশ পালন করিতে যে স্ত্রী অসমর্থ—তাহার আবার সধবা বলিয়া গৌরব কি, পঙ্কজিনী? সধবার বেশ ধারণ করাই অধিক গৌরবের বিষয় না স্বামীর আদেশ পালন করাই অধিক গৌরবের বিষয়—একবার আপনার মনে স্থির চিত্তে ভাবিয়া দেখিলেই তো হয়?

পঙ্কজিনী। সবই কি ছাড়িতে হইবে?

আমি। হাঁ, সবই।

পঙ্কজিনী। এয়োর লক্ষ্যণ একখানিও কি গায়ে রাখিতে পারিব না।

আমি। না, একখানিও গায়ে রাখিতে পারিবে না।

আবার কাতর কণ্ঠে পঙ্কজিনী কহিলেন—"কেন এমন কঠোর প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন।"

আমিও এবার ততোধিক কাতরকণ্ঠে কহিলাম,—"তুমি পঙ্কজিনী—আমার স্ত্রী, প্রাণাধিকা। একদিন তুমিই তো এই কঠিন প্রতিজ্ঞা করাইবার একমাত্র প্রধানতম কারণ,—আবার তুমিই আমাকে জিজ্ঞাসা করিতেছ—'কেন এমন কঠোর প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন'—এবার কথা কয়েকটী বলিতে আমার

নয়নে প্রবলবেগে জল আসিল। আমি চোখের জল মুছিয়া কহিলাম—"তবে শুন—ভাবিয়াছিলাম তোমাকে আর বলিব না, কিন্তু যখন তুমিই আবার সেই পুরানো কথা পাড়লে, তখন শুন। সেইবার—সেই বি, এ পরীক্ষার ফীর টাকা কোথায়ও সংগ্রহ করিতে না পারিয়া, প্রথমে তোমার বড় মানুষ পিতার নিকট ভিক্ষার্থী হইয়া কাতরকণ্ঠে তোমার পিতার নিকট টাকা চাহিয়া পাঠাইয়াছিলাম। কিন্তু ধনবান তিনি—আমি তাঁহার ইচ্ছানুযায়ী, অগ্রজের স্নেহপাশ ছিন্ন করিয়া, তাঁহার গলগ্রহ হইতে সম্পূর্ণ অসমর্থ হইয়াছিলাম তাই তিনি সেই রাগে, আর পাছে অধ্যয়ন করিব বলিয়া তাঁহার নিকট হইতে টাকা লইয়া সেই টাকা সংসারে ব্যয় করি এই ভয়ে টাকা পাঠান তো দূরের কথা পত্রের উত্তর পর্য্যন্ত দিতে তিনি অসমর্থ হইয়াছিলেন। এদিকে আর কোথায়ও কোন প্রকার টাকা সংগ্রহ করিতে না পারিয়া, 'ফী' দাখিলের ঠিক পূর্ব্ব রাত্রিতে তোমার নিকট তোমারই পিতৃদত্ত কয়েকখানি গহণা চাহিয়াছিলাম, গহণার জন্য কত তোমার পায়ে ধরিয়াছিলাম। কিন্তু বড়মানুষের মেয়ে তুমি—তুমি যখন আপনার পিতার ধনগৌরবে অন্ধ হইয়া গহণা দিয়া—আমি তোমার স্বামী, আমার বিপদুদ্ধার করা তো দূরের কথা, বরং দরিদ্র বলিয়া পদে পদে আমাকে অপমানিত ও পদদলিত করিয়াছিলে। কিন্তু আমার সেই বড় বিপদের দিন, তোমারই সমবয়েসী, আশৈশব দরিদ্রের কন্যা, আমার এই চিরহতভাগিনী বউঠাকুরাণী, আমার মর্ম্মান্তিক যন্ত্রণায় কাতর হইয়া, আপনারই পিতৃদত্ত আপনার গায়ের একমাত্র অবশিষ্ট সোণার বালা দু'গাছি ও তাঁহারই কিঞ্চিদধিক দেড় বৎসর বয়সের শিশু কন্যা,—আমাদের বড় আদরের, বড় স্নেহের শেফালিকার গায়ের গহণাগুলি অম্লান অন্তঃকরণে খুলিয়া দিয়া, আমাকে সেদিনকার বড় বিপদে উদ্ধার করিয়া, আমার চিরদিনের উন্নতির পথ পরিস্কার করিয়া দিয়াছিলেন—সে কথা কি তোমার মনে আছে?"

পঙ্কজিনী পূর্ব্ববৎ কাতর করুণ কণ্ঠে কহিলেন—"আছে বৈকি? যতদিন বাঁচিব হৃদয়ে শেলের ন্যায় তাহা বিদ্ধ হইয়া রহিবে।"

আমি। তখন আমার এমনই দুঃসময় পড়িয়াছিল, টাকার এতই গরজ হইয়াছিল যে, বালিকা শেফালিকার কাতর ক্রন্দনেও আমার এ পাষাণ হৃদয়

এক মুহূর্ত্তের জন্য দ্রবীভূত হয় নাই। আমি কাহারো সুখ দুঃখের প্রতি একবার মাত্র দৃক্‌পাত না করিয়া, সেই অলঙ্কারগুলি বিক্রয় করিয়া তখনকার সেই বড় বিপদ হইতে উদ্ধার হই। আর সত্য কথা বলিতে দোষ নাই যে, সেই বড় দুঃসময়ে আমার সেই লক্ষ্মীস্বরূপিনী বালিকা বউঠাকুরাণী অম্লান অন্তঃকরণে এই গহণাগুলি আমাকে না দিলে, চিরহতভাগ্য রজনীরঞ্জন আমি —আমি আজ পাটনা কালেজের অধ্যাপক হইতাম না—একটা নগণ্য মনুষ্য হইয়া থাকিতাম। কিন্তু একমাত্র বউঠাকুরাণীর স্নেহে আমি আজ একটা লোকের মত লোক হইতে পারিয়াছি। তাই সেই দিন আমার বড় দুঃসময়ে বউঠাকুরাণীর এই অলৌকিক কাণ্ড দেখিয়া মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলাম যে,—'যেমন অসহ্য হৃদয়বেদনা বুকে করিয়া তাঁহারই হাতের একমাত্রাবশিষ্ট বালা দু'গাছি ও শেফালিকার গায়ের গহণাগুলি লইয়াছি তেমনই আবার আমার সুসময় পড়িলে—আমি উপার্জ্জনক্ষম হইতে পারিলে আমার প্রথম উপার্জ্জিত অর্থের দ্বারায় তাঁহার ও শেফালিকার গায়ের গহণাগুলি গড়াইয়া তাঁহাদিগকে পরাইয়া হৃদয়ের দুঃখ দূর করিব।' কিন্তু উপার্জ্জনক্ষম হইবার পূর্ব্বেই বিধাতা আমার বড় সাধে বাদ সাধিয়াছেন। তাই সেদিন—সেই মধুমতীর সৈকতভূমে দাদার সেই পরম পবিত্র চিতার সম্মুখে আমি কঠোর প্রতিজ্ঞায় আবদ্ধ হইয়াছি যে, জীবনে কখন স্বর্ণ স্পর্শ করিব না। এখন তোমার অনুরোধে আমি আমার সে প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিয়া কেন কলঙ্কিত হইব? আমি হাসিতে হাসিতে অক্লেশে আপনার জীবন বিসর্জ্জন করিতে পারি তবু জীবনের এ কঠোর প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিতে পারিব না। এই বলিয়া চোখের জল মুছিলাম।

এবার আমার নয়নে প্রবলবেগে জল পড়িতে দেখিয়া পঙ্কজিনীর আশৈশবের সে পাষাণ হৃদয়ও গলিয়া গেল। আবার দীর্ঘকাল ধরিয়া আপনার মনে আপনি কি ভাবিলেন—একবার আমার মলিন মুখের প্রতি কাতর দৃষ্টিপাত করিলেন, তারপর একটা গভীর দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া কহিলেন—"তবে তাহাই হউক—আপনার প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিয়া আপনার আদেশই পালন করি এবং জীবনের আত্মকৃত কঠোর পাপের কঠোর প্রায়শ্চিত্ত করি"—এই বলিয়া একে একে আপনার গাত্র হইতে আপনারই পিতৃদত্ত সেই রত্নখচিত বহুমূল্য অলঙ্কার

রাশি একে একে উন্মোচন করিয়া ঘরের মেজেতে ছড়াইয়া দিয়া কহিলেন—"আজি হইতে প্রতিজ্ঞা করিলাম, জীবনে আর কখন অলঙ্কার পরিব না।" তারপর ক্ষণকাল নীরব থাকিবার পর, ধীরে ধীরে কহিলেন—"কেমন, এতদিন আমার উপর আপনার যে রাগ ছিল, এখন আপনার সে রাগ পড়িল কি।"

আমি। আমি রাগিয়া তোমার উপর এ কঠোর আদেশ করি নাই। একদিন মর্ম্মান্তিক হৃদয়বেদনায় যে কঠোর প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলাম—এখন আত্মকৃত সেই প্রতিজ্ঞাভঙ্গ করিতে আমি সম্পূর্ণ অশক্ত, তাই তোমার প্রতি এই কঠোর আদেশ করিতে বাধ্য হইয়াছি—অন্য কোন কারণ নাই।

পঙ্কজিনী। যাহা হউক এখন আমার পূর্ব্বকৃত সব অপরাধ ক্ষমা করিলেন কি?

আমি। "হাঁ, করিলাম—প্রসন্নচিত্তে তোমার সব অপরাধ ক্ষমা করিলাম। আশা করি, আজিকার এই রাত্রি হইতে আমার শোকদুঃখপরিপূর্ণ জীবনের কয়টা দিন ঠিক আমারই ন্যায় হইয়া আমার সৎকার্য্যের সহায়তা করিয়া সহধর্ম্মিনী নামের সার্থকতা সম্পাদন করিয়া আমার জীবনকে মধুর ও উন্নত করিও।" এই বলিয়া ক্ষণকাল উভয়েই নীরবে থাকিবার পর আমি কহিলাম—"যখন তুমি আমার প্রতিজ্ঞা পালন মানসে আপনার গা হইতে অলঙ্কার পরিত্যাগ করিয়াছ, তখন অক্লেশে আমার সহিত বসবাস করিতে পার।"

* * * *

এইখানেই আমার শোকদুঃখপরিপূর্ণ জীবনেতিহাসের সেই অংশের ইতিবৃত্ত শেষ করিলাম। যেইদিন যেই রাত্রিতে আমার মনস্তুষ্টিসাধন মানসে পঙ্কজিনী আপনার গাত্র হইতে যে অলঙ্কার রাশি উন্মোচন করিয়াছিলেন, সেই দিন হইতে আজি এই সুদীর্ঘ দশ বর্ষ কাল মধ্যে আর কখন আপনার দেহ স্বর্ণালঙ্কারে শোভিত করেন নাই—কখন শোভিত করিবার অভিলাষ পর্য্যন্তও প্রকাশ করেন নাই। তবে সত্যের অনুরোধে একটা কথা বলিয়া রাখি যে, অলঙ্কার ধারণে পঙ্কজিনী বীতস্পৃহ হইলেও আশৈশবের পিতৃ মাতৃদত্ত হিংসা, দ্বেষ, পরশ্রিকাতরতা প্রভৃতি পরিপূর্ণ চরিত্র এখনও একেবারে সংশোধন করিতে পারেন নাই; হৃদয়টা এখনও নব বসন্তের প্রভাতকালিন নির্ম্মলাকাশের ন্যায়, অথবা শরদাকাশের নিষ্কলঙ্ক পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় নিষ্কলঙ্ক

করিতে পারেন নাই; তবে চারিদিক দেখিয়া শুনিয়া মনে হয় যে, দেবতার সংসর্গে—আমার হতভাগিনী বউঠাকুরাণীর পবিত্র ও মধুর সংস্পর্শে শীঘ্রই তাঁহার চরিত্রের মলা অপসারিত করিয়া আমার শোকদুঃখপরিপূর্ণ হৃদয়ে পূণানন্দ দান করিতে পারিবেন—এখন জগদীশ্বর ভরসা। ইতি

দীনহীন—হতভাগ্য শ্রীরজনীকান্ত শর্ম্মা।

উপসংহার।

আমি আমার শৈশব সুহৃৎ রজনীরঞ্জনের লিখিত, তাঁহারই শোকদুঃখ পরিপূর্ণ জীবন নাটকের একাংশের আখ্যায়িকা এই "সোণায় অরুচি"—পাঠ করিয়া মুগ্ধ হইলাম। এবং বার বার ভক্তিভরে তাঁহার উদ্দেশে তাঁহারই পবিত্র চরণে ভক্তিভরে প্রণিপাত করিলাম। তারপর অন্তঃপুর মধ্যে প্রবেশ করিয়া আমার প্রাণাধিকা পত্নী অনঙ্গমুঞ্জরীকে ডাকিলাম।

অনঙ্গমুঞ্জরী আমার আহ্বানে আমার নিকট আসিলে পর তাঁহার হাতে "সোণায় অরুচি"র প্যাকেট্‌টা দিয়া কহিলাম—এই নাও পড়।"

অনঙ্গ আমার হাত হইতে আগ্রহ সহকারে রজনীর লিখিত "সোণায় অরুচি"র তাড়াটা লইয়া কহিলেন—"কবে আসিয়াছে—তুমি পড়িয়াছ?"

আমি। আজই এসেছে। আমি এতক্ষণ ধরে পড়িলাম। এখন তুমি পড়—একটু সতর্ক হ'য়ে প'ড়ো যেন মলা না হয়। রজনীর ইচ্ছা যে, তাঁহার লিখিত এই কাহিনীটা সাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য কোন একটা মাসিক পত্রের পৃষ্ঠায় প্রকাশিত হয়।

অনঙ্গ। কোন্ পত্রিকায় প্রকাশ কর্ব্বার মতলব করেছ?

আমি। এখনও ঠিক করি নাই—পরে করিব। আর যিনি আগ্রহভরে প্রকাশ করিতে চাহিবেন তাঁহারই কাগজে বাহির হইবে।

অনঙ্গ। উত্তম।

আমি। এখন তুমি বেশ মনোযোগের সহিত আদি অন্ত পাঠ কর—রাত্রিতে "সোণায় অরুচি" সম্বন্ধে তোমার মতামত শুনিব।

অনঙ্গ। শুনিও, বলিয়া প্যাকেট্‌টা হাতে করিয়া কার্য্যান্তরে উঠিয়া গেলেন—আমিও বহির্ব্বাটীতে আসিলাম।

সমাপ্ত। শ্রীউমেশচন্দ্র মৈত্রেয়।

দোল।

বসন্ত—ধামার।

জাগ জাগ সবে নব বসন্ত পবনে;
খেল সবে, প্রেমমত্ত ভাবদোলে দুলি',
অঙ্গে মাখি রাগরক্ত চরণের ধূলি;
শুনাও মধুর নামগান সর্ব্বজনে।
এসময়ে দেখ সব রাগে ঢল ঢল
কুসুমেরা নানা রঙ্গে পরিমল মাখে,
গাহিছে পাখীরা গান তরুপরে দুলে,
রক্ত কিসলয় শোভে সহকার শাখে;
আমরা কেননা প্রাণ দিব তাঁরে খুলে?
পাপময় জড়তার চলে গেছে শীত,
মোহের কুয়াসাজাল চির অপসৃত;
নবপ্রাণ খেলিতেছে এবে জলে স্থলে;
ভাবেমত্ত মুক্ত প্রাণ এসো দলে দলে,
শিশুসম খেল দেবের চরণতলে।

শ্রীঋতেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

সঙ্গীতে যুগলমূর্ত্তি।

তবলা ও বাঁয়া।

সঙ্গীতে দুইটী জিনিষ "তবলা ও বাঁয়া" আমাদের বাদ্যযন্ত্ররূপে বিরাজ করিতেছে, ইহারাই প্রকৃতপক্ষে সঙ্গীতের প্রধান সহচর। যেমন কাজ করিতে গেলে দুটী হাতের আবশ্যক, ঘরকন্না করিতে গেলে স্ত্রী পুরুষ দুই না হইলে চলে না, দেখিতে গেলে দুটী চক্ষুর প্রয়োজন, শুনিতে গেলে দুটী কর্ণের আবশ্যক, তেমনি বাজাইতে গেলে দুটী যন্ত্রের আবশ্যক তবলা ও বাঁয়া অর্থাৎ ডাইনে ও বাঁয়া অর্থাৎ দক্ষিণ ও বামের আবশ্যক। বাদ্যযন্ত্রের এই দুই যুগল-মূর্ত্তি বিনা বাজনা যেন সম্পূর্ণ হয় না, অঙ্গহীন থাকে।

আমাদিগের এই তবলা ও বাঁয়ার ভাব হইতেই ইউরোপীয় সঙ্গীতের Treble Clef ও Bass Clef য়ের ভাব নাবিয়াছে। এই ভারতীয় আর্য্য সঙ্গীতাচার্য্যদিগের নিকট হইতে অন্যান্য আর্য্যেরা সঙ্গীতের মূলমন্ত্র প্রাপ্ত হয়েন ও তাহাতে শিক্ষিত ও দীক্ষিত হইয়াছিলেন। ইউরোপীয় Treble Clef ও Bass Clef য়ের ভাব আমাদিগের তবলা ও বাঁয়ার ভাবের ছায়া।

Treble টী উচুসুরে এবং Bass টী নীচুসুরে। আমাদিগের তবলাটী উচুসুরে বাধা হয় আর বাঁয়াটী নীচুসুরে বাঁধা থাকে। Treble Clef য়ে উচ্চতা ও সূক্ষ্মতা আছে Bass Clef য়ে নিম্নতা ও গভীরতা আছে; আমাদিগের 'তবলা'তে উচ্চতা ও সূক্ষ্মতা আছে; বাঁয়াতে নিম্নতা ও গভীরতা আছে; Treble Clef য়ে তারভাব ও Bass Clef য়ে মন্দ্রভাব; আমাদিগের তবলা ও বাঁয়াতেও সেইভাব, 'তবলা'য় তারভাব আর বাঁয়ায় মন্দ্রভাব, বলিতে গেলে তবলা ও বাঁয়া যেন ঠিক আলো ও ছায়া—সঙ্গীতের পটে যেন যুগলমূর্ত্তি।

সঙ্গীতবাদ্যের স্বভাব ফুটাইতে তবলা ও বাঁয়া বড়ই পটু। এই দুইটী বাদ্য যেন আলোছায়ার ন্যায় ঘুরিয়া বেড়ায়, বাদ্যের তারমন্দ্রতা তীব্র ও মৃদু ভাব বজায় রাখে।

যদি আলোছায়া জগতে বিদ্যমান না থাকিত তবে সব একাকার দেখাইত, স্বভাবের ভাব বুঝিতে পারিতাম না, প্রকৃতির কৃতিত্ব বুঝিতে পারিতাম না। আলোছায়া নানারূপে বিশ্বসংসারে লীলাখেলা করিতেছে।

পৃথিবীতে স্বভাবচিত্র বিকশিত করিতে আলোকের আবশ্যক হয়, ছায়ারও আবশ্যক হয় অর্থাৎ কখনো বা কোনস্থানে আলোকের কখনো বা কোনস্থানে স্নিগ্ধ ছায়ার প্রয়োজন হয়। শুধু আলো হইলেও জীবন বাঁচে না, শুধু ছায়াও হইলে প্রাণ রক্ষা পায় না। সেই কারণে পরমেশ্বর দিন রাত্রি দিয়াছেন।

বাদ্যে দিন যেন তবলা ও রাত্রি যেন বাঁয়া। সমস্ত দিন বলিলে যেমন আমরা দিন রাত্রির সমাবেশ দেখি সেইরূপ মৃদঙ্গে আমরা তবলা বাঁয়া এই যুগলমূর্ত্তির একত্র সমাবেশ দেখিতে পাই। মৃদঙ্গে যেন তবলা বাঁয়া এই যুগল-মূর্ত্তির মধুর মিলন। এই আলোছায়াময় মৃদঙ্গ লইয়া যেন গণপতি বিশ্বেশ্বরের সেই মহা শিবভাবের মহাছন্দময় নৃত্যের সঙ্গে ক্রীড়া করিতেছেন—বাজাইতে-ছেন।

তবলা ও বামার যুক্ত ভাব মৃদঙ্গে দেখা যায়। গানের সুরে যেমন কড়ি ও কোমলের ছাঁদ, বাদ্যের সুরেও সেইরূপ কড়ি ও কোমলের ছন্দের আবশ্যক হওয়ায় তবলা ও বামার উৎপত্তি।

এই মৃদঙ্গ সংস্কৃত যন্ত্র; মৃদঙ্গ সংস্কৃত কথা। পূর্ব্বে প্রথম প্রথম ইহা মৃত্তিকাদ্বারা প্রস্তুত হইত বলিয়া ইহার নাম মৃদঙ্গ হইয়াছে। কালে এই মৃদঙ্গ কাষ্ঠে তৈয়ারি হইতে লাগিল। রক্তচন্দন, চন্দন খদির, কাঁঠাল প্রভৃতি নানারূপ কাষ্ঠে এই মৃদঙ্গ প্রস্তুত হইতে আরম্ভ হইয়াছে। যাহার যেরূপ কাষ্ঠে পছন্দ হয়, সে সেইরূপ কাষ্ঠে তৈয়ারি করিয়া লয়। রক্তচন্দন কাষ্ঠের প্রস্তুত মৃদঙ্গ দুর্লভ ও বহুমূল্য। রক্তচন্দনের মৃদঙ্গ বড় সুমিষ্ট ও সুন্দর শব্দবিশিষ্ট হয়। *

সংস্কৃত মৃদঙ্গ শব্দটী সহসা পাখোয়াজ নাম লাভ করিল কিরূপে? একথা

---

* পূজনীয় পিতৃদেব ৺ হেমেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় এক সময়ে তাঁহার যৌবনে ওস্তাদের কাছে মৃদঙ্গ শিখিতেন ও অভ্যাস করিতেন। তাঁহার অনেকগুলি মৃদঙ্গ সংগ্রহ ছিল তন্মধ্যে একটী রক্তচন্দনের পাখোয়াজ অতি যত্নে তিনি রাখিয়া গিয়াছেন।

সকলেরই মনে প্রশ্ন উঠিতে পারে। তাহার উত্তর কেহ বলেন, এই মৃদঙ্গের মধুর ধ্বনিতে আকৃষ্ট হইয়া ওস্তাদেরাই তাহাকে পাক্কোয়াজ কহে। পক্ক আওয়াজ বা পাকা আওয়াজ এইরূপ হইতে ক্রমশঃ পাখাওয়াজ কথায় দাঁড়াইয়াছে। এই পাখোয়াজ যেখানে গম্ভীর ধ্রুপদাদি গান হয় তথায় ব্যবহার হয় খেয়াল টপ্পার সময় অখণ্ড মৃদঙ্গের পরিবর্ত্তে মৃদঙ্গেরই খণ্ডভাব তবলা ও বাঁয়া ব্যবহৃত হয়।

কিন্তু কেচিতের মতে আমাদের পুষ্করবাদ্যেরই অপভ্রংশ হইতেছে পাখোয়াজ। পুষ্করবাদ্যের আওয়াজ মেঘের ন্যায় শাস্ত্রে বর্ণিত আছে আমাদের পাখোয়াজেরও ঐরূপ জলদগম্ভীর নির্ঘোষ। আর পুষ্করবাদ্যকে ভাঙ্গিলেও দেখা যায় এইরূপ হয়ঃ পুষ্করবাদ্য—পুখরবাজ—পুখর্বাজ—পাখোয়াজ।

যাই হৌক মৃদঙ্গ পুষ্কর প্রভৃতিতে ডান ও বাঁ হাত যুগপৎ ব্যবহৃত হয়। যেন তবলা ও বাঁয়া যুগলমূর্ত্তির একত্বে অবস্থান। আমরা কখনো যুগলমূর্ত্তিকে পৃথক করিয়া আনন্দ অনুভব করি কখনো অপৃথকভাবে তাহাদের একীকরণে আনন্দ উপভোগ করি।

শ্রীহিতেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

ব্রাহ্মসমাজ স্থাপনের পূর্ব্বে রামমোহন রায়ের আরও কয়েকটী কার্য্য।

এই অধ্যায়ে আমরা রামমোহন রায়ের জীবনের আরও কতকগুলি কার্য্যের উল্লেখ করিব, যে সকল পূর্ব্ব অধ্যায়ে হয় একেবারেই উল্লিখিত হয় নাই অথবা সম্যক্ আলোচিত হয় নাই। ইতিপূর্ব্বে যে সকল ঘটনা উল্লেখ করিয়া আসিয়াছি, সেগুলি আলোচনা করিলেই বুঝা যাইবে যে উত্তরকালে সেই সকল কার্য্যের ফলে ব্রাহ্মসমাজের ন্যায় কোন সমাজ প্রতিষ্ঠিত না হইয়া যাইতে পারে না। ব্রাহ্মসমাজের প্রতিষ্ঠাসূচক কার্য্যসমূহের মধ্যে রামমোহন

রায়ের বিভিন্নসম্প্রদায়ের সহিত তর্কযুদ্ধ অন্যতর। এই সকল তর্কের মূলমন্ত্র অবশ্য মূর্ত্তিপূজার পরিবর্ত্তে ব্রহ্মপূজা প্রতিষ্ঠিত করা, কিন্তু আনুষঙ্গিকভাবে অন্যান্য অনেক গুরুতর বিষয়ও আসিয়া পড়িত। এই সকল তর্কে রামমোহন রায়ের একটী গুণ দেখি এই যে, তিনি স্বয়ং কখনও বিপক্ষের প্রতি গালাগালি বা অপমানসূচক কোন কথা প্রয়োগ করিতেন না, কিন্তু বিপক্ষের হয়তো তাঁহার ধৈর্য্যের নিকট পরাজিত হইয়া রামমোহন রায়কে কিছুতেই রাগাইতে না পারিয়া প্রায়ই মৎস্যজীবিনীদিগের ব্রহ্মাস্ত্র ব্যক্তিগত কুৎসা ও চরিত্রের প্রতি ইঙ্গিত করিয়া শান্তিলাভ করিতেন। আশ্চর্য্য এই যে রামমোহন সেই সকলেরও উত্তরপ্রদানে পরাঙ্মুখ হইতেন না। রামমোহন বিপক্ষদিগের এই সকল ক্ষুদ্রতায় রাগান্বিত হইলেও বাহ্যিক ব্যবহারে কখনই কোন প্রকার বিরক্তি প্রকাশ করিতেন না। সময়ে সময়ে তাঁহার ব্যঙ্গ যে কিরূপ গম্ভীর অথচ তীব্র হইত, তাহার দৃষ্টান্ত খৃষ্টধর্ম্ম সম্বন্ধে মিশনরি ও তিন চীনদেশীয় ব্যক্তির তর্ক। কবিতাকার বলিয়া এক ব্যক্তি রামমোহন রায়কে পাষণ্ড, নাস্তিক প্রভৃতি বলিয়া গালি দেন। তদুত্তরে রামমোহন রায় লিখিলেন যে ইহাতে তাঁহার ক্রোধ হয় নাই, কারণ শিশুকে যেমন ঔষধ খাওয়াইতে গেলে শিশুর ক্রোধ হয় এবং শিশু দুর্বাক্য বলে, সেইরূপ বহুদিনের মূর্ত্তিপূজায় যাঁহাদের চক্ষু অন্ধ হইয়াছে, তাঁহাদিগকে ব্রহ্মপূজার কথা বলিলে স্বভাবতই তাঁহাদের ক্রোধোদয় হইতে পারে। উপসংহারে রামমোহন রায় প্রার্থনা করিতেছেন "হে পরমেশ্বর, কবিতাকারকে আত্মা ও অনাত্মার বিবেচনার প্রবৃত্তি দাও; তখন কবিতাকার অবশ্য জানিবেন যে আমরা তাঁহার ও তাদৃশ ব্যক্তি সকলের আত্মীয় বা অনাত্মীয় হই।" ইহা কেমন গম্ভীর অথচ মর্ম্মস্পর্শী। অনেক সময়ে রামমোহন রায়কে যে কিরূপ শৈশবোচিত তর্কযুদ্ধে নামিতে হইত, কবিতাকারের সহিত সংগ্রামই তাহার পরিচয়স্থল। কবিতাকার লিখিলেন যে রামমোহন রায় যবনের ন্যায় বস্ত্রপরিধান করিয়া দরবারে যান। রামমোহন রায় প্রত্যুত্তরে তাহাতে দোষ কি এবং তাহার শাস্ত্রপ্রমাণ জানিতে চাহিলেন।

রামমোহন রায়ের চরিত্রে কয়েকটী ছিদ্র ছিল, বিপক্ষেরা সেগুলি জানিতেন এবং তাঁহাদের তর্কযুদ্ধ সেই সকল ছিদ্রের কথা উল্লেখ করিতে কুণ্ঠিত

হইতেন না। কিন্তু রামমোহন রায়ও অপ্রস্তুত হইবার লোক ছিলেন না। তাঁহার উত্তরও সঙ্গে সঙ্গে প্রদত্ত হইত। বিপক্ষগণ কাজেই নিরস্ত হইতেন। কলিকাতানিবাসী কাশীনাথ তর্কপঞ্চানন ধর্ম্মসংস্থাপনাকাঙ্ক্ষী নাম ধারণ পূর্ব্বক রামমোহন রায়কে চারটী প্রশ্ন করেন। এই সকল প্রশ্নে রামমোহন রায়ের কোন কোন মত ও ব্যবহারের প্রতি লক্ষ্য করা হইয়াছিল। রামমোহন রায় "সম্যগনুষ্ঠানাক্ষম তজ্জন্য মনস্তাপবিশিষ্ট" নাম স্বাক্ষর করিয়া চারি প্রশ্নের উত্তর প্রকাশ করেন। প্রথম প্রশ্ন—ইদানীন্তন ভাক্ত তত্ত্বজ্ঞানী ও তাঁহাদের সংসর্গী কোন্ নিগূঢ় শাস্ত্রাবলম্বনে স্ব স্ব জাতীয় ধর্ম্মকর্ম্ম পরিত্যাগ করিতেছেন এবং তাঁহাদের সংসর্গ পরিত্যজ্য কি না? ইহার উত্তরে রামমোহন রায় বলিলেন যে তাঁহার দল উপনিষদ্ মনুস্মৃতি প্রভৃতির প্রমাণে জ্ঞানমার্গ অবলম্বন করিয়াছেন, কিন্তু বিনা বেদবিধি-সাধনের প্রমাণ আছে যথা গৌরাঙ্গ, জগাইমাধাই এবং তিন প্রভু। আর ভাক্ত কর্ম্মী (তর্কপঞ্চাননের ন্যায়) নিজ ধর্ম্মের লক্ষাংশের একাংশ অনুষ্ঠান করিয়া (রামমোহনের ন্যায়) ভাক্ত তত্ত্বজ্ঞানীকে নিন্দা করিলে কর্ম্মী নিজেই পাপে ডুবিবেন।

দ্বিতীয় প্রশ্ন—সদাচার ও সদ্ব্যবহারহীন ব্রহ্মজ্ঞানাভিমানীর যজ্ঞোপবীত ধারণ নিরর্থক কি না? উভয়ে রামমোহন রায় বলিলেন যে ধর্ম্মসংস্থাপনাকাঙ্ক্ষী আগে নিজের গায়ে হাত দিয়া বলুন যে তিনি নিজধর্ম্মবিহিত আচার ব্যবহারের সহস্রাংশের একাংশও অনুষ্ঠান করিতে পারেন কি না—যদি না পারেন, তবে নিজের যজ্ঞোপবীত নামাইয়া অপরকে তদ্বিষয়ে উপদেশ দিতে পারেন। বিভিন্ন সম্প্রদায়ের ব্যক্তিগণ নিজ নিজ মহাজনগণের প্রবর্ত্তিত আচার ব্যবহার অনুষ্ঠান করেন, সুতরাং আচার ব্যবহার ভিন্ন হইলেই যজ্ঞোপবীত ধারণ নিরর্থক একথা বলা অন্যায়। এখন কথা এই যে হিন্দুশাস্ত্রের নির্দ্দিষ্ট নিত্যনৈমিত্তিক ক্রিয়াকলাপ সম্যক্ অনুষ্ঠান করা একেবারেই অসম্ভব, কারণ হিন্দুশাস্ত্র স্তরে স্তরে গঠিত হইয়াছে এবং ক্রিয়াকলাপও সঙ্গে সঙ্গে স্তূপীকৃত হইয়াছে। রামমোহন রায় সহজেই অগাধ হিন্দুশাস্ত্র হইতে স্বমতের পরিপোষক ভাবাত্মক ও অভাবাত্মক সর্ব্বপ্রকার যুক্তিলাভ করিয়াছিলেন। আমরা মনশ্চক্ষে বেশ দেখিতেছি যে রামমোহন রায় এই সকল প্রশ্নের উত্তর প্রদান কালে মনে মনে কিরূপ আমোদলাভ করিতেছিলেন।

রামমোহন রায় একজন প্রসিদ্ধ ভোজনপটু ছিলেন। মাংস তাঁহার বিশেষ প্রিয় ছিল। এই কারণে কবিতাকারের তৃতীয় প্রশ্ন এই যে ব্রাহ্মণ সজ্জনের পক্ষে অবৈধ হিংসা দ্বারা আত্মোদর ভরণ অনুচিত কি না। এই প্রশ্নের ব্যাখ্যায় রামমোহন রায়ের উপর এই দোষারোপ হইয়াছিল যে তিনি অবৈধরূপে ছাগ হনন এবং অনিবেদিত মাংস ভোজন করেন! রামমোহন রায় তদুত্তরে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে ছাগ হনন ও মাংসভোজন কালে তিনি কি উপস্থিত হইয়া দেখিয়াছেন? কলিযুগে আগমোক্ত বা বেদোক্তবিধানে লোকযাত্রা নির্বাহ করিবেক ইহাই বিধি, সুতরাং আগমানুযায়ী বিহিতবিধানে মাংসভোজন করিলে অধর্ম্ম হয় না।

রামমোহন রায় শিখা রাখেন নাই; তাঁহার নিয়মিত পরিমাণে সুরাপান অভ্যাস ছিল, এবং শৈববিবাহে বিবাহিত এক স্ত্রী ছিলেন বলিয়া জনশ্রুতি আছে। এই সকলের প্রতি কটাক্ষপাত করিয়া চতুর্থ প্রশ্ন হইল যে "লজ্জা ও ধর্ম্মভয় পরিত্যাগ করিয়া যাঁহারা বৃথা কেশচ্ছেদন, সুরাপান ও ব্যভিচার করেন, তাঁহারা বিরুদ্ধাচারী কি না? রামমোহন রায় সুরাপান সম্বন্ধে তন্ত্রশাস্ত্রের দোহাই দিয়া সিদ্ধান্ত করিলেন যে সংস্কারহীন মদ্যপান করিলে মহাপাতক হয়; নিজ নিজ উপাসনানুসারে সংস্কৃত মদ্যপানে দোষ নাই। তান্ত্রিক সাধনে, মন্ত্রার্থের স্ফূর্ত্তি হইবার উদ্দেশ্যে এবং ব্রহ্মজ্ঞানের স্থিরতার জন্য সুরাপান বিধেয়, কিন্তু লোলুপ হইয়া পান করিলে নিরয়গামী হইতে হয়। ব্যভিচার সম্বন্ধে তিনি বলিলেন যে ব্যভিচার মহাপাতক, কিন্তু তান্ত্রিকদিগের পক্ষে তন্ত্রোক্ত শৈববিবাহে দোষ নাই। শৈববিবাহ স্ত্রী সপিণ্ডা ও সভর্তৃকা না হইলেই হইল, তদ্ভিন্ন তাহাতে বয়স বা জাতিবিচার নাই। বৈদিক বিবাহে বিবাহিত স্ত্রী যদি স্ত্রী হইতে পারে, শৈববিবাহে বিবাহিত স্ত্রী পত্নীনামের অনুপযুক্ত হইবে কেন। এইরূপে রামমোহন রায় চারি প্রশ্নের উত্তর দিয়া কবিতাকারকে নিরস্ত করিলেন।

রামমোহন রায়ের সময়ে ইংরাজীশিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে যুবকদিগের হৃদয়ে এই ভাব প্রবেশ করিতেছিল যে মদ্যমাংস উপযুক্তরূপে সেবা না করিলে ইংরাজীশিক্ষা পূর্ণতা প্রাপ্ত হয় না। বলা বাহুল্য যে রামমোহন রায়ের তর্কযুদ্ধে জয়লাভ করাতে অনেক শিক্ষিত যুবক সন্তুষ্টই হইয়াছিলেন এবং তাঁহার দল

জ্ঞাত ও অজ্ঞাতভাবে গঠিত হইতে লাগিল।

আমার মতে উত্তরকালে ব্রাহ্মসমাজের সংগঠনকল্পে তর্কযুদ্ধ যেরূপ সহায়তা করিয়াছিল, সেইরূপ তাঁহার পুস্তকপ্রকাশও ভাবী ব্রাহ্মসমাজের গঠনপ্রদান করিয়াছিল। সভাষ্য ও সানুবাদ বেদান্ত এবং কয়েকটী উপনিষদ্ এবং তর্কযুদ্ধে আত্মরক্ষার্থ প্রকাশিত গ্রন্থ ব্যতীত তিনি আরও কয়েকখানি স্থায়ী উপযোগিতারও পুস্তক প্রকাশ করিয়াছিলেন। ১৮২৬ খৃষ্টাব্দে "ব্রহ্মনিষ্ঠ গৃহস্থের লক্ষণ"; ১৮২৭ খৃষ্টাব্দে "গায়ত্র্যা পরমোপসনাবিধানং"; ১৮১৮ সালে "গায়ত্রীর অর্থ", "অনুষ্ঠান"; ১৮২৮ সালে "ব্রহ্মোপসনা"; ১৮২০ সালে "প্রার্থনাপত্র"; শঙ্করাচার্য্যের আত্মানাত্মবিবেকের অনুবাদ; "পৌত্তলিকমুখচপেটিকা" এই সকল পুস্তক নিজযন্ত্রে মুদ্রিত করিয়া অজস্র বিতরণ করিতেন। আমরা শুনিয়াছি যে তাঁহার পরিণামে দ্রারিদ্র্যে উপনীত হইবার একটী প্রধান কারণ পুস্তকবিতরণ।

ধর্ম্মবিষয়ক নানাবিধ পুস্তক প্রকাশের সঙ্গে সংবাদ পত্র প্রকাশও রামমোহন রায়ের স্বাধীনতার পরিচায়ক এবং লোকসমূহকে একটা সমাজস্থাপনের জন্য একপ্রকার প্রস্তুত করিয়া তুলিতেছিল। শ্রীরামপুরের মিশনরিদিগের "সমাচারচন্দ্রিকা" পত্রে হিন্দুশাস্ত্রের বিরুদ্ধে ১৮২১ খৃষ্টাব্দে একখানি পত্র প্রকাশিত হয়। রামমোহন রায় তাই পত্রের বিরুদ্ধে একখানি উত্তর লিখিয়া পাঠাইলেন। তাহা উক্ত সমাচার চন্দ্রিকায় প্রকাশিত হইল না। তিনি "ব্রাহ্মণসেবধি" নামক পত্রিকা বাহির করিয়া সেই উত্তর প্রকাশ করিলেন। ইহার পূর্ব্বেই তিনি "সংবাদ কৌমুদী" নামক একখানি সাপ্তাহিক পত্র বঙ্গভাষায় এবং "মিরাট আল আকবর" নামক আর একখানি সাপ্তাহিক পত্র উর্দ্দু ভাষায় প্রকাশ করিতেন। লর্ড আমহার্ষ্টের আসিবার পূর্ব্বে অস্থায়ী গবর্ণর জেনেরল জন এডাম্‌স্ মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা হরণ করিয়া এক নিয়ম প্রচার করিলেন। এই নিয়ম প্রচার হইতে কয়েক মাসের মধ্যেই মিরাট কাগজ উঠিয়া গেল। সংবাদ কৌমুদী আরও কয়েক বৎসর চলিয়াছিল। সদ্বিষয়ের তত্ত্বসকল প্রচার করিবার জন্য যে দেশীয়গণ অপরের সাহায্য ব্যতিরেকে সংবাদপত্র চালাইতে পারেন, তাহার পথপ্রদর্শক রামমোহন রায়। ধর্ম্মবিষয়ক পুস্তক এবং সংবাদপত্র ব্যতীত তিনি ভূগোল, খগোল, জ্যামিতি

এবং বঙ্গভাষার একখানি সুন্দর ব্যাকরণ লিখিয়াছিলেন। বঙ্গভাষাকে সাধারণের উপযোগী করিবার মূল বলিতে গেলে রামমোহন রায়। এরূপ উপযোগী ভাষা প্রাপ্ত না হইলে ব্রাহ্মসমাজ স্থাপিত হইলেও কোন বিশেষ কার্য্য করিতে সমর্থ হইত কি না সন্দেহ।

এইরূপে যখন একে একে সমাজপ্রতিষ্ঠাতার সমস্ত পথই পরিষ্কৃত হইল, তখন ব্রাহ্মসমাজ সহজেই প্রতিষ্ঠিত হইল।

শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

বরাকরে বারদিন।

চিঠি।

বাঙ্গলার কাছে বসিয়া ধ্বনিপ্রতিধ্বনি শুনিতে শুনিতে কত কথা মনে আসিতেছে, অতীতের কত কাহিনী স্মরণপথে জাগ্রত হইয়া উঠিতেছে, কখনো বাঙ্গলার বারান্দার বাহিরে বসিতেছি, কখনো সেখান হইতে উঠিয়া চৌকিটী লইয়া সম্মুখে মুক্ত প্রাঙ্গনে যাইয়া বসিতেছি—অদূরে ক্ষুদেনদীর অবিরাম জলপ্রপ্রপাতধ্বনি কর্ণকুহরে প্রবেশ করিতেছে,—শুনিতে শুনিতে এক একবার তন্ময় হইয়া যাইতেছি।

ক্ষেত্রী বাবুর বাঙ্গালায় পঁহুছিবার দু তিন দিন পরে, আমি বাড়ীতে একটী চিঠি দিলাম। পোষ্ট কার্ড ছাড়িলাম। সেই পোষ্ট কার্ডখানিতে ক্ষুদ্র ক্ষুদে নদীর মহত্ব, বাঙ্গালার ও পঞ্চকোট পাহাড়ের গৌরব কিঞ্চিৎ প্রকাশ করা হয়; পরে আর থাকিতে না পারিয়া একটা বড় চিঠি ঝাড়িলাম:—সে চিঠিতে খুব একচোট কবিতায় বর্ণন চলিল, কিন্তু লেখাটী কাহাকে পাঠাই—কাহাকে পাঠাই করিয়া পত্রটী যেন কোন্ বায়ুভরে তরুবৃন্তচ্যুত পত্রের ন্যায় গড়াইতে গড়াইতে স্বীয় অর্দ্ধাঙ্গিনীর অভিমুখে ছুটিল—

২৩

স্থবির স্থবিরা জনক জননী,
তুমি স্নেহময়ী তাঁদের প্রাণ ;
রাখ চোকে চোকে দিবস রজনী,
মুখে মুখে কর আহার দান।

২৪

নবীনা নন্দিনী কেশ এলাইয়ে,
রূপেতে উজলি বিজলী হেন ;
নয়নের পথে দুলিয়ে দুলিয়ে,
সোনার প্রতিমে বেড়ায় যেন।

২৫

রোগীর আগার, বিষাদে আঁধার,
বিকার বিহ্বল রোগীর কাছে,
পাখাখানি হাতে করি অনিবার,
দয়াময়ী দেবী বসিয়ে আছে।

২৬

নাই আগামূল কত বকে ভুল,
শুনে উড়ে যায় তরাসে প্রাণ ;
হেরি হুলুস্থূল হৃদয় ব্যাকুল,
নয়নের নীরে ভাসে বয়ান !

২৭

সতত যতন, সদা ধ্যান জ্ঞান,
কি রূপে সে জন হইবে ভাল ;
বিপদের নিশি হবে অবসান,
প্রকাশ পাইবে তরুণ আলো।

২৮

দুখির বালক ধূলায় ধূসর,
ক্ষুধায় আতুর, মলিন মুখ ;
ডাকিয়া বসাও কোলের উপর,
আঁচলে মুচাও আনন বুক।

২৯

পরম করুণ জননীর মত,
ক্ষীর সর ছানা নবনী আনি,
মুখে তুলে দাও আদরিয়ে কত;
গায়েতে বুলাও কোমল পাণি

৩০

স্নেহ রসে তার গ'লে যায় প্রাণ,
অচলা ভকতি জনমে চিতে ;
ভেসে ভেসে আসে জলে দুনয়ান,
পদধূলি চায় মাথায় দিতে।

৩১

আহা কৃপাময়ী, এ জগতী তলে,
তুমিই পরমা পাবনী দেবী ;
প্রাণীরা সকলে রয়েছে কুশলে,
তোমার অপার করুণা সেবি !

৩২

তুমি যারে বাম, সে'ই হতভাগা ;
দুনিয়ায় তার কিছুই নাই ;
একা ভেকা হয়ে বেড়ায় অভাগা,
ঘুরে ঘুরে মরে সকল ঠাঁই।

৩৩

হিমালয়ে আসি করি যোগাসন,
প্রেমের পাগল মহেশ ভোলা ;
ধেয়ান তোমারি কমল চরণ,
ভাবে গদ গদ মানস খোলা !

৩৪

নিশীথ সময়ে আজো ব্রজবনে,
মদনমোহন বেড়ান আসি ;
কালিন্দীর কূলে দাঁড়ায়ে, সঘনে,
রাধা রাধা ব'লে বাজান বাঁশী।

৩৫

শুনিয়ে কানুর বেণুর সে রব,
দিগঙ্গনাগণ চকিত হয় ;
ফল ফুলে সাজে তরু লতা সব,
যমুনার জল উজান বয়।

৩৬

কোকিল কুহরে ভ্রমর গুঞ্জরে,
সুধীর মলয় সমীর বায় ;
যেন পাগলিনী গোপিনী নিকরে,
শ্যাম কালশশী হেরিতে ধায়।

৩৭

না হেরি সেথায় সে নীল কমলে,
নেহারে সকলে বিকল মনে,
চরণ প্রতিমা রয়েছে ভূতলে,
বাজিছে নূপুর সুদূর বনে।

৩৮

আহা অবলায় কি মধুরিমায়,
প্রকৃতি সাজায় বলিতে নারি !
মনের প্রভায়, মাধুরী মালায়,
কেমন মানায় তোমায় নারী !

৩৯

মধুর তোমার ললিত আকার,
মধুর তোমার সরল মন ;
মধুর তোমার চরিত উদার,
মধুর তোমার প্রণয় ধন।

৪০

সে মধুর ধন বরে যেই জনে,
অতি সুমধুর কপাল তার ;
ঘরে বসি, করে পায় ত্রিভুবনে,
কিছুরি অভাব থাকেনা আর !

৪১

অয়ি মধুরিমে, লোচন পূর্ণিমে !
সমুখে আমার উদয় হও ;
আঁকি সাত খানি তোমার প্রতিমে,
স্থির হয়ে তুমি দাঁড়ায়ে রও।

৪২

মনের, দেহের চেহারা তোমার,
ভেবে ভেবে আজ হইব ভোর ;
আচম্বিতে এক আসিবে আমার,
আধ ঘুম্ ঘুম্ নেশার ঘোর।

৪৩

ঢুলু ঢুলু সেই নেশার নয়নে,
যেমতি মূরতি স্ফূরতি পাবে,
আপনা আপনি হৃদি দরপণে,
তেমতি আদরা পড়িয়া যাবে।

৪৪

টানিব তখনি খাড়া হয়ে উঠে,
আদরা মাফিক দুচারি রেখা ;
সাজাইয়ে রঙ্ ত্রিভুবন ঘুঁটে ;
দেখিব কেমন হইল লেখা।

৪৫

বাঁচিতে প্রার্থনা নাহিক আমার,
যে কদিন বাঁচি তবুগো নারী !
উদার মধুর মূরতি তোমার,
যেন প্রাণভোরে আঁকিতে পারি !

ইতি বঙ্গসুন্দরী কাব্যে নারী-বন্দনা
নামক দ্বিতীয় সর্গ।

অপর বন্ধুরা করে সাহায্য মোদের সব
দেখে বৈদ্যনাথও করে সাহায্যের হট্টরব।

* * *

সকলেই আছি ভাল সবে ভাল থেকো ঘরে
ভাল থেকো রব ভাল ভেবোনা আমার তরে।

* * *

এইরূপ বরাকরের উপর এক পদ্যপাঠ লিখে, চিঠিটা বাড়ীতে পাঠান গেল। আরো লিখিবার সাধ, দুর্ব্বো ঘাসের মত যেন কবিতা গজাইয়া উঠিতে লাগিল, যা দেখি তাতেই কবিতা, আমার আঁখিদুটী যেন কবি হ'য়ে উঠিল, পা দুটো তখন ক্ষেপিয়া উঠিল, উঠিয়া পড়িলাম, চারিধারে বেড়াইতে লাগিলাম, একবার মাঠে যাই, একবার একটা খদের ধারে যাই, এই রকম ক'রে এলোমেলো ভাবে বেড়াইতে থাকিলাম। এইরূপ বেড়াইতেছি সহসা পথে আমাদের কাছ দিয়া শ্যামপুরে শ্যামের মোহন বাঁশী বাজাইয়া কয়লার রেলগাড়ী তার কৃষ্ণচূড়া তুলিয়া ধূম উদ্গীরণ করিতে করিতে মহাধূমে চলিয়া গেল। আমরা সহসা চমকিয়া উঠিলাম ও রেলগাড়ীর ছন্দময় শব্দ যতক্ষণ শোনা গেল ততক্ষণ শুনিয়া বাড়ী ফিরিলাম।

ক্রমশঃ

রোগের ঔষধ।

(স্বরলিপি।)

বিভাস—রূপক।

রোগের ঔষধ তোমারেই জানি;
মৃত্যুরে তাড়ায়ে দূরে, আনহ অমৃত পূরে,
মানসের সুবর্ণ কলসখানি;
দূর ক'রে দাও জীবনের গ্লানি।

ভীষণ ব্যাধির জ্বালা যবে হয়,
রোগ তাপ দুঃখ শোক, বিষম যন্ত্রণা ভোগ
তোমার ঔষধ-নামে করে জয়—
নবীন জীবন আসে সুধাময়।

জানি দেব তুমি পূর্ণ ধন্বন্তরী;
তব বাণী চরাচরে অমঙ্গল রোগ হরে,
জন্মমৃত্যু ভয় সদা পরিহরি;
জানি দেব তুমি পূর্ণ ধন্বন্তরী।

যবে তুমি আছ পূর্ণ মহিমাতে,
কি ভয় রে ভবরোগ সন্নিপাতে?
এই যে অমৃতসিক্ত দিয়েছ বিপদ তিক্ত
অনায়াসে সর্ব্বরোগ যায় তা'তে,
যবে তুমি আছ পূর্ণ মহিমাতে।

অপর বন্ধুরা করে সাহায্য মোদের সব
দেখে বৈদ্যনাথও করে সাহায্যের হট্টরব।

* * *

সকলেই আছি ভাল সবে ভাল থেকো ঘরে
ভাল থেকো রব ভাল ভেবোনা আমার তরে।

* * *

এইরূপ বরাকরের উপর এক পদ্যপাঠ লিখে, চিঠিটা বাড়ীতে পাঠান গেল। আরো লিখিবার সাধ, দুর্ব্বো ঘাসের মত যেন কবিতা গজাইয়া উঠিতে লাগিল, যা দেখি তাতেই কবিতা, আমার আঁখিদুটী যেন কবি হ'য়ে উঠিল, পা দুটো তখন ক্ষেপিয়া উঠিল, উঠিয়া পড়িলাম, চারিধারে বেড়াইতে লাগিলাম, একবার মাঠে যাই, একবার একটা খদের ধারে যাই, এই রকম ক'রে এলোমেলো ভাবে বেড়াইতে থাকিলাম। এইরূপ বেড়াইতেছি সহসা পথে আমাদের কাছ দিয়া শ্যামপুরে শ্যামের মোহন বাঁশী বাজাইয়া কয়লার রেলগাড়ী তার কৃষ্ণচূড়া তুলিয়া ধূম উদ্গীরণ করিতে করিতে মহাধূমে চলিয়া গেল। আমরা সহসা চমকিয়া উঠিলাম ও রেলগাড়ীর ছন্দময় শব্দ যতক্ষণ শোনা গেল ততক্ষণ শুনিয়া বাড়ী ফিরিলাম।

ক্রমশঃ

রোগের ঔষধ।

(স্বরলিপি।)

বিভাস—রূপক।

রোগের ঔষধ তোমারেই জানি;
মৃত্যুরে তাড়ায়ে দূরে, আনহ অমৃত পূরে,
মানসের সুবর্ণ কলসখানি;
দূর ক'রে দাও জীবনের গ্লানি।

ভীষণ ব্যাধির জ্বালা যবে হয়,
রোগ তাপ দুঃখ শোক, বিষম যন্ত্রণা ভোগ
তোমার ঔষধ-নামে করে জয়—
নবীন জীবন আসে সুধাময়।

জানি দেব তুমি পূর্ণ ধন্বন্তরী;
তব বাণী চরাচরে অমঙ্গল রোগ হরে,
জন্মমৃত্যু ভয় সদা পরিহরি;
জানি দেব তুমি পূর্ণ ধন্বন্তরী।

যবে তুমি আছ পূর্ণ মহিমাতে,
কি ভয় রে ভবরোগ সন্নিপাতে?
এই যে অমৃতসিক্ত দিয়েছ বিপদ তিক্ত
অনায়াসে সর্ব্বরোগ যায় তা'তে,
যবে তুমি আছ পূর্ণ মহিমাতে।

কথা—শ্রীঋতেন্দ্রনাথ ঠাকুর। স্বরলিপি—শ্রীহিতেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

স্থাঃ—II সা ধা । ধা ধা । পা ধা +ধা । পা পা ।
স্থাঃ—II রো গে । র ঔ । ষ ধ — । তো মা ।

গা পা । গা রে সা II । (স্ত):— পা
রেই জা । নি — — II । (স্ত):— মৃ

২..
ধা । সা স্রে । সা সা + সা । সা২ নি২
ত্যু । রে তা । ড়া — — । য়ে —

২.............. ২..............................
সা । সা২ নি২ সা । সা৩ । সা রে ।
— । দূ — — । রে । আ ন ।

....
রে রে । রে রে২ । সা২ রে২ গা ।
হ অ । মৃ ত । — — — ।

....
গা রে । সা ধা পা । পা পা ।
পূ — । রে — — । মা ন ।

পা পা । পা পা২ । গা মা বা "ধা" ।
সের্ স্থ । ব র্ণ । ক ল "ল" ।

ধা পা । ৫মপা গা২ । সা২ । সা রে ।
স থা । নি — । দুর্ । ক' রে ।

গা৩ । গা গা । ধা পা । ধা৩ । সা
দাও । জী ব । নে — । —র্ । গা

ধা । পা গা । + গা রে সা ।
— । — — । নি — — ।

(ভো):— সা সা । সা সা । সা২ সা ।
ভী — । ষ ণ । ব্যা ধি ।

সা২ । সা২ । সা৩ । সা সা । নি সা ।
র । জা । লা । য রে । — — ।

রে৩ । রে২ । রে২ । রে৩ । গা২ । গা২ ।
— । হ । — । —য়্ । রো । গ ।

গা২	গা	।	গা২	।	গা২	।	মা২	গা	।
তা	প	।	দুঃ	।	খ	।	শো	ক	।

গা	রে	।	গা২	মা২	পা	।	পা২	গা	।
বি	ষ	।	ম	—	—	।	ষ	ন্ত্র	।

গা	রে	।	গা	রে	।	+	রে	+	রে২
গা	—	।	ভো	—	।		—		—

সা২	সা	।	ধা	ধা২	পা২	।	ধা	ধা	।
—	গ	।	তো	মা	—	।	র	ও	।

২.....

ধা	ধা২	।	পা	ধা	।	সা২	।	+ সা৩	।
ষ	ধ	।	না	—	।	মে	।	—	।

২.....

পা	ধা	।	রে	রে	।	সা৩	।	গা	গা ।
ক	—	।	—	রে	।	জয়	।	ন	বী ।

গা	গা	।	গা	রে	।	সা২	।	সা২	।
—	ন	।	জী	—	।	ব	।	ন	।

২.....

পা	ধা২	।	সা২	।	সা২	।	পা	ধা২	।
আ	—	।	—	।	সে	।	সু	—	।

পা	গা	।	+ গা	পা	।	গা	রে	সা	।
—	—	।	—	ধা	।	ম	য়	—	।

অবশিষ্ট আভোগদ্বয় প্রথম আভোগের মত।

কড়াইশুটির শিঙ্গাড়া।

(খাদ্যপাক।)

উপকরণ।—কড়াইশুঁটি এক ছটাক, ধনেশাক এক ছটাক, কাঁচালঙ্কা একটা, আদা এক তোলা, পেঁয়াজ এক তোলা, জারকনেবু একটা, ঘি প্রায় তিন ছটাক, নুন সিকি তোলা, চিনি সিকি তোলা, ময়দা এক ছটাক।

প্রণালী।—প্রথমে কড়াইশুঁটিগুলাকে আধ-বাঁটা কর। তারপরে ধনেশাক, কাঁচালঙ্কা, আদা ও জারকনেবু এই সবগুলিকে কুচা কর। আধতোলা পেঁয়াজ বাঁটিয়া রাখ, আর আধতোলা পেঁয়াজ কুচা করিয়া রাখ।

এইবারে আধ ছটাক ঘি চড়াও। তাহাতে কুচা মশলাগুলা সব ফেল। পরে আধ-সেঁত করা কড়াইশুঁটিগুলি ফেল। নুন ও চিনি দিয়া উহাতে জারকনেবু ও ধনেশাক কুচি ছাড়। একটু আধটু নাড়াচাড়া করিয়া নামাও।

এখন এক ছটাক ময়দা মাখ। একচুটকি নুন ও আধতোলাটাক ঘি ময়ান দাও। বাঁটা পেঁয়াজটুকুর রস দিয়া ও খুব অল্প জল দিয়া ময়দা মাখ। লুচির ময়দা যেমন মাখে সেইরূপ সমানভাবে মাখ—বেশী নরমও না হয় বেশী

শক্তও না হয়। ছয়টা গুটী কর। গুটী বেলিয়া মধ্যখানে ছুরি দ্বারা কাট—অর্দ্ধচন্দ্রাকার হইবে। এইরূপে ছয়টী গুটীতে বারটী শিঙ্গাড়া হইবে। এক্ষণে ঐ অর্দ্ধচন্দ্রাকার ময়দার শিঙ্গাড়ার আকারে খিলি কর। প্রতি খিলির ভিতরে কড়াইশুটি প্রভৃতির পুর ভর। পুর দিয়া শিঙ্গাড়ার মুখ বুঝাইয়া দাও। আধপোয়াটাক ঘি চড়াইয়া শিঙ্গাড়াগুলি ভাজ।

শ্রীঃ দেবী।

কাঁচা পেঁপে দিয়া মাংসের কোপ্তা।

(খাদ্যপাক।)

উপকরণ।—পাঁটার বা ভেঁড়ার কিমা মাংস এক পোয়া, ধনেশাক এক তোলা, আদা এক তোলা, পেঁয়াজ আধ ছটাক, কাঁচা পেঁপে এক ছটাক, ভিনিগার বা নেবুর রস আধ ছটাক, নুন পৌন তোলা, ছোলার ছাতু আধ পোয়া, ঘি এক ছটাক।

প্রণালী।—আদাকুচি আধতোলা, আদা-বাঁটা আধতোলা, ধনেশাকের পাতাকুচা, পেঁয়াজ-বাঁটা একতোলা, পেঁয়াজ-কুচি একতোলা, পেঁপে-বাঁটা, নুন এই সকল একত্র মাংসের সঙ্গে মিশাইয়া ভিনিগারে ভিজাইয়া রাখ। যাঁহারা ঝাল খান তাঁহাদিগের জন্য একটী কাঁচালঙ্কা কুচি ইহাতে দিবে।

এইবারে ছাতু দিয়া মাংসটাকে মাখ; চেপটা চেপটা গোলাকার কোপ্তা কর। ঘি চড়াও। কোপ্তাগুলি নরম আঁচে ভাজ। মিনিট পাঁচ সাত এর মধ্যে হইয়া যাইবে।

ভোজন বিধি।—ইহা লুচি রুটির সঙ্গে বা ভাতের সঙ্গে খাও। শীঘ্র হজম হইয়া যায়।

শ্রীঃ দেবী।

ঘুরোপে শান্তিমন্ত্র।

নীরব নিশীথে তারার আলোকে একেলা যখন অনন্ত আকাশের দিকে চাহিয়া থাকি, তখন আপনা হইতেই অন্তরে এই উদার গীত জাগিয়া ওঠে:—

এ সংসারে হায় কেন এ যুদ্ধবিগ্রহ?
কি শান্তিতে ভ্রমে এ নক্ষত্র তারাগ্রহ?—
কেন এ সংসারে জাগে ঘোর হিংসাদ্বেষ
খণ্ডাখণ্ডি করে এই খণ্ড খণ্ড দেশ
উত্তম মানব জন্ম পেয়ে কি পাষণ্ড
নরাধম হ'য়ে ভুলে আনন্দ অখণ্ড!

উত্তম মানবজন্ম পাইয়া মানব হায় কি করিতেছে!—এ ওর হিংসা করিতেছে, এ ওরে হত্যা করিতেছে!—কি ভয়ানক!—সামান্য বিষয় লইয়া এক মানুষ অপর মানুষকে প্রবঞ্চনা করিতেছে, এক মানুষ অপর মানুষকে হিংসা করিতেছে—হননেচ্ছা করিতেছে, এক জাতি অপর জাতিকে প্রবঞ্চনা করিতেছে, এক জাতি অপর জাতির হিংসা করিতেছে!—ভাবিলে প্রাণ মন শিহরিয়া উঠে, এ পৃথিবীকে নরক সমান বলিয়া মনে হয়, এ পৃথিবীতে আর শান্তি নাই!—এ পৃথিবীতে বৃথা শান্তি অন্বেষণ করি!—যাই হোক্, কিন্তু যতক্ষণ শান্তি না পাইতেছি ততক্ষণ মন শান্ত হইতেছে না, কিন্তু শান্তি পাইবে কিরূপে যদি দিনরাত মানবের মন কেবল পরের অহিত লইয়া থাকে? পরের যাহাতে হিত হয়, ইহাতে যদি মানুষের মনপ্রাণ ব্যাকুল থাকে, তাহা হইলে মানুষের রাজ্য হইতে অশান্তি পলায়ন করিবে, শান্তির যথার্থ মাহাত্ম্য সে সতত উপলব্ধি করিতে সমর্থ হইবে।

নিস্তব্ধ নিশীথে যখন নিমগ্ন হইয়া থাকি, তখন সেই মহাস্তব্ধতার মধ্যে জগতের সারমন্ত্র ধ্বনিত শুনিতে পাই, সে সার মন্ত্র ওঁ শান্তি!—আসলে এই সার মন্ত্রে তাঁর সমস্ত জগৎ চলিতেছে; তিনি সমস্ত জগতকে শান্তিতে

রাখিতে চাহেন, সমস্ত জগতের কর্ম্মের মধ্যে গতিক্রিয়ার মধ্যে শান্তিকে মুখ্য করিয়া দিয়াছেন। অশান্তি থাকিলে কি কখনো ভালরূপে কর্ম্ম করা যায়? ভাল কর্ম্ম করিতে গেলেই শান্তভাবে করা চাই, নচেৎ সকল কর্ম্মই খারাপ হইয়া যায়। এই যে কোটি কোটি নক্ষত্র কত দ্রুতবেগে আকাশে ভ্রাম্যমান হইয়া বেড়াইতেছে, তাহা কি শান্তভাবে! ভাবিলে আশ্চর্য্য হইতে হয়, কোন গোলমাল নাই, কোন কোলাহল নাই, নক্ষত্ররাজি একেবারে নিঃশব্দে ধীরে অথচ কত দ্রুত মহাকাশের মাঝখান দিয়া চলিয়া যাইতেছে, বিন্দুমাত্র গোল নাই!

আমাদের এ ভারত শান্তি মন্ত্রের মাহাত্ম্য অতি প্রাচীন কালে বুঝিতে পারিয়াছিলেন, তাই তাঁহার উপনিষদাদিতে আদ্যন্তে শান্তিমন্ত্র ধ্বনিত শুনা যায়।—এতদিনে রণমত্ত ইউরোপ তাহার মধুর আস্বাদ পাইয়াছে—পাইয়া এতদিনে এক শান্তিসভার সৃষ্টি করিয়াছে। রণপ্রিয় ইউরোপীয় জাতির ও শান্তিসভা শুধু নামমাত্র হইয়া রহিয়াছে। তাহার রণমত্ততায় তাহার ধর্ম্ম-শাস্ত্র উড়িয়া যায়—বাইবেলের peace মত্তপ্রাণে কি স্থান পায়?—শান্তি কোথায়?—ইউরোপের মনে শান্তি কোথায়? ইউরোপীয় রাজাদের পরস্পরের মধ্যে যদি সদ্ভাব থাকে, তাহা হইলেও বা কতকটা রক্ষা, শান্তি-সভার সার্থকতা হইতে পারে। সে সার্থকতা এখন বহুদূরে!—কারণ ইউরোপে রাজাদের মধ্যে যে পরস্পর ভালবাসা তাহা আর মোল্লার মুর্গিপোষা এ দুইই সমান। ইউরোপীয় alliance অর্থাৎ সদ্ভাব বৃথা। চোরে চোরে মাস্ততো ভায়ের যে সদ্ভাব আর রাজনৈতিক সদ্ভাব প্রায় একই কথা, যখন কোন যুদ্ধবিগ্রহ দেখি তখন দেখিতে পাই ইউরোপের দুটো রাজারা একদিকে মিত্রবৎ রহিলেন, অপর তিনটে রাজা তাহাদের শত্রুবৎ রহিলেন, আর হয়তো অপর দুটো রাজা শান্তি প্রার্থী হইয়া Neutral অর্থাৎ উদাসীনভাবে স্বতন্ত্রভাবে অবস্থান করিলেন। পরক্ষণেই হয়তো আবার দাবার চালের মত সব উল্টাইয়া গেল। —শুধু ইউরোপে কেন সকল দেশেই রাজনৈতিক সদ্ভাব অসদ্ভাব বড় পরিবর্ত্তনশীল। সতত পরিবর্ত্তনশীলতার মধ্যে বিশ্বাস দুর্ব্বল হইয়া যায়, মন অশান্ত হইয়া উঠে;—শান্তিলাভ করিতে গেলে ধ্রুব অপরিবর্ত্তনীয় ভাবের আশ্রয় গ্রহণ করা চাই। রাজনৈতিক ব্যাপারে পরিবর্ত্তনশীলতাই অনেক

সময়ে মুগ্ধভাবে বিরাজ করিত তাই রাজনৈতিক সদ্ভাব অসদ্ভাব রাজনৈতিক শান্তিবাক্যে প্রকৃতরূপে বিশ্বাস স্থাপন করা যাইতে পারে না, কারণ তাহা প্রপঞ্চ বিষয়ের ঘোর স্বার্থময় লীলাখেলায় জড়িত তাহা স্ত্রীলোকের দুর্ব্বলতার মত। শাস্ত্রকারেরা ঠিকই বলিয়াছেন:—'রাজকুলে বিশ্বাস কর্ত্তব্য নয়।'

কারণ রাজনৈতিক সদ্ভাব অসদ্ভাব স্বার্থপর—নিঃস্বার্থপর নয়।—ঐ যে তিনটে রাজার মিত্রতা উহা একরূপ স্বার্থপরতার মিত্রতা। ঐ যে তিনটে রাজার শত্রুতা উহা একরূপ স্বার্থপরতার শত্রুতা। ঐ যে কয়টা রাজার ঔদাসিন্য উহা শুধু স্বার্থপরের ঔদাসিন্য।

যে সকল কার্য্য শুদ্ধ স্বার্থপরতাপ্রণোদিত হয় তাহার মধ্যে প্রকৃত শান্তি নাই সুতরাং মানবের তাহা প্রকৃত প্রিয় হইতে পারে না।

স্বার্থপরতা ও নিঃস্বার্থপরতা লইয়া জগতে প্রিয় ও অপ্রিয়ের তারতম্য ঘটিয়া থাকে। স্বার্থ ও নিঃস্বার্থ লইয়া সংসারে তিনরূপ ভাব দেখিতে পাওয়া যায়: কেহ শত্রু কেহ মিত্র কেহ না-শত্রু-না-মিত্র। আমাদের শাস্ত্রকার পণ্ডিতেরাও বলিয়াছেনঃ—

"অরি মিত্র উদাসীনং ত্রিবিধং স্যাদিদং জগৎ
ব্যবহারেষু নিয়তং দৃশ্যতে নান্যথা পুনঃ।
প্রিয়া প্রিয়াদি ভেদস্তু বস্তুষু নিয়তস্ফুটং॥"

এই জগৎ ত্রিবিধ, অরি, মিত্র ও উদাসীনবৎ, ব্যবহারে সর্ব্বদাই এইরূপ দৃষ্ট হইতেছে, অর্থাৎ কেহ শত্রুভাবে, কেহ মিত্রভাবে এবং কেহ বা উদাসীন ভাবে অবস্থিতি করিতেছে। সকল বস্তুতেই প্রিয় ও অপ্রিয়াদি ভোগ দৃষ্ট হয়।

এই ত্রিবিধ ভাব লইয়া জগতে যেন আহত সঙ্গীতকোলাহল চলিতেছে, উদাসীন ভাবটী যেন সঙ্গীতের rest বা বিশ্রামের কাজ করিতেছে। কিন্তু এ আহত সঙ্গীতের মধ্যে সেই অনাহত সঙ্গীত—সেই অনাহত নাদ শ্রবণ করিতে পারা যায় না—যে অনাহত নাদের মূল প্রাণই ওঁ শান্তি! এই ওঁ শান্তি শুনিতে গেলে "শান্তো দান্ত উপরত স্তিতিক্ষুঃ সমাহিতো ভূত্বা আত্মন্যে বাত্মানং পশ্যতি";—এই মন্ত্রের প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখা চাই।

গাভী-বৃক্ষ।

পরমেশ্বর আমাদের নানারূপে অভাব মোচন করিতেছেন। যখনি আমরা তাঁর কাছে গিয়া নিজ দুঃখ কাহিনী বলিতেছি, আমাদের অভাব প্রকাশ করিতেছি, তিনি তাহা শুনিতেছেন, অভাব পূরণ করিতেছেন।—আরও তাঁর কৃপা যে তিনি আমাদের প্রার্থনার পূর্ব্বেই আমাদের প্রয়োজন অনুসারে দ্রব্যাদি যোগাইয়া থাকেন। আমাদের মধ্যে কেহ তাহা জানিতে পায়, আর কেহ জানিতে পায় না, এই যাহা প্রভেদ। দেখ সন্তান জন্মাইবার পূর্ব্বেই তিনি দুগ্ধের ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছেন; এই দুগ্ধ আমাদের শিশুকালে পোষণের প্রধান সহায়। এই দুগ্ধের দিকে জীবমাত্রের বড়ই স্পৃহা; শৈশবে আমরা মাতৃদুগ্ধে মানুষ হই, মাতৃদুগ্ধের অভাবে পশুদুগ্ধে মানুষ হই; গাভী ছাগ মহিষাদিরও দুগ্ধ সাহায্যে মানুষ হই। দুগ্ধ মানবের এক প্রধান পোষণসহায় বলিয়া নানাদিকে আমাদের দুগ্ধের সুবিধা করিয়া দিয়া অভাব পূর্ণ করিতেছেন, এই দুগ্ধের তুল্য সর্ব্বদিক পোষণকারী দ্রব্য নাই বলিলে কিছু অত্যুক্তি হয় না। এই দুগ্ধের বর্ণ সাদা। ইহার সাদা ভাব। বিজ্ঞান শাস্ত্রে বলে সাদা বর্ণের মধ্যে সকল বর্ণ গুপ্তভাবে বিদ্যমান থাকে, সকল বর্ণের সমাবেশে সাদাবর্ণের বিকাশ। সেইরূপ দুগ্ধের সাদাভাবের মধ্যে আমাদের পোষণকারী সকলরূপ ভাব গোপনে বিরাজ করে।

আমরা শিশুর ন্যায় সাদাপ্রাণ হইলে দুগ্ধেই আমাদের জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ হয়, নচেৎ ক্রূরপ্রাণে হিংসাদির দিকে টান যায়। সকলদিক দিয়া আলোচনা করিয়া দেখিলে বুঝা যায় যে দুগ্ধের তুল্য জিনিষ নাই। দুগ্ধ বিষনাশক। পরমেশ্বর সর্ব্বদেশে গোপালের মত দুগ্ধরক্ষার কাজ করিয়াছেন, দুগ্ধ যোগাইয়াছেন।—যে দেশে জীবরাজ্যে দুগ্ধের সেরূপ সুবিধা নাই, সেখানে গাছেও দুধ দিয়াছেন: গাভীবৃক্ষের সৃষ্টি করিয়াছেন: দক্ষিণ আমেরিকার স্থানে স্থানে দুগ্ধদায়ী জীবের বড়ই অভাব, আশ্চর্য্য সেখানে সেই কারণে একরূপ গাছে দুধ পাওয়া যায়। দক্ষিণ আমেরিকার প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড

অরণ্যের মধ্যে 'এণ্ডীস' পর্ব্বতের তলে গাভীবৃক্ষ নামে একপ্রকার বিশেষ বৃক্ষ আছে। এই বৃক্ষ পূর্ব্বে ইউরোপের মধ্যে কেহই জানিত না। পরে হাম্বোলট্‌নামা জর্ম্মণদেশীয় জনৈক বিখ্যাত ভ্রমণকর্ত্তা ইহা সহসা আবিষ্কার করিয়া ইউরোপে গোচর করেন। তিনি তাঁহার জীবনের সমুদয় অংশ প্রায় এই সকল দেশে অতিবাহিত করিয়াছেন। তাঁহার ন্যায় ইউরোপের অন্য কোন পণ্ডিত আমেজন ও অরিনোকো নামক নদীদ্বয়ের চতুপার্শ্ববর্ত্তী প্রদেশসমূহের আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য বিষয়সকল আবিষ্করণার্থে এত চেষ্টা করেন নাই। তিনি এই বৃক্ষ দেখিয়া লিপিবদ্ধ করিয়াছেন: "এই বৃক্ষের পত্রদল মসৃণ চর্ম্মের ন্যায়। ইহার পত্র হইতে দুগ্ধের ন্যায় আস্বাদযুক্ত একপ্রকার আটা বাহির হয় বলিয়া ইহাকে গাভীবৃক্ষ কহে। দক্ষিণ আমেরিকার অরণ্যের মধ্যে, সূর্য্য উদয়কালে প্রায়ই দেখা যায় যে, স্ত্রীলোকেরা নারিকেল ফলের ন্যায় শাঁসময় ছালযুক্ত একপ্রকার ফলের নির্ম্মিত পাত্র হস্তে লইয়া গাভীবৃক্ষের নিকট গমন করিতেছে। আমাদের দেহাভ্যন্তরস্থ শিরার ন্যায় এই বৃক্ষের ছালের মধ্যে একপ্রকার অত্যন্ত সূক্ষ্মশিরা আছে, তাহার মধ্য দিয়া ঐ দুগ্ধবৎ রস নির্গত হয়। এই রস পাত্রপূর্ণ করিয়া তাহারা তাহাদিগের সন্তানসন্ততির নিমিত্ত লইয়া যায়।" হাম্বোলট্ স্বয়ং এই দুগ্ধ পান করিয়া দেখিয়াছেন,—ইহা সুমিষ্ট ও পুষ্টিকর। এই দুগ্ধবৃক্ষের ভাব আমাদের নারিকেল গাছে পাওয়া যায়। দেখ আমাদের নারিকেল ফলটি 'কুরলে' মিষ্ট দুগ্ধ পাওয়া যায় এবং যেমন দুগ্ধ হইতে ঘৃত হয়, সেইরূপ নারিকেলদুগ্ধ হইতে ঘৃতবৎ নারিকেল তৈল প্রস্তুত হয়; সেই তৈলে নারিকেল বৃক্ষের দেশে পরোটা রুটি তৈয়ারি করিয়া লোকে খায়। হাম্বোলট্ যেমন পরিভ্রমণ করিয়া দুগ্ধবৃক্ষের আবিষ্কার ও উপকারিতা বুঝিয়াছিলেন, সেইরূপ আমাদের মহর্ষি বিশ্বামিত্রও নারিকেল ফলের গুণ আবিষ্কার করতঃ জগতে প্রচার করেন, তাই খুব সম্ভবতঃ নারিকেল ফলের অন্যতম নাম বিশ্বামিত্র ফল। নারিকেলবৃক্ষও গাভীর ন্যায় মানবের পরম উপকারী বলিয়া হিন্দু ইহাকে গাভীর ন্যায় অবধ্য চক্ষে দেখেন।

কহাবৎ বা জয়পুরী প্রবচন।

গলতা ও স্ত্রীলোক।

প্রবচন। ৮২ (১) ঔরতোকোঁ লগা গলতা
চুলা ছোড়া জলতা।
(২) লুগায়োঁ নো লাগো গলতো
চুলো ছোড়া বলতো।

অনুবাদ। স্ত্রীলোকদিগের জন্য গলতা। (তাহারা) জ্বলন্ত উনুন ছাড়িয়া (তথায়) যায়।

অর্থ। গলাতাপর্ব্বতে একটি পবিত্র নির্ঝরিণী আছে, সেইকারণ বহু স্ত্রীলোক তথায় স্নান করিতে গমন করে।
(এই প্রবচনটী জয়পুর সম্বন্ধীয়।)

কার্য্যসিদ্ধি।

প্রবচন। ৮৩ দালাল বগর হালাল নহি হোতা।

অনুবাদ। দালাল ব্যতীত হালাল বা কার্য্যসিদ্ধি হয় না।

অর্থ। দালাল ব্যতিত কেনা বেচা হয় না, অর্থাৎ যে ব্যক্তি যে কার্য্যে পারদর্শী তাহার সাহায্য ব্যতীত সে কার্য্য সিদ্ধ হওয়া কঠিন।

নিজের বুদ্ধি ও পরের ধন।

প্রবচন। ৮৪ আকল আপনে ঔর ধন পেলা কনে ঘনো দীখেছে।

অনুবাদ। আপনার বুদ্ধি ও অপরের ধন (সকলের) বেশী বোধ হয়।

অর্থ। সকলেই আপনাকে "সবজান্তা" মনে করেন কিন্তু পরের ধন সকলের নিকট বেশী বোধ হয়।

যোগ্য আচরণ।

প্রবচন। ৮৫ করতা সে করজে
(ঔর) পাপ পুণ্য সে নৈ ডরজে।

অনুবাদ। যে সেমন ব্যবহার করিবে, তাহার প্রতিও তেমনি ব্যবহার করিয়ো। পাপ পুণ্যকে ভয় করিয়ো না।

অর্থ। কেহ ভাল ব্যবহার করে ত তুমিও তাহার প্রতি ভাল ব্যবহার কোরো। মন্দ ব্যবহার করে ত তুমিও মন্দ ব্যবহার কোরো।

বঙ্গীয় প্রবচন। যেমন কুকুর তেমনি মুগুর।

সংস্কৃত প্রবচন। শঠে শাঠ্যং সমাচরেৎ।

গাজর ও শৃগাল।

প্রবচন। ৮৬ গাজর খাতাঁ্যা ভী কস্যা গিরধর কা মারা জায় ?

অনুবাদ। গাজর খেতে খেতে কোন্ শৃগাল মারা যায় ?

অর্থ। গাজর খেলে কেহ মারা যায় না। সকলেই গাজর খেয়ে থাকে। সকলেই এ কাজ করে থাকে। একজনের প্রতি সাধারণ নিয়মের ব্যতিক্রম হবে কেন ?

সময়ে জিনিষের মূল্য।

প্রবচন। ৮৭ দাঁত হুয়া তো চনা কোনে,
চনা হুয়াতো দাঁত কোনা।

অনুবাদ। দাঁত ছিল তো (তখন) ছোলা ছিল না (আর) ছোলা হোলো তো দাঁত নাই।

অর্থ। দাঁত থাকতে থাকতে ছোলা জোটেনি, দাঁত যেই গেল ছোলাও জুটলো। অর্থাৎ কোন বস্তু সময়ে না পাইলে তাহা নিরর্থক হয়।

ভাল জিনিষের দুরবস্থা।

প্রবচন। ৮৮ রাবলা ঘোড়া ঔর বাবলা সবার।
অনুবাদ। ভাল ঘোড়া আর পাগল সয়ার।
অর্থ। ভাল ঘোড়ার মন্দ সয়ারী। মন্দ লোকের হাতে ভাল জিনিষ পড়িলে তাহাও খারাপ হইয়া যায়।

বালকের বন্ধুত্ব।

প্রবচন। ৮৯ নাদান কী দোস্তী জীব কো জানো।
অনুবাদ। বালকের ভালবাসা আর প্রাণের নাশ।
অর্থ। অব্যবস্থিতচিত্ত বালকের ভালবাসা সাঙ্ঘাতিক।
ইংরাজী প্রবন। "Trust not a boy's love."
সংস্কৃত প্রবচন। অব্যবস্থিত চিত্তস্য প্রসাদোয়পি ভয়ঙ্করঃ।

হাতের লক্ষ্মী।

প্রবচন। ৯০ মুড়া মৈঁ গুড় আয়ো কুন থুকে?
অনুবাদ। মুখে গুড় এলে কে ফেলে দেয়?
অর্থ। মুখে খাবার পেয়ে কে ফেলে দেয়?
বঙ্গীয় প্রবচন। হাতের লক্ষ্মী কে পায়ে ঠেলে?

উচ্চ আকাঙ্ক্ষা।

প্রবচন। ৯১ ঘর মেঁ নৈহে চনাকোচুন, বেটো মাগে মোতীচুর।
অনুবাদ। ঘরে ছাতু নাই, বেটা চায় মতীচুরের নাড়ু।
বঙ্গীয় প্রবচন। হেঁসেলের খবর জানেনা, ডাল ডাল করে।

মনের মিল।

প্রবচন। ৯২ মীয়া বীবী রাজী
তো কাঁই করেলো কাজী?
অনুবাদ। স্ত্রী ও পুরুষে (বিবাহে) সম্মত হইলে কাজীর কি প্রয়োজন?
অর্থ। প্রেমিকযুগলের পরস্পর মনের মিলন হইলে কাজীর বা ব্যবস্থাপকের প্রয়োজন হয় না।

মনের মিল।

প্রবচন। ৯৩ মন মিল্যা সুঁ দোজনা তো, কাঁই করেলা সোজনা।
অনুবাদ। দুজনের মনের মিল হইলে শতজন কি করিবে?
অর্থ। প্রেণয়ীযুগলের পরস্পর মনের মিল হইলে শত জন লোকের কি প্রয়োজন?

নিজে পায় না পরকে দিবে?

প্রবচন। ৯৪ সীতলা কুন সা ঘোড়া দে,
আপ হী গধা চড়ে?
অনুবাদ। শীতলা ঘোড়া কোথা থেকে দেবে, আপনিই গাধা চড়ে?
অর্থ। নিজেই পায় না, পরকে দেবে।

নীচের আস্পর্দ্ধা।

প্রবচন। ৯৫ উঁদ্রানে হল্দীকী গাঁঠ মিলগই, সো পসারী বন্ বেঠ্যো।
অনুবাদ। ইঁদুর একটুকরো হলুদ পেলেই পসারী বনিয়া বসে।
বঙ্গীয় প্রবচন। (১) না প'ড়ে পণ্ডিত।
(২) গাছে না উঠতেই এক কাঁদী।

বিড়াল তপস্বী।

প্রবচন। ৯৬ সাতসো মূসা খায়, বিলাই তঁপ কররা বৈঠী।

অনুবাদ। সাতশো ইঁদুর খেয়ে বিড়াল তপস্যা করিতে বসিল।

অর্থ। অসংখ্য ইঁদুর ভক্ষণ করে বিড়াল তপস্বী হইল।

বঙ্গীয় প্রবচন। বিড়াল তপস্বী। বকা ধার্ম্মিক।

বিড়ালব্রতী।

প্রবচন। ৯৭ নোসে চুহে মার বিল্লি তীর্থ কো চলি।

অনুবাদ। নশো ইঁদুর মেরে বিড়াল তীর্থযাত্রা করিল।

অর্থ। উপরোক্ত প্রবচন ও এই প্রবচনটীর ভাব একই।

বিড়ালজাতির শঠতা ও বিশ্বাসঘাতকতা সম্বন্ধে একটী প্রাচীন গল্প নিম্নে বলিলাম।—

একটা বৃদ্ধ বিড়াল ছিল। বৃদ্ধবয়সে মূষিক ধরিতে অসমর্থ হইয়া একটী ইঁদুরের গুহার নিকট ঊর্দ্ধমুখ পূর্ব্বক এক পায়ের উপর দাঁড়াইয়া থাকিত। মূষিকগণ গর্ত্ত হইতে বাহির হইয়া তাহাকে ঊর্দ্ধমুখ হইয়া এক পায়ে দাঁড়াইতে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল—"মহাশয়! আপনি কে?"

বিড়াল। "আমি বিড়াল তপস্বী।"

মূষিকগণ। "আপনি একপায়ে দাঁড়াইয়া আছেন কেন?"

বিড়াল উত্তর করিল—"চারি পায় দাঁড়াইলে পাছে বসুন্ধরা আমার ভার সহ্য করিতে না পারেন, তাই আমি একপায়ে দাঁড়াইয়া 'তপ' করিতেছি।" মূষিকগণ তাহাকে মহাধার্ম্মিক ও দয়ার্দ্রচিত্ত ভাবিয়া "বিড়াল ঠাকুর! নমস্কার" বলিয়া আহার অন্বেষণে নির্গত হইল। প্রত্যহ মূষিকগণ গর্ত্ত হইতে বাহির হইয়া সাষ্টাঙ্গে তাহাকে প্রণাম করিত। কিছুদিন গত হইলে ইঁদুরদিগের মধ্যে কাহারও ভাই, কাহারও ভগ্নী, কাহারও স্ত্রী বা পুত্র হারাইতে লাগিল। বিড়াল তপস্বী আসিবার পূর্ব্বে ইঁদুরদিগের মধ্যে এরূপ আত্মীয় বিচ্ছেদ হয় নাই। তাহাদিগের সন্দেহ স্বভাবতঃ বিড়াল ঠাকুরের উপর পড়িল। এক

দিন পূর্ব্বের ন্যায় ইঁদুররা আহার অন্বেষণার্থে সার বাঁধিয়া গর্ত্তের ভিতর হইতে নির্গত হইল। ইঁদুরদিগের সর্দ্দার বা দলপতি পশ্চাতের দিকে বরাবর লক্ষ্য রাখিয়া চলিতে লাগিল। সমস্ত ইঁদুর গর্ত্ত হইতে নির্গত হইয়া সার বাঁধিয়া চলিতে লাগিল। বিড়াল তপস্বী ঝট সর্ব্বশেষ ইঁদুরটিকে থাবা দিয়া চাপিয়া ধরিল ও অন্য ইঁদুররা চলিয়া গেলে মারিয়া ভক্ষণ করিবে স্থির করিল। সর্দ্দার ইঁদুর এই ভীষণ ব্যাপার দেখিয়া তাহার সহচরদিগকে বলিল—"ভাই! এই ভণ্ডতপস্বী আমাদিগের একটী সঙ্গীকে ধরিয়াছে। এ অতি বৃদ্ধ বিড়াল। আমরা একত্র হইয়া ইহাকে মারিয়া ফেলি চল।" এই ষড়যন্ত্র করিয়া তাহারা গর্ত্তের দিকে ফিরিবার উদ্যোগ করিল। বিড়াল অকস্মাৎ তাহাদিগকে ফিরিতে দেখিয়া ইঁদুরটিকে ছাড়িয়া পূর্ব্ববৎ চক্ষু মুদিয়া এক পায়ে দাঁড়াইয়া তপোমগ্ন হইল। ইত্যবসরে ইঁদুরেরা একত্র হইয়া সজোরে তাহার লেজ ধরিয়া গর্ত্তের মধ্যে টানিতে লাগিল। বিড়াল যন্ত্রণায় আর্ত্তনাদ করিতে লাগিল। ভবিতব্য কে খণ্ডাতে পারে। বিড়ালটী গর্ত্ত মধ্যে নিশ্বাস রোধ হইয়া মরিয়া গেল ও ইঁদুরেরা বন্ধুবান্ধবদিগকে আহ্বান করিয়া কিছুদিন মহাসুখে চর্ব্ব্য চোষ্য খাইতে লাগিল।

শ্রীশোভনা সুন্দরী দেবী।

বিশ্ব-মাতা।

'মা' বলে একলা আমি ডাকিতাম তোরে এতদিন,
একলাই তোর বুকে সতত মা রহিতাম লীন ;
তোর ও অপার স্নেহে নাহি ছিল কোনো অংশী আর,
একলাই সবটুকু করিতাম ভোগ অনিবার !
মোর কথা বিনে তোর নাহি ছিল অপর ভাবনা,
মোর পাশে বসে সদা রহিতি মা ভুলিয়া আপনা ;
আমি চিনিতাম তোরে তুই শুধু চিনিতি আমায়,
আছিলাম কত সুখী দু'জনারে লয়ে দু'জনায় !
সহসা হেরি মা তোরে আজ একি অপরূপ রূপে,
আপনা বিকায়ে কবে দিলি মা জগতে চুপে চুপে,—
তোর মুখপানে ওই কোটি ছেলে 'মা' বলিয়া চায়,
কোটি ভাগে স্নেহ তোর ঝরে পড়ে সবার মাথায় !
সারা হৃদিখানি তোর ভরে গেল বিশ্বের চিন্তায়—
জগত-জননী হয়ে ভুলে কি মা যাইবি আমায় ?

শ্রীজীবেন্দ্র কুমার দত্ত।

পুণ্য পঞ্জিকা।

মাঘ।—১৩১২, ইং ১৯০৬।

দিন	মাঘ	জানুয়ারি	তিথি		দিন	মাঘ	ফেব্রুয়ারি	তিথি	
র	১	১৪	চ	কৃষ্ণপক্ষ	সো	১৬	১	প	সরস্বতীপূজা
সো	২	১৫	প		ম	১৭	২	ষ	
ম	৩	১৬	ষ		বু	১৮	৩	স	
বু	৪	১৭	স		বৃ	১৯	৪	অ	
বৃ	৫	১৮	অ		শু	২০	৫	ক	
শু	৬	১৯	ন		শ	২১	৬	ন	
শ	৭	২০	দ এ		র	২২	৭	দ	
র	৮	২১	দ্বা		সো	২৩	৮	এ	
সো	৯	২২	ত্র		ম	২৪	৯	দ্বা	
ম	১০	২৩	চ		বু	২৫	১০	ত্র	
বু	১১	২৪	অ		বৃ	২৬	১১	চ	
বৃ	১২	২৫	প্র	শুক্লপক্ষ	শু	২৭	১২	পূ	
শু	১৩	২৬	দ্বি		শ	২৮	১৩	প্র	কৃষ্ণপক্ষ
শ	১৪	২৭	তৃ		র	২৯	১৪	দ্বি	
র	১৫	২৮	চ		সো	৩০	১৫	তৃ	

১লা মাঘ সূর্য্যোদয়—ঘ ৬।৪৮ মি ; সূর্য্যাস্ত—ঘ ৫।৩০ মি।
৩০শে ঐ ঐ —ঘ ৬।৩৯ মি ; ঐ —ঘ ৫।৪৮ মি।
বিবাহ—মাঘ ২।৩।৯।১৫।১৬।১৭।১৮।২১।২৯।

পুণ্য ডায়েরী।

ওঁ

সুন্দর।

বাহার—ঝাঁপতাল।

সুন্দর তুমি হে! সুন্দর তোমার বাণী,
সুন্দর রচনা শোভে মহিমা বাখানি।
সুন্দর বসন্ত ঋতু কুসুম-যৌবনে,
কিবা আমোদিত করে চারু উপবনে।
পূর্ণিমা নিশীথে বিহসিত সুধাকর
মধুর জোছনা সুধা বিতরে সুন্দর;
গগনের বাতায়নে বসি সুরকবি
কি সুন্দর আঁকিয়াছ চরাচর-ছবি!
সৌন্দর্য্য বিকীরিত তব লোকে লোকে,
অনন্ত অম্বর নীল খচিত আলোকে;
কত শোভা মনো-লোভা ভাসে কত দিকে।—
শেষ নাহি হয় তার কোটি যুগ লিখে।
হৃদয়ে সুন্দর তুমি সবার অধিক—
তৃপত না হয় প্রাণ দেখি অনিমিখ।

শ্রীঋতেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

জ্ঞান। *

যতদূর আকাশ আছে পরমেশ্বর ততদূর আছেন।

যাবান্ বৈ আকাশ তাবানস্যৈষ মহিমা

যেখানে আকাশ আছে সেইখানে তাঁহার মহিমা। "আকাশো বৈ নাম" আকাশে যে অনন্ত ভাব তাহার সঙ্গে ঈশ্বরের উপমা হয়। আকাশের কি শেষ করিতে পার? যতদূর যাও আকাশ তার চেয়েও দূরে। আকাশের সীমা নাই। আয়তনের সীমা নাই; যেখানে জায়গা সেইখানে ঈশ্বর আছেন। তবে আকাশ তাহা শূন্য নয়, ঈশ্বর দ্বারা সব স্থানটা পূর্ণ রহিয়াছে। জ্ঞান যদি স্পর্শ করা যাইত, যেখানে সেখানে ঈশ্বরকে ছুঁইতে পারিতাম; জ্ঞান যদি দেখিবার বিষয় হইত, জ্ঞান যদি গোলাপী রং হইত তাহা হইলে এখনি সকল স্থানে ঈশ্বরকে দেখিতে পাইতাম। কিন্তু জ্ঞানকে চক্ষের দ্বারা দেখা যায় না, হাতের দ্বারা ছোঁয়া যায় না। জ্ঞান দিয়া জ্ঞানস্বরূপকে দেখা যায়।

সমুদয় আকাশে তিনি পূর্ণ হইয়া রহিয়াছেন ইহা ঠিকটা বুঝিলে, তিনি দূর হইতে দূরে আছেন ইহা বুঝা সহজ হইবে। আকাশে খুব চলিয়া যাও যেখানে দূরবীণ দিয়া দেখা যায় সেখানেও তিনি আছেন। যে স্থান দূরবীণ দিয়া দেখিতে হয় সেই নক্ষত্র হইতে আবার তত দূর চলিয়া যাও সেখানেও তিনি বিদ্যমান। তাঁর যেমন এখানে এক পদ সেইরূপ আরেক পদ সেখানে। যেমন দিগন্তের পরে ত আমরা চক্ষুর দ্বারা দেখিতে পাই না কিন্তু ঈশ্বর তাহা হইতেও দূরে আছেন। আবার তিনি এখানেও আছেন এত নিকটে যে তিনি আমাদের আত্মাতে বিরাজ করিতেছেন। আত্মা আপনার ভিতরে রহিয়াছে, আকাশ আপনার বাহিরে রহিয়াছে। বাহিরে যে আকাশ তাহাতেও

* ১৭৮৭ শক ২২শে মাঘ শনিবারে স্বর্গীয় মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্ত্তৃক ব্যক্ত এই প্রবন্ধটী স্বর্গীয় পিতৃদেব হেমেন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্ত্তৃক লিখিত হয়। বর্ত্তমান কালে ১৮২৭ শকাব্দ চলিতেছে। তাহা হইলে জানা গেল ইহা চল্লিশ বৎসর পূর্ব্বে লিখিত।

পুঃ সং

তিনি রহিয়াছেন, ভিতরে যে আত্মা তাহাতেও বিরাজ করিতেছেন। আত্মা ইহার চেয়ে আর নিকট হইতে পারে না। তুমি তোমার নিকট, আমি আমার নিকট। যেমন রাজধানীর রাজপ্রাসাদ হইতে ক্রোশপ্রস্তর আরম্ভ হয় তেমনি প্রতি জন হইতে দূর নির্ণয় হয়। আমা হইতে উহা অত দূরে, আমার সঙ্গে সঙ্গে দূর গণনা হয়; তবে কে আমার এত নিকট যেমন আমি? তবে আমি যে পদার্থ তাহার অন্তরাত্মা যিনি তিনি আরো কত নিকট। যদি আমি এত নিকট আমার অন্তরাত্মা যিনি তিনি কত নিকট? ঈশ্বর খুব নিকট আছেন।

ঈশ্বর যেমন বাহিরের আকাশে আছেন সেইরূপ গভীর আত্মাতেও নিমগ্ন আছেন। যাহা কিছু আছে তাঁহাকে আশ্রয় করিয়া আছে, এই জন্য তিনি সকলের আশ্রয়। তাঁহাকে আশ্রয় বলিয়া জানিলে বস্তু দেখিবামাত্রই ঈশ্বরকে জানা যায়। বৃক্ষের যদিও মূল দেখিতে না পাই কিন্তু জানি যে তাহা মাটীর ভিতরে রহিয়াছে। ঈশ্বরকে সকলের আশ্রয় বলিয়া জানিলে জানি যে তিনি সকলের ভিতরে রহিয়াছেন; তাহা না হইলে তাহারা থাকিতে পারে না। যখন জানিতেছি তিনি আত্মারও আশ্রয় তখন তিনি কত নিকটে!

আমার মনে তোমার মনের ভাবটা আসিতেছে যে তোমার মনের ভাবটা এইরূপ, তেমনি ঈশ্বর জগৎ চালাইতেছেন দেখিয়া তাঁহার মনটা বুঝা যায়। মন বলিলে পরিমিত বোধ হয় এই জন্য তাঁহাকে জ্ঞানস্বরূপ বলিয়া নির্দ্দেশ করি। যেমন তোমার মনটা জানিতেছি তেমনি জানিতেছি যে তিনি জ্ঞানস্বরূপ। এক জ্ঞানস্বরূপ, আর এক অন্ধশক্তি এই দুই প্রকার হইতে পারে। এক তিনি কিছু না জানিয়া শুনিয়া করিয়াছেন আর এক জানিয়া শুনিয়া করিয়াছেন। তাঁহাকে জ্ঞানস্বরূপ বলিলে কৌশলকর্ত্তা বলিলে সকল ভাবটা জানিয়া শুনিয়া করিয়াছেন বুঝায়; আর এক অন্ধশক্তি বলিলে না জানিয়া শুনিয়াও শক্তিটা প্রকাশ হইয়া যাইতেছে বুঝায়, যেমন জলের স্রোত তীর ভাঙ্গিয়া চুরিয়া চলিয়া যায়। কিন্তু ঈশ্বরের শক্তি এরূপ অন্ধভাবে চলিতেছে না, তাহা নিপুণরূপে সমুদয় জগৎকে চালাইতেছে। কচ্ছপ দেখ। কচ্ছপ ডাঙ্গায়ও বেড়াইতে পারিবে আবার জলে বেড়াইতে পারিবে বলিয়া ঈশ্বর তাহার পাকে তেমনি করিয়াছেন। আবার জলের অথবা ডাঙ্গার জন্তুর আক্রমণ হইতে

রক্ষার জন্য তাহার উপর নীচে কঠিন ঢাল দিয়া আবৃত করিয়াছেন। বিপদের সময়ে কচ্ছপ তাহার মাথা এবং হাত পা সেই ঢালের ভিতরে লইয়া যায়। কচ্ছপকে দেখিলেই বোধ হয় যে ঈশ্বর জানিয়া শুনিয়া উহাকে ঐরূপ তৈয়ারী করিয়াছেন।

ঈশ্বর জ্ঞানস্বরূপ। যদি আমাদের মন না থাকিত যদি আমরা তাঁহার কৌশল না বুঝিতাম তবে তিনি কেমন জ্ঞানস্বরূপ তাহা জানিতে পারিতাম না। যদি পশুর মত হইতাম তবে কৌশল বুঝিতে পারিতাম না, বিজ্ঞান বুঝিতে পারিতাম না। জানিয়া শুনিয়া ঈশ্বর সৃষ্টি করিয়াছেন রক্ষা করিতেছেন যতক্ষণ এ জ্ঞান না হবে ততক্ষণ ঈশ্বরকে জানিতে পারিবে না। অন্ধশক্তি তাহা ত ঈশ্বর নয়। ঈশ্বর জ্ঞানস্বরূপ, সেই জ্ঞানস্বরূপ সমুদয় আকাশে ব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছেন। যেমন মন সমুদয় শরীরে ব্যাপ্ত হইয়া থাকিয়া সমুদয় শরীরে শরীর হইতে আপনাকে পৃথক করিয়া জানিতেছে সেইরূপ সমুদয় আকাশে তিনি আপনাকে আপনাতে ঐরূপ জানিতেছেন। আমরা তাঁহাকে আমাদের মন দ্বারা জানিতেছি—তাঁহার প্রতিবিম্ব আমাদের মনেতে পড়িয়াছে। যেমন চিক্কণ বস্তুত সূর্য্যের প্রতিবিম্ব পড়ে তেমনি মন যখন জ্ঞানেতে ধর্ম্মেতে বিশুদ্ধ হয় তখন পরমেশ্বর তাহাতে প্রতিপ্রকাশ হন।

জ্ঞান দুই প্রকার। পরোক্ষ জ্ঞান আর প্রত্যক্ষ জ্ঞান। পরোক্ষ জ্ঞান তাহা যাহা শুনিয়া শুনিয়া জানি, যেমন শুনিয়া শুনিয়া জানি বিলাত আছে কিন্তু বিলাত দেখি নাই। প্রত্যক্ষ জ্ঞান যাহা নিজের চক্ষে দেখা; যেমন কলিকাতায় থাকিয়া কলিকাতাকে জানি। পরমেশ্বরকে কেবল আমার কথা শুনিয়া যদি জান তবে পরোক্ষ জ্ঞান হবে। তুমি যখন আপনা আপনি বুঝিবে, তাঁহাকে অনুভব করিবে তখন প্রত্যক্ষ জ্ঞান হবে। যখন মনটী বিশুদ্ধ হবে তাঁর জ্ঞানের আলো তাহাতে পড়িবে তখন প্রত্যক্ষ জ্ঞান হবে। যেমন জলে সূর্য্য প্রতিভাত হয় তেমনি মনটী স্বচ্ছ হইলে পরিশুদ্ধ হইলে ঈশ্বরের জ্ঞান তাহাতে প্রতিবিম্বিত হয়—তখন তাঁহাকে সাক্ষাৎ হয়।

৺ মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

রামপ্রসাদের গান।

গান আমাদিগকে কি বলিয়া দেয়? আমাদিগকে বলিয়া দেয় যে কি রকম লোক। গান শুনিয়া আমরা লোকের মন বুঝিতে পারি। তর্ক যাহা না মীমাংসা করিতে পারে, আমরা গানে তাহা চকিতে মীমাংসা করিতে পারি। কারণ গান হৃদয়ের জিনিষ; তর্ক ইহাতে ঠাঁই পায় না, অনুভূতিই ইহার মূল প্রাণ। অনুভূতির মধুর সাহায্যে আমরা লোকের গান শুনিয়া লোক চিনিতে পারি:—পঞ্চদশীতে আছে

"স্বানুভূতাববিশ্বাসে তর্কস্যাপ্যনবস্থিতঃ।
কথং বা তার্কিকম্মন্যস্তত্ত্বনিশ্চয়মাপ্নুয়াৎ॥

তর্কের উন্মত্ততায় এই অনুভূতিকে কেহ দূরে ফেলিও না, অনুভূতিকে ছাড়িয়া দিলে কেহই ভালরূপে কোন তত্ত্ব নিরূপণ করিতে পারিবেন না। অনুভূতি গানের প্রাণ।—গানের সহায়তায় আমরা লোককে সহজে অনুভব করিতে পারি। রামপ্রসাদের গান শুনিয়া আমরা কেমন তাহাকে বুঝিতে পারি, কেমন আমরা তাহার প্রাণ উপলব্ধি করি! রামপ্রসাদের গানে আমরা কি শুনি, তাহা আমাদের কি বলিয়া দেয়? সংসারের দুঃখশোক দ্বন্দ্ব কোলাহলে পড়িয়া মানবমাত্রেই সহজে ভগবানের নিকট যাইবার জন্য, তাঁহার নিকটে আশ্রয় গ্রহণের জন্য উন্মুখ হয়।—তাঁহার নিকটে যাইতে আর তর্কের সাহায্য আবশ্যক হয় না।—রামপ্রসাদ যৌবনের প্রারম্ভেই পিতাকে জন্মের মত হারাইয়া, সংসারের গুরুভারে ভারগ্রস্ত হইয়া সংসারাতীত অতীন্দ্রিয় অনুপম রাজ্যের দিকে উন্মনা হইয়াছিলেন। দুইটী বস্তুর ঘাতপ্রতিঘাতে যেমন অগ্নির সঞ্চার হয়, সেইরূপ এই সংসারের ঘাতপ্রতিঘাতে তাঁহার অন্তঃকরণে সৎচেতনা হয়, তাহার দ্বারা তিনি ধর্ম্মের জগৎ দেখিতে পান।

রামপ্রসাদ তর্কের দ্বারা তাঁহার ইষ্টদেবতাকে হৃদয়ে ধারণ করিতেন না, শুদ্ধ যেন গানের বলে দেবতাকে হৃদয়ে ধারণ করিতেন। তিনি তাঁহার হৃদয়ের দেবতার নিকট গানের দ্বারা কথোপকথন করিতেন, অভিমান করি-

তেন, স্নেহপ্রীতি আদি ভিক্ষা করিতেন।

যেমন চকমকি পাথর ঘর্ষণে অগ্নির উৎপত্তি হয়, সেইরূপ সাংসারিক ঘটনাবলীর সংঘর্ষে অন্তরে সদ্ভাব কণিকা সব অনুভূত হইতে থাকে। ঈশ্বর-তত্ত্ব উপলব্ধ হয়।—প্রসিদ্ধ পরিব্রাজক মঙ্গোপার্ক একবার আফ্রিকায় পথি-মধ্যে দস্যুদিগের দ্বারা প্রতারিত ও লুণ্ঠিত হইয়া বিবস্ত্রপ্রায় ও নিরাশভাবে ঘুরিতে ঘুরিতে সহসা একটী অন্তরালস্থিত বিজন ফুলের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়াই উচ্ছ্বসিত ও আশান্বিত হইয়া বলিয়া উঠিলেন "এই বিজন প্রদেশস্থিত ক্ষুদ্র ফুলটীকে যখন তিনি এত যত্ন করিয়া বাঁচাইয়া রাখিয়াছেন, তখন তিনি তাঁহার আরো প্রিয় বস্তু—অর্থাৎ প্রিয়তম মানবকে কি তিনি দেখিতেছেন না?" এই বলিয়া তিনি ঈশ্বরের করুণা স্মরণ করতঃ, করুণা উপলব্ধি করিয়া যেন পুনরায় সজীব হইয়া উঠিলেন। তাঁহার সন্দেহ, নৈরাশ্য ভয় সব ছুটিয়া গেল। ইহুদী ধর্ম্মশাস্ত্রে এই অনুভূতিমাহাত্ম্যজনক শত শত গল্প আছে। আমাদের ধর্ম্মশাস্ত্রর তো কথাই নাই।—রামপ্রসাদের গল্পে আমরা এই দেখি যে তিনি ভবের বিপাকে পড়িয়া ঈশ্বরতত্ত্ব অনুভব করেন ও সেই অনুভূতি ধ্বনিত করেন। আমরা তাঁহার শত তত্ত্বের মধ্যে তাঁহার প্রস্ফুটিত গীতি-সুসটী দেখিয়া তাহার সৌরভে মুগ্ধ হই—তাঁহার পরিচয় পাই। রামপ্রসাদের গানে অনুভূতির প্রধান বিষয় শিবা ছিলেন, শিব ছিলেন না। শিবের চেয়ে তিনি শিবাতেই ব্যাকুল। দুর্ব্বলসন্তান যেমন মাতার কাছে যাইতে চায়, বাঙ্গালীর গীতিধ্বনি সেইরূপ দেখি জগন্মাতা শিবার দিকে ছুটিতে চায়। পশ্চিমপ্রদেশবাসীরা অধিকাংশ শিবের ভাবে মগ্ন। কিন্তু বাঙ্গালীর প্রাণ প্রধানতঃ শিবার ভাবে মগ্ন। বাঙ্গালী গীতিকবি রামপ্রসাদ তাই শিবার প্রতি অধিক সম্মান দেখাইয়া গাহিয়া গিয়াছেন:

"এবার আমি বুঝবো হ'রে।
মায়ের ধরব চরণ লব জোরে।
ভোলানাথের ভুল ধ'রেছি,
বলব এবার যারে তারে।
সে যে পিতা হ'য়ে মায়ের চরণ
হৃদে ধরে কোন্ বিচারে?
পিতাপুত্রে একক্ষেত্রে,
দেখামাত্রে বলব তারে
ভোলা মায়ের চরণ করে হরণ,
মিছে মরণ দেখায় কারে॥
মায়ের ধন সন্তানে পায়,
সে ধন নিলে কোন্ বিচারে।
ভোলা আপন ভাল চায় যদি সে,
চরণ ছেড়ে দিক আমারে॥
শিবের দোষ বলি যদি,
বাজে আপন গা'র উপরে।
রামপ্রসাদ বলে ভয় করিনে,
মার অভয় চরণের জোরে॥

মায়ের আদুরে ছেলে যেরূপ করে রামপ্রসাদও সেইরূপ করিয়াছেন। মায়ের আদরাধিক্য বশতঃ রামপ্রসাদ বাবা ভোলানাথকে কত কথাই শোনাইলেন। রামপ্রসাদের গান শুনিয়া আমরা রামপ্রসাদকে বুঝিতে পারি যে তিনি একজন মাতৃভক্ত পুরুষ ছিলেন।—নিশ্চয় তাঁহার মাতৃভক্তি প্রবলা ছিল। শৈশবে পিতাকে হারাইবার জন্য তাঁহার পিতার ভাবের অধিকতর টান না হইয়া মাতৃভাবের দিকেই অধিকতর টান হইয়াছিল, তাই খুব সম্ভব তিনি একজন জগন্মাতার স্তুতিগায়ক হইয়া উঠেন—শিবের চেয়ে শিবাকে হৃদয়ে অধিকতররূপে স্থান দান করিয়া গিয়াছেন।

শ্রীহিতেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

ব্রত।

(গল্প।)

১

সপ্তম বর্ষিয়া বালিকা বকুল তলায় বসিয়া বকুল ফুলে আঁচল ভরিতেছে। বকুল ফুলের গন্ধে সে স্থানটী আমোদিত। বালিকা বকুল ফুল কুড়াইয়া আঁচলে রাখিতেছে, আর মধ্যে মধ্যে তাহার ঠাকুরমার নিকট যে ছড়াগুলি শিখিয়াছে তাহা আবৃত্তি করিতেছে। বালিকার মুখে সে ছড়াগুলি শুনিতে কি মধুর! ফুল কুড়ান শেষ হইল। বালিকা তখন উঠিয়া মালা গাঁথিবার জন্য নিকটস্থ বটবৃক্ষের ঝুরি আহরণ করিয়া পুনরায় বকুলতলায় আসিয়া মালা গাঁথিতে বসিল। মালা গাঁথা আরম্ভ হইল। বালিকার দৃষ্টি একবার অঞ্চল-স্থিত ফুলের উপর, একবার সেই অসম্পূর্ণ মালার উপর পড়িতে লাগিল। হস্তস্থিত চুড়িগুলি বড় মধুর বাজিতে লাগিল। কেশরাশি বায়ুভরে উড়িয়া আসিয়া মধ্যে মধ্যে গণ্ডস্থল স্পর্শ করিতে লাগিল—অঞ্চল একটু একটু উড়িতে লাগিল। বালিকা তখন আবৃত্তি করিতেছে,—

"পানকৌটী পানকৌটী ডেঙ্গায় ওঠ্‌লে
তোমার শ্বাশুড়ী বলে গেছে বেগুণ কোট্‌সে
ও বেগুণটী কুটনা বীজ রেখেছে
ও দুয়ারে যেওনা বঁধু এসেছে
বঁধুর পান খেওনা ভাব লেগেছে।"

বালিকার আর আবৃত্তি করা হইল না। সহসা সে চমকাইয়া উঠিল। বকুল গাছটী কে নাড়াইয়াছিল। ফুলে ফুলে বালিকার আপাদমস্তক ভরিয়া গেল! চকিতের মধ্যে বালিকা যেন ফুলরাণী সাজিল। বিরক্তির সহিত বালিকা পশ্চাতে চাহিল, কিন্তু চাহিয়াই হাসিয়া ফেলিল। তাহার পশ্চাতে এক নবম বর্ষীয় বালক বালিকার অলক্ষে পা টিপিয়া টিপিয়া আসিয়া গাছ নাড়াইয়াছিল। বালিকা বলিল, "ওঃ—তুমি; আমি মনে কর্‌লুম বুঝি কি

হ'ল। তা এখন বুঝি ওঠা হ'ল? আমি কখন ভোরবেলা উঠে, মুখ-হাত ধুয়ে, ফুল কুড়িয়ে এই মালা গাঁথ্‌ছি। এসো না—মালা পর্‌বে?"

বালক স্বীকৃত হইল। বালিকা মালা সম্পূর্ণ করিয়া হাত বাড়াইল। বালক মাথা নিচু করিল। বালিকা মালা পরাইয়া দিল। বালক এইরূপ কতদিন বালিকার নিকট হইতে মালা পরিয়াছে, আর বালিকা তাহার মালার বিনিময়ে বালকের পাশে বসিয়া কত ভূতের গল্প, রাজার গল্প, দুওরাণী ও সুওরাণীর গল্প শুনিতে শুনিতে আত্মহারা হইয়া যাইত। বালিকা বুঝিত না, বালকের গল্পে কেন সে এত আত্মহারা হয়! বালক কতদিন হাতে কাঁটা ফুটাইয়া গোলাপ ফুল তুলিয়া বালিকার খোঁপায় পরাইয়া দিত। বালকও বুঝিত না, কেন সে ওই ছোট মেয়েটার জন্য এত কষ্ট স্বীকার করে! বাল্যের ভালবাসা কি পবিত্র!

২

এই বালক-বালিকাদ্বয় আরও শৈশব হইতে এইরূপ একসঙ্গে খেলা করিয়া থাকে। উভয়ে বড় ভাব! এক পাড়ায় বাড়ী, সুতরাং উভয়েই প্রায় সকল সময় এক সঙ্গেই থাকিতে পারিত। দুজনে খেলাঘরে কত 'বৌ—বৌ' খেলিয়াছে, কত ঝগড়া করিয়াছে; কিন্তু শীঘ্রই আবার ভাব হইত। বাল্য জীবনের এরূপ বিচ্ছেদ ও মিলন বড় মধুর—বড় প্রীতিপ্রদ! 'বৌ—বৌ' খেলার সময় বালিকা বৌ সাজিত, আর বালক সাজিত বর। প্রতিবেশীমণ্ডলী-স্ত্রী-পুরুষ সকলের সম্মুখে তাহারা এইরূপ খেলা ও সংসারের স্ত্রী-পুরুষের অভিনয় করিতে কিছুমাত্র লজ্জিত হইত না। যে হৃদয়ে পাপের লেশমাত্র নাই সে হৃদয় এমনিই নির্ম্মল—এমনিই স্বচ্ছ।

কার্ত্তিক মাসে বালিকা প্রতি সন্ধ্যায় তুলসী গাছের তলায় প্রদীপ দিয়া পূজা করিত। বালক তাহার 'আকাশ-প্রদীপ' তুলিয়া দিয়া বালিকার কাছে আসিয়া সতৃষ্ণ নয়নে তাহার দিকে চাহিয়া থাকিত। পূজা শেষ হইলে উভয়ে প্রদীপ লইয়া ঘাটে প্রদীপ দিতে যাইত। আসিবার সময়ে দুজনে দুজনের হাত ধরিয়া ফিরিয়া আসিত। তারপর উভয়ে তুলসী তলায় প্রণাম করিয়া যে যাহার ঘরে যাইত। প্রণাম করিবার সময় বালক—বালিকার, এবং বালিকা—বালকের দীর্ঘ জীবন প্রার্থনা করিত। ইহার অধিক তাহারা

ঠাকুরের নিকট প্রার্থনা করিতে জানিত না।

দুজনে কত লুকোচুরি খেলিয়াছে। খেলিবার সময় বালিকাই প্রায় চোর হইত। কখন কখন সন্ধ্যার সময় বালক বালিকায় বসিয়া হেঁয়ালী আওড়াইত। হেঁয়ালীর স্রোত যখন খুব বেগে বহিত তখন বালিকার মস্তক অজ্ঞাতে, অলক্ষিতে বালকের বক্ষে আসিয়া পড়িত। তাহারা তখন নীরবে চাঁদের হাসি দেখিয়া বিভোর হইত। বালিকা একটু পরে বলিত,—

"কই, আমার হেঁয়ালীর উত্তর দিলে না?"

"কোন্ হেঁয়ালী?"

"এক নৌকা সুপারী—গুণতে পারেনা ব্যাপারী।"

বালক উত্তর করিল,—"নক্ষত্র"। এইরূপে তাহাদের দিন কাটিত।

বালক পাঠশালে যাইত। বালিকার কোনও আবশ্যক না থাকিলেও সে মধ্যে মধ্যে বালকের সহিত পাঠশালে যাইত। যে দিন বালিকা বালকের সঙ্গে পাঠশালে যাইত না, সেদিন বালকের ভাল পাঠ অভ্যাস হইত না। বালিকা পাঠশালে যাইলে বালকের আর কিছু ভাল হউক না বা হউক, বালিকা-সুলভ চপলতা বশতঃ কখনও কখনও বালিকা তাহার বই ছিঁড়িয়া ফেলিত, কখনও বা দোয়াত উল্টাইয়া ফেলিয়া দোয়াতের কালী নষ্ট করিত। বালক ইহাতে বিরক্ত হইত না।

৩

দীঘীর পাড়ে আমবাগান। বায়ুভরে দীঘীর জল তরঙ্গায়িত। পরিষ্কার বিকাল। আকাশে একটীও মেঘ নাই। স্বচ্ছ-নীল আকাশের পশ্চিম প্রান্তে রাঙা রবি ডুবিয়া যাইতেছে। তাহার দীপ্তির প্রভাবে তাহার চতুর্দ্দিকস্থ নীলিমা-ভাল লাল রঙে রঞ্জিত। পত্রের শর্ শর্ শব্দে পাখীর কাকলী মিলিয়া কি এক মধুর তানের সমাবেশ হইয়াছে। দীঘীর জলের উপরিস্থ ভাসমান পত্র সকল বায়ু-প্রভাবে দীঘীর এক কোণে জমিয়া গিয়াছে। গাছের ছায়া ও জলমধ্যস্থ কৃত্রিম আকাশ জলে তালে তালে দুলিতেছে।

বালক বালিকার জীবনের অন্তর্গত আরও দুই বৎসর অতিবাহিত হইয়া গিয়াছে। বালক বেশ বাঁশী বাজাইতে পারে। সেই দীর্ঘিকা কুলে, সেই মৃদুল সমীরণান্দোলিত তরুরাজির পার্শ্বে বসিয়া শোভমান প্রকৃতির ক্রোড়ে

আত্মহারা বালক শূন্যপানে চাহিয়া আপন মনে বাঁশী বাজাইতেছে। বাঁশের বাঁশী, কিন্তু বাজাইবার কৌশলে বড় মধুর সুরে—বড় মর্ম্মস্পর্শী করুণ কণ্ঠে গাহিতেছে। সেই বংশীরবের সহিত পত্রের মর্ম্মর শব্দ যেন তান দিতেছে। বংশীর কম্পিত কণ্ঠের সহিত যেন দীঘীর জল বিভোর হইয়া নাচিতেছে। দূরে—অতিদূরে গ্রামপ্রান্তে সেই স্বর বায়ুর স্তরে স্তরে কাঁপিয়া কাঁপিয়া—কাঁদিয়া কাঁদিয়া ভাসিয়া যাইতেছে। কে জানে সেই বংশীরবে কোনও বিরহ বিধুরার অন্তস্তলে লুপ্ত ব্যথা জাগিয়া উঠিয়াছিল কিনা! বালকের জীবনে কোনও ক্রন্দনের অভিনয় অভিনীত হয় নাই, কিন্তু তথাপি কি জানি কেন—বুঝি তাহার অদৃষ্টে তাঁহার ভবিষ্যত জীবন ক্রন্দনময় হইবে বলিয়া, বিধাতা তাহাকে করুণ কাতর কণ্ঠের গানে এত প্রিয় করিয়াছিলেন। তাই বালকের বাঁশী ক্রন্দনের সুরেই অধিক গাহিত।

কাহার কোমল দুখানি কর সেই বংশীবাদক তন্ময়চিত্ত বালকের চক্ষু দ্বয় আবরিত করিল। দুটী অতি কোমল ওষ্ঠ বালকের গণ্ডে স্থাপিত হইল। বালকের বাঁশী থামিয়া গেল। বালক জিজ্ঞাসা করিল,—"কে?" বালিকা হাসিয়া ফেলিল। বালকের চক্ষু ছাড়িয়া দিয়া একটু দূরে দাঁড়াইল। বালক সে রূপে—সে হাসিতে স্বর্গের দৃশ্য দেখিল। দেখিল—সেই আলুলায়িত কুন্তল, সেই ভাসা ভাসা টানা টানা বড় বড় চক্ষু দুটী, সেই অলক্ত-রাগরঞ্জিত পা দুখানি, সেই বাতান্দোলিত বসন। আর কি দেখিল?—আর দেখিল, সেই সকলের মধ্যে কি এক অপূর্ব্ব মাধুরী! উভয়ে চিত্রার্পিতের ন্যায় কিছুক্ষণ চাহিয়া রহিল। তারপর দুজনে হাত ধরাধরি করিয়া গৃহে ফিরিল।

বালিকা অনেক পূর্ব্বে বালকের পশ্চাতে আসিয়াছিল। অনেকক্ষণ ধরিয়া দাঁড়াইয়া সে সেই বাঁশীর গানের—সেই মধুর কণ্ঠের কি প্রতিদান দিবে ভাবিয়া পাইতেছিল না। এমন সময়ে তাহার মনে পড়িল, একদিন ঝম্ ঝম্ করিয়া বৃষ্টি পড়িতেছিল। তখন বর্ষা কাল। বালক ও বালিকা উভয়ে পুষ্করিণী হইতে স্নান করিয়া যে যাহার গৃহে ফিরিতেছিল। পথে বালিকা পড়িয়া গিয়া কাঁদিয়া উঠিল। বালক তাহাকে উঠাইয়া কাদা মুছাইয়া দিল। বালিকাকে সান্ত্বনা করিবার জন্য তাহার অশ্রুসিক্ত মুখে সাদরে চুম্বন করিল। বালিকার সে পতন—সেই চুম্বন আজ স্পষ্ট মনে পড়িয়া গেল। তাই সে

ধীরে ধীরে বালকের নিকটে গিয়া, তাহার চক্ষু আবরণ করিয়া, সেই মধুর বংশীধ্বনির প্রতিদান দিল—একটী চুম্বন।

৪

বালিকা তাহার মামার বাড়ী যাইবে। চঞ্চল নদীর বক্ষে চঞ্চল তরণী ভাসিতেছে। নদীর স্রোত তরঙ্গে তরঙ্গে, কূলে কূলে উছলিয়া উঠিতেছে। উচ্ছ্বাসময়ী তটিনী কি এক অপূর্ব্ব উচ্ছ্বাসে কল কল, ছল ছল শব্দে বহিয়া চলিয়াছে। কে বলিতে পারে তটিনীর সে উচ্ছ্বাস আনন্দের—না, শোকের! সূর্য্যকিরণে প্রবাহিনী রজতময়ী হইয়াছে। উভয় কূলে কোথাও বন কোথাও ধনীর বাগান, কোথাও সুউচ্চ অট্টালিকা, কোথাও জীর্ণ কুটীর, আর কোথাও বা বিস্তৃত শস্যশ্যামলা প্রান্তর। নদী-বক্ষে মেঘমালা মণ্ডিত আর একটী আকাশ। সে আকাশে কিন্তু সূর্য্য একটী নহে। সে আকাশে শত সহস্র সূর্য্য এক একটী তরঙ্গের উপর উঠিয়া খেলিয়া বেড়াইতেছে, আর মানবের চক্ষু তাহার উপর পড়িলে, চক্ষু ঝল্‌সাইয়া দিতেছে। একটী নৌকার হাল ধরিয়া ঝিঁকা দিতে দিতে মাঝী গান ধরিয়াছে,—

"ভাগ্যে হ'ল না হ'ল না—
পিতার দরশন ভাগ্যে হ'ল না"

নৌকা দাঁড় ও হালের সাহায্যে আরও অনেক দূর গিয়াছে। তখন মাঝী দ্বিতীয় পদ গাহিতেছে,—

"এই খেদ রৈল জনমের মতন
ভাগ্যে হ'ল না——।"

নৌকা চলিয়া গেল। মাঝীর কণ্ঠস্বর বায়ুতে মিশাইয়া গেল।

অনেকক্ষণ প্রভাত হইয়া গিয়াছে। বালিকা তাহার মাতা ও অন্যান্য লোকজনের সহিত নদীতীরে উপস্থিত হইল। আজ সে মামার বাড়ী যাইবে। তীরে পূর্ব্ব হইতেই নৌকা ঠিক করা ছিল। নৌকার মধ্যে দাঁড়ী মাঝীরা এতক্ষণ তাহাদের নির্দ্দিষ্ট যাত্রীগণের অপেক্ষা করিতেছিল। যাত্রী আসিল। তাহারাও প্রস্তুত ছিল। মোট নৌকায় তুলিলে পর কয়জন যাত্রী নৌকায় উঠিল।

নৌকায় উঠিয়া বালিকা একবার তীরের দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চাহিল।

অশ্রু-বাষ্পে বালিকার নয়ন ভরিয়া গেল। বালিকা কিছুই দেখিতে পাইল না। অতি শীঘ্র জলের দিকে চাহিল। কয়ফোঁটা তপ্ত অশ্রু নদীর শীতল জলে মিশিয়া গেল। নৌকারোহীগণের মধ্যে কেহ সে অশ্রু দেখিল না। সেই মরমের কয়ফোঁটা তপ্তাশ্রু তীর হইতে কেহ দেখিয়াছিল কি?

নৌকা ছাড়িল। দাঁড়ী ও মাঝী সকলেই আপন আপন কার্য্যে ব্যস্ত হইল। তীরে যাহারা নৌকারোহীগণকে পৌঁছাইয়া দিতে গিয়াছিল, তাহাদের পশ্চাতে রাখিয়া নৌকা চলিতে লাগিল। নৌকার দাঁড়ে ক্ষণে ক্ষণে মুক্তা ঝরিতে লাগিল। আন্দোলিত নৌকা মধ্যে আন্দোলিত নৌকারোহীগণ সাবধান হইয়া বসিল। একটী ক্ষুদ্র বালিকার মুখ নৌকা হইতে বাহির হইল। বালিকা একবার পশ্চাতে চাহিল। যেখানে সে নৌকায় উঠিয়াছিল সেখানে আর কেহ নাই; কেবল একটী বালক তৃষিতনেত্রে চাহিয়া আছে। বালিকার চক্ষে অশ্রু ভরিয়া গেল। সে অশ্রু গড়াইয়া জলে পড়িল। দূরে, তীরে দাঁড়াইয়া বালক আঁখি মুছিল।

নৌকা অদৃশ্য হইলে চক্ষের জল মুছিতে মুছিতে বালক গৃহে ফিরিল। বাড়ীতে আসিয়া বালক শয্যায় শুইয়া পড়িল। সেদিন আর সে পাঠশালে যায় নাই। পরদিন হইতে প্রত্যহ পাঠশালে যাইত কিন্তু কয়দিন বড় অমনস্ক ছিল। সেই জন্য পাঠ অভ্যাস করিতে পারে নাই বলিয়া পাঠশালে গুরুমহাশয়ের নিকট তিরস্কৃত হইত। তবু কি সে সেই মধুর স্মৃতিকে মনের অন্তরালে রাখিতে পারে? বালিকার স্মৃতির জন্য, গুরুমহাশয়ের তিরস্কারও তাহার নিকট পুরস্কার বলিয়া বোধ হইত। কিছুদিন গত হইলে পর, বালিকা ফিরিয়া আসিলে আবার দেখা হইবে এই আশায় বালক মনকে কতকটা প্রকৃতিস্থ করিত; কিন্তু যখন প্রাণের অনন্ত আবেগ তাহার হৃদয়ের কূলে কূলে উছলিয়া উঠিত তখন অশ্রু ভিন্ন আর কাহারও সহায় তাহাকে শান্ত করিতে পারিত না। বালকের জীবনে এই প্রথম ক্রন্দন—বালকের বুকে এই প্রথম ব্যথা লাগিয়াছিল। মনের ব্যথা কেমন—বালক ইতিপূর্ব্বে তাহা জানিত না।

৫

আরও চার বৎসর অতীত হইয়া গিয়াছে। বালক এখন পঞ্চদশ বর্ষ

বয়স্ক—বালিকার বয়স ত্রয়োদশ বৎসর। এখন আর বালক বালিকা তেমনি করিয়া একসঙ্গে বেড়াইতে পায় না। এখন তাহাদের মধ্যে বড় একটা কঠিন ব্যবধান পড়িয়াছে! এখন যদি দুই এক দিনের মধ্যে মুহূর্ত্তের জন্য উভয়ে উভয়ের সাক্ষাত পায়, তাহাই তাহাদের পক্ষে যথেষ্ট। কিছু পূর্ব্বে তাহারা যখন সাধ করিয়া দুজনে খেলাঘরের বর-কোনে সাজিত, তখন মনে মনে কি, আশা না করিয়াছে যে সংসারের পথে এইরূপে তাহাদের দুইটী হৃদয় একত্রে মিলিত হইবে? কত আশা—কত স্বপ্ন সেই ক্ষুদ্র দুইটী হৃদয়ে বড় সাধে প্রবাহিত হইত; কিন্তু জীবনের পথে আর একটু অগ্রসর হইয়া তাহারা দেখিল যে তাহাদের সুখময় মিলনের কল্পনা কেবল স্বপ্নমাত্র। তাহাদের সকল সাধ ভিত্তিশূন্য। তাহারা এতদিন সমুদ্র-সৈকতে আশার রেখাপাত করিয়া আসিয়াছে। একদিনও ভাবে নাই যে সংসার-সমুদ্রের প্রচণ্ড শাসন-তুফানে তাহাদের সে আশা তিষ্ঠিতেই পারে না। শূন্যে দুর্গ নির্ম্মাণ করিয়া বালক-বালিকা ভাবিয়াছিল যে তাহার মধ্য হইতেই তাহারা নিরাপদে জীবন সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইবে; কিন্তু এখন দেখিল সে দুর্গে তাহাদের নিরাপদে বাস করা দুরূহ। এখন তাহাদের সাধের স্বপন ভাঙ্গিল।

বালক-বালিকা দেখিল যে তাহাদের মধ্যে বিবাহ সংঘটিত হওয়া অসম্ভব। বালক ব্রহ্মণসন্তান, আর বালিকা কায়স্থের কন্যা। তাই তাহারা যত বয়ঃপ্রাপ্ত হইতে লাগিল, তাহাদের অভিভাবকগণ, তাহাদের উভয়কে উভয়ের নিকট হইতে দূরে রাখিতে তত অধিক প্রয়াস পাইতে লাগিলেন। তাঁহারা বুঝিয়া ছিলেন যে, উভয়ের হৃদয়-প্রাচীরে যে প্রেম-বট বৃক্ষের বীজ অঙ্কুরিত হইয়াছে তাহা অধিক বাড়িতে দিলে উভয়ের হৃদয়ই ভাঙ্গিয়া যাইবে। সুতরাং তাঁহারা পূর্ব্ব হইতেই সতর্ক হওয়া শ্রেয়স্কর বিবেচনা করিলেন। বালক-বালিকার অভিভাবকগণ আরও কিছু পূর্ব্ব হইতে সাবধান হইলে বোধ হয় ভাল করিতেন। কারণ অঙ্কুর ত দূরের কথা, এখন যে তাহাদের হৃদয়ে বৃক্ষের মূল পর্য্যন্ত প্রবেশ করিয়াছে। কিন্তু উপদেশ দেওয়া অপেক্ষা উপদেশকে কার্য্যে পরিণত করা অতিশয় কঠিন। পূর্ব্বে সাধ করিয়া তাঁহারা এই বালক বালিকার সংসারের অভিনয় দেখিতেন—দেখিতে ভালবাসিতেন। এখন দেখিলেন যে ফল বিপরীত হইয়া দাঁড়ায়। এখন তাঁহাদের সতর্ক

হইবার সময় আসিল। এক একবার ভাবিতেন—উভয়েই যদি এক জাতীয় হইত তাহা হইলে উভয়ের মিলনে কি মধুর স্বর্গের সৌন্দর্য্য সৃষ্ট হইত! কিন্তু তাহা হইবার নহে। সমাজ খড়্গহস্ত! পূর্ব্বকালে যখন ব্রাহ্মণসন্তান—ব্রাহ্মণী, ক্ষত্রিয়া, বৈশ্যা, শূদ্রানী প্রভৃতিকে বিবাহ করিতে পারিত তখন হইলে হয়ত হইত। এখন আর নয়।

বালক-বালিকা উভয়ে উভয়কে ভালবাসিত কেবল তাহাদের হৃদয় ভালবাসিতে চায় বলিয়া। চিরজীবন একসঙ্গে থাকিতে পাইবে বলিয়াই তাহারা বিবাহ-ইচ্ছা করিয়াছিল; নতুবা তাহাদের মনে কোনও প্রকার কামনা জাগাইয়া তাহারা এ বিবাহে ইচ্ছুক ছিল না। নিষ্পাপ—পবিত্র প্রেমে কি কোনও কামনার উদ্রেক হয়? যথার্থ প্রেমিক কেবল ভালবাসিয়াই সুখী—ভালবাসার লোককে সুখে থাকিতে দেখিয়াই সুখী। প্রেমিক ত আর কামুক নয়? বালক-বালিকা যদি বিবাহবন্ধনে বদ্ধ না হয় তাহা হইলে তাহারা এক একবার উভয়কে দেখিয়াই সুখী হইবে ভাবিল। তাহাও যদি অদৃষ্টে না থাকে ত তাহারা উভয়ে, উভয়ের জীবন সুখের হইল দেখিয়াই সুখী হইবে। তাহাদের ভালবাসা, স্বামী-স্ত্রী কি ভ্রাতা-ভগিনীর ভালবাসার মত তাহা তাহারা জানিত না। ভালবাসিয়া সুখ পায় তাই তাহারা উভয়কে ভালবাসে।

একদিন বালিকা কোনও সূত্রে বালকের বাড়ীতে আসিল। আসিল, কিন্তু একবার বালকের সহিত দেখা করিয়া যাইবার আশা ছাড়িতে পারিল না। বালক যে ঘরে পড়িতেছিল ধীরে সেই ঘরের দ্বার উদ্ঘাটিত হইল। বালিকা সে ঘরে প্রবেশ করিল। বালক চাহিল—বালিকাও চাহিল। উভয়েই আপন আপন চক্ষু মুছিল। সেই নীরব গৃহে দুইটী সরল প্রাণীর কথোপকথন অতি ধীরে চলিতে লাগিল।

বালক স্থির করিল, সে এইবার হইতে বালিকাকে ভগ্নীর মত ভালবাসিবে, আর বালিকা সৎপাত্রে ন্যস্ত হইয়া সুখে থাকিলেই সে সুখী হইবে। বালিকা স্থির করিল, একটী সৎগুণসম্পন্না সুন্দরী বালিকার সহিত বালকের উদ্বাহ কার্য্য সম্পাদিত হইয়া বালক সুখে থাকিলেই সে সুখিনী হইবে। বালককে সে এইবার হইতে ভ্রাতার ন্যায় ভালবাসিয়াই শান্তিলাভ করিবে।

কথোপকথনে এই স্থির হইয়া গেল। বালিকা চলিয়া গেল। অলক্ষিতে বালকের আঁখি-কোণ হইতে এক বিন্দু অশ্রু গড়াইয়া পড়িল।

৬

বালকের অদৃষ্ট বুঝি বড়ই মন্দ। তাহার শেষ আশাও পূরিল না। আরও কিছুদিন গত হইয়াছে। দুই এক স্থান হইতে বালিকার বিবাহের সম্বন্ধও আসিতেছে। একদিন অকস্মাৎ একটা গোলমাল উঠিল যে, বালিকা নিকটস্থ পুষ্করিণীতে ডুবিয়া গিয়াছে। বালক ঊর্দ্ধশ্বাসে সেই পুষ্করিণীর দিকে ছুটিল। পুকুরের পাড়ে লোক অনেক, কিন্তু কেহ হঠাৎ তত জলে গিয়া বালিকার অন্বেষণ করিতে সাহস করিতেছে না। পঞ্চদশ বর্ষিয় বালক প্রেমের বিনিময়ে জলে ঝাঁপ দিল। সেই সময় বালকের দিকে চাহিয়া বালিকার মাতা ঈশ্বরের নিকট তাহার মঙ্গল কামনা করিয়াছিল। আপনার সন্তরণ কৌশলে বালক বালিকাকে লইয়া একবার উঠিল; কিন্তু আবার ডুবিয়া গেল। আবার চেষ্টা করিয়া একবার উঠিল। সেই সময় তীর হইতে এক দীর্ঘ রজ্জু বালকের নিকট পৌঁছিল। বালক তাহা দ্বারা বালিকাকে পৃষ্ঠে বাঁধিয়া তাহারই সাহায্যে তীরে উঠিল। বালিকার মাতার চক্ষে আনন্দাশ্রু বহিল। কে জানে মাতার সে আনন্দাশ্রু শোকাশ্রুতে পরিণত হইবে! অনেকবার ঘুরান হইল। কিছুতেই কিছু হইল না। বালক একবার ঘুরাইয়া তাহার শেষ আকাঙ্ক্ষা মিটাইতে গেল। বালক যথেষ্ট বলবান ছিল।

বালিকা জীবিত হইল না। সেই প্রেমময় দুইটী হৃদয়ের একটী চলিয়া গেল। একটী রহিল কেবল কাঁদিতে। বালকের অবস্থা তখন কি শোচনীয়!

* * * *

অনেকদিন বালিকা চলিয়া গিয়াছে, কিন্তু বালকের হৃদয়ের ক্ষত এখনও শুকায় নাই। বালক এখন যুবক হইয়াছে। বিবাহ করিয়াছে; কিন্তু হৃদয়ের ব্যথার আগুন এখনও নিবে নাই। তাই সে প্রত্যহ একগাছি করিয়া মালা গাঁথিয়া লইয়া, বালিকা শ্মশানের যে চাঁপা গাছের তলায় চিতা শয্যায় শুইয়াছিল, সেই গাছের ডালে পরাইয়া একটু করিয়া কাঁদিয়া আসে। ইহাই তাহার জীবনের ব্রত হইয়া দাঁড়াইয়াছিল, তাহাতেই তাহার কতক শান্তি হয়।

শ্রীকালিদাস চক্রবর্ত্তী।

কথালাপ।

বঙ্গ-নারিকেলবৃক্ষ ও তাহার ফল।

বঙ্গদেশকে নারিকেল গাছের সঙ্গে তুলনা করা যায়। নারিকেলের পাতার যে কাঠি তাহার শক্তি বড় কম নহে। গৃহের জঞ্জাল অপসারণে সেই কাঠিগুলির সমবেত শক্তি অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। সেই সমবেত কাঠিগুলির নাম ঝাঁটা। বঙ্গের লেখনী দেখিতেছি সেই ঝাঁটার কাঠির স্থানীয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে। যদিও ঝাঁটার ন্যায় বঙ্গের লেখনীকে বিদেশীগণ অত্যন্ত হেয়চক্ষে দেখেন তথাপি ভারত হইতে দুর্নীতি ও দুষ্কৃতি-জঞ্জাল ঝাঁটাইয়া ফেলিতে বঙ্গের লেখনীরূপ ঝাঁটার কাঠিই একমাত্র উপায়।

তারপরে দেখ নারিকেলের পত্র গৃহ-আচ্ছাদন কার্য্যে ব্যবহৃত হয়। বঙ্গের পত্রগুলিও এই ভারতগৃহের সকল স্থান আচ্ছাদিত করিয়া আছে।

এই নারিকেল বৃক্ষের অতি উচ্চে এক শুভ ফল ধরিয়াছে—তাহাই "স্বদেশী" ফল। ঐ ফলের উপরে যে আবরণ (ছোবড়া) তাহাও ফেলিবার জিনিষ নহে। তাহাতে একতারূপ বন্ধনরজ্জু প্রস্তুত হইয়াছে। ফলের ভিতরে যে জল ও শস্যাংশ তাহা ভারতের সকলের ক্ষুধা ও তৃষা নিবারণ করিতে সমর্থ। এই শুভ নারিকেলফল সকল কর্ম্মে মঙ্গল ঘটে স্থাপন করিতে ভুলিও না।

কলমের চারা।

বাঙ্গলা দেশকে এক অর্থে কলমের চারা বলা যায়। কোন দেশ বা কোন সমাজ এত শীঘ্র উন্নতি পথে অগ্রসর হয় নাই যেমন বঙ্গদেশ বা বঙ্গীয়

সমাজ ইংরাজশাসনে দ্রুতপদক্ষেপে অগ্রসর হইয়াছে। এক এক মানব-সমাজকে যদি এক এক বৃক্ষরূপে কল্পনা করা যায় ত দেখা যায় বঙ্গসমাজ যত শীঘ্র ফল ধরিয়াছে এত শীঘ্র কোন দেশ বা কোন সমাজ বোধ করি চিরবাঞ্ছিত ফল ধরিয়া গৌরব-ভাবে ভূমি-লুণ্ঠিত হয় নাই।

বঙ্গদেশ এত শীঘ্র ফল ধরিল কেন? **কলমের চারা** বলিয়া—**লেখনীর বলে**। যেমন কলমের আমের চারাগুলি অল্পদিনের মধ্যেই ভাল ফল ধরে সেইরূপ **কলমের গাছ** বলিয়া বঙ্গদেশ এত শীঘ্র ফল ধরিয়াছে। সেই ফল কি? 'স্বদেশী' ফল। কলমের গাছের ফল যেমন সুমিষ্ট হয় সেইরূপ বঙ্গের এই 'স্বদেশী' ফলটীও সুমিষ্ট সরস। আজ বঙ্গবৃক্ষ স্বদেশী ফলের গৌরব-ভারে মাতৃভূমির দিকে নিতান্ত ঝুঁকিয়া পড়িয়াছে।

কৃষাণশাসক লর্ড কর্জন ও বঙ্গভূমির কর্ষণ।

লর্ড কর্জন এই নামটীকে ঈষৎ পরিবর্ত্তিত আকারে লর্ড কর্ষণ বলিতে পারা যায়। কৃষাণশাসক লর্ড কর্জন বঙ্গদেশকে **পার্টিশনরূপ হলচালনা** দ্বারা কর্ষিত করিয়া গেলেন। সেই কর্ষিত বঙ্গভূমিতে শুভক্ষণে স্বদেশী ধান্যবীজ উপ্ত হইয়াছে। এ সময়ে **সুরেন্দ্র** অর্থাৎ **ইন্দ্রদেব** বক্তৃতা বর্ষণে বঙ্গের মৃত্তিকা সরস করিয়া তুলিয়াছেন। আশা হয় সেই বীজ হইতে শীঘ্রই প্রচুর শস্য উৎপন্ন হইয়া ধনধান্যে ভারতকে সমৃদ্ধিমান করিয়া তুলিবে।

বিদেশী ফল ও স্বদেশী শস্য।

ফলটী পাড়িয়া দুই চারি দিন ঘরে রাখিলে ফলটী পচিয়া উঠে—আর তাহা খাওয়া যায় না। কিন্তু শস্যের বেলায় তাহা হয় না। ফলটী আপাততঃ

আরামদায়ক কিন্তু ধান্যাদি শস্য চিরদিনের পরিপোষক। বিদেশানীত দ্রব্যরূপ ফল আমাদিগের গৃহে বেশী দিন ব্যবহৃত হইতে থাকিলে ক্রমে তাহা পচিয়া অব্যবহার্য্য হইয়া উঠিবে, কারণ দেশের অর্থ বিদেশে অধিক চলিয়া গেলে, আর আমাদের তাহা ব্যবহার করিবার সামর্থ্যই থাকিবে না। কিন্তু স্বদেশী শস্যে সেরূপ হয় না। ডাল, চাল, গম প্রভৃতি শস্য যতদিন ঘরে রাখ খারাপ হইবার নহে—চিরদিন ব্যবহার করা চলে। স্বদেশী দ্রব্য এইরূপ আমাদের দেশের চিরকালের পরিপোষক—উহা বিদেশী দ্রব্যরূপ ফলের ন্যায় শীঘ্র পচিয়া উঠিবার জিনিষ নহে।

শ্রীঋতেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

পদরাগ।

(২১) কি হবে আমার গতি!

কেদারা—কাওয়ালি।

কি হবে আমার গতি?
কিছুই করিনা, শুধু আলসে কাটাই কাল,
জড়ায়েছে চারিধারে বিষয়ের মোহজাল,
কবে হবে শুভমতি?

কি হবে আমার গতি?
সময় বহিয়া যায় শীঘ্র ঝটিকার মত,

শুভভাব ত্যজি হায় রিপুবশে পদানত,
করি জীবনের ক্ষতি।

কি হবে আমার গতি ?
ডুবে থাকি ভাবনায় ভাবিনাক পরিণাম,
যাঁর তরে আছি বেঁচে লইনাক তাঁর নাম,
যিনি সবাকার পতি।

(২২) সব সহিব।

বিভাস—ঝাঁপতাল।

সব দুঃখ সব কষ্ট সহিব তোমার তরে,
যা' বলিবে তা' শুনিব,
যা' আছে তা' সব দিব,
কিছু না রাখিব আর আমি আপনার ঘরে ;
তুচ্ছ করি সব সুখ,
যাব তব অভিমুখ,
ফেলি দিব যশ মান তব কাজে অনাদরে।

(২৩) প্রত্যুষে।

ভৈরব—ঢিমাতেতালা।

প্রত্যুষে জাগিয়া উঠি নিত্য নমি তব পায়,
পূর্ব্বদিক অরুণিত যবে বিমল প্রভায় ;
বিহগেরা গাহে গীত, তব নাম বনে বনে,
এ শুভ মুহূর্ত্তে জাগি, ধ্যান করি একমনে ;

চারিদিকে পুষ্পরাজি শিশিরেতে স্নান করি
তোমারই মধুগন্ধ লইতেছে প্রাণ ভরি ;
এ সময়ে পূজা ক'রে সর্ব্বপাপ দূরে যায়—
মোহ অন্ধকার যত দিবাকর সুপ্রভায়।

(২৪) সর্ব্বজ্ঞ সে বিচারক।

রামকেলি—কাওয়ালি।

পরেরে বঞ্চিত করে' সাজিয়াছ ধর্ম্মবক,
তারো হবে সুবিচার—সর্ব্বজ্ঞ সে বিচারক ;
লক্ষপতি তুমি হ'য়ে করিয়াছ অত্যাচার
সামান্য দরিদ্র পরে,—তারো হবে সুবিচার ;
গোপনে করিয়া পাপ সাজ যদি সুধার্ম্মিক,
জানিবেন তিনি সব—সুবিচার হবে ঠিক ;
রাশি মিথ্যা বলে' যদি হও সত্য প্রচারক,
তারো হবে সুবিচার—সর্ব্বজ্ঞ সে বিচারক।

(২৫) আরাধনা।

কানাড়া—চৌতাল।

যিনি করিয়াছেন এ ব্রহ্মাণ্ড রচনা,
তাঁহারে সতত কর হৃদয়ে ভজনা ;
কত লোক কত রাজ্য না হয় গণনা,
অসীম তাঁহার বল অবোধ জাননা ?
সূর্য্য চন্দ্র এ পৃথিবী ক্ষুদ্র এক কণা,
তাঁর সাথে কাহারো যে না হয় তুলনা ;

পুণ্য।

নিশিদিন ভজ তাঁরে হ'য়ে একমনা,
ভক্তিভরে কর তাঁর শুভ আরাধনা।

(২৬) জননী উঠায়ে লও।

জয়জয়ন্তী—ঝাঁপতাল

মগ্ন যবে পাপপঙ্কে, জননি! উঠায়ে লও,
শান্তির অঞ্চল দিয়া অন্তর মুছায়ে দাও;
ধূলায় খেলিতে খেলা,
কেটে গেছে সারাবেলা,
মলিনতা মেখে আছি, অঙ্কেতে তুলিয়া লও;
গৃহেতে এসেছি ফিরে,
ডাকি তাই জননীরে,
ক্ষুধায় কাতর প্রাণ বক্ষের সুধা পিয়াও।

শ্রীঋতেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

বরাকরে বারদিন।

(সাঁওতালী গান।)

পরদিন প্রাতে উঠিলাম। সূর্য্যের উদয়ে পাহাড়ে পাহাড়ে কতরকমের রং ফলিয়াছে দেখিতে পাইতেছি; দেখিতে দেখিতে একবার বাঙ্গলায় আসিয়া সম্মুখের বারান্দায় বসিতেছি, একবার সূর্য্যের সপ্ত রশ্মির ছটায় নানারঙের রেশমের ন্যায় স্থানে স্থানে বর্ণের প্রতিফলন দেখিয়া প্রকৃতির অপূর্ব্ব শোভায় আনন্দে মগ্ন হইয়া যাইতেছি:

রৌদ্রের আলোছায়ায় পাহাড়ে কি রঙ ফলে
বেগ্নি লাল আরো কত রঙ খেলে পলে পলে।

রংয়ের খেলা বর্ণের বৈচিত্র্য ভাবিতে ভাবিতে গিরিনদীময়ী স্বাভাবিক ছবির মাধুরী উপভোগ করিতেছি—নানাবিধ তরুলতাসমাচ্ছন্ন পঞ্চকোট গিরি দূর হইতে একেবারে ছাইবর্ণ দেখাইতেছে।

সেদিন ১লা কার্ত্তিক শুক্রবার। নূতন হিমের ভাব জাগিবার উপক্রম করিতেছে। দূর হইতে পঞ্চকোট পাহাড়ের চমৎকার শোভা। শ্যামপুরের বাঙ্গলা থেকে পাহাড়টী প্রায় ১২ ক্রোশ দূরে, দূর হইতে পঞ্চকোটের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্তরের ভাব অনেকটা ধরিতে পারা যায়; কিন্তু তাহা দেখিতে দেখিতে যেন মিলাইয়া যায়; বোধ হয় যেন উহা আলোছায়ার খেলা! দূর থেকে পঞ্চকোটের কোন কোন অংশ ছাইবর্ণের মত দেখা যায়:—স্থানে স্থানে আলোক মিশ্রিত ছাই রং, আর স্থানে স্থানে কালো ছাই রং। এই পঞ্চকোট পাহাড়ের কিয়দংশ শুনিলাম রাজা মধুসূদন পাণ্ডে (ঘাটোয়ালের) অধিকৃত। পাহাড়ের নিম্নে অনেক গাছপালার ঘন দৃশ্য দেখা যায়, তাহা দূর হইতে ছায়াময় ঘন হরিদ্বর্ণের দেখাইতেছে; ক্রমে পঞ্চকোটের পরে যে পাহাড়টী আরো দূরে অবস্থিত তাহার রং যেন ফিকে ছাই;—ক্রমে যেন শূন্যতায় পরিণত হইবার উপক্রম করিতেছে। চারিধারে পাহাড়ে পাহাড়ে শালের শ্রেণী

চলিয়াছে—কোন কোন শাল খুব বড় কিন্তু অনেক শালই এখনও ছোট ছোট; শালগাছগুলির এমনি এক বিশাল ভাব যে দেখিলেই তাহা মনে যেন মুদ্রিত হইয়া যায়। কবিশ্রেষ্ঠ কালিদাস মহারাজ দিলীপের শরীরের বর্ণনা কালে তাহাকে দীর্ঘকায়রূপে বর্ণনা করিতে গিয়া বলিয়া গিয়াছেন: শালপ্রাংশু: শালের ন্যায় প্রাংশু অর্থাৎ লম্বা উন্নত। শাল গাছের প্রাংশুভাবে সকলেই মোহিত। এই সকল শালপ্রাংশুতার ঘনত্বের মধ্যে প্রতিফলিত কনককিরণসমূহ কোথাও মলিন, কোথাও উজ্জলরূপে কতভাবে যে ক্রীড়া করিতেছে, বর্ণনায় তার ইয়ত্তা কে করিবে? আমাদের বাঙ্গলার কাছে ছোট বড় কত শালগাছ কত পাতা তার পড়িয়া গড়াগড়ি যাইতেছে; এগুলি ব্যর্থ যায় না; গরিবলোকে এইগুলি কুড়াইয়া লয় ও বস্তাবন্দী করিয়া বাজারে চালান দেয়। বাজারে হাটে ঘাটে এই সকল পতিত শালপত্রের বড়ই আদর; খাদ্যসামগ্রী দোকানদারের এইসকল শালপত্রের ঠোঙ্গা করিয়া তাহার মধ্যে আহার্য্য পুরিয়া দেয়। শালে যেমন শোভা, তেমনি ইহার কাঠ পত্র সকলি মানবের নানা ব্যবহারে লাগে; শালনির্য্যাসের অতি সুগন্ধ যাহাতে ধুপধুনা প্রস্তুত হয়। কবি কালিদাস শালবন বর্ণনাকালে বলিয়া গিয়াছেন:—

"সেব্যমানো সুখস্পর্শৈঃ শালনির্য্যাসগন্ধিভিঃ।
পুষ্পরেণুৎকিরৈর্ব্বাতৈরাধূত বনরাজিভিঃ॥"

"তখন পুষ্পরেণু-বিক্ষেপকারী বনরাজি কম্পিতকারী, শালনির্য্যাস-গন্ধবাহী মুখস্পর্শ বায়ু কর্ত্তৃক রাজা ও রাজমহিষী পরিসেবিত হইতে লাগিলেন। অর্থাৎ তাঁহাদিগের গমনকালে ধূনার গন্ধযুক্ত সুখস্পর্শ বায়ু, পুষ্পরেণু-বিক্ষেপকারী বনরাজি ঈষৎ কম্পিত করিয়া তাঁহাদিগকে সেবা করিতে লাগিল।"

যখন এই সকল শালতরু তরুণ তপনালোকে দুলিতে দুলিতে সমীরভরে ধ্বনিত হইতে থাকে, তখন তাহা শুনিতে কি মধুর; মনে হয় গিরিতলে শালতরুতলে দুদণ্ড বসিয়া নৈসর্গিক আনন্দ উপভোগ করি। কত পার্ব্বতীয় রমণী শালতরুতলে আসিয়া বিশ্রাম করে, হাস্যকৌতুক গল্পাদি করিয়া পুনরায় চলিয়া যায়; সঙ্গে শালপত্র রাশি রাশি জড় করিয়া লইয়া যায়।

এখানে শ্যামপুরে যে ক্ষুদ্র নদীটী আছে তাহার শোভা কি চমৎকার;

তাহার আবার ছোটখাট জলপ্রপাত আছে; তাহার আয়তন ছোট কিন্তু আওয়াজ বেশী; নানা পাথরের মধ্যে একস্থানে এমনভাবে পড়িতেছে যে তাহাতে শব্দ অধিক না হইয়া যাইবার যো নাই, যদিও আসলে সে জলপ্রপাতে জলরাশির ভীষণত্ব নাই তথাপি শব্দে যেন ভীষণত্ব প্রকাশ পাইতেছে। ইংরাজি প্রবাদ আছে—Empty vessel sounds much এখানেও সে কথা খাটে। এ নদীতে জল সেরূপ নাই বলিলেই হয়, তবুও স্থানে স্থানে সেই অতি কম জল নানারূপ পাথরে পড়িয়া কি উদ্বেগে না জানি মহাধ্বনি করিতেছে। দেখিলাম যেখানে একটু জল অধিক জমা হ'য়েছে সেখানে আর শব্দ নাই; যেখানে অল্প জল সেখানেই অধিক ধ্বনি করিতেছে। এই ক্ষুদে নদীটীর শোভা আর তো বাঙলায় বসিয়া দেখা যায় না, ক্ষুদেনদীর কলকলধ্বনি ছোট ছোট জলপ্রপাত দেখিবার জন্য আমরা প্রায়ই দেখিতে যাইতাম; সেখানে পাথরের উপরে ক্ষুদ্র বৃহৎ শিলাখণ্ডে মাঝে মাঝে বসিতাম:—

সজনে বিজনে কভু বসিয়া নীরবে
শুনিতাম কলধ্বনি অনন্ত গৌরবে।

একদিন ক্ষুদেনদীর ধারে পরিভ্রমণ করিয়া দূরে বেড়াইতে গিয়াছি, দেখি অপূর্ব্ব চিত্র!—একটী কৃষ্ণকায় কাফ্রির মত কালো ও নগ্নপ্রায় দেহ একটী লোক লাঠির উপর ভর দিয়া—একটী দীর্ঘ বল্লম হাতে করিয়া নদীমধ্যস্থিত একটী শিলাখণ্ডের উপর দাঁড়াইয়া আছে!—একেবারে মিশ কালো!—ঠিক যেমন এফ্রিকান। তাহার লাঠির আগায় একটা লৌহফলকের মত ছিল। তাহাদের আমরা জিজ্ঞাসা করিলাম 'কেরে তুই এখানে দাঁড়িয়ে কেন?' সে বলিল "আমি ঘাটোয়াল।" ভাবিলাম ঘাটোয়াল এত কালো? ঘাটোয়ালরাজ পাণ্ডুরাজ যখন মাঝে শ্যামপুরে গাছলতায় আসিয়া বসে সে এক অপরূপ চিত্র! ঘোর কালোবর্ণ—কাণে মাকড়িও আছে।—ঘোর অসভ্যজাতির মত চেহারা। অসভ্যজাতির ছবি প্রায় সর্ব্বত্র সমান।—ঘাটোয়াল সাঁওতাল সবই প্রায় এক।

একদিন শ্যামপুরে পাহাড়ী সাঁওতালদের দেখিবার ইচ্ছা হইল; আমরা দলবল মিলিয়া সাঁওতাল পাড়ায় বেড়াইতে গিয়াছিলাম। সাঁওতালেরা আমাদের কেমন এক সন্দেহ চক্ষে দেখিতে লাগিল। তাহাদের স্ত্রীরা তাহাদের

চলিয়াছে—কোন কোন শাল খুব বড় কিন্তু অনেক শালই এখনও ছোট ছোট; শালগাছগুলির এমনি এক বিশাল ভাব যে দেখিলেই তাহা মনে যেন মুদ্রিত হইয়া যায়। কবিশ্রেষ্ঠ কালিদাস মহারাজ দিলীপের শরীরের বর্ণনা কালে তাহাকে দীর্ঘকায়রূপে বর্ণনা করিতে গিয়া বলিয়া গিয়াছেন: শালপ্রাংশুঃ শালের ন্যায় প্রাংশু অর্থাৎ লম্বা উন্নত। শাল গাছের প্রাংশুভাবে সকলেই মোহিত। এই সকল শালপ্রাংশুতার ঘনত্বের মধ্যে প্রতিফলিত কনককিরণসমূহ কোথাও মলিন, কোথাও উজ্জলরূপে কতভাবে যে ক্রীড়া করিতেছে, বর্ণনায় তার ইয়ত্তা কে করিবে? আমাদের বাঙ্গলার কাছে ছোট বড় কত শালগাছ কত পাতা তার পড়িয়া গড়াগড়ি যাইতেছে; এগুলি ব্যর্থ যায় না; গরিবলোকে এইগুলি কুড়াইয়া লয় ও বস্তাবন্দী করিয়া বাজারে চালান দেয়। বাজারে হাটে ঘাটে এই সকল পতিত শালপত্রের বড়ই আদর: খাদ্যসামগ্রী দোকানদারের এইসকল শালপত্রের ঠোঙ্গা করিয়া তাহার মধ্যে আহার্য্য পুরিয়া দেয়। শালে যেমন শোভা, তেমনি ইহার কাঠ পত্র সকলি মানবের নানা ব্যবহারে লাগে; শালনির্য্যাসের অতি সুগন্ধ যাহাতে ধুপধুনা প্রস্তুত হয়। কবি কালিদাস শালবন বর্ণনাকালে বলিয়া গিয়াছেন:—

"সেব্যমানো সুখস্পর্শৈঃ শালনির্য্যাসগন্ধিভিঃ।
পুষ্পরেণুৎকিরৈর্ব্বাতৈরাধূত বনরাজিভিঃ॥"

"তখন পুষ্পরেণু-বিক্ষেপকারী বনরাজি কম্পিতকারী, শালনির্য্যাস-গন্ধবাহী সুখস্পর্শ বায়ু কর্ত্তৃক রাজা ও রাজমহিষী পরিসেবিত হইতে লাগিলেন। অর্থাৎ তাঁহাদিগের গমনকালে ধূনার গন্ধযুক্ত সুখস্পর্শ বায়ু, পুষ্পরেণু-বিক্ষেপকারী বনরাজি ঈষৎ কম্পিত করিয়া তাঁহাদিগকে সেবা করিতে লাগিল।"

যখন এই সকল শালতরু তরুণ তপনালোকে দুলিতে দুলিতে সমীরভরে ধ্বনিত হইতে থাকে, তখন তাহা শুনিতে কি মধুর; মনে হয় গিরিতলে শালতরুতলে দুদণ্ড বসিয়া নৈসর্গিক আনন্দ উপভোগ করি। কত পার্ব্বতীয় রমণী শালতরুতলে আসিয়া বিশ্রাম করে, হাস্যকৌতুক গল্পাদি করিয়া পুনরায় চলিয়া যায়; সঙ্গে শালপত্র রাশি রাশি জড় করিয়া লইয়া যায়।

এখানে শ্যামপুরে যে ক্ষুদ্র নদীটী আছে তাহার শোভা কি চমৎকার;

তাহার আবার ছোটখাট জলপ্রপাত আছে; তাহার আয়তন ছোট কিন্তু আওয়াজ বেশী; নানা পাথরের মধ্যে একস্থানে এমনভাবে পড়িতেছে যে তাহাতে শব্দ অধিক না হইয়া যাইবার যো নাই, যদিও আসলে সে জলপ্রপাতে জলরাশির ভীষণত্ব নাই তথাপি শব্দে যেন ভীষণত্ব প্রকাশ পাইতেছে। ইংরাজি প্রবাদ আছে—Empty vessel sounds much এখানেও সে কথা খাটে। এ নদীতে জল সেরূপ নাই বলিলেই হয়, তবুও স্থানে স্থানে সেই অতি কম জল নানারূপ পাথরে পড়িয়া কি উদ্বেগে না জানি মহাধ্বনি করিতেছে। দেখিলাম যেখানে একটু জল অধিক জমা হ'য়েছে সেখানে আর শব্দ নাই; যেখানে অল্প জল সেখানেই অধিক ধ্বনি করিতেছে। এই ক্ষুদে নদীটীর শোভা আর তো বাঙলায় বসিয়া দেখা যায় না, ক্ষুদেনদীর কলকলধ্বনি ছোট ছোট জলপ্রপাত দেখিবার জন্য আমরা প্রায়ই দেখিতে যাইতাম; সেখানে পাথরের উপরে ক্ষুদ্র বৃহৎ শিলাখণ্ডে মাঝে মাঝে বসিতাম:—

সজনে বিজনে কভু বসিয়া নীরবে
শুনিতাম কলধ্বনি অনন্ত গৌরবে।

একদিন ক্ষুদেনদীর ধারে পরিভ্রমণ করিয়া দূরে বেড়াইতে গিয়াছি, দেখি অপূর্ব্ব চিত্র!—একটী কৃষ্ণকায় কাফ্রির মত কালো ও নগ্নপ্রায় দেহ একটী লোক লাঠির উপর ভর দিয়া—একটী দীর্ঘ বল্লম হাতে করিয়া নদীমধ্যস্থিত একটী শিলাখণ্ডের উপর দাঁড়াইয়া আছে!—একেবারে মিশ কালো!—ঠিক যেমন এফ্রিকান। তাহার লাঠির আগায় একটা লৌহফলকের মত ছিল। তাহাদের আমরা জিজ্ঞাসা করিলাম 'কেরে তুই এখানে দাঁড়িয়ে কেন?' সে বলিল "আমি ঘাটোয়াল।" ভাবিলাম ঘাটোয়াল এত কালো? ঘাটোয়ালরাজ পাণ্ডেরাজ যখন মাঝে শ্যামপুরে গাছলতায় আসিয়া বসে সে এক অপরূপ চিত্র! ঘোর কালোবর্ণ—কাণে মাকড়িও আছে।—ঘোর অসভ্যজাতির মত চেহারা। অসভ্যজাতির ছবি প্রায় সর্ব্বত্র সমান।—ঘাটোয়াল সাঁওতাল সবই প্রায় এক।

একদিন শ্যামপুরে পাহাড়ী সাঁওতালদের দেখিবার ইচ্ছা হইল; আমরা দলবল মিলিয়া সাঁওতাল পাড়ায় বেড়াইতে গিয়াছিলাম। সাঁওতালেরা আমাদের কেমন এক সন্দেহ চক্ষে দেখিতে লাগিল। তাহাদের স্ত্রীরা তাহাদের

কুটীরের প্রাচীরে লুকাইল; পুনরায় তাহারা প্রাচীরের উপর মুখ বাড়াইয়া আমাদিগকে দেখিতে লাগিল। হিন্দু কুলললনাদিগের মত সাঁওতালিনীদের মাথায় সিঁদুর ছিল। আমরা সাঁওতাল পুরুষদের সঙ্গে নানা কথা কহিতে লাগিলাম। তাহাদের সঙ্গে কথা কহিয়া জানা গেল যে তাহারা খৃষ্টান সাঁওতালদের সঙ্গে মেশে না; তাহারা খৃষ্টান সাঁওতালদের তাহাদের জাতি হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিয়াছে; তাহাদের গ্রামের বাহির করিয়া দিয়াছে। তাহারা বলিল 'আমরা ওদের সঙ্গে একপংক্তিতে খাইনে, ওদের সঙ্গে তাহাদের আদানপ্রদান হয় না।' খৃষ্টান সাঁওতালদিগকে তাহারা নিকৃষ্ট চক্ষে দেখে। আমি কথাবার্ত্তার স্রোতে তাহাদের জিজ্ঞাসা করিলাম "তোমরা তোমাদের বড়দেবতার গান জান? তাহারা তাহাতে হাসিয়া উঠিল; শুনিয়া সাঁওতাল রমণীরা পর্য্যন্ত তখন লজ্জাসম্ভ্রম দূরকরতঃ প্রাচীরের উপর অনেকটা উঠিয়া সকলেই যেন উত্তর দিবার জন্য ব্যস্ত হইয়া পড়িল। আমি তাহাদিগকে কহিলাম 'আমি বড়দেবতার গান জানি', তখন তাহারা ভারি আশ্চর্য্যান্বিত হইল। আমি যখন একটু সুর করিয়া তাহাদিগকে শুনাইলাম, তাহারা তখন সকলেই আমাকে কেমন এক ভক্তিচক্ষে দেখিতে লাগিল বলিয়া মনে হইল। তখন সাঁওতাল পুরুষ ও রমণীদের চক্ষে যেন একটু কি পবিত্রতার ছায়া জাগিয়া উঠিল; তাহারা আমার কাছে কথা কহিতে আর যেন তেমন সঙ্কুচিত হইল না; সাঁওতাল পুরুষ ও রমণী সকলে যেন একত্রে আমার কথাবার্ত্তার উত্তর প্রত্যুত্তর দিবার জন্য উন্মুখ হইয়া উঠিল ও আনন্দ প্রকাশ করিল। তাহারা স্ত্রীপুরুষে সকলে মিলিয়া বড়দেবতার গান ধীরে ধীরে গাহিতে সুরু করিল!—

বড়দেবতার গান।

"লোগোবুরু থির্ গো সিনি
ঘণ্টাবাড়ী ধির্গো কেওয়াড়।
লোগোবুরু থিরগো সিনিন্
ঘণ্টাবাড়ী ধির্গো কেওয়াড়॥
ধিরিমা সিনিন্
কাপাট মা কেওয়াড়।

হেরম জা লোক্সোন্ জা ঝিঁঝমে
কাপাট মা কেওয়াড়॥

সাঁওতালেরা গান গাহিবার সময় নৃত্য করে ও মাদল বাজায়। ঢুলকি বাজায়, ঢোলককে তাহারা ঢুলকি বলে; তাহারা বড়ঢাককে কড়ানাগারা বলে। আরেকটা গান গাহিতে বলা গেল তখন তাহারা ঝিল্লি লড্ডু বলিয়া একটা গান ধরিল; এই গানের তাৎপর্য্য যে, বাবা বেটাকে বল্‌চে যে যখন বিদেশ গেল তখন ছেলে ফিরে এসো।" তাহারা গাহিল:—

অমদম চেলাকান চেতান দিসোঁ
যুগিবর্য্যাৎ ডাড়াঁতেদা বুলুতেদা
সানাম চিন্নিলাড্ডু লেচাবায়ে।

নীচে তাহাদের গানের স্বরলিপি দিলাম।

গা	গা	।	সা	মা	সা	।	গা	গা ।
অম	দম	।	চে	লা	কান্	।	চে	তান্ ।

সা	গা	+	গা	।	গা	গা	।	সা	সা২ ।
দি	সোঁ		—	।	—	—	।	হো	— ।

সা	সা	।	সা	সা	সা	।	গা	গা ।
যু	গি	।	ব	র্য্যা	ৎ	।	ডা	ড়ে ।

সা	সা	সা	।	গা	গা	।	সা	সা	সা ।
তে	দা	—	।	—	—	।	দো	—	— ।

সা	সা	।	সা	সা	সা	।	গা	গা	।
বু	লু	।	তে	দা	—	।	সা	ন্নাম্	।

(ঈষৎ বিকৃতভাবে)

সা	সা + সা	।	সা	সা	।	সা	সা	সা	।
চি	নি	—	।	লা	ডু	।	—	—	—	।

(কম্পিতভাবে)—

সা	সা	।	সা	সা	সা	।	সা	সা	।
লে	চা	।	বা	য়ে	—	।	—	—	।

....

সা	সা	সা	॥
—	—	—	॥

পূর্ব্বোক্ত দুইটী সাঁওতালী গান সাঁওতালদের মধ্যে বড় প্রচলিত। যথার্থ সাঁওতাল যাহারা, তাহাদের মধ্যে সকলেই প্রায় ও-দুটী গান জানে। যথার্থ সাঁওতাল বলিলাম কেন? তাহার অর্থ এই যে খৃষ্টধর্ম্মে বা অপর ধর্ম্মে দীক্ষিত হইবার পর, সে অসভ্য সাঁওতাল আর থাকে না। অসভ্য সাঁওতালকে লক্ষ্য করিয়াই আমি যথার্থ সাঁওতাল বলিলাম। আজকালকার অনেক সভ্য সাঁওতাল হইয়াছে, তাহারা একরূপ সাঁওতাল জাতিচ্যুত। সাঁওতালেরা তাহাদিগকে ঘরে লয় না, তাহাদিগের সঙ্গে একপংক্তিতে আহার করে না। নয়াডুম্কার পথে একবার কতকগুলি অসভ্য সাঁওতালদের ডাকিয়া যখন আমি নাচ গান করাই, তাহাদিগের নিকটও আমি উপরোক্ত

গান দুটী শুনিয়াছি। উপরোক্ত গীতিদ্বয় প্রকৃত পাহাড়ী বা অসভ্য সাঁওতালদের বড় প্রিয়। নয়াডুম্কার পথে একদল সাঁওতাল আসিয়া বসিয়াছিল, বিশ্রাম করিতেছিল, তাহাদিগকে আমি গান গাহিতে বলিলাম; প্রথমে তাহারা গাহিতে লজ্জা বোধ করিতেছিল, কিছুতেই গাহিতে চাহে না, বলে, আমরা অত্যন্ত ক্ষুধিত, ক্ষুধায় মুখে কথা সরিতেছে না। তাহাদিগের জন্য তাই আহার্য্যদ্রব্য আনাইতে পাঠাইলাম। তাহাদিগকে আমি অনেক বলিয়া কহিয়া তবে গাওয়াইতে সমর্থ হইলাম। তাহারা প্রথমে "যখন জনম তখন লিখন"—বলিয়া গান ধরিল। আমি বলিলাম, "ওতো বাঙলা, তোদের নিজের সাঁওতালি গান গা।" তখন তাহারা হাসিয়া—আপনাদের মধ্যে কি কথা কহিয়া, পরে তাহাদের নিজের গান ধরিল। প্রথম গানটী পিতাপুত্রের উক্তিসম্বন্ধীয়—তাহা এই :—

সিক্যোর দিসোং (ববু) স্থন্‌লেনামরে
ডাণ্ডাতেদাদো বুলুতেদা তোকোর্ তম্ব্‌বু
ঝিলি লড়ু লে চাবায়ে।

সিক্যোর দিসোং অর্থ পরদেশ। এই দিসোং=দেশ। স্থন্‌লেনাম=চল্‌লাম—গিয়াছিলে। ডাণ্ডাতে দাদো=দাঁড়াইয়া নদী নদ। ডণ্ডাতে=দণ্ডাতে আর কি। বুলুতে অর্থ উরুতে। তোকোর=তোর কই। কোর (কই—ক্ব—কউ—কো+রে—কোর) তোম—(তুই) ববু=বেটা বাবা আর কি। *আমরাও ছেলেকে বাবা বলি। ঐ বাবা—বাবু—ববু সবই প্রায় এক কথা। ঝিলি লাডু=মিঠাই লাড্ডু। লে চাবায়ে=নিয়ে ছাপায়ে অর্থাৎ গেল নিয়ে ভাসিয়ে। সাঁওতালী ভাষা অনেকটা বাঙলারই মত, বুনো বাঙলা আর কি? অনেক সাঁওতাল তাই সহজেই বাঙ্গালী হইয়া যায়, সাঁওতালরা আসলে বাঙলার অধিবাসী। অনেক সাঁওতাল নিজেদের রাজপুতবংশীয়—চন্দেলবংশীয় রাজপুত বলে : কালে উহারা অবনতি প্রাপ্ত হইয়াছে। বাস্তবিক তাহা হইলেও হইতে পারে। বলে যে কি পাপে কি একটা দোষ করিয়া তাহারা পতিত হইয়াছে, হিন্দুসমাজভ্রষ্ট হইয়াছে। তা হইতেও পারে কিছু বিচিত্র নহে। হিন্দুশাস্ত্রে ওরকম কত ঘটনার উল্লেখ আছে। কত জাতি পতিত হইয়া গিয়া হিন্দুজাতির বাহিরে পড়িয়াছে দেখা যায়।

এই সাঁওতালদের প্রধান আড্ডা প্রায় বাঙলা দেশের গিরি নদী সকল। বাঙলার ছোট ছোট পাহাড়ে প্রায় সাঁওতালদের বাস। পাহাড়ী সাঁওতালেরা যে জাতীয় বড়দেবতার গান গায়, তাহার মধ্যেও রাম লক্ষ্মণের কথা আছে; তাহাতেই মনে হয় ইহারা পতিত ভ্রষ্ট নিকৃষ্ট হিন্দুজাতি ছাড়া আর কি। পাহাড়ী সাঁওতালদের বড়দেবতার গান, সকল সাঁওতালদের মধ্যে প্রচলিত।

বড়দেবতার গান গাহিবার সময়ে যখন বুনো সাঁওতালেরা নাচে তাহা দেখিতে চমৎকার—বীরত্বে ও স্বাভাবিকভাবে ভরা।— কেমন সাদাসিদে গান কেমন সাদাসিদে নাচ!—অসভ্য হইলে কি হয়? সহজভাবের সঙ্গীত সর্ব্বদাই ভাল লাগে:—ভারতসঙ্গীতে উইলার্ড সাহেব যথার্থই বলিয়াছেন:—"হিন্দুস্থানের আদিম অসভ্য জাতিদিগের গীতসমূহ পবিত্রতা, রচনা, সততা, ভাবের উচ্চতা ও কোমলতার জন্য যে কোন দেশের গীতের সঙ্গে তুলনাধারণে সক্ষম।"

ধর্ম্মভাগ।

হে মানব! তোমরা ধর্ম্ম না সাংসারিক সুখ ঐশ্বর্য্য প্রত্যাশী? একটী প্রাণ কিছু দুইটা প্রাণের কার্য্য করিতে পারে না; একটী রোগীর এককালীন দুইটী রোগ চিকিৎসা হয় না। রোগীকে যদি সুস্থ করিতে চাও, তাহা হইলে প্রথমতঃ তাহার প্রধান রোগ নির্ণয় পূর্ব্বক প্রথমে তাহারি চিকিৎসা আবশ্যক, প্লীহা বা যকৃৎ হইলে অগ্রেই জ্বর পরিত্যাগ করান কর্ত্তব্য, তৎপরে প্লীহা বা যকৃত প্রশমন চেষ্টা অধিক পরিমাণে ফলোপোধায়ী হয়। যদি তোমরা পারিবারিক সুখকেই জীবনের লক্ষ্য কর, যশস্বী ও কীর্ত্তি উপার্জ্জন পূর্ব্বক সমাজের মধ্যে একজন হইতে চাও, তবে বৃথা দম্ভ সহকারে

আপনাকে ধার্ম্মিক বলিয়া পরিচয় দেওয়া কোন মতে যুক্তিযুক্ত নহে। এরূপ করিলে কুটিলতা ও অকৃতজ্ঞতার নির্ম্মম পেষণযন্ত্র হইতে নিস্কৃতি নাই। ধর্ম্ম ও সাংসারিক সুখ ইহাদের মধ্যে আকাশ পাতাল প্রভেদ; সংসারকে ধর্ম্মের অধীন করিয়া না রাখিলে সে সংসার রসাতলে যায়। তোমার দৃষ্টি শক্তি আছে, এই পরিবর্ত্তনশীল পরিদৃশ্যমান জগৎ তোমার চক্ষুর উপর নৃত্য করিতেছে, কিন্তু বলিতে পার কি যে কাহার কর্ত্তৃত্বাধীনে তোমার চক্ষু কার্য্য করিতেছে? চক্ষুর যে দৃষ্টিশক্তি উহা আত্মার। অন্ধ বাহ্যপ্রকৃতি কি দেখিবে? কণ্ঠতালু পরিশুষ্ক হইলে পানিয় জল আবশ্যক। কিন্তু কে সে জল পান আবশ্যক প্রতীতি করিয়াছে? ক্ষুধার্ত্ত হইয়া আহার কর, কে সে আহার প্রয়োজন হৃদয়ঙ্গম করে? এই সকলের মূলে আত্মা থাকিয়া কার্য্য করিতেছে। সেইরূপ এই জগত সৃষ্টির মূলে পরমাত্মা—তিনি অন্তরে থাকিয়া জগত চালাইতেছেন। কল্পনা, জল্পনা যাগযজ্ঞ, ধ্যান, যোগ বলে তাঁহার বার্ত্তা পাওয়া যায় না। কি উদ্দেশ্যে ভগবান সংসার সৃষ্ট করিয়া মায়ার হাট করিয়াছেন? কেন তিনি এই দেহভার প্রপঞ্চে সংসৃষ্ট করিয়া ক্রীড়নকস্বরূপ নাচাইতেছেন? জগৎ সৃষ্টি কেন? ইহা কে বলিতে পারে? ক্ষুদ্র বুদ্ধি মানব কি উত্তর দিবে?

যাঁহারা ধর্ম্মকে জীবনে আলিঙ্গন করেন সাংসারিক সুখ তাঁহাদিগের নিকট নিতান্ত তুচ্ছ। এই ভারতবর্ষে অন্নাচ্ছাদন পরিত্যক্ত কত শত মহাত্মা সমাজ কর্ত্তৃক নিন্দিত ও ঘৃণার্হ হইয়া শত শত কষ্ট সহ্য করিয়াও তাঁহাদিগের হৃদয় নিহিত সত্যের জ্যোতিতে দীপ্তিশালী হইয়া বিচরণ করিতেছেন। তাঁহারা সাংসারিক সুখ ও বিষয় বৈভবে বঞ্চিত হইয়াও সদা প্রসন্নচিত্ত। যাঁহারা তাঁহাদের হৃদয় পরীক্ষা করিয়াছেন, পবিত্র নির্ম্মল আত্মায় প্রভাশালী ধর্ম্মনিধির জ্যোতি প্রতিফলিত দর্শন করিয়াছেন, তাঁহারাই মনে জানিয়াছেন এ ব্যক্তি সামান্য নর নহে সিদ্ধ পুরুষ। যাঁহারা সংসারের সুখকেই আদর্শ করিয়াছেন তাঁহারা প্রকৃত সাধুর মর্য্যাদা কি বুঝিবেন? তাঁহারা হয়ত সাধু ব্যক্তির নগ্ন দেহ জীর্ণ বস্ত্র দেখিয়া তাঁহাকে ঘৃণার চক্ষে দেখিবেন। তাঁহার মাহাত্ম্য না বুঝিয়া হয়ত তাঁহাকে উপহাস করিবেন। হে বিষয়াভিমানি মানব! তাঁহারা সাংসারিক সুখ পরিত্যাগ পূর্ব্বক কি যে শান্তি রসাস্বাদন করিতেছেন

তাহা তুমি কি জানিবে? প্রকৃত সাধুর অন্তঃকরণ হিমাদ্রি শিখরের ন্যায় শান্ত সুগম্ভীর, প্রশান্ত সমুদ্রের ন্যায় সুগভীর, গগনাপেক্ষা অত্যুচ্চ, তুষারতুহীন সমাচ্ছাদিত ক্ষেত্রস্থলী অপেক্ষাও নির্ম্মল ও সুশীতল। মহা বজ্র-নির্ঘোষে সে অন্তঃকরণ প্রকম্পিত হয় না, প্রলয় কালের বর্ষণে তাহা স্থির থাকে, উষ্ণ প্রস্রবণ উদ্গীরিত হইলে ও পৃথিবী বিকম্পিত দ্বিধা হইলেও কিছুতেই তাঁহার অন্তঃকরণ সঞ্চালিত হয় না। রাজপদ, অরণ্য, সুখ হর্ষ, বিষাদ, জীবন, মরণ তাঁহার সান্নিধ্যে সকলই সমান। যাঁহারা সংসারের দাস, সাংসারিক সুখ-জিগীষু, তাঁহারা সাংসারিক সুখ অনুরোধে সত্য প্রকাশিত করিতে কুণ্ঠিত হয়, এবং ধনী ও রাজার ইচ্ছানুরূপ তোষামোদ করিলে কষ্টের লাঘব ও সাংসারিক সুখ সম্পত্তি দিন দিন বৃদ্ধি পাইবে, এই আশায় সাংসারিক মমতা আবদ্ধ ক্রীতদাস সত্য সংগোপন করিয়া রাখে। কিন্তু যিনি জ্ঞানবান যিনি প্রকৃত সাধু সংসারের কুহেলিকা মধ্যে যিনি অবস্থিত নহেন, সাংসারিক ভোগ আসঙ্গ লিপ্সায় ঈপ্সিত নহেন তাঁহার কিছুতেই ভয় নাই, তিনি সাংসারিক কিছুরই আবশ্যক রাখেন না, তাঁহার কিসের আশঙ্কা? তুচ্ছ নর দূরের কথা, নরপতিকেও ভয় করেন না। উদ্বন্ধন প্রভৃতি যন্ত্রণাদায়ক রাজদণ্ডও তৃণবৎ জ্ঞান করিয়া তিনি নিত্য সত্য বস্তু প্রকাশিত করেন। তাঁহার অন্তঃকরণে সদ্বৃত্তি-সমূহ সমীচীনরূপে চিরবিকশিত; তাঁহার সমবেত গুণনিচয়ের ধারাবাহিকরূপে পরিচয় প্রাপ্ত হইয়া তাঁহাকে মরজগতের মনুষ্য বলিয়া বিবেচিত হয় না, স্বর্গবাসী বলিয়া মনে হয়। প্রকৃত পক্ষে তিনি ইহজগতের জীব নহেন, বসুন্ধরা তাঁহার পাদপীঠ হইতে পারে। তাঁহার আত্মা স্বর্গে অর্থাৎ উচ্চে আরোহণ করিয়াছে। পশুত্ব ও দেবত্ব এই দ্বিবিধ ভাবই মনুষ্যেরই মধ্যে বিদ্যমান। সুতরাং মনুষ্য, পশু ও দেবতা উভয়ই হইতে পারে। যিনি সত্য-সেবক সাধু মাহাত্মা তিনি পশুত্ব পরিত্যাগ পূর্ব্বক দেবত্ব লাভ করিয়াছেন। প্রাচীন আর্য্য ঋষিগণ এই দেবত্ব লাভকেই 'দ্বিজ' অর্থাৎ পুনর্জন্ম বলিয়াছেন। হে মানব! তুমি কি সাধু হইতে ইচ্ছা কর? মনে করিলে, মুখে বলিলে সাধু হওয়া যায় না। হরিভক্ত হইয়া ত্রিপুণ্ড্রক প্রভৃতি ধর্ম্মের বাহ্যিক আভরণ ধারণ করিয়া, হরিনামে বিভোর হইয়া ঘন ঘন দশা প্রাপ্ত হইলে এবং নানা সভায় বিবিধ প্রেমপূর্ণ বক্তৃতা লহরী প্রবাহিত করিলে অথবা দার্শনিক

গবেষণাবিশিষ্ট বিশুদ্ধ নৈয়ায়িক তর্ক তরঙ্গ উত্থিত করিয়া সার্ব্বভৌম পণ্ডিত হইলেই সাধু হওয়া যায় না। কেবল সাধন করিলে সাধু হয়। সে সাধন কেবল রাজসিক তামসিক ভাবের প্রশ্রয় নয়, সেই সাধনা কেবল রক্ত-চন্দন তুলসীপত্র সাপেক্ষ নহে, দৈনন্দিন বাহ্যিক অনুষ্ঠানেরও সহিত উহার অণুমাত্র সংস্রব নাই; এরূপ কাল্পনিক সাধনায় কেহ সিদ্ধ হয় না। যদি জিজ্ঞাসা কর তবে হয় কিসে, ইহার প্রত্যুত্তরে আমি বলি ঈশ্বর সত্য নিত্য বস্তু পরমানন্দ সচ্চিদানন্দ এক সত্য নির্ব্বিকল্প পরমপিতার অনুসরণে আত্মোৎসর্গ করাই একমাত্র সাধন-পন্থা। আবার কেবল বাগাড়ম্বরে প্রাণমন সমর্পণ বা ঈশ্বর উদ্দেশ্যে ত্যাগ স্বীকার করিলাম এরূপ প্রচারিত করা ইহাও সিদ্ধপুরুষের লক্ষণ নহে। সত্য কার্য্যে পরিণত করা আবশ্যক। এক সত্য নিত্যবস্তু এইরূপে স্থিরসিদ্ধান্তে উপস্থিত হইয়া বিষয়বৈভব পুত্র কন্যার প্রতি মমতা প্রভৃতি সমগ্র প্রবৃত্তিগুলির উপরে উঠিতে হইবে। ইহাও স্থির জ্ঞাত থাক যে বনসজ্জায় বিভূষিত হইতে হয় কি বনবাসে জীবন যাপন করিতে হয় তথাপি সত্য আচরণে প্রতিনিবৃত্ত ও ভীত হইব না, অল্পায়াসেই সকলি ত্যাগ করিব, কিন্তু সত্য হইতে বিচ্যুত হইব না। সুদৃঢ় ব্রত ও সংযমচিত্তে সাধন ও সত্যধর্ম্মে আত্মনির্ভর এসকল সাধন সাপেক্ষ। এক্ষণে আমরা জিজ্ঞাসা করি, 'মানব! তুমি কি ধার্ম্মিক হইতে ইচ্ছা কর?' যদি বল হাঁ! তবে সংক্ষেপে আমরা যাহা কিছু বলিলাম তাহা করিতে চেষ্টা করিবে—মূলকথা ধর্ম্মের ভেক ধারণ বা ধার্ম্মিকের অনুকরণে সকলকে প্রতারণা প্রবঞ্চনা করিও না, বৃথা আর পঙ্কিলময় জলকে উদ্বেলিত করিয়া জঘন্য করিও না।

শ্রীঃ।

JOTINDRO NATH DUTTA
JANMABHUMI OFFICE

ভারতমাতার স্বর-সাধন।

ভারতমাতা এক্ষণে সাত সুরে গান অভ্যাস করিতেছেন—স্বরসাধন করিতেছেন। তাঁহার বামাকণ্ঠ হইতে বেশ সুমিষ্ট স্বর বাহির হইয়া সকলকে মুগ্ধ করিতেছে। সা, রে, গা, মা, পা, ধা, নি, এই সাত সুর। এই সাত সুরের সংস্কৃত নাম ষড়জ, ঋষভ, গান্ধার, মধ্যম, পঞ্চম, ধৈবত, নিষাদ। বর্ত্তমান যুগে ভারতমাতা এই ষড়জ আদি সপ্তস্বরে কণ্ঠ সাধিতেছেন। ষড়জ, ঋষভ ও গান্ধার ছাড়াইয়া তাঁহার স্বর এক্ষণে মধ্যমে উঠিয়াছে। যাঁহার সুর বোধ আছে তিনিই আমাদের কথার মর্ম্ম বুঝিবেন। সা বা ষড়জস্বর কি? ষড়-জ অর্থাৎ ষড়রস-আস্বাদনের যাবতীয় দ্রব্য যখন ভারতেই জাত বা উৎপন্ন হইত সেই প্রাচীন কালে বলা যাইতে পারে ভারত-মাতা আদিসুর ষড়জস্বর সাধন করিতে বসিয়াছেন। তৎপরে ঋষভ বা রেখাব সুর। সংস্কৃতে ঋষভ অর্থে বৃষ বা ষাঁড়। যখন আমাদের দেশে বিদেশী বৃষ আসিয়া স্বদেশের উৎপন্ন দ্রব্য মুড়াইয়া খাইয়া বিদেশী দ্রব্যে আচ্ছন্ন করিল সেই সময়ে ভারতমাতা ঋষভস্বরে গাহিয়া উঠিলেন। পরে যখন বিদেশী পণ্যদ্রব্যে, বিদেশীভাবে, বিদেশীবিলাসিতার গন্ধে দেশ পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল সেই সময়ে ভারত-মাতা গন্ধার স্বর সাধন করিতেছিলেন। বর্ত্তমান কালে ভারতের মধ্যম সুরে কণ্ঠ সাধন চলিতেছে—মা সুরে তাঁহার কণ্ঠ উত্থিত। মধ্যম স্বর অর্থাৎ বিদেশী ও স্বদেশীর মাঝামাঝি অবস্থা। এখন বিদেশী হইতে স্বদেশীর দিকে ফিরিলেও একেবারে বিদেশীকে বর্জন করিতে পারে নাই—ইহারই নাম মধ্যম বা মা সুর। এখন কথা হইতেছে রেখাব ও গান্ধারের যেমন কোমল সুর আছে, মা সুরের কোমল নাই কেবল কড়ি আছে। প্রথম যখন ঋষভ ও গান্ধার সুরে সাধন চলিতেছিল

তখন তাহার মধ্যে কোমলতা ছিল—স্বদেশী ও বিদেশী পরস্পরের মধ্যে সখ্যভাব ছিল। কিন্তু মা সুরের কোমল নাই—মধ্যমের সঙ্গে কড়ি মধ্যম—এখন ভারতমাতার স্বরটা কিঞ্চিৎ কড়াভাবেই চলিয়াছে—বয়কট আদিই তাহার পরিচয়। মা সুরের পরে যখন পঞ্চম বা পা সুরে ভারত-মাতার কণ্ঠ চড়িবে তখন বিদেশীদ্রব্য ব্যবহার একেবারে পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইবে। পঞ্চমের পরে ধৈবত সুর। ভারতমাতার ধৈবত সাধন কালে স্বদেশীয় দ্রব্য দেশে দেশে জগতের চারিদিকে ধাবিত হইবে। অর্থাৎ ভারতের পণ্যদ্রব্যসমূহ এত প্রচুর পরিমাণে এখানে উৎপন্ন হইবে, যে, সে সকল, দেশ-বিদেশে রপ্তানী হইতে আরম্ভ হইবে। সর্ব্বশেষে নিষাদ বা নি সুর। নি সুরে যখন ভারতমাতা সাধন করিবেন, তখন তাঁহার উচ্চকণ্ঠ চরমসীমায় উঠিবে। সংস্কৃতে নিষাদ অর্থে ব্যাধ। নিষাদ অর্থাৎ ব্যাধের ন্যায় তখন স্বদেশী দ্রব্যসমূহ বিদেশী দ্রব্যকে শীকার করিয়া বধ করিতে পারিবে। সেই সময়ে জানিও ভারতের স্বরসাধন পূর্ণমাত্রা লাভ করিয়াছে এবং ভারতমাতা স্বরসাধনায় সিদ্ধি লাভ করিয়া জগতের মহা সঙ্গীতে যোগ দিতে পারিয়াছেন।

শ্রীঋতেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

সাংখ্যস্বরলিপি।

তারে চেনা দায়।

(শ্রীকৃষ্ণবিষয়ক গীত।)

শ্রীরাধার প্রতি সখির উক্তি।

বেহাগ—কাওয়ালি।

তারে বল সাধু, বড় ভালো,
চতুর সে যে বিষম কালো,
হায়
চেনোনি তাহায়
তাহার কথায় গো ভুলনা,
সাধুর সঙ্গে তাহার তুলনা!—
হায়
চেনোনি তাহায়।
তারে চেনা দায়,
তারে চেনা দায়।

তালি। ১ (স্থা, স্তু) । ২ঃ । ৩ । ০ ‖
মাত্রা। ৪ । ৪ । ৪ । ৪ ‖

স্থাঃ— সা সা গা গা । রে মা গা২ । গা পা
স্থাঃ— তা রে ব ল । সা — ধু । ব ড়

রে মা । গা৪ । গা পা পা । পা৩ পা ।
তা — । লো । চ তুর্ সে । যে বি ।

পা২ "৴মা পা" বা "পা½ গা½ পা"
ষম্ কা — কা — —

প্রথম দ্বিতীয়

বা "৴মা½ পা½ নি½ ধা½" । পা৪ । পা৪ বা ২ স্না
কা — — — । লো । হায় হা

২ ন্সা ধা পা । গা মা পা মা ।
— — —য়্ । চে নো নি তা ।

গা৩ রে । গা রে সা২ ‖
হা — । — — —য়্ ‖

(স্তু)ঃ— পা পা২ নি । নি৩ নি ।
(স্তু)ঃ— তা হার্ ক । থায় গো ।

২...
সা সা নি½ সা½ রে½ সা½ । সা৩ সা ।
ভু ল — — — — । না সা ।

....
সা৩ সা । রে সা৩ । নি নি ধা পা ।
ধুর্ স । — ঙ্গে । তা হা — — ।

+ পা	পা	পা	২ সা	।	নিও	পা	।	+	পা৩
—র্	তু	ল	—	।	না	হা	।		—য়্

গা	।	মা২	পা	মা	।	গা৩	রে	।	গা	রে
চে	।	নো	নি	তা	।	হা	—	।	—	—

সা২	॥
—য়্	॥

সা	সা	রে	নি	।	সা৪	।	সা	সা	রে
তা	রে	চে	২ না	।	দায়্	।	লো	ক্	চে

নি	।	সা৪	॥	(স্থা-পু):—	সা	সা
২ না	।	দায়্	॥	(স্থা-পু):—	তা	রে

গা	গা	।	রেঃ	॥ ॥
ব	ল	।	ভা	॥ ॥

শ্রীহিতেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

কিন্ ও কিন্নরজাতি।

সংস্কৃত কাব্যনাটকে কিন্নরজাতির বিষয় কথায় কথায় দেখিতে পাই; তাহারা অত্যন্ত গীতিপ্রিয় ছিল, গীতিবাদ্যে তাহারা বড়ই আনন্দ লাভ করিত। প্রাচীন ভারতের সেই কিন্নরদিগের কথা এখন অনেকটা উপকথার মত বোধ হয়। বাস্তবিক সে কিন্নরজাতি এখনও কি আছে? আছে বৈ কি; আর্য্যজাতির বংশধর আমরা যেমন আছি, কিন্নরেরাও সেইরূপ আছে এখনও লোপপায় নাই। অবশ্য এইমাত্র, তাহাদের কিঞ্চিৎ ভাবান্তর সাধিত হইয়াছে ইহা স্বীকার করিতে হইবে। ইউরোপীয় পণ্ডিতেরা যাহা লিখিয়া গিয়াছেন, তাহা পাঠ করিয়া ও তাহার উপর নানারূপ চিন্তা ও আলোচনাদির দ্বারা ইহাই বুঝি, যে সেই আমাদের প্রাচীন ভারতের কিন্নরজাতির চিহ্ন এখনও বিদ্যমান, যদিচ সহজে লোকের চক্ষে ধরা পড়ে না। ঐতিহাসিক গবেষণার দ্বারাই আমরা এখনও সেই প্রাচীন ভারতের কিন্নরজাতির পরিচয় প্রাপ্ত হই।

বিদেশীয় ঐতিহাসিকগণের ইতিবৃত্তাদি পাঠে জানা যায়, যে টুঙ্গুসিয় নামধেয় এক জাতি আছে, পুনশ্চ তাহাদের অন্তর্গত কয়েকটী শাখাজাতি রহিয়াছে। সেই শাখাজাতির নামগুলির মধ্যে 'কিন্' নামক জাতি অন্যতম। শাখাজাতিগুলির নাম নিম্নে উদ্ধৃত হইতেছে:

মন্ড্সু, (Mandshoo বা Manchu), টুঙ্গহস্, (Toung-hous), কিন (Kin), খিতান (Khitan) এবং উরিয়াঙ্গুইৎ (Ouriangouit) এই পঞ্চ উপজাতি।

টুঙ্গুসিয়দিগের ইতিবৃত্ত চীনেরা রাখে; চীনেদের সঙ্গে ইহাদের ঘনিষ্ঠ যোগ।—যেন কিন্ হইতেই চীন!—তাহারা যত্নসহকারে বরাবর রাখিয়া আসিয়াছে বলিয়া জগতে তাহাদিগের জাতীয় সংবাদাদি এখনও আমরা পাইতেছি। তাহাদের অতি প্রাচীন জাতীয় ইতিবৃত্ত নাই—সেরূপ পাওয়া যায় না; চীনদেশীয় ইতিহাসবিদগণ তাহাদের সম্বন্ধে বরাবর অনু-

সন্ধানাদি করিয়া গিয়াছে; তাহারাই বিশেষভাবে তাহাদের সম্বন্ধে যাহা কিছু লিখিয়া গিয়াছে; টুঙ্গুসিয়েরা নিজেরা আপনাদের বিষয় তেমন কিছু লিখিয়া যান নাই; সম্ভবতঃ তাহারা আমোদ আহ্লাদে ক্ষত্রিয়জনোচিত কার্য্যকলাপে দিনাতিপাত করিত, তাই বোধ হয় তাহাদের লেখাপড়া ভাল লাগিত না; কিন্তু টুঙ্গুসিয় জাতীয় মনুষ্যদিগের গানে বেশ সখ ছিল, তাহা আমরা স্বদেশীয় ও বিদেশীয় উভয়বিধ গ্রন্থকারদিগের গ্রন্থের সাহায্যে জানিতে পারি। চৈনইতিহাস লেখকেরা বলেন, যে টুঙ্গুসিয়জাতির অন্যতম শাখা অতি পূর্ব্বকাল হইতে প্রাচ্য তাতার দেশে আসিয়া বসতি করে। মান্‌যু জাতির ভাষার সহিত টুঙ্গুসিয় ভাষার যে সম্বন্ধ ও সৌসাদৃশ্য আছে তাহা দেখিয়া স্পষ্ট বোধ হয়, যে টুঙ্গুসিয় জাতি মানবু জাতিরও পূর্ব্বে। তাহার ইতিহাস মানষুজাতির উৎপত্তিরও পূর্ব্বযুগকে নির্দ্দেশ করে; যখন মোগলেরা তার্তার দেশের যোদ্ধৃজাতিরূপে অবির্ভূত হয় নাই, তখনও টুঙ্গুসিয়েরা ছিল। তখন তাহাদের চিহ্ন তার্তার দেশে দীপ্তি লাভ করিত। পণ্ডিত বিসডেলু সাহেব বলেন যে প্রাচ্যতার্তারের যে নিয়োষি (Niutschi) এবং 'সুরসে' (Tchurche) নামধেয় যে জাতিদ্বয় ছিল, তাহারা কিন্ রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা এবং উক্ত উপজাতিদ্বয় টুঙ্গুসিয় নামক মূলজাতিরই লোক। তাঁহার মত সাবেল রেমুসৎ এবং ক্লপ্রথ নামক পণ্ডিতদ্বয়ও সমর্থন করেন এবং পরপরবর্ত্তী সমুদয় ইতিবৃত্ত লেখকবর্গই তাহার মতের সমর্থন করিয়া যান—তাঁহার মতের প্রতি সমাদর ও সম্মান প্রদর্শন করিয়া যান।

তাহাদের ভাষার অবশিষ্টাংশ চৈন ঐতিহাসিকেরা রক্ষা করিয়া আসেন; মানসু ভাষার সঙ্গে তাহাদের ভাষার অনেকটা সাদৃশ্য আছে এবং আধুনিক মান্‌সুরা তাহাদের সম্বন্ধসূত্রতা স্বীকার করে। এই 'নিযোচি' বা 'সুর্‌ষে' জাতিরা স্বাধীন যাযাবর জাতি; ইহারা সাগালিয়েন্ বা আমুর নদীর উত্তর দিকে এবং সোঙ্গারি নদীর পশ্চিমদিকে যে সব মরুভূমি আছে, সেই সকল মরুস্থলে পরিভ্রমণ করিয়া বেড়ায়। এই শোষোক্ত নদী অর্থাৎ সোঙ্গারি নদীর দরুণ তাহারা খিতান জাতি হইতে পৃথক ভাবে অবস্থান করে। এই খিতান জাতিও টুঙ্গুসিয় জাতির অন্তর্গত। ইহারাও কম নহে; এরাও নিয়োচি জাতির চেয়ে কিছু কম প্রসিদ্ধ নয়; ইহারা 'সুর্সে' উপজাতিভুক্ত

দলের মধ্যে একত্রীভূত হইবার পূর্ব্বে প্রাচ্যে বিস্তৃত সাম্রাজ্য স্থাপন করে; এই সুরসে জাতি ১১১৪ খৃষ্টাব্দে একজন অধিনায়কের অধীনে থাকিয়া খিতানদের উপর প্রভুত্ব কল্পনা করিয়া তাহাদিগকে জয় করে এবং চীনের উত্তরে প্রাচ্য তার্তারের মধ্যে বিখ্যাত কিন্ সাম্রাজ্য স্থাপন করে। কিন্নর হইতেই কিন্ নাম আসিয়াছে। কিন্নর ব্যতীত আর কি?

বাস্তবিক এই কিন্নরজাতির কথা আলোচনা করিতে গেলেই আমরা প্রাচীন ভারতের স্বপ্নের মধ্যে যেন মগ্ন হইয়া যাই; ইচ্ছা হয় যেন সেই অতীতে একবার ফিরিয়া যাই; মহাভারত রামায়ণের কথা মনে পড়ে, কালিদাসের কুমারসম্ভবের কথা স্মরণে আসে, সংস্কৃত কাব্যাদির মধ্যে কিন্নরের প্রাণে নিজের প্রাণ যেন মিশাইতে ইচ্ছা হয়।

এই কিন্নর জাতি যেমন বীর ছিল, সেইরূপ নৃত্যগীতপরায়ণও ছিল; প্রাচীন ভারতীয় কাব্যাদিতে যে তাহাদের নৃত্যগীতপরায়ণতার কথা আছে তাহা সত্য। কবি কালিদাস তাঁহার কুমারসম্ভব নামক কাব্যে অষ্টমসর্গে বলিতেছেন

"স ব্যবুধত বুধস্তবোচিতঃ
শাতকুম্ভকমলাকরৈঃ সমম্।
মূর্চ্ছনাপরিগৃহীতকৈশিকৈঃ
কিন্নরৈরুষসি গীতমঙ্গলঃ॥"

"বুধস্তবোচিত সেই মহাদেব কনকপদ্মসমূহের সহিত প্রত্যুষে জাগরিত হইলেন। কিন্নরেরা বীণাতন্ত্রতে মূর্চ্ছনার সংযোগ করিয়া, তদীয় মঙ্গলগানে প্রবৃত্ত হইল।" রামায়ণে আছে—

"কে ঐ মহাদ্যুতি পুরুষ, সুমধুর গায়ক ও নৃত্যকারী কিন্নরগণে পরিশোভিত হইয়া গমন করিতেছেন?"

* * * *

"নৃত্যগীতপরায়ণ কিন্নরেরা এই নরশ্রেষ্ঠের পরিচর্য্যা করিতেছে।"

কাব্যাদিতে আছে কিন্নররাজকন্যারাও গাইতেন; বনান্তে গাইতে ভাল বাসিতেন।

আমাদের ভারতীয় কবিরা গায়কদিগকে কিন্নরকণ্ঠ বলিয়া সম্মান করি-

তেন। গান ও মধুর সুরের জন্য কিন্নরেরা প্রাচীন কালে এরূপ বিখ্যাত ছিল যে তাহাদের মত কেহ গান করিতে পারে বা নৃত্য করিতে পারে—তাহাদের মত সঙ্গীতে পটু বলিলে আর অধিক প্রশংসাপত্রের আবশ্যক হইত না, তাহাই যথেষ্ট ছিল। কালিদাস রঘুবংশে একস্থানে গানবিষয়ে লব কুশের প্রশংসা করিতে গিয়া বলিয়াছেন ঃ—

"একে রামের চরিত, তাহাতে বাল্মীকির প্রণীত এবং তাহাতে আবার কিন্নরের ন্যায় সুস্বরকণ্ঠ লবকুশ গায়ক। সুতরাং এমন কি আছে, যাহাতে তাঁহারা উভয়ে শ্রোতৃবর্গের মনোহরণ করিতে না পারিবেন ?"

এই কিন্নরেরা পৃথিবীর নানাস্থানে এক সময়ে পরিভ্রমণ করিত, নানা জায়গায় গিয়া উপনিবেশ স্থাপন করে। ইহারা যেখানেই গিয়াছে, সেখানেই আপনাদের পৃথক্ অস্তিত্ব রক্ষা করিয়া আসিতে চেষ্টা করিয়াছে। ইহারা সকল স্থানে আপনাদের একটু বিশেষত্ব রাখিয়াছে। ইহারা যেখানে গিয়াছে, সেখানে ভিন্ন জাতির সঙ্গে মিশিয়া যাইতে পারে নাই কারণ ইহাদের মুখের আকৃতিতে কিঞ্চিৎ বৈলক্ষণ্য প্রকাশ পাইত; অপরজাতি ইহাদের সঙ্গে সহজে মিশিয়া যাইতে পারিত না—মিশিয়া যাইতে চাহিত না। ভারতেও প্রাচীনকালে ইহাদিগকে কিম্ভূতকিমাকারভাবে দেখিত; কিন্নর কথাটীর সংস্কৃতে শব্দার্থই হইতেছে কিং অর্থাৎকিম্ভূতকিমাকার যে নর তাহাকে কিন্নর বলে। সংস্কৃত কাব্যাদিতে কিন্নরকে কদাকার অশ্বমুখ বলা হইয়াছে।

প্রাচীন গ্রীক ধর্ম্মশাস্ত্রে একজাতীয় দেবযোনির কথা আছে তাহাদের Cyno বলে অর্থাৎ কুকুরমুখী। অশ্বমুখ নর ও শ্বানমুখ নর প্রায় একইরূপ কিম্ভূতকিমাকার। সংস্কৃত শাস্ত্রেও এই কিন্নরকে দেবযোনির মধ্যে ফেলিয়াছে। ইহারা দেবযোনি কেন? পুরাণাদি পাঠে জানা যায় যে ইহারা দেবতারা যেখানে থাকিতেন যক্ষেরা যেখানে থাকিত, সেখানেই ইহারাও প্রায় থাকিত। দেবতার রাজ্যে ইন্দ্রের রাজ্যে কৈলাসে যক্ষভূমিতে এদের বড় গমনাগমন ছিল; যক্ষের কাছে ইহারাও কুবেরের অধীনে থাকিত।

কিন্‌রা বলে তাহারা স্বর্ণ ভূমির লোক; কিন অর্থ তাহারা বলে স্বর্ণ, আর আমাদের কুবেরের ভূমিকেও সুবর্ণভূমি বলে। এবং কুবেরকেও কিন্নরেশ কহে।

অষ্টাদশ শতাব্দীর ইংলণ্ডীয় দণ্ডবিধি।

আজ যে দেশের দণ্ডবিধি পৃথিবী মধ্যে সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকার করিয়াছে—যে দেশের বর্ত্তমান দণ্ডবিধি প্রণয়নকারী ও বিচারকগণ প্রত্যেক বিষয়ই তুলাদণ্ডে উত্তোলন করিয়া সিদ্ধান্ত করেন, কিঞ্চিদধিক দেড়শত বৎসর পূর্ব্বে সে দেশের দণ্ডবিধি ও তৎপ্রয়োগবিধির বিবরণ শুনিলে পাষাণ হৃদয়ও বিগলিত ও বিচলিত না হইয়া পারে না। এ বিষয়ে সাধারণের দৃষ্টির কথা দূরে থাকুক্ আইন-প্রণয়নকারিগণও যে এবিষয়ে সম্পূর্ণ উদাসীন ছিলেন ইহাপেক্ষা লজ্জাকর বিষয় আর কিছুই হইতে পারে না। Pitt, Fox, Rockinghan প্রভৃতি সুধীগণ দণ্ডবিধির কিঞ্চিন্মাত্রও উৎকর্ষ সাধনে তৎপর ছিলেন না। এস্থলে কেবল একটী মাত্র ব্যতিক্রম দেখা যায়। যিনি এই আইন পরিবর্ত্তনের চেষ্টা করিয়াছিলেন—ইনি এডমণ্ড বার্ক নামে জগতে পরিচিত। কিন্তু বাগ্মীবর বার্কও এবিষয়ে বিন্দুমাত্রও সফলকাম হইতে পারেন নাই। বার্ক এবিষয়ে একটী গল্প বলিতেন যাহাতে দেশের ও দশের এবিষয়ের প্রতি লক্ষ্যের দৌড় বোঝা যায়। মহাসভায় এবিষয়ে কোন কথা উঠিলেই মেম্বরগণ স্বস্থান পরিত্যাগ করিতেন। এক রাত্রিতে বার্ক মহাসভা পরিত্যাগ করিতে উদ্যত হইলে জনৈক কেরাণী তাঁহাকে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করিতে বলেন। কারণ জিজ্ঞাসা করিলে কেরাণী বলেন "Oh, Sir, it is only a new capital felony."

এইকালীন দণ্ডবিধি নৃশংসতা ও বর্ব্বরতায় চরমোৎকর্ষ প্রাপ্ত হইয়াছিল! এই সময়ে, মৃত ব্যক্তির প্রতি দণ্ডপ্রয়োগ করা হইত একথা বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। "State Trials" নামক পুস্তক পাঠে জানা যায় যে, টাউনলি নামক জনৈক অপরাধীকে ফাঁসী কাষ্ঠে ছয় মিনিট ঝুলাইয়া রাখিবার পর নামাইয়া আনা হয়। (এস্থলে ইহাও বক্তব্য যে তখনও 'drop' এর সৃষ্টি হয় নাই। রজ্জু গলবদ্ধ হইলেও পাঁচ সাত মিনিট হতভাগ্যকে জীবনের সহিত বিবাদ করিতে হইত। অনেক স্থলে এরূপও দেখা যাইত যে মৃত ব্যক্তির

আত্মীয়গণ শীঘ্র শীঘ্র যাহাতে প্রাণবায়ু বহির্গত হয় সেজন্য মৃতের পা ধরিয়া ঝুলিয়া থাকিত। এপ্রকার কষ্টকর মৃত্যু কি ভয়ঙ্কর সহজেই অনুমেয়।) হতভাগ্যর তখনও জীবনদীপ সম্পূর্ণরূপে নির্ব্বাপিত হইয়াছিল না। হত্যাকারী টাউনলির বক্ষে কয়েকবার আঘাত করিয়া তাহার মস্তক স্কন্ধ হইতে বিচ্ছিন্ন করে। তৎপর হতভাগ্যের উদর বিচ্ছিন্ন করিয়া নাড়ী ইত্যাদি বাহির করিয়া সেইগুলিকে অগ্নিকুণ্ডে প্রক্ষিপ্ত করা হয়। পরিশেষে তাহার দেহ চারি খণ্ডে বিভক্ত করিয়া শবাধারে রক্ষা করা হয়।

কি বীভৎস ব্যাপার! অসভ্য নরমাংস-প্রয়াসীর পক্ষেই ইহা শোভা পায় নাকি? সুসভ্য ইংরাজের দণ্ডবিধির অবস্থা কি ছিল ইহাতেই প্রতীয়মান হইতে পারে! যে স্ত্রীজাতিকে লোকে অত্যন্ত সম্মানের চক্ষে দেখিয়া থাকেন, তাহাদের প্রতি বা কি না ব্যবহার হইত! জনৈক নাবিকের পত্নী স্বামীর মৃত্যুর পর অনাহারক্লিষ্ট সন্তানদ্বয়কে বাঁচাইবার জন্য যৎসামান্য খাদ্য কোন বিপণী হইতে অপহরণ করে। সন্তান দুইটীর একটী তিন বৎসর বয়স্ক অন্যটী মাতৃ-স্তন্যপায়ী। এই সামান্য অপহরণাপরাধে হতভাগিনীর প্রাণদণ্ড হয়। দুগ্ধপোষ্য শিশু স্তন্য পান করিতে লাগিল এরূপ অবস্থায় তাহার মাতাকে ফাঁসীকাষ্ঠে লটকাইয়া দেওয়া হইল। কি নৃশংসতা!

তৎপর, স্বামী হত্যাকারী স্ত্রীকে প্রকাশ্যে এবং সাধারণের সম্মুখে দগ্ধ করা হইত। আইনানুসারে যদিও প্রথমতঃ শ্বাসরোধ করিয়া পরে দগ্ধ করিবার প্রথা ছিল, তথাপি প্রায় অধিকাংশস্থলে দগ্ধ করিয়া যমালয়ে পাঠাইবার প্রথাই প্রচলিত ছিল।

Dublin Weekly Journal পাঠে জানা যায় যে ১৭৩২ খৃষ্টাব্দে এক দিনে অষ্টাদশজন হতভাগ্যকে ফাঁসীকাষ্ঠে প্রাণ দিতে হইয়াছিল। এবং সাধারণতঃ দশ কি দ্বাদশ ব্যক্তিকে এক সময়ে ফাঁসীকাষ্ঠে লম্বমান হইতেও দেখা যাইত।

পূর্ব্বেই রাজনীতি-বিশারদগণের এবিষয়ে কি প্রকার দৃষ্টি ছিল উল্লেখ করা হইয়াছে। জনসাধারণের নিকটও ফাঁসীকাষ্ঠে ঝুলাইয়া হত্যাকরণ ব্যাপার একটী আমোদের (তামাসার) মধ্যে পরিগণিত হইত। অত্যাশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, যে দেশের লোক অন্য দেশে লৌহশৃঙ্খলে বদ্ধ কয়েদীকে

প্রকাশ্যস্থানে কয়েদ করিতে হইত বলিয়া, সেই দেশের আইন প্রণয়নকারীদিগের প্রতি উপহাসবাণ নিক্ষেপ করিতে বিন্দুমাত্রও দ্বিধা বোধ করিত না, সেই দেশের লোকেরাই প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত ব্যক্তি কর্ত্তৃক নগর প্রদক্ষিণ করার দৃশ্য দেখিয়া অতুল আনন্দ উপভোগ করিত। অধিক কি দণ্ডিত ব্যক্তিকে দেখাইয়া পয়সা আদায় করা হইত। মিঃ হ্যারিস কৃত "Howard the Philanthrophist"য়ের জীবনী পাঠে জানা যায় যে সেফার্ড নামক একব্যক্তিকে এই প্রকারে সাধারণের সমক্ষে প্রদর্শন করিয়া ২০০ পৌণ্ড অর্থাৎ ৩০০০৲ টাকা আদায় হইয়াছিল।

দণ্ডবিধির অবস্থা পর্য্যালোচনা করিলে সহজেই অনুমিত হইবে যে দণ্ডবিধি যেরূপ নৃশংসভাবে গঠিত হইয়াছিল, তাহাতে তাহার প্রয়োগবিধি যে ততোধিক হইবে, তাহাতে কিছু মাত্র বিস্ময়ের বিষয় নাই। দণ্ডবিধি নৃশংসতার পরাকাষ্ঠা দেখাইয়াছিল সুতরাং তাহার সহকারী প্রয়োগবিধিও যে "যোগ্যং যোগ্যেন যুজ্যতে" হইবে তদ্বিষয়ে আর বিচিত্রতা কি? কিঞ্চিৎ পর্য্যালোচনা করিলে এবিষয়ের সত্যতা উপলব্ধি হইবে। নিম্নলিখিত অপরাধে অপরাধী ব্যক্তিদিগকে আইনের চরমশাস্তি ভোগ করিতে হইত। যথা—(১) অশ্ব অথবা পশ্বাদি চুরি করা (২) কাহারও বাটী হইতে ৪০ শিলিং চুরি করা (৩) কোন দোকান হইতে দোকানীর অজ্ঞাতসারে ৫ শিলিং মূল্যের দ্রব্য অপহরণ করা (৪) কাহারও পকেট হইতে ১২ পেনির অতিরিক্ত অপসারিত করা (৫) পুষ্প বাটীকা কিম্বা কোন উদ্যানের কোন বৃক্ষ কর্ত্তন করা ইত্যাদি।—Blackstone পাঠে জানা যায় যে এই প্রকার ১৬০ রকমের সামান্য অথবা যৎসামান্য অপরাধের শাস্তিস্বরূপ প্রাণদণ্ড করা হইত।

দণ্ডবিধির বেশ একটু বিশেষত্বও ছিল। সামান্য ১২ পেনি মূল্যের দ্রব্য চুরি করিলে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হইতে হইত, পক্ষান্তরে পিতাকে আক্রমণ করা গুরুতর অপরাধ বলিয়া পরিগণিত হইত না; অথবা মিথ্যা সাক্ষ্য দিয়া কোন ব্যক্তিকে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করাইলেও এই সাক্ষীকে কোনরূপ গুরুতর শাস্তি দেওয়া হইত না।

যে দেশে অশ্বচোরকে ফাঁসী দেওয়া হইত কিন্তু পিতৃহন্তা অথবা পিতার জীবন বিনাশে উদ্যত পুত্রকে কোন দোষে দোষী করা হইত না, অথবা সামান্য

দোষে দোষী করা হইত, সে দেশের আইনের অবস্থা সহজেই অনুমেয়। কেবল যে পাপের গুরুত্ব ও লঘুত্ব অনুসারে শাস্তি দেওয়া হইত না তাহা নহে। আইনে অসামঞ্জস্যেরও অভাব ছিল না। সংগৃহীত ফল চুরি করিলে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হইতে হইত কিন্তু কোন উদ্যানে প্রবেশ করিয়া ফল নিজে সংগ্রহ করিয়া অপসারিত করিলে উহা কেবল অনধিকার প্রবেশ বলিয়া পরিগণিত হইত ও অপরাধীকে যৎসামান্য শাস্তি দেওয়া হইত। গোধূলির সময় চুরির উদ্দেশ্যে কোন বিপণীস্থ গবাক্ষের সার্সি ভাঙ্গিয়া ফেলিলে, সে ব্যক্তি ফাসীকাষ্ঠে তাহার প্রায়শ্চিত্ত ভোগ করিত; পক্ষান্তরে প্রভাত কালে কোন বাটীতে চুরির উদ্দেশ্যে প্রবেশ করিলেও উহা কেবল অসদাচরণ (misdemeanour) বলিয়া পরিগণিত হইত। চুরী করিবার কালীন দোকানী দেখিতে পাইলে দ্বীপান্তর হইত, পক্ষান্তরে না দেখিতে পাইলে ও চোর পরে ধৃত হইলে তাহাকে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করা হইত। একস্থলে এক প্রভুভক্ত (?) ভৃত্য তাহার প্রভুকে হত্যা করার প্রয়াস পায়। হত্যাভিপ্রায়ে দরজা খুলিয়া তাহার প্রভুর শয়নকক্ষে তাহাকে প্রবেশ করিতে হয়। এই গুরু হত্যাপরাধে সে নিষ্কৃতি পাইয়াছিল কিন্তু তাহাকে যে তাহার প্রভুর ঘরে প্রবেশ করিতে হইয়াছিল এই অনধিকার প্রবেশ অপরাধে তাহাকে প্রাণ দিতে হইয়াছিল। অন্যস্থলে আর এক ব্যক্তি বহু গুরুতর অপরাধে অপরাধী হইলেও সকল স্থলেই সে নিষ্কৃতি পাইয়া পরে সামান্য এক বৃক্ষ ছেদন অপরাধে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হয়।

তবে কি গুরু অপরাধে অপরাধী ও লঘু অপরাধে অপরাধীর শাস্তির কি তৎপ্রয়োগবিধির কোন প্রভেদ ছিল না? ছিল বৈ কি? কিন্তু এ প্রভেদের কথা শুনিলে যুগপৎ বিস্ময়, ভয় ও হাস্যের উদ্রেক না হইয়া পারে না! গুরু অপরাধে অপরাধীকে ৪৮ ঘণ্টার মধ্যেই প্রাণ দিতে হইত ও পরে তাহার শরীর খণ্ড খণ্ড করিয়া তাহার অন্ত্রাদি বাহির করিয়া ফেলা হইত। দণ্ড প্রয়োগবিধির এই মাত্র প্রভেদ ছিল—অন্য কিছু বিশেষত্ব দৃষ্ট হয় না।

রাজদণ্ডে দণ্ডিত ব্যক্তির শাস্তির কথা শুনিলে পাষাণ হৃদয়ও বিগলিত না হইয়া যাইতে পারে না। রাজদণ্ডে দণ্ডিত ব্যক্তিকে কিছুক্ষণ ফাঁসীকাষ্ঠে ঝুলাইয়া রাখিবার পর নামাইয়া আনিয়া তাহার পেটের অন্ত্রাদি বাহির করিয়া

ফেলা হইত। তৎপর তাহার ঐ অন্ত্রাদি দগ্ধ করা হইত। রাজদ্রোহী যদি নিজের পক্ষ সমর্থন না করিত তবে তাহাকে উলঙ্গ করিয়া কোন ঘরের মধ্যে রাখিয়া পাষাণ অথবা লৌহ চাপা দিয়া তাহাকে মৃত্যুর করাল কবলে নিক্ষেপ করা হইত।

পাঠক, এখন একবার বিচার করিয়া দেখুন যে এই প্রকার আইন সুসভ্য ইংলণ্ডদেশে শোভা পায় কি নরমাংস-প্রয়াসী আফ্রিকাদেশের অধিবাসীগণের পক্ষেই শোভা পায়?

দণ্ডবিধির এ প্রকার কঠোরতার ফলাফল যে অত্যন্ত বিষময় হইবে তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি? প্রায়ই দেখা যায় যে অনেকস্থলে আসামীকে নিষ্কৃতি দেওয়ার জন্য জুরীগণ মিথ্যা মত (verdict) দিতেন। লঘু অপরাধে অপরাধী অথচ আইনানুসারে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হইবার যোগ্য ব্যক্তিকে (যথেষ্ট বিশ্বাস যোগ্য প্রমাণ থাকা সত্ত্বেও) খালাস দেওয়ার জন্য তাঁহারা মিথ্যা verdict দিয়া আসামীকে দণ্ডের হাত হইতে নিষ্কৃতি দেওয়াইতেন। অনেক স্থলে আসামীকে নিষ্কৃতি দেওয়ার জন্য যে স্থলে আসামী হয়ত অনেক টাকার দ্রব্য চুরি করার অপরাধে অপরাধী হইত সে স্থলে জুরীগণ অপহৃত দ্রব্যের মূল্য কম কম ধরিয়া ৪০ শিলিঙ্গের কম করিয়া আসামীকে নিষ্কৃতি দেওয়াইতেন। দুই এক স্থলে এরূপ বৈসদৃশ্যও দেখা যায় যে আসামী কয়েকটী গিনি অথবা কয়েক শত টাকা অপহরণের অপরাধী হইলেও জুরীগণ মিথ্যা রায় দিতেন।* দণ্ডবিধির কঠোরতার দরুণ অনেক সময় সাক্ষীগণ আদালতে অনুপস্থিত হইতেন অথবা ইচ্ছা পূর্ব্বক মিথ্যা সাক্ষ্য প্রদান করিতেন। এবং সময় সময় বাদী আদালতে ইচ্ছাপূর্ব্বক অনুপস্থিত হওয়াতে আসামীগণ খালাস পাইত। দ্বাদশ বর্ষীয়া একটী বালিকা একবার এক খণ্ড চেক কাপড় এক সহযোগীর নিকট হইতে লওয়াতে ফাঁসীকাষ্ঠে প্রাণত্যাগ করে। বাদী জানিত না যে এই অপরাধে এই প্রকার গুরুদণ্ডে দণ্ডিত হইতে হয়। অনুতাপানলে এই ব্যক্তি দগ্ধ হইয়া এই মোকর্দ্দমার অব্যবহিত পরেই প্রাণ পরিত্যাগ করে। Colquhan "on the Police of the Metropolis"

* Romili's observations on the criminal Law of England.

নামক গ্রন্থে বলেন যে সাক্ষী ও বাদীগণের গরহাজিরে ৫৫৯২ জন ব্যক্তি খালাস পায়।

কেবল যে জুরী বা সাক্ষীগণ বা পক্ষগণ এই প্রকার মিথ্যা সাক্ষ্য দিয়া আসামীদের খালাসের পথ প্রশস্ত করিয়া দিতেন তাহা নহে। বিচারকগণও সময়ে সময়ে আসামীদের নির্দ্দোষিতা প্রমাণের সাহায্য করিতেন। যিনি ইংলণ্ডের বিচারাসন পবিত্র করিয়া গিয়াছেন, যাহার ন্যায় বিচারক বিরল বলিলেও অত্যুক্তি হয় না সেই প্রথিত নামা Lord Mansfieldও একবার একজন আসামীকে নির্দ্দোষ প্রমাণের চেষ্টায় সফলকাম হইয়াছিলেন।

কঠোরতার উপর কঠোরতা—দণ্ডিত ব্যক্তিকে উকীলের সাহায্য লইতে দেওয়া হইত না। রাজদ্রোহী ও সামান্য অনধিকার প্রবেশকারীর শাস্তি একই হইলেও প্রথম ব্যক্তিকে উকীলের সাহায্য লইতে দেওয়া হইত কিন্তু নির্ধন, মূর্খ, প্রাণভয়ে ভীত অনধিকার প্রবেশকারীকে অনেক সময়েই কোনরূপ উকীলের সাহায্য লইতে দেওয়া হইত না। দুই একস্থলে বিচারকের অনুমতি লইয়া উকীল নিযুক্ত করিতে দেওয়া হইত কিন্তু এই উকীলের জুরী কিম্বা বিচারককে কোন কথা বলিবার অধিকার দেওয়া হইত না।

পরিশেষে আমরা "Thoughts on Executive Justice" নামক হইতে কয়েক ছত্র উদ্ধৃত করিয়া কবি পোপের "And wretches hang that jurymen may dine" এই বাক্যের সত্যতা প্রমাণ করিয়া পাঠকের নিকট বিদায় লইব। এই পুস্তকের প্রণেতা একস্থলে বলিয়া গিয়াছেন যে "প্রায়ই দেখা যাইত যে জুরীগণ এবং সাক্ষীগণ অনেক সময় মদের নেশায় এত বিভোর হইয়া পড়িতেন যে যেস্থলে হয়ত তাঁহারা কোন ব্যক্তির প্রাণদণ্ডের কর্ত্তা হইতেন সেস্থলে তাঁহাদের নিদ্রা হইতে উঠাইবার জন্য বলপ্রয়োগ করিতে হইত। *"

---

* A cause of much evil is the trying prisoners after dinner, when from the morning's adjournement all parties have retired to a hearty meal, which at assize time is commonly attended, among the middling and lower ranks of people at least, with a good deal of drink. Drunkenness is too frequently apparent where it ought of all things to be avoided—I mean in jurymen and witnesses. The heat of the Court, joined to the fumes of liquor, has laid many an honest jurymen into a calm and profound sleep and sometimes it has been no small trouble for his fellows to joy him into the verdict even where a wretche's life has depended on the event. This I myself have seen—as also witnesses by no means in a proper situation to give their evidence.

কি বীভৎস ব্যাপার—ইহাপেক্ষা বীভৎস কিছু হইতে পারে কি না পাঠকগণই বিচার করুন।

শ্রীযোগীন্দ্রনাথ সমাদ্দার।

বেসনের কঢ়ি।

(হিন্দুস্থানী খাদ্যপাক।)

উপকরণ।—ছোলার বেশন একপোয়া, কাঁচালঙ্কা দুই তিনটা, দৈ আধ সের, তেল আধপোয়া, ঘি এক কাঁচ্চা, মেতি হুয়ানীভর, হলুদ সিকি তোলা, জল এক পোয়া আন্দাজ, চিনি সিকি তোলা, নুন সিকি তোলা।

প্রণালী।—ছোলার বেশন একপোয়া, একটা কাঁচালঙ্কা ও একপোয়া দই ফেটাইয়া লও। তারপরে তেল চড়াইয়া ফুলুরিগুলি ভাজ।

এইবারে এক কাঁচ্চা ঘি চড়াইয়া তাহাতে মেতী ছাড়। আবার এক কাঁচ্চা বেশন বাকী দইয়ের সঙ্গে ফেটাইয়া তাহাতে হলুদগুঁড়া মিশাইয়া ঘিয়ে ছাড়। জল দাও। চিনিটুকু দাও। ফুটিলে তাহাতে ফুলুরিগুলি ছাড়। নুন দাও। নাবাইয়া কাঁচালঙ্কা-কুচি দাও। কাঁচালঙ্কা অভাবে শুক্নলঙ্কা-গুঁড়া দিতে পার।

শ্রীঃ দেবী।

নামক গ্রন্থে বলেন যে সাক্ষী ও বাদীগণের গরহাজিরে ৫৫৯২ জন ব্যক্তি খালাস পায়।

কেবল যে জুরী বা সাক্ষীগণ বা পক্ষগণ এই প্রকার মিথ্যা সাক্ষ্য দিয়া আসামীদের খালাসের পথ প্রশস্ত করিয়া দিতেন তাহা নহে। বিচারকগণও সময়ে সময়ে আসামীদের নির্দ্দোষিতা প্রমাণের সাহায্য করিতেন। যিনি ইংলণ্ডের বিচারাসন পবিত্র করিয়া গিয়াছেন, যাহার ন্যায় বিচারক বিরল বলিলেও অত্যুক্তি হয় না সেই প্রথিত নামা Lord Mansfieldও একবার একজন আসামীকে নির্দ্দোষ প্রমাণের চেষ্টায় সফলকাম হইয়াছিলেন।

কঠোরতার উপর কঠোরতা—দণ্ডিত ব্যক্তিকে উকীলের সাহায্য লইতে দেওয়া হইত না। রাজদ্রোহী ও সামান্য অনধিকার প্রবেশকারীর শাস্তি একই হইলেও প্রথম ব্যক্তিকে উকীলের সাহায্য লইতে দেওয়া হইত কিন্তু নির্ধন, মূর্খ, প্রাণভয়ে ভীত অনধিকার প্রবেশকারীকে অনেক সময়েই কোন-রূপ উকীলের সাহায্য লইতে দেওয়া হইত না। দুই একস্থলে বিচারকের অনুমতি লইয়া উকীল নিযুক্ত করিতে দেওয়া হইত কিন্তু এই উকীলের জুরী কিম্বা বিচারককে কোন কথা বলিবার অধিকার দেওয়া হইত না।

পরিশেষে আমরা "Thoughts on Executive Justice" নামক হইতে কয়েক ছত্র উদ্ধৃত করিয়া কবি পোপের "And wretches hang that jurymen may dine" এই বাক্যের সত্যতা প্রমাণ করিয়া পাঠকের নিকট বিদায় লইব। এই পুস্তকের প্রণেতা একস্থলে বলিয়া গিয়াছেন যে "প্রায়ই দেখা যাইত যে জুরীগণ এবং সাক্ষীগণ অনেক সময় মদের নেশায় এত বিভোর হইয়া পড়িতেন যে যেস্থলে হয়ত তাঁহারা কোন ব্যক্তির প্রাণ-দণ্ডের কর্ত্তা হইতেন সেস্থলে তাঁহাদের নিদ্রা হইতে উঠাইবার জন্য বল-প্রয়োগ করিতে হইত। *"

---

* A cause of much evil is the trying prisoners after dinner, when from the morning's adjournement all parties have retired to a hearty meal, which at assize time is commonly attended, among the middling and lower ranks of people at least, with a good deal of drink. Drunkenness is too frequently apparent where it ought of all things to be avoided—I mean in jurymen and witnesses. The heat of the Court, joined to the fumes of liquor, has laid many an honest jurymen into a calm and profound sleep and sometimes it has been no small trouble for his fellows to joy him into the verdict even where a wretche's life has depended on the event. This I myself have seen—as also witnesses by no means in a proper sitnation to give their evidence.

কি বীভৎস ব্যাপার—ইহাপেক্ষা বীভৎস কিছু হইতে পারে কি না পাঠক-গণই বিচার করুন।

শ্রীযোগীন্দ্রনাথ সমাদ্দার।

বেসনের কড়ি।

(হিন্দুস্থানী খাদ্যপাক।)

উপকরণ।—ছোলার বেশন একপোয়া, কাঁচালঙ্কা দুই তিনটা, দৈ আধ সের, তেল আধপোয়া, ঘি এক কাঁচ্চা, মেতি দুয়ানীভর, হলুদ সিকি তোলা, জল এক পোয়া আন্দাজ, চিনি সিকি তোলা, নুন সিকি তোলা।

প্রণালী।—ছোলার বেশন একপোয়া, একটা কাঁচালঙ্কা ও একপোয়া দই ফেটাইয়া লও। তারপরে তেল চড়াইয়া ফুলুরিগুলি ভাজ।

এইবারে এক কাঁচ্চা ঘি চড়াইয়া তাহাতে মেতী ছাড়। আবার এক কাঁচ্চা বেশন বাকী দইয়ের সঙ্গে ফেটাইয়া তাহাতে হলুদগুঁড়া মিশাইয়া ঘিয়ে ছাড়। জল দাও। চিনিটুকু দাও। ফুটিলে তাহাতে ফুলুরিগুলি ছাড়। নুন দাও। নাবাইয়া কাঁচালঙ্কা-কুচি দাও। কাঁচালঙ্কা অভাবে শুকলঙ্কা-গুঁড়া দিতে পার।

শ্রীঃ দেবী।

জারকনেবু ও ধনেশাক দিয়া

মাংসের কোপ্তা।

(খাদ্যপাক।)

উপকরণ।—পাঁঠার বা ভেঁড়ার কিমা মাংস আধসের, আদা পোন্‌তোলা, পাটনাই পেঁয়াজ একটা, দেশী ছোট পেঁয়াজ একটা, ঘি এক কাঁচ্চা, গোল-মরিচ-গুঁড়া দুয়ানীভর, পাঁওরুটী এক স্লাইস, দুধ এক ছটাক, ধনেশাক আধ আঁটি, জারক নেবু দেড়টা, কাঁচালঙ্কা একটা, নুন দুয়ানীভর, চিনি দুয়ানীভর।

প্রণালী।—প্রথমে কিমা-মাংসটা ভাপাইয়া লইবে। এক কাঁচ্চা ঘি চড়াইয়া তাহাতে একটা ছোট পেঁয়াজ ভাজিয়া লও এবং সেই ঘিয়ে সিদ্ধ মাংসটা ভাজিয়া লও। তারপরে নামাইয়া গোলমরিচ-গুঁড়া আদা ও পেঁয়াজ বাঁটা মাংসে বেশ করিয়া মিশাইয়া লও। তারপরে দুধে ভিজান এক শ্লাইস পাঁওরুটীও উহাতে মিশাও। অল্পক্ষণ আগুনে চড়াইয়া একটু আঁট বাধাইয়া লও।

এইবারে কিমা-করা ধনেশাক, জারকনেবু-কিমা, চিনি, কাঁচালঙ্কা-কুচি ও নুনটুকু দিয়া পুর কর।

মাংসের ভিতরে পুর ভরিয়া দিয়া কোপ্তার আকারে গড়ন করিয়া ভাজ। আধপোয়া ঘিয়ে কোপ্তাগুলি ভাজ।

ভোজন বিধি।—ডাল ভাত, লুচি রুটির সঙ্গে খাও।

শ্রীঃ দেবী।

বর্ণানুক্রমিক সূচী।

বিষয়			নাম	পৃষ্ঠা
অষ্টাদশশতাব্দীর ইংলণ্ডীয় দণ্ডবিধি		...	শ্রীযোগীন্দ্রনাথ সমাদ্দার	৫৩০
অভাগিনী (গল্প)	...	...	৺কালিদাস চক্রবর্ত্তী	৬৪
আলিপুর	...	...	শ্রীগোলোক বিহারি দে	৩৭
আমের লক্ষ্ণৌ মোরব্বা (খাদ্যপাক)		...	শ্রীসুদক্ষিণা দেবী	৯২
আনারসের লক্ষ্ণৌ মোরব্বা	ঐ	...	ঐ	১৪৪
আদার মিষ্টি রুটী	ঐ	...	শ্রীঃ দেবী	৩৮৭
উৎসব (গান)	...	...	শ্রীঋতেন্দ্রনাথ ঠাকুর কবিভাস্কর	৩৮৮
কছবাহ্ রাজবংশ	...	...	শ্রীনগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এম, এ, বি, এল,	৩১
ক'য়নাক বেশী কথা (গান)		...	শ্রীঋতেন্দ্রনাথ ঠাকুর কবিভাস্কর	৩৩৬

কথালাপ।—(লর্ড কর্জন কর্ত্তা নয় গিন্নি, পার্টিশন (Partition) ও পর্দ্দা, অত্যুত্থানং হি পতনায়, লর্ড কার্জনের অহংরোগ, বঙ্গের কোমরবন্ধ, রাজভক্তি, বঙ্গ-নারিকেলবৃক্ষ ও তাহার ফল, কলমের চারা, কৃষাণশাসক লর্ড কর্জন ও বঙ্গভূমির কর্ষণ, বিদেশী ফল ও স্বদেশী শস্য) ঐ ৪৩০,৫০৪

কত দিনে আর (কবিতা) ...	... শ্রীজীবেন্দ্র কুমার দত্ত	৩৫৬
কহাবৎ বা জয়পুরী প্রবচন	...শ্রীশোভনা সুন্দরী দেবী	৩৯৯,৪৮১
৺ কবিবর বিহারী লাল চক্রবর্ত্তীর অপ্রকাশিত পত্র		৪২৩
কড়াইশুটির শিঙ্গাড়া (খাদ্যপাক)	... শ্রীঃ দেবী	৪৭৪
কচুর মালপুয়া ঐ	... ঐ	৪৩৩
কাঁচা পেঁপে দিয়া মাংসের কোপ্তা	... ঐ	৪৩৫

কাঁচা আমের আচার (খাদ্যপাক) ... শ্রীসুনৃতা দেবী ২৬১
কিন্ ও কিন্নরজাতি ৫২৬
কুচবেহার ... ... শ্রীনগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়
এম, এ, বি, এল, ২৮৯
কুচবেহার ও কামরূপ ... ... ঐ ৩৬৪
কুসুম ও যৌবন (কবিতা) ... ... ঐ ৫৬
গাভি-বৃক্ষ ৪৭৯
গীতগোবিন্দে শ্যামবর্ণ ... ... শ্রীহিতেন্দ্রনাথ ঠাকুর
কবিগুণসাগর ১
গীতিকবি আমিরখস্রু ও সুলতান নেজামদ্দিন ঐ ১৫৬
গুরুনানক (কবিতা) ... ... শ্রীঋতেন্দ্রনাথ ঠাকুর
কবিভাস্কর ১৯৭
গুরুনানকের ব্যবসায়বুদ্ধি ... ঐ ২১৬
গুরুনানক ও বৈষ্ণবহরিদাস ... ঐ ৩২৭
গুরুনানকের উপনয়ন ... ... ঐ ৪৪১
জ্ঞান ... ... ৺মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ৪৮৯
চকলেট (খাদ্যপাক) ... ... শ্রীসুদক্ষিণা দেবী ২৩৫
চাপাটি ঐ ... ... শ্রীঃ দেবী ২৬০
চা ... ... শ্রীযোগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়
এম, এ, ৪২,৫০
চিত্রে অপ্রতিম ভাব ... ... শ্রীহিতেন্দ্রনাথ ঠাকুর
কবিগুণসাগর ২৮
ছবি ও তাহার ব্যাকগ্রাউণ্ড বা পৃষ্ঠভূমি ... ঐ ১৯৯
জয় জয় বিশ্বরাজ (গান) ... শ্রীঋতেন্দ্রনাথ ঠাকুর
কবিভাস্কর ২১২
জয়ন্তী (গল্প) ... ... শ্রীপ্রজ্ঞাসুন্দরী দেবী ২৪৬
জানিনা (কবিতা) ... ... ৺ কালিদাস চক্রবর্ত্তী ১৬৭

জীবন (কবিতা) ... ... শ্রীনগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়
এম, এ, বি, এল, ১৪৩
"টমকাকার কুটীর" প্রণেত্রী শ্রীমতী হ্যারিয়েট
বিচার ষ্টো ... ... শ্রীসুষমা সুন্দরী দেবী ৩৫৭
তির্ব্বতে তানসেন ... ... শ্রীহিতেন্দ্রনাথ ঠাকুর
কবিগুণসাগর ১৪৯
তানসেন ও স্বরসাধন ... ... ঐ ২২৭
দেবনামে অনাদর ... ... শ্রীঋতেন্দ্রনাথ ঠাকুর
কবিভাস্কর ২৭
দোল (গান) ... ... ঐ ৪৫৬
ধর্ম্মভাণ ... শ্রীঃ ৫১৭
নিবেদন (কবিতা) ... ... শ্রীজীবেন্দ্র কুমার দত্ত ২৭
নিয়মিত উপাসনা ৩৮৫
পবিত্রতা ... ... ৺ হেমেন্দ্রনাথ ঠাকুর ৩৩৪
পরোপকারই পুণ্য ... ... শ্রীঃ ২০১
পাকা তেঁতুলের আচার (খাদ্যপাক) ... শ্রীসুনৃতা দেবী ২৬২
পদরাগ।—(পদরাগ, পুণ্য দাতা, মনেতেই সব, নিশিদিন জপ, তুমি আদি চিরকবি, অন্নপূর্ণা, তুমি যাকে দাও সেই পায়, মহাধনী, স্বাধীনতা, কর'নাক আশা, কেন বিষাদে মগন, চিরকাল রহিব তোমার পথে, কেন আছ বসে, দণ্ড মঙ্গলের জন্য, জপরে অন্তরে, অন্তর্যামী, দুই পক্ষ, কোথা যাও অন্ধকারে, প্রেমচন্দ্র, কি হবে আমার গতি, সব সহিব, প্রত্যুষে, সর্ব্বজ্ঞ সে বিচারক, আরাধনা, জননী উঠায়ে লও) ... শ্রীঋতেন্দ্রনাথ ঠাকুর কবিভাস্কর
২৫৮ ৩৩১ ৩৭৩ ৪১৫ ৫০৬
পুণ্য (কবিতা) ... ... শ্রীদেবেন্দ্রনাথ সেন ২৬
পুরাতন ঐ ... ... শ্রীঃ দেবী ৩০২
পুণ্য ভাণ্ডার (চিঠি, সন্ধ্যা, বাল্মীকির বিষাদোচ্ছ্বাস ও হিমাচল—সচিত্র) ... শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর
তত্ত্বনিধি বি, এ, ৭১

পূর্ব্বদ্বার (গান) ... ... শ্রীঋতেন্দ্রনাথ ঠাকুর কবিভাস্কর ৪৪০

প্রশংসা ভিখারী (কবিতা) ... শ্রীভূপেন্দ্রবালা দেবী ১১৩

বরাকরে বারদিন (বার বৎসর পূর্ব্বে বারজনে) ৪১৭,৪৬৪,৫১০

বসন্তে বরষা (কবিতা) ... ... শ্রীঃ দেবী ৬৩

বঙ্গ-অদর্শন ... ... শ্রীঋতেন্দ্রনাথ ঠাকুর কবিভাস্কর ২৫৪

বঙ্গে মহালয়া ... ... ঐ ৩১৮

বাঙ্গালী (কবিতা) ... ...শ্রীঋতেন্দ্রনাথ ঠাকুর কবিভাস্কর ৩৯

বাঞ্ছিতের প্রতি ঐ ... ... শ্রীজীবেন্দ্র কুমার দত্ত ৪০৩

বিশ্বমাতা ঐ ... ... ঐ ৪৮৮

ব্যাকুলতা ... ... শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর তত্ত্বনিধি বি, এ, ১৪২

বেসনের কারি (খাদ্যপাক) ... শ্রীঃ দেবী ৫৩৬

ব্রত (গল্প) ... ৺ কালিদাস চক্রবর্ত্তী ৩৯৫

ব্রহ্মে শূলীনাথ ... ... শ্রীসুনৃতা দেবী ১৬৫

ব্রাহ্মসমাজের প্রয়োজন ... ... শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর তত্ত্বনিধি বি, এ, ১৬০

ব্রাহ্মসমাজের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস ঐ ১০৮

ব্রাহ্মসমাজ সংস্থাপনের পূর্ব্বে রাজা রামমোহন রায়ের আরও কএকটী কার্য্য ঐ ৪৫৯

ভাষা ... ... ঐ ৩৩৭

ভারতমাতার স্বর-সাধন ... শ্রীঋতেন্দ্রনাথ ঠাকুর কবিভাস্কর ৫২১

ভানুমতী (গল্প) ... ... শ্রীঃ ৩

ভিনিস ভ্রমণ (সচিত্র) ... ... শ্রীযোগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এম, এ, ১৮৩ ২২১ ৩১১

৺মাইকেল মধুসূদন দত্তের অপ্রকাশিত পত্র সচিত্র) ৮৮ ২৩০ ৩২১

মাংস বা মাছের ইষ্টু-দোম্মা (খাদ্যপাক) ... ৪১

মাংসের ভাজা-ইষ্টু ঐ ... শ্রীঃ দেবী ২০৬

মাছের পরোটা ঐ ... ঐ ৪৩৩

মাংসের কোপ্তা ঐ ... ঐ ৫৩৭

মানসিংহের কাবুল জয় ... শ্রীনগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এম, এ, বি, এল, ২১৩

মুদির দোকান ... ... শ্রীঋতেন্দ্রনাথ ঠাকুর কবিভাস্কর ২৯০

যোগ (কবিতা) ৪৯

যোগীগায়ক হরিদাসস্বামী ... ... শ্রীহিতেন্দ্রনাথ ঠাকুর কবিগুণসাগর ৩৭৬

রামায়ণের সুমালি রাক্ষস ও আফ্রিকার সুমালিভূমি (সচিত্র) ... ... ঐ ৭৬ ১১৪

রামপ্রসাদের গান ... ঐ ৪৯২

রাজনীতি ও রমণীপ্রতিভা ... শ্রীসুষমা দেবী ১৮৮

রাজা রামমোহন রায়ের বাল্যকাল ... শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর তত্ত্বনিধি বি, এ, ২৩৩

রাজা রামমোহন রায়ের বিদ্যাশিক্ষা ... ঐ ২৭৬

রাজা রামোহন রায় কলিকাতা বাসের পূর্ব্বে ঐ ৩৩৭

রাজা রামমোহন রায়ের কলিকাতাবাস ঐ ৪০৩

লক্ষ্ণৌ পোলাও (খাদ্যপাক) ... শ্রীসুদক্ষিণা দেবী ৯৩

লৌহ (মরিচা) ... ... ৺হেমেন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৯৮

শ্মশান ... ... শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর তত্ত্বনিধি বি, এ, ২০৩

শৃণ্বন্তু বিশ্বেহমৃতস্যপুত্রা ... ... ঐ ৩২৫

সত্যলোক (কবিতা) ... ... শ্রীঋতেন্দ্রনাথ ঠাকুর কবিভাস্কর ৩১৫

সফেদার ফুলপায়স (খাদ্যপাক) ... শ্রীঃ দেবী ২০৫

সঙ্গীতে যুগলমূর্ত্তি	শ্রীহিতেন্দ্রনাথ ঠাকুর কবিগুণসাগর	৪৫৭
সাংখ্যস্বরলিপি (কেটে যায় রে বেলা গান)	ঐ	৪৭
ঐ (বিশ্বভুবন রঞ্জন গান) ...	ঐ	১৪৫
ঐ (হিন্দুস্থানী গান) ..	ঐ	২০৭
ঐ (আমি আমার প্রধান সহায় গান)	ঐ	২৭২
ঐ (নাহি দিই দুখ গান) ...	ঐ	৩৮২
ঐ (পুণ্য দৃষ্টি গান) ...	ঐ	৪৩৬
(তারে চেনা দায়) ...	ঐ	৫২৩
ঐ ...	শ্রীসুষমা সুন্দরী দেবী	৯৪
ঐ (অচল ঘন গহন গুণ ব্রহ্মসঙ্গীত)	ঐ	৩১৬
ঐ (রোগের ঔষধ) ...		৪৭০
সাধ (কবিতা)	শ্রীজীবেন্দ্র কুমার দত্ত	২৮৩
সিদ্ধ ডিমের নূতন প্রকার কারি (খাদ্যপাক)		৪০
সুইডিস কিন্নরী বা গায়িকা লিণ্ড ...	শ্রীসুষমা দেবী	২৩৮
সুন্দর (গান)	শ্রীঋতেন্দ্রনাথ ঠাকুর কবিভাস্কর	৪৮৮
সৌন্দর্য্য রক্ষা		৩৮৯
সোণায় অরুচি (উপন্যাস) ...	শ্রীউমেশ চন্দ্র মৈত্রেয়	১২২,১৬৮ ২৬৩ ৩০৩ ৩৪৩ ৩৯০ ৪৪৬
স্বর্গীয় কেশবচন্দ্র ব্রহ্মানন্দের নব কুমারের শুভ জাত-কর্ম্ম—ব্রহ্মস্তোত্র (সচিত্র) ...	৺মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর	৩৫
স্বদেশের উন্নতিকল্পে মহিলাদিগের কর্ত্তব্য ...	শ্রীমনীষা দেবী	২৮৫
হ্যারিয়েট মার্টিনো	শ্রীসুষমা দেবী	৫৭

পুণ্য পঞ্জিকা।

ফাল্গুন ও চৈত্র।—১৩১২, ইং ১৯০৬।

ফাল্গুন	ফেব্রুয়ারি	দিন	চৈত্র	মার্চ	দিন	চৈত্র	মার্চ	
১	১৩	ম	১৫	২৮		১	১৫	বৃ	১৫	২৯	
২	১৪	বু	১৬	২৭		২	১৬	শু	১৬	৩০	
৩	১৫	বৃ	১৭	১	মার্চ্চ আরম্ভ	৩	১৭	শ	১৭	৩১	
৪	১৬	শু	১৮	২		৪	১৮	র	১৮	১	এপ্রেল
৫	১৭	শ	১৯	৩		৫	১৯	সো	১৯	২	
৬	১৮	র	২০	৪		৬	২০	ম	২০	৩	
৭	১৯	সো	২১	৫		৭	২১	বু	২১	৪	
৮	২০	ম	২২	৬		৮	২২	বৃ	২২	৫	
৯	২১	বু	২৩	৭		৯	২৩	শু	২৩	৬	
১০	২২	বৃ	২৪	৮		১০	২৪	শ	২৪	৭	
১১	২৩	শু	২৫	৯		১১	২৫	র	২৫	৮	
১২	২৪	শ	২৬	১০		১২	২৬	সো	২৬	৯	
১৩	২৫	র	২৭	১১		১৩	২৭	ম	২৭	১০	
১৪	২৬	সো	২৮	১২		১৪	২৮	বু	২৮	১১	
		ম	২৯	১৩				বৃ	২৯	১২	
		বু	৩০	১৪				শু	৩০	১৩	

বিবাহ—ফাল্গুন ৪।৬।১৩।১৫।১২।২৬।২৭।

শিবরাত্রি—৯ ফাল্গুন, শ্রীকৃষ্ণের দোলযাত্রা—২৬ ফাল্গুন, বাসন্তীপূজা—১৮ চৈত্র, অন্নপূর্ণা পূজা—১৯ চৈত্র, চড়কপূজা—৩০ চৈত্র।